মাস, ঋতু, সংবৎসর নিয়ন্ত্রিত। ইহারই প্রশাসনে হিমালয়াদি পর্ব্বত হইতে পূর্ব্বদিগভিগামিনী গঙ্গাদি নদী প্রবহমানা; পশ্চিমাভিগামী সিন্ধু প্রভৃতি নদ প্রবাহমান। ইহারই প্রশাসনে মানবেরা দেবতার, দেবতারা যজমানের, পিতৃগণ হোমের প্রশংসা করেন। "এতস্যাক্ষরস্য প্রশাসনে সূর্য্যচন্দ্রামসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।" ইত্যাদি বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

হে গার্গী, এই অক্ষর জ্ঞান সম্যক্ আয়ত্ত না করিয়া যিনি হোম করেন, যজ্ঞ করেন, তপস্যা করেন, তাঁহার হোম, যজ্ঞ, তপস্যা আংশিক স্বর্গফলদ হইলে, পরিণামে ক্ষীণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব যাহারা এই অক্ষর-তত্ত্ব জ্ঞান না করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হয়েন, তাহারাই কৃপণ। তাহাদের সুখই অল্প।

"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ'। "অল্পং বৈ তেষাং সুখং" (ছান্দোগ্যোপনিষৎ)। এই কৃপণগণের জীবন পণ্যক্রীত দাসাদির মত ভারবহ মাত্র। আর যাঁহারা অক্ষর-তত্ত্ব সম্যক্ বুঝিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ।

"অথ য এতদক্ষরং গার্গী বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ" "ভূমৈব তেষাং সুখং"। সে তাঁহাদের সুখ পরিপূর্ণ আনন্দ প্রচুর।

এই অক্ষর কেমন জান? তিনি পৃথিব্যাদি যাবতীয় বস্তুতে বিদ্যমান; অথচ পৃথিব্যাদির কোনকালে ইহাকে জানিতে পারা সম্ভব নহে। এই পৃথিব্যাদি যাঁহার শরীর স্থানীয়, যিনি এই পৃথিব্যাদিকে নিয়মিত করিতেছেন, সেই অন্তর্যামী অমৃত আত্মাই অক্ষর। ইনি অদ্রষ্টা হইয়াও দ্রষ্টা, অজ্ঞাতা হইয়াও জ্ঞাতা। ইহা হইতে পৃথক কোন পদার্থই নাই। যাহা দৃশ্যমান, তাহা ইহারই অবভাস। আমাদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টি লইয়া সে দৃষ্টির বিচার করিলে তাহা ঔপাধিক; তাঁর দৃষ্টি তাঁরই, এভাবে বিচার করিলে নিত্য। আমাদের আকার, রূপ দৃষ্টান্তে তাঁহাকে সাকার বল, সত্য রূপ বিশিষ্ট বল, তাহা ঔপাধিক—মায়িক। আর যদি তাঁরই নিজ আকার, তাঁরই নিরঞ্জন রূপ—তাঁরই, ইহা মনে করিতে পার, তাহা হইলে প্রকৃতিই তিনি সাকার, রূপবিশিষ্ট। ভক্তানুকম্প-ধৃত-বিগ্রহ শ্রীভগবান্, নিত্য দ্রষ্টা, নিত্য দৃষ্টি স্বরূপ, বিজ্ঞানগম্য, বিজ্ঞান-লভ্য, মনোগম্য—যাহাই বলা যাউক, সবই তাঁহাতে কল্পিত, সবই তাঁহাতে সত্য। আমরা যে ভাবে কর্ত্তা, সে ভাবে তিনি কর্ত্তা নহেন।

গার্গী সন্তুষ্ট হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রণাম করতঃ তত্ত্ব কথা শ্রবণে মুগ্ধ—হৃদয়

ব্রাহ্মণগণকে কহিলেন,—"ভোঃ ভগবন্তো ব্রাহ্মণাঃ! যাজ্ঞবল্ক্য বস্তুতই ব্রহ্মিষ্ঠ; সকলেরই নমস্কারার্হ। শ্রেষ্ঠ সম্মান ইঁহারই। ইনি আমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবাদী মহর্ষি।

জনক রাজের অশ্বমেধ যজ্ঞ আজ সফল হইল। ব্রাহ্মণগণের পবিত্র সম্মিলনে আজ কৃতকৃত্যতা লাভ করিল।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ ভট্টচার্য্য।

কাম]

প্রেমময়।

মম হৃদয়-তরু শাখে, জাগ জাগ
আজি গাহ গাহ পাখী!
লহ নাম তাঁর বার বার,
প্রেম-সুধায় মাখি॥
প্রভাত রবির উদয়ে যাঁহার,
প্রেম আলোক হেরি।
অস্ত-রবির কিরণে তাঁহার
হের করুণ পূর্ণ আঁখি॥

ভেবনারে মন, ভেবনারে আর,
ভাবনা কিছুই নাহ।
জীবনে মরণে হৃদয়-রতনে,
হৃদয়ে নিয়ত পাই॥
মৃত্যু কোথায়,—দুঃখ কোথায়?
বিরহ বেদনা নাহি।
অরুণ-কিরণে প্রেমময় মোর,
হৃদয়-পানে চাহি॥

কাম]

পাগলের প্রলাপ।

বেশ তো, যত ইচ্ছা ভয় দেখাও, আমি কিন্তু কিছুতেই ভয় পাচ্চিনা। তোমাকে যে না চেনে, সে তোমাকে ভয় করুক বা 'জড় সড়' হয়ে বসে থাকুক—আমি সে সব কর্ত্তে গেলাম্ কেন? যারা তোমার খবর রাখে না, তা'রা তোমার চোখ-রাঙ্গানিতে কম্পবান হ'ক; কিন্তু আমি যে, দাদা! তোমাকে বেশ চিনি,—বিলক্ষণ করে তোমাকে জানি। আমার কাছে ও সব রং-তামাসা তোমার চল্‌বে না। জানি গো জানি, তুমি এত রকমের ভেল্কি দেখাতে পার, যে তা' দেখে বুদ্ধিকে স্থির রাখা কঠিন। তা' হ'ক, বুঝ্‌তে পারি বা না পারি, ধর্‌তে পারি বা না পারি; কিন্তু এ সব সত্যিকার ভেল্কি—তা'তো ঠিকই জানি! ভয় একটু হয়—হ'ক; তা'য় আর কি করব! ধর্‌তেই না হয় নাই পারলাম্। 'বাজী'

করে যে ভেল্কি দেখায়,—ধর্ত্তেই যদি পার্‌লাম, তবে আর বাজি দেখানো হল কি? কিন্তু মনে মনে তো জানি ও সবই মিথ্যা—তা'ই নিশ্চিন্ত আছি। অনেক সময় মা'রা শুধু শুধু ছেলেকে ধমক দিয়ে কাঁদায়; আবার আদর ক'রে হাঁসায়,—এই রকম করে রঙ্গ দেখে। বোকা ছেলেরা ধমক খেয়ে কাঁদে, আর আদর পেলে হাঁসে। আমি কিন্তু তা'তে ভুল্‌চি না। তুমি ধমক দিলেই যে পড়ে পড়ে কাঁদ্‌বো, তা' মনে করো না;—ও সব ফিকির তোমার আমি বুঝি! তুমি ধমকই দাও, আর সজোরে একটি চপেটাঘাতই কর—আর যাই কর, আমি 'টবাং' করে তোমার কোলে চড়ে বস্‌বো। তারপর তোমার বকৃতে হয় বকো, মার্‌তে হয় মেরো,—যা খুসি হয় করো; আমি চুপ করে পড়ে থাকৃবো এখন।

আচ্ছা এ কি তোমার কাণ্ড বল দেখি! চিরকালই কেবল তোমার ঐ খেলা আর তামাসা!! বেশ, যত ইচ্ছা খেল; কিন্তু আমাকে আর কিছু বল্‌তে পাবে না; আমি তোমার কোল থেকে নড়্‌চি না!! তুমি তো বহুরূপী—'বহু' রূপ ধরে খেলে বেড়াচ্ছ—বেশ খেলে বেড়াও; আমি তোমার ঐ মাতৃমূর্ত্তির জ্বালা-জুড়ান স্নেহ-সিক্ত কোল্‌টিতে ঘুমিয়ে নিই। বাবা!! একদিন নয়, দু'দিন নয়, যুগ-যুগান্ত ধরে তোমার এই খেলা চল্‌চে,—থামাবার নামটি নেই। তা বাপু! তোমার নাচ্‌তে ভাল লাগে, নেচে নাও; মনের মধ্যে নৃত্য করে বেড়াও, আমাকে আর আসরে নামিও না। আমি বাস্তবিকই আর পেরে উঠ্‌ছি না; আমাকে এইবার একটু অবসর দিতে হয়েছে! তোমার খেলার জ্বালায় উত্তক্ত হয়ে উঠেছি, ভাই! দোহাই তোমার, এইবার একটীবার খেলা থামাও। বন্ বন্ করে মাথা ঘুরে পড়্‌চে। মাথাটা আগে একটু ঠাণ্ডা হ'ক —তার পর যদি ভাল লাগে, তখন না হয় ফিরি ফি॰ ০ আবার খেলা যাবে! তোমার কি বল ভাই, মাথাও নাই—মাথার ব্যাথাও নাই!! আমাদের আস্ত মাথাটি কিন্তু তোমার খেলার চোটে গুঁড়া হ'তে বসেছে। তোমার কাছে শুয়ে নিস্তার নাই, জেগে নিস্তার নাই। জেগে থাকৃলে কি অপরূপ ভেল্কি দেখাও, তা দেখে দেখে অবাক্ হয়ে যেতে হয়—বুদ্ধিতে যে তা'র কিছু থই পাই নাই! আবার যদি ঘুমুই; স্বপ্ন রাজ্যে সে কি খেলা তোমার!! কোন খানেই কিন্তু খেলার কামাই নাই। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এ তিনটা যেন তোমার খেলার মাঠ; সেখানে কেবল বোঁ বোঁ করে ঘুরপাক দেওয়া হচ্চে!!

আমার একটা পরামর্শ যদি শুন, তবে বলি। এ আগেকার মাঠ দুটো ছেড়ে পালাই চল! বেশ তো সুষুপ্তির সুনীল নির্ম্মল প্রান্তরে পড়িয়া পড়িয়া,

একবার প্রাণের বোঝা গুলা নামাইয়া হাল্কা হইয়া লই না কেন? এ দুটো মাঠ যেমন কদর্য্য, তেমনি উব্‌ড়ো খুব্‌ড়ো; —কেবল সেখানে হোঁচট্ খেয়ে খেয়ে পড়ে যাচ্চি! এখানে যে অগ্নি জ্বালা; চারিদিক যেন পুড়িয়ে ফেল্‌চে;—এক জায়গায় তিষ্ঠুবার জো নাই। আর ও মাঠটি কেমন স্নিগ্ধ, শীতল ছায়া—কি চারু দৃশ্য! কোন জ্বালা নাই—কোন তাপ নাই। পথের কোন খানে বন্ধুরতা নাই। যদি খেলতেই হয়, তবে চল ঐ খানে গিয়ে খেলিগে। আনন্দময়-কোষে বসে বসে দুজনে কত আনন্দের খেলাই খেল্‌ব!—বেশ হবে! এ নিরানন্দের ভূমি ছেড়ে—চল সখা! পালিয়ে যাই।

আপনাদের পুরাতন পাগল।

ভোগ ও ত্যাগ।

কাম]

ভগবতী ভারতভূমি চিরকালই ত্যাগ'ভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। জগতে যে অন্যান্য দেশ আছে, তাহা সব 'ভোগ'স্থান অন্যান্য দেশের লোকগণ দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির পরিতৃপ্তির নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতের মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের কর্ম্মের অভ্যন্তরে স্ফুট বা অস্ফুট ভাবে ত্যাগ বিদ্যমান রহিয়াছে।

অন্যান্য জীবের যেমন দেহ ইন্দ্রিয়াদির ভোগই চরম লক্ষ্য, আহার বিহার ব্যতীত অন্য লক্ষ্য তাহাদের নাই, মানবের কি তাহাই উদ্দেশ্য? যদি মানবের তাহাই লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি হইতে মানবের বৈশিষ্ট্য কি? বাস্তবিক পক্ষে অন্যান্য জীবের ন্যায়, মানব জন্ম ভোগের নিমিত্ত নহে। অনেক জন্মের পর দুর্ল্লভ মানব-দেহ ধারণ, কেবল মাত্র আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির জন্য। কিন্তু সেই আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি ভোগে হয় না, তজ্জন্য ত্যাগই একমাত্র অবলম্বনীয়। যদি ভোগের পরাকাষ্ঠা সম্পাদনই আমাদের চরম লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে পশু প্রভৃতির দেহ দ্বারাই পর্য্যাপ্ত হইত; পুনঃ মানব-দেহ ধারণের বিন্দুমাত্রও প্রয়োজন থাকিত না। যদি বল, বিচিত্র বিমানে যথেচ্ছ-বিহার, নদ নদী গিরিতে অনায়াসে গমন, অভ্রংলিহ প্রাসাদে অবস্থান, মুহূর্ত্ত মধ্যে জগতের ব্যাপার অবগতি, প্রভৃতি বিচিত্র ভোগ অন্য দেহে সম্ভব নহে ও সেই সমস্ত ভোগ সম্পাদনের জন্যই মানব দেহ। তাহা হইলে একবার ভোগের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। যান, বসন, আহার, প্রাসাদ আমার নাই, তাহা অপ-

রের দেখিয়া আমার মনে দুঃখ জন্মে ; সেই দুঃখ নিবারণের জন্য সেই সমস্ত বস্তুর আহরণ করিতে হয় ; তাহাতে ও দুঃখ-পরম্পরা আছে। জগতে সকলে সেই সমস্ত দ্রব্য যথেচ্ছ-আহরণ করিয়া দুঃখ-নিবৃত্তি করিতে পারে না। অপিচ এই সমস্ত দ্রব্য মানব-মতি-প্রসূত ; যদি কেহ তদপেক্ষা সুনিপুণ সুন্দর যান আহারাদির ব্যবস্থা করিতে পারে, তবে তাহা অপরের দুঃখের হেতু হয়। যে ব্যক্তি তাহা আয়ত্ত করিয়াছে, তাহারও তদ্বিষয়ে দৃঢ় অভিনিবেশ করিতে হয় ; তাহার রক্ষণ, উন্নতি ও সংস্কারে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়। এই সমস্ত বিচিত্র বস্তুর উপভোগ কখনও স্পৃহা নিবৃত্তি করে না, বরং শত গুণে বর্দ্ধিত করে। চিরকাল নির্জ্জন বনবাসী অনাস্বাদিত-মিষ্টান্ন মানব, নগরে ধনীর গৃহে ধনীকে স্বাদু মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতে দেখিয়া তাহাতে তাহার লালসা জন্মিল। সে ভাবিল ঐ অপূর্ব্ব বস্তু প্রাপ্ত হইলে, তাহার স্বাদ গ্রহণ করিলে, তাহার অপ্রাপ্তি নিবন্ধন দুঃখ নিবৃত্ত হইবে। যখন সে সেই দুর্ল্লভ বস্তু পাইয়া আস্বাদ গ্রহণ করিল, তখন মুহূর্ত্তমাত্র একটু শান্তিলাভ করিল বটে, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে জ্ঞাতাস্বাদ-ইন্দ্রিয় আবার তাহা পাইবার জন্য লোলুপ হইল। এইরূপ যত বস্তুই ইন্দ্রিয়কে উপহার দেও না কেন, সে ততই নূতন নূতন তজ্জাতীয় বস্তু চাহিবে। সেইজন্য ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥"

কাম্য বস্তুর উপভোগের দ্বারা কখনও বিষয়াভিলাষ নিবৃত্ত হয় না ; যেমন অগ্নিতে ঘৃত প্রক্ষেপ করিলে তাহা অধিকতর প্রজ্বলিত হয়।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী বিষয় ; তাহাদের গ্রহণের নিমিত্ত যথাক্রমে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, রসনা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটী ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। যদি ইহা অপেক্ষা অতিরিক্ত বিষয় থাকিত, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের আধিক্য ও আবশ্যক হইত। বি পূর্ব্বক ষিঞ্ (ষি) ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে অচ্ প্রত্যয় করিয়া 'বিষয়' পদ সিদ্ধ হইয়াছে ; অর্থাৎ যে পুরুষকে বন্ধন করে, তাহাকে 'বিষয়' বলে। ইন্দ্রের অর্থাৎ আত্মার ভোগ সাধক বলিয়া শ্রোত্রাদিকে ইন্দ্রিয়' বলা হয়। যেমন ভৃত্য নানাস্থান হইতে বিবিধ ভোগ্য-দ্রব্য আহরণ করিয়া প্রভুকে উপহার দেয়, তাহাতে প্রভুর পরিতৃপ্তি হয় ;—সেইরূপ আত্মার পরিজন-স্থানীয় ইন্দ্রিয় সমূহ পার্থিব বিষয় জাত আহরণ করিয়া, প্রভুস্থানাপন্ন আত্মাকে উপঢৌকন দিতেছে। অনাদি অবিবেক নিবন্ধন আত্মা তাহাতে আত্ম-আত্মীয়

ভাব স্থাপন করতঃ নিত্যমুক্ত স্বরূপ হইয়াও বদ্ধের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন। অজ্ঞান বশতঃ আত্মা বুঝিতে পারেন না 'যে এই সমস্ত বিষয়ের সহিত আমার কোন ও সম্বন্ধ নাই; ইহারা বিষয়, আমি অবিষয়।' বিষয়ের স্বরূপ বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে তাহার ভোগের পরিণতি কতদূর?

শব্দ ধ্বনিমাত্র সামান্য-ধর্ম্মরূপে এক হইলেও, 'ষড়জাদি' বিশেষ ধর্ম্ম দ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হয়। তাহা আবার স্তুত্যাদিরূপে প্রিয়, এবং অনিত্য-বীৎসাদিরূপে অপ্রিয় হইয়া থাকে। লোক, প্রশংসা শ্রবণ করিয়া তাহাতে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করতঃ তাহার দ্বারা নিজের বৃদ্ধি, এবং নিন্দা শ্রবণ করিয়া তাহার দ্বারা নিজের হানি বিবেচনা করিয়া থাকে। প্রশংসা বা নিন্দা শব্দে কল্পিত; তাহা আবার আত্মাতে কল্পনা করিয়া লোক আত্মার হানি বা বৃদ্ধি কল্পনা করে। শব্দ বাহ্য পদার্থ; তাহার সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু লোক সেই অত্যন্ত বাহ্য বস্তুতে আত্ম-আত্মীয়ত্ব বুদ্ধি স্থাপন করিয়া নিজেকে সুখী দুঃখী বিবেচনা করে।

সেইরূপ একই স্পর্শ, শীত, উষ্ণ ভেদে, নানা প্রকার ভেদ প্রাপ্ত হইয়া সুখ দুঃখের কারণ হয়। সুন্দররূপ দর্শনে তাহাকে পাইবার জন্য মনে বাসনা হইল; পরে দেহের ক্রিয়া আরম্ভ হইল; এইরূপে তাহাকে লাভ করিবার জন্য কত সাধনের আশ্রয় লইতে হইল। উর্ব্বশী দর্শনে পুরুরবার কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা পুরাণ পাঠকগণের অবিদিত নাই। একমাত্র রূপের মোহে সমাচ্ছন্ন মানব, তাহাকে আত্মা বিবেচনা করিয়া, তাহাকে পাইবার জন্য ইতস্তত ধাবিত হয়; ভেলার দ্বারা দুস্তর সাগর উত্তীর্ণ হয়, রর্জ্জু বোধে বিষধর অহিকে আলিঙ্গন করে। এক রূপই মনুষ্যকে কতদূরে নিক্ষেপ করে, তাহা সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগোচর। আবার কুৎসিত রূপ দর্শন করিয়া তাহা অপ্রিয় বোধে তাহাতে দ্বেষ করে। মধুর রস আস্বাদন করিয়া তাহাতে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করতঃ তাহা লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত হয়। রাহু একবার মাত্র রসনার দ্বারা সুধার আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছিল; তাহা গলাধঃকরণ করিতে পারে নাই। সে তথাপি ছিন্নদেহ হইয়াও সুধা পাইবার জন্য সুধাকরকে অদ্যাপি গ্রাস করে। পক্ষান্তরে অতি কটু তিক্তরস আস্বাদ করিয়া তাহাতে হেয়ত্ব বুদ্ধি স্থাপন করে। পুষ্পাদির মনোহর গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া লোকে তাহাতে মানব পুনরায় ধাবিত হয়; বিষ্ঠাদির গন্ধে উদ্বেজিত হইয়া তাহা ত্যাগ করে।

উল্লিখিত পাঁচটী বিষয় গ্রহণ করিতে করিতে ইন্দ্রিয় সমূহ এতদূর অভ্যস্ত হয় যে, বিষয় ব্যতীত তাহারা অন্য কিছু গ্রহণ করিতে সমর্থ হন না। থিয়েটারে

বারাঙ্গনাদিগের সঙ্গীতও শব্দ, এবং দেবগৃহে অধীত বেদ-বেদাঙ্গ ব্যাখ্যানও শব্দ। উভয়ের মধ্যে শব্দের কোনরূপ পার্থক্য না থাকিলেও, লোক অর্থব্যয় ও রাত্রি জাগরণ করতঃ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে তাহা শুনিবার জন্য কেন ধাবিত হয়? আর অর্থ ব্যয় নাই, রাত্রি জাগরণে দেহক্ষয়ের ও সম্ভাবনা নাই; তথাপি আচার্য্যের উপদেশ এক ঘণ্টাকাল লোকে শুনিতে চায় না বা কেন? তাহার কারণ, শ্রবণেন্দ্রিয় ঐরূপ সঙ্গীত অনেক বার শুনিয়া অভ্যস্ত হইয়াছে; সংস্কার দৃঢ়ভাবে বসিয়াছে, তা'ই শ্রবণ তজ্জাতীয় সঙ্গীত শুনিতে চায়। আচার্য্যের ব্যাখ্যান তাহার শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করে নাই; সুতরাং তাহা তাহার কর্ণ-জ্বালা উৎপাদন করে। সে ঐরূপ দর্শন করিয়াছে; নব-নীরদ-নিন্দিত কুণ্ডলি-বিড়ম্বী কেশগুচ্ছের শোভায় দিক্‌হারা হইয়াছে, নর্ত্তকীর অভিরাম অঙ্গ সঞ্চালনে নয়ন স্থাপন করিয়াছে; তাই তাহার নয়ন পুনঃ পুনঃ সেই বস্তু দর্শন করিতে চায়। কিন্তু পরম পবিত্র নাভোদর্ক দেব মূর্ত্তি কিংবা শিখা-তিলক-মণ্ডিত-মস্তক আচার্য্য-মূর্ত্তি দর্শনে তাহার নয়ন অভ্যস্ত নহে; সুতরাং নয়ন তাহা চায় না। পবিত্র আজ্য, চরু, পায়সও খাদ্য, এবং হোটেলে ম্লেচ্ছপক্ক মাংস, পলাণ্ডু, লসুন প্রভৃতিও খাদ্য; তবে পরোক্ত খাদ্যে লোকের স্বভাবতঃ রুচি হয় কেন? কেনই বা হবিষ্যান্নে অরুচি ঘটে? তাহার কারণ রসনা ঐ সমস্ত বস্তুর বার বার আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপ অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে বিচার করিলে, তাহাদের স্বরূপ বোধগম্য হইবে। এই সমস্ত প্রিয়াপ্রিয় শব্দ-স্পর্শাদি মানবকে ইতস্ততঃ চালিত করে, অকাণ্ডে নিপাতিত করে। কিন্তু মানব অজ্ঞান নিবন্ধন তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারে না; তা'ই শব্দ-স্পর্শাদিতে মনোনিবেশ করে। সমস্ত প্রাণীর সুখই প্রার্থনীয়; কিন্তু বিষয়জ সুখ চপলা প্রভাবৎ ক্ষণভঙ্গুর এবং পরিণামে দুঃখদ। বিবেকী পুরুষ বিষয়ের স্বরূপ অবগত হইয়া, তাহা অনন্ত দুঃখের নিদান ভাবিয়া তাহার দিকে ধাবিত হ'ন না; বরং মলমূত্রাদির ন্যায় বর্জ্জন করেন। যতই এই সমস্ত বিষয় ভোগ করা যায়, ততই ইন্দ্রিয়ের কৌশল বৃদ্ধি হয়; নূতন নূতন বিষয়ে নিক্ষিপ্ত হইতে হয়। যখন ভোগে বিন্দুমাত্র শান্তি ও সুখ নাই, বরং অনন্ত দুঃখের আগার, তখন সুধী ব্যক্তির তাহা হইতে উপরত হওয়া বিধেয়। ত্যাগই একমাত্র শান্তির উপায় ও সুখের আশ্রয়।

বিশেষতঃ প্রাণী-পীড়ন ব্যতীত ভোগ সম্পাদিত হইতে পারে না; শত শত তরু, গুল্ম, লতা, পশু, পক্ষীর প্রাণবিয়োগ করিয়া তোমার ভোগ-বাসনার পরিতৃপ্তি করিতে হইতেছে। মানব! তুমি এক গ্রাস অন্ন মুখে দিবে, কত জীব

তোমার ঐ গ্রাসটী গ্রহণ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিয়াছে; এবংবিধ পর-পীড়ক ভোগে আসক্ত হওয়া মানব মাত্রের কথনও উচিত নহে। ভোগে যেমন পরের কষ্ট, সেইরূপ নিজেরও অশেষবিধ ক্লেশ বিদ্যমান আছে। কিন্তু ত্যাগে হিংসা, দ্বেষ কিংবা অসূয়া নাই। পক্ষান্তরে পরহিত ব্রত তাহার মধ্যে নিহিত আছে। তবে ইন্দ্রিয়গুলিকে কিরূপে বিষয়ভোগ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারা যায়? বিষয়ের দোষ দর্শন করতঃ তাহা হইতে তাহাদিগকে ফিরানই একমাত্র উপায়! এইরূপ বিষয়ের দোষ দর্শন করিতে করিতে আবার ইন্দ্রিয়সমূহ সদ্বিষয়ে ধারণ করিতে অভ্যস্ত হইবে। যে ইন্দ্রিয়, মন একদা উদ্দাম অশ্বের ন্যায় দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করত কত লোকের অনিষ্ট সাধনে সর্ব্বদা নিরত থাকিত, এখন আর তাহারা দুষ্ট বিষয়ের দিকে প্রবৃত্ত হয় না। এখন মনঃ বিষয় পরিহার করিয়া অবিষয় পাইবার জন্য ব্যগ্র হইবে

শব্দ স্পর্শাদি বিষয় আর অবিষয়, সুতরাং ইন্দ্রিয় তাহা গ্রহণ করিতে পারে না 'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুঃ তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্'—স্বয়ম্ভু ইন্দ্রিয়দিগকে বাহ্যদর্শী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন সুতরাং ইহারা অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না, এইরূপ—শ্রুতি তদ্বিষয়ে প্রমাণ অতএব এখন ভোগ ও ত্যাগ উভয়টী বিচার করিয়া দেখুন যে কোনটী ত্যজ্য, কোনটী বা গ্রাহ্য।

এই জন্য প্রাচীন মহর্ষিগণ ভোগস্থান হইতে দূরে অবস্থান করিতেন,—ভোগ স্পৃহা মন হইতে সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিতেন। তাই তাঁহারা সংসারাবস্থায়ও পরমানন্দলাভ করতঃ অন্তে অপুনরাবৃত্তি পদ প্রাপ্ত হইতেন। ত্যাগে প্রতি-দ্বন্দ্বী নাই, পরের দ্রব্য আহরণ করিতে হয় না, কেবল মানসিক ব্যাপার মাত্র। প্রথমে অত্যন্ত বাহ্যবস্তু বসন, ভূষণ, অশন প্রভৃতিতে হেয়ত্ব বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা করিতে হয়; অনন্তর গো, হিরণ্য, চিত্ত, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতিতে ত্যাগবুদ্ধি কর্ত্তব্য।

অতঃপর পুত্র কলত্রে, পরে স্বীয় দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতিতে ত্যাগবুদ্ধি দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিবে। যখন ঐ সমস্ত বিষয়ে ত্যাগ প্রতিষ্ঠালাভ করিবে, তখন তাহার অন্য কিছুই প্রাপ্তব্য থাকিবে না। এই ত্যাগ-ব্রতের জন্য ভারত জগতের গুরু। যে দেশে বাল্যকালে উপবীত গ্রহণ করিয়া সমস্ত বিলাস-বাসন পরিত্যাগ করতঃ গুরুগৃহে থাকিয়া ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, পরে গার্হস্থ্য-আশ্রমে দৈব, পৈত্র্যকার্য্য, অতিথিসেবা প্রভৃতির দ্বারা ত্যাগের মহিমা প্রদর্শন করিতে হয়; তৃতীয় বৈখানস আশ্রমেও ত্যাগের বিস্তার সাধন করিতে হয়; চতুর্থ সন্ন্যাসাশ্রম কেবল ত্যাগেরই জন্য; সেখানে পুত্র, কলত্র,

চিত্ত, ঐশ্বর্য্যের কণামাত্রও নাই ; সমস্ত বস্তুকে তৃণবৎ উপেক্ষা করিয়া কৌপীন পরিধান করতঃ ব্রহ্মপদে মতি রাখিতে হয়। এই সময়ে শ্রুতিও গম্ভীর নিনাদে বলিয়াছেন,—

'ন কর্ম্মণা প্রজয়া জায়য়া ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুঃ'—

কর্ম্ম, পুত্র ও জায়া দ্বারা মুক্তিলাভ করা যায় না, কেহ কেহ একমাত্র ত্যাগের দ্বারা মুক্তিলাভ করিয়াছেন। মুক্তিই মনুষ্যের একমাত্র প্রার্থয়িতব্য বস্তু ; মনুষ্যদেহ ধারণ তাহারই জন্য, ভোগের জন্য নহে। সেই মুক্তিলাভ করিতে গেলে ত্যাগই আশ্রয়নীয়।

অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী (পঞ্চতীর্থ)।

কাম]

আসিবে।

বিলম্ব হউক সখা, তাহে কোন ক্ষতি নাই।
'আসিবে আসিবে তুমি' এতে যে ভরসা পাই॥
বসে আছি কত যুগ, তব আশাপথ চেয়ে
নয়ন পলকহীন, তোমাপানে চেয়ে চেয়ে॥
হৃদয়-কমল মাঝে, আসন বিছায়ে একা।
বসে আছি কত দিন, টের কি পাওনি সখা!
ভাবিয়া ভাবিয়া মন পাগল হয়েছে এবে।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া আঁখি, শুষ্ক হয়েছে তবে॥
কাঁদাতে আপন জনে, কেন ভাল বাস প্রভু।
ব্যথা দিতে নিজ জনে, বেদন হয় না কভু॥
সে বিশ্বাস হয় না যে, তুমি যে করুণাময়।
তব প্রেমে আছে পূর্ণ, হেরি তা' যে বিশ্বময়॥
অন্য কাজ থাকে সখা, সব তুমি নিও সেরে।
যখন রবে না কাজ, এস এ কুটীর দ্বারে॥
ব্যস্ত আমি নহি কিছু, হ'ক না বিলম্ব আর।
এ যে পরমানন্দ, নহে তা' যে ঢাকিবার॥
হৃদয়-নিকুঞ্জ মাঝে, রব প্রতিদিন জাগি।
অবসর হলে তুমি আসিও দাসের লাগি॥

সে দিন কেমন হবে, ভাবি আমি তাই মনে।
এই রবি, এই চন্দ্র, কি শোভা ধরিবে ব্যোমে॥
জল, স্থল, অন্তরীক্ষে, আসিবে অপূর্ব্ব সাজে।
সব আলো, সব গন্ধে, তুমি ধরা দিবে নিজে॥
নয়ন দেখিবে তব, কিবা রূপ মনোহর।
সুধা সম প্রবেশিবে, কর্ণে তব কণ্ঠস্বর॥
অমৃত পরশ তব, হৃদয় পাগল করা।
অমৃত চাহনি তব, শান্তি সুধায় ভরা॥
আসিবে তুমি যে সেথা, সে কথা শুনিতে চাই।
বিলম্ব হউক সখা তাহে কোন ক্ষতি নাই॥

কাম]

মায়ের পূজা।

মা! মা! তুমি সে দিন (গত বৎসর) আমাদের ছে'ড়ে চ'লে গিয়েছিলে!!! জানিনা, তুমি "মা" সন্তানগণকে ফেলে চলে গিয়েছিলে কি মানব-চক্ষুর অদর্শনে সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে ছিলে; কিন্তু মা, তোমার সে বিশ্ব বিমোহন-কারিণী, পশান্তি-দায়িনী প্রতিমার অদর্শনে সমস্ত ভারতের হৃদয়ে হৃদয়ে এক বিরহ জনিত দুঃখের প্রবাহ চলিতেছিল। সকল অন্তঃকরণই যেন অপূর্ণ, সে দিন যেন বিষাদের প্রতিবিম্বে সকল হৃদয়ই নীলিমায় কলুষিত ছিল। তোমার অদর্শনে সমস্ত ভারত বিপন্ন,—ব্যথিত! মা-হারা সন্তানের মত "মা—মা" বলে কাতর কণ্ঠে কত কাঁদ্‌ছিল। মা! আমাদের অশ্রুনীরে ভাসিয়ে তুই চ'লে গিয়েছিলি!!!

মার অদর্শনে।

আঃ, বহু দিন হ'য়ে গেল! এক্ষণে আর সহ্য হয় না! ভারত আর বিচ্ছেদ-রূপ দুঃখ-সাগরে ভাস্‌তে পারে না। মা, অসহ্য যন্ত্রণা! এস মা! একবার এস! একবার দেখা দাও মা! তোমার সেই প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখা দিয়ে ভারতকে অকূল প্রবাহমাণ দুঃখ-সাগর হ'তে তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে তুলে নাও মা! যতই দিনের পর দিন গত হচ্ছিল, আমাদের হৃদয়ের প্রজ্বলিত শোকাগ্নিতে কে যেন ঘৃতাহুতি প্রদান কর্‌ছিল, আর সেই অগ্নি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রবল ভাবে জ্বলে জ্বলে উঠ্‌ছিল! এক্ষণে এস মা!

মা! এস মা!

ভারত-হৃদয়ে সংস্থাপিত হও মা। প্রজ্বলিত শোকাগ্নিতে সুশীতল বারিধারা সিঞ্চন কর মা! দুঃখ-নিবারিণি, শরণাগত-পালিনি, ভারতজননি! মা তুমি সন্তানের দুঃখ দেখে এখনও নীরবে বসে আছ? একবার কৃপা-কটাক্ষ পতিত কর মা!

ওমা! তুমি যে ভারতের প্রতি চিরানুকূল। তুমি বৎসর বৎসর আমাদের একবার প্রতিমারূপে দেখা দাও। প্রতি বৎসরেই তোমার অপত্য-স্নেহের প্রবাহ বহিয়া থাকে। প্রতি বৎসরেই আমরা তোমার নিকটে অনন্ত স্নেহ-ধারা পান করিয়া থাকি; এবং স্বর্গীয় কমনীয় মুখারবিন্দু দর্শন করতঃ দেহে জীবন পাইয়া নবোৎসাহিত হই।

যুগে যুগে মায়ের অনন্ত স্নেহ-ধারা পান করিয়া থাকি।

মা! প্রকৃতি-রাণী পূর্ব্বেই ভারতকে তোমার শুভাগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়াছে। এখন যেন আবার নূতন যুক্তি সমাগত। গত বৎসরের বিচ্ছেদ-জনিত দুঃখের নিবিড় কৃষ্ণ-বর্ণ সমুদ্রের উপর আনন্দরশ্মি ঝলকিতেছে। সকলের মনই মাতার আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া উৎফুল্ল! প্রকৃতি-রাণী নব বেশে সজ্জিতা। নভোমণ্ডল মেঘ নির্ম্মুক্ত নীলাকাশে নক্ষত্র মালা বিভূষিত। চারিদিকে অনুপম শোভা। বৃক্ষ সকল ফুল-ফলাবনত। সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে সুবর্ণাগ্রযুক্ত ধান্য সকল যেন তোমার আগমন জন্য কনকাসন বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে। এক্ষণে এই সকল অপূর্ব্ব শোভার আধার স্বরূপা সুখদা ধরিত্রী দেবীর প্রতি হৃদয়ে হৃদয়ে প্রীতি-প্রেম-বারি অবিশ্রান্ত উত্তাল তরঙ্গ বিস্তার করতঃ ধাবিত হইতেছে!! চতুর্দ্দিকেই আনন্দময়। সকল প্রাণীর ধমনীতে ধমনীতে আনন্দের ধারা প্রবাহিত। ধরণী আনন্দে নিমজ্জিতা হইয়া মাতার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। মা! এস মা! তৃষিত প্রাণ জুড়াও মা! তোমার সেই শারদ-শশাঙ্কের কমনীয় আভা-বিনিন্দিত প্রশান্ত মূর্ত্তির প্রভ, মস্তকে মনোহর উজ্জ্বল কিরীট, হস্তে রবিকর সমন্বিত অসি, সমস্ত জগতের দুঃখ-তিমির নাশ করতঃ স্বর্গীয় সুখ-প্রদায়িনী শান্তির আলোকে আলোকিত করুক!!

নূতন যুগ।

মাগো! সর্ব্বস্বরূপিনি! প্রতি বৎসর তুমি একবার আসিয়া দু'দিন থাক মাত্র। আর তমসাচ্ছন্ন মানব-মানসাকাশে সমুজ্জ্বল প্রভা প্রকাশ করতঃ চলিয়া যাও। মা আমরা তোমার পুত্র, তুমি আমাদের মা! তুমি আমাদের মানব চক্ষুর অন্তহিত থাক; কিন্তু মা! তোমার ক্রোড়ে শায়িত ভারতী অপত্য-স্নেহ সুখে সতত নিমজ্জিত। মা, তুমি

তুমি মা ভারত জননী!

সর্ব্বস্বরূপিণী, তুমি মা জগজ্জননী! আঁধারে আলোকে তুমি মা ভারতের আলোক।

২

মা! মা! আমাদের পথ দেখাও, আমরা নিবিড় অন্ধকারে পতিত। মা, তুমিই আমাদের দুঃখ-নিশার একমাত্র উজ্জ্বল তারা। তুমি ভিন্ন আর কে আমাদের অন্ধকারে পথ প্রদর্শক? দুঃখ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সুখধামে উপস্থিত হইতে হইলে, তুমি ভিন্ন আর আমাদের কে কর্ণধাত্রী আছে মা? তুমি ফেলিয়া যেও না মা! তুমি ভিন্ন আমাদের আর গতি নাই। তুমি আমাদের প্রতি কৃপা-দৃষ্টি বর্ষণ কর মা! কিন্তু যে মা জগৎ সুখ-বিধায়িনী, যে মা সর্ব্বসন্তাপহারিণী, যে স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ে জগৎ শায়িত, সে মায়ের শান্তিময় ক্রোড়ে কি আমরা স্থান পাব না? আমাদের পক্ষে সে জননীর প্রসাদ কি নিতান্তই দুষ্প্রাপ্য?— ———অসম্ভব! কিন্তু আবার মনে যেন কেমন এক প্রকার নিরাশার ছায়া পড়ে। আবার মনে হয়———যে জননীর স্নেহের দ্বারা আমরা পুষ্ট, যাঁর নিঃশ্বাসে আমরা অনুপ্রাণিত, যাঁর করুণাধারা আমাদের হৃদয়ে নিরন্তর প্রবাহিত, সেই অনন্ত স্নেহ-পারাবার-স্বরূপিনী জননীর চরণ যুগল কখনও একবার কৃতজ্ঞতার বাষ্পবারি দ্বারা অভিষিক্ত করিতে পারি নাই, তাঁহার নিকট কাতর কণ্ঠে ভক্তি গদগদ চিত্তে কখনও ত' একবার "মা—মা" বলে ডাকি নাই, আমরা তাঁ'র চরণে অকৃতজ্ঞ!

তুমি যে আমাদের দুঃখ-নিশার একমাত্র উজ্জ্বল তারা।

কিন্তু আবার মনে হয়,—এরূপ চিন্তন অলীকতা মাত্র। কারণ—"কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখন নয়॥" মাতৃপদে সন্তান যতই অপরাধ করুক না কেন, সন্তানের শত অত্যাচার সহ্য ক'রিয়াও জননী স্নেহ বর্ষণে কুণ্ঠিত হইবেন না।

জননী! তোমার ও শ্রীচরণকমলে আমরা কত আব্দার ক'রে থাকি, মা ভিন্ন আর কা'র কাছেই বা সন্তান আব্দার করবে?—কা'র কাছেই বা হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা জানাব? তুমিই মা আমাদের বাসনা-প্রদীপ জ্বালিয়া দিতেছ, আবার তুমিই সেটীকে নিভাইতেছ। কিন্তু মা! এ বাসনা যে অনন্ত! এক বাসনা পরিতৃপ্ত হইতে না হইতেই অপর বাসনার উদয়! মা, চিরকালই কি এইরূপ অদম্য বাসনা হৃদয়কে কলুষিত করিবে? এ যে শান্তি পথের কন্টক! এই বাসনা, এই ইচ্ছা—তোমার প্রশান্তিদায়িনী জননীর সুখ-বিধায়ক নামও

অদম্য বাসনার নিবৃত্তি কর মা!

একবার স্মরণ করিতে বাধা প্রদান করে। তোমার সেই স্বর্গীয় কমনীয় মুখারবিন্দের একবার ধ্যান করিতে গেলেও পার্থিব বাসনা, পার্থিব চিন্তা আসিয়া মন কাড়িয়া লয়। চিরকালই কি এই অনন্ত বাসনা-জালে বিজড়িত থাকিতে হ'বে মা!

যে চির-প্রশান্তিময় পথ এক অনন্ত সুখধামে পৌছিয়াছে, যে পথ চির-প্রফুল্লিত, যে পথাভিমুখে অগ্রসর হইলে, মায়ের সমস্ত সন্তান-সন্ততি মায়ের কার্য্যে ব্রত, মায়ের ধ্যানে রত হইতে পারিবে; মা আমাদিগকে সেই পথের পথিক কর। সমস্ত ভারতের মন এক দিকে ধাবিত করাও মা!

কোন্ মোহিনী শক্তি বলে মুগ্ধ হয়ে জীবনাবধি তোমাকে ভুলে রহিলাম? মোহের বন্ধন কি ছিন্ন কর্‌বি না মা! ঘুমের ঘোর কি ভাঙ্গাবি না মা! জালে পতিত হ'য়ে ভুলে আছি ব'লে কি চিরকাল এই অধম সন্তানগণকে ভুলাইয়া রাখিবি?

মা! তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তুমি আমাদের জননী। আমরা তোমার মোহান্ধ সন্তান। সর্ব্বমঙ্গলময়ি! তুমি কি কখনও সন্তানের অমঙ্গল দেখতে পার? জননী সন্তানের দুঃখে দুঃখী, সন্তানের সুখে সুখী! যে মা অবনীর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী, যিনি ত্রিভুবনের সর্ব্বসুখ বিধায়িনী, যাঁর সামান্য কৃপা-কটাক্ষের দ্বারা সমস্ত জগতের মানব-হৃদয় আলোকিত হয়, তাঁর সন্তানের বিষাদানল কেন? তাঁ'র সন্তান মোহান্ধ ও দুঃখ নিপীড়িত কেন? এই দুঃখ পাশ হ'তে মুক্ত করা কি সেই অসীম শক্তিশালিনী মহামায়ার শক্তির বহির্ভূত?—অসম্ভব! মা'গো! ইহাতে কি গূঢ় মর্ম্ম নিহিত আছে, তাহা মানব-বুদ্ধি ও শক্তির আগোচর। জানিনা মা, তুমি কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত সতত যত্নবতী। জানি না, অচিন্ত্য-চরিতে! তুমি কোন্ পথের পথ প্রদর্শিনী? কেবল জানি যে তুমি চির মঙ্গলময়ী ও সুখ বিধায়িনী!

মা সর্ব্বময়ি! পরমেশ্বরি! তোমার ইচ্ছাই ফলবতী হউক। সন্তানের শ্রীচরণের এই প্রার্থনা!

জননি! আজ তুমি আমাদের ঘরে। তোমার দেব দেব বাঞ্ছিত শ্রীচরণ কি দিয়ে সাজাব মা? ও চরণের উপযুক্ত আমাদের কি আছে মা? আমাদের অর্ঘ্য-ডালি শূন্য, আমাদের উদ্যান পুষ্পহীন মানস-মরুভূমি সম! কিছুই নাই, কি দিব মা?

মা এসেছেন। আজ এই সুখের দিনে ভারত মায়ের চরণ কমলে

কি দিবে, এই ভেবেই আকুল! কিছুই নাই, কেবল ভারতের শরীরে, ক্ষীণ প্রাণের ভিতরে যে ভক্তিটুকু সঞ্চারিত, তাহাই ভারত তোমার চরণে অঞ্জলি স্বরূপে প্রদান কর্‌ছে। জননি! সন্তানের এই দীনহীন উপহার কি গ্রাহ্য নয় মা? ভ্রমরের মত হৃদয়-বন হ'তে ভক্তি-মধু চয়ন কর্‌বে না কি মা?

মাতঃ! প্রকৃতির দিবা ধুপ ধূনাদি গন্ধ দ্রব্য তোমার চরণে উত্থিত হউক অবনী তোমার চরণে ভক্তি অঞ্জলি প্রদান করুক; তোমার যশ গুণ গানে দশদিশি ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হউক।

জননি! প্রেমময়ী তুমি। বেথ মাগো—শান্তিময় সুশীতল ছায়ায় তোমার॥

শ্রীবিশ্বনাথ মিত্র।

অর্ঘ্য] সন্দেহ ও তাহার নিরাকরণ।

১।—সন্দেহ।

কিছুদিন পূর্ব্বে কোনও একজন বিশিষ্ট ও প্রথিতনামা ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"অশীতি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া এই যে মানব-জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি, ইহা কি কেবল আহার, নিদ্রা প্রভৃতি কতিপয় স্বাভাবিক ধর্ম্ম পরিপালন করিলেই ইহার উদ্দেশ্য সফল হইবে; অথবা ইহার আর অন্য উদ্দেশ্য আছে? যদি থাকে, তাহা হইলে তাহা কিরূপেই বা লাভ হইয়া থাকে, এবং তাহা কি করিয়াই বা ঠিক রাখিতে হয়।" তাহাতে তিনি এই মর্ম্মে উপদেশ দিলেন যে, মনুষ্য-জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কেবল কতকগুলি স্বাভাবিক ধর্ম্ম আচরণ করিলেই তাহার উদ্দেশ্য পালন করা হইল না। ইহার উদ্দেশ্য কি, তাহা ঠিক করিতে হইলে, গৃহস্থের পক্ষে সৎগ্রন্থ পাঠ, সাধু সঙ্গ ও মাঝে মাঝে নির্জ্জন বাস করিয়া ধ্যান, বিচার ও উপাসনাদি করিয়া জীবনের উদ্দেশ্য যে কি, তাহা ঠিক করিয়া লইতে হইবে। পরে দৃঢ়ভাবে উহার সফলতা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিলে, মানব নিজ অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারিবে। এই কথাগুলিতে কেমন একটা সন্দেহ আসিল, ভাবিলাম আমাদের মত নিম্ন অধিকারীর পক্ষে, আমাদের মত অল্প বুদ্ধিজীবীর পক্ষে, আমাদের মত অকর্ম্মঠ জীবের পক্ষে এই বাক্যগুলি সর্ব্বাংশে কিরূপে প্রয়োগ হইতে পারে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলে ক্ষতি কি।

সৎগ্রন্থ পাঠে চরিত্রের সংগঠন হয় এবং জীবনের উদ্দেশ্যও যে কতকটা ঠিক হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সৎগ্রন্থ নির্ব্বাচন করে কে? সকলেই এক এক গ্রন্থের পক্ষপাতী, কাজেই কোন্ ব্যক্তির উপর ভার দিলে আমার প্রকৃতি অনুযায়ী গ্রন্থ বাছিয়া দিবেন; তাহারই বা নিদ্ধারণ কার কি করিয়া? ষড়্দর্শন যাঁহার সম্পত্তি, তাঁহাকে নির্ব্বাচনের ভার দিলে, তিনি তাঁহার দর্শন-শাস্ত্র হইতে সংখ্যাতীত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া দর্শন-শাস্ত্র পাঠের উপকারিতা দেখাইয়া আমাকে তাহাই পাঠ করিতে বলিবেন। যিনি ন্যায়-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তিনি তাঁহার ন্যায় ও তর্ক-শাস্ত্রের পরিচয় দিয়া আমাকে ন্যায়-শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, যিনি সাহিত্য-রক্ষী, তিনি তাঁহার সাহিত্য-সাগর মন্থন করিয়া গুরু-গম্ভীর সন্ধি-সমাস-যুক্ত শব্দের লহরী তুলিয়া আমাকে চমকিত করিবেন; কখনও বা ভাবের অমৃত তুলিয়া আমাকে পান করিতে বলিবেন; আবার কখনও বা কল্পনার অতীত রাজ্যে লইয়া যাইবেন এবং বলিবেন সাহিত্যে যেমন ভাবের বিকাশ ও স্ফুরণ হয় এমন আর কোন শাস্ত্রে হয় না। শাস্ত্রে কেবল মাত্র প্রকৃতি, জড়, চৈতন্য, দ্বৈত ও অদ্বৈত লইয়া তুমুল সংগ্রাম। অতএব যদি বিশুদ্ধ ভাবের উৎকর্ষ সাধন করিতে চাও, তবে স্বদেশী ও বিদেশী গ্রন্থকার প্রণীত গ্রন্থ সকল পাঠ কর, তাহা হইলে মনে শান্তি পাইবে। যাঁহারা প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত, যাঁহারা ঐতিহাসিক, যাঁহারা মানব-প্রকৃতি-তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে বলিবেন, যাহা স্বচক্ষে দর্শন করিতেছ, তাহা ছাড়িয়া বৃথা কল্পনার পদানুসরণ করিয়া জীবনের উদ্দেশ্য কি, তাহা বুঝিতে যাওয়া প্রকৃত বাতুলের কার্য্য। অতএব এই সমগ্র ভূখণ্ডের কোথায় কি রত্ন আছে, তাহার অন্বেষণ করিয়া কৃতকার্য্য হইলে মানব সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করা হয় ও সঙ্গে সঙ্গে জীবনের উদ্দেশ্য কি তাহাও জানিতে পারা যায়।

এই ত' গেল এক দিকের কথা। আবার অন্য দিক দিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি,—যিনি খৃষ্ট-ধর্ম্ম-মতাবলম্বী, যিনি মহম্মদ-ধর্ম্মাবলম্বী, যিনি বুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী—প্রত্যেকেই স্ব স্ব ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ দিয়া তাহাই পাঠ করিতে বলিবেন। আবার এই হিন্দু ধর্ম্মও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। কাহাকেও গ্রন্থ নির্ব্বাচনের ভার দিলে, তিনি সেই সম্প্রদায়ের পুস্তকরাজী উপহার দিয়া আমাকে তাহাই পড়িতে বলিবেন। আবার ইহার ভিতর জ্ঞানী আছেন, ভক্ত আছেন, যোগী আছেন, কর্ম্মী আছেন। এই সংসার-মেলায় অগণ্য দোকানদার, প্রত্যেকেই ক্রেতাগণকে নিজেদের গ্রন্থ দিবার জন্য ব্যস্ত আছেন। সকলেই যেন বলিতে

চাহেন, তাঁহাদের নির্ব্বাচিত গ্রন্থই সৎগ্রন্থ, আর অপরের কৃত্রিম। তাই সন্দিগ্ধ চিত্তে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি,—এই অসংখ্য শাস্ত্ররাশি, যদি এক একটী পাঠ করিয়া সৎগ্রন্থ নির্ব্বাচন করিতে হয়, তাহা হইলে কত লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হইবে, তাহার সীমা নাই। কোন্ গ্রন্থ আমার প্রবৃত্তির উপযোগী, অথবা কোন্ গ্রন্থ আমার প্রকৃতির প্রতিকূল, তাহা আমি ঠিক করিব কেমন করিয়া? অনন্ত শাস্ত্রের অতল গর্ভে অনন্ত ও মহামূল্য তত্ত্ব-কথা নিহিত আছে সত্য; কিন্তু সে সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম্ম অধিকার করিতে না পারিলে ত' আমি আমার গন্তব্য পথ কি, তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। আপনি মহাজ্ঞানী—আমাকে জ্ঞান-কাণ্ডের 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য বুঝাইতে আসিলেন, কিন্তু মহামূর্খ আমি, আপনার সে ভাষা ও ভাব আমি আয়ত্ত করিতে পারিলাম না। আপনি মহাপ্রেমিক ও ভক্ত, ভক্তি শাস্ত্রের মহিমা আমার নিকট কীর্ত্তন করিতে থাকিলেন; কিন্তু পাষাণ-চিত্ত আমি, আমার চিত্ত তাহাতে একবিন্দুও দ্রব হইল না। আপনি মহাযোগী পুরুষ, যোগ-শাস্ত্র ও যোগ-সংহিতা হইতে রাশি রাশি তত্ত্ব-কথা কহিয়া আমাকে অষ্টসিদ্ধি লাভের উপায় বলিতে আসিলেন, কিন্তু চঞ্চল-চিত্ত আমি, তাহাতে মন স্থির করিতে পারিলাম না। আপনি যাগ-যজ্ঞ-ক্রিয়া-কুশল পরম নিষ্ঠাবান ও মহাকর্ম্মী পুরুষ, আমাকে কর্ম্মকাণ্ডের উপকারিতা বুঝাইতে আসিলেন, কিন্তু আমি তাহা বুঝিতে না পারিয়া উহা বৃথা পণ্ডশ্রম জ্ঞান করিলাম। আমাদের পরমায়ু অল্প, জ্ঞান নিতান্তই সঙ্কীর্ণ এবং শক্তি সামর্থ্যও নিতান্ত ক্ষীণ; কাজেই যদি নিজে সৎগ্রন্থ পড়িয়া—বুঝিয়া নিজ গন্তব্য পথ ঠিক করিতে হয়, তাহা হইলে ইহজনমে আর হইবে না। আমার বিশুদ্ধ প্রকৃতি কি চাহে, তাহা অজ্ঞানান্ধ-মায়াবিকার মুগ্ধ—আমি বুঝিতে পারি না; তা'ই খেয়ালের বশে কখনও বেদে, কখনও বাইবেলে, কখনও পুরাণে, কখনও কোরাণে যাই।—কখনও বা জ্ঞানীর জ্যোতির্ম্ময় সচ্চিদানন্দে আকৃষ্ট হই, বা ভক্তের শান্তিময় প্রেম-নিকুঞ্জ-কাননে শান্তির আশায় ছুটিয়া যাই; আবার পরক্ষণেই হয়ত যোগীর অষ্ট-সিদ্ধি-সম্পন্ন যোগৈশ্বর্য্য দেখিয়া ঋদ্ধি ও সিদ্ধির ভিখারী হইয়া যোগ-প্রাণায়াম করিতে বসি। কিন্তু তাহাও অতি কষ্টসাধ্য দেখিয়া ও কর্ম্মীকে ভগবৎ সেবায় অহঃরহঃ নিরত দেখিয়া, তাঁহার পদানুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হই। এইরূপ নানা ধর্ম্মের, নানা সাধন প্রণালীর ভিতর দিয়া ছুটাছুটি করিতেই জীবন অবসান হইয়া আসিল! গন্তব্য পথ কোথায় কোন্ স্থানে তাহার কিছুই ঠিকানা করিতে পারিলাম না। অনন্ত শাস্ত্রের গোলক-ধাঁধায় পড়িয়া দিশাহারা

হইয়া কেবলই ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। সেইজন্য মনে হয়, আমাদের মত দুর্ব্বল ও নিম্ন অধিকারীর পক্ষে পুস্তক পাঠ করিয়া নিজের পথ, নিজ জীবনের উদ্দেশ্য কি, তাহা ঠিক করা একান্তই অসম্ভব।

আজীবন ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিলে সুফল না হউক, কুফলও যে হয় না, ইহা ঠিক। ইহাতে অন্ততঃ চরিত্রও যে সংগঠিত হয়, তাহাতে মতভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু সাধুসঙ্গ আমাদের পক্ষে একেবারেই আকাশ-কুসুমবৎ। একে ত' আমরা সহজেই বিশ্বাসহীন, তাহাতে আবার সংসারের আবর্জ্জনা রাশি দ্বারা নয়নদ্বয় অন্ধীভূত ; কাজেই আমাদের পক্ষে সাধু চিনিয়া সাধুসঙ্গ করা প্রকৃতই আশ্চর্য্য ব্যাপার। আমরা আমাদের নিজ নিজ সীমা বিশিষ্ট জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা, অপরিমার্জ্জিত বুদ্ধি দ্বারা, অপরিণত বিচার-শক্তি দ্বারা ও কল্পিত সাধুত্বের ভিতর দিয়া সাধু চিনিতে যাই ; কাজেই প্রকৃত সাধু আমরা পাই না। কলির অধম জীব আমরা, সাধুসঙ্গ আমাদের পক্ষে দুর্ঘট হইয়াছে। অবশ্য সাধু পাওয়া যায় না বলিয়া নহে, প্রকৃত চেষ্টা করিলে সাধু পাওয়া যাইতে পারে বটে ; কিন্তু সে চেষ্টা সে উদ্বেগ, সে আন্তরিক যত্ন আমাদের কৈ ? আমাদের চেষ্টার শতধারা সাংসারিক কার্য্যে ছুটিয়া যায়, কিন্তু তাহার একটী অতি ক্ষীণ রেখাও সাধু অন্বেষণে দেখা যায় না। আমরা নিজে সাধন বিহীন, অসাধু, কপট, কদাচারী ; তা'ই সাধন-সিদ্ধি-সম্পন্ন সরল সাধু-প্রকৃতি সাধু দেখিতে পাই না। আমার শ্রীগুরুদেব একবার বলিয়াছিলেন যে, "সাধু কতটুকু সাধনায় অগ্রসর হইয়াছেন, কতটুকু সাধন-সিদ্ধি সম্পন্ন লক্ষণ তাহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে, সাধন-ক্ষেত্রে কোন্ গূঢ় গভের নিভৃত রত্ন ভাণ্ডারের অধিকার তিনি লাভ করিয়াছেন, তাহার বিচার করিয়া লওয়া আমাদের মত অসাধকের শক্তি ও সামর্থ্যের বহির্ভূত"।

প্রকৃত কথাই তাহাই। আমরা নিজে অসাধু হইয়া কেমন করিয়া সাধু চিনিব। নিজে মূর্খ হইয়া অপরের জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিমাণ কেহ কি করিতে পারে। তাহার উপর অমরা একেবারে চেষ্টাশূন্য। শত সহস্র দুঃখ কষ্টে পতিত হইলেও ভ্রম ক্রমেও আমরা সাধুর অমৃতময়ী উপদেশ পাইতে ইচ্ছা করি না। বিষম বিপদে পতিত হইলেও আমরা সেই ভবভয়-হারিণী, দুর্গতিনাশিনী, করাল-বদনী মায়ের কাছে যাইতে চাহি না। আজ ভক্ত ধ্রুব বিমাতা কর্তৃক তিরস্কৃত ও অপমানিত বোধ করিয়া, পিতার প্রাসাদ ফেলিয়া আসিলেন এবং গহন-কান্তারে 'কোথায় পদ্মপলাশলোচন হরি' বলিয়া প্রাণের ডাকে ডাকিতে

পারিয়াছিলেন বলিয়াই না, বিপদের সহায় দীনবন্ধু সাধক-শ্রেষ্ঠ সাধু-হৃদয় দেবর্ষি নারদকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারই অমৃতময় উপদেশে তিনি জলে হরি, স্থলে হরি, বৃক্ষে হরি, ব্যাঘ্রে হরি, ভূচরে—খেচরে হরি, অনলে,—অনিলে হরি দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি মর্ম্মভেদী যাতনায় কাতর হইয়া ভগবানের দিকে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই না, জীবন্মুক্ত নারদ ঋষি আসিয়া দীক্ষাচ্ছলে তাঁহার গন্তব্য পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যতক্ষণ না আমরা ঐরূপ যাতনায় কাতর হইব, যতক্ষণ সর্ব্বভূতে হরি না দেখিব, ততক্ষণ আমাদের উপায় কি? কে আমাদের মলিন চিত্তকে পরিমার্জ্জিত করিয়া ক্ষিত্যপ্‌তেজ-মরুদ্‌ব্যোমে হরি দেখাইবার সহজ কৌশল শিখাইবেন? কে আমার উন্মত্ত মন-মাতঙ্গকে শ্রীহরির ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্নিত চরণ-প্রহারে নিয়মিত করিয়া আমার জীবনের কর্ত্তব্য কি, গন্তব্য কোথায়, তাহা ঠিক করিয়া দিবেন? হে ত্রিজগদ্‌গুরো! আমি তোমাতেই আত্ম-সমর্পণ করিলাম; আমার সকল চেষ্টা, সকল যত্ন যেন তোমাতেই লীন হয়।

যাহার মন সংসারের ঘোর আবর্ত্তে সদাই নিমজ্জিত, যাহার বুদ্ধি-বৃত্তি অপরিমার্জ্জিত, অসংস্কৃত ও হীন, যাহার চরিত্রের সম্যক্‌রূপে সুগঠন হয় নাই, তাহার আবার নির্জ্জন বাস কি? বরং এবম্প্রকার জীবের নির্জ্জন বাস কুচিন্তা ও দুশ্চিন্তাকেই প্রসব করে। যে দুরাচার রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া নির্জ্জন কারাগারে কালাতিপাত করিতে থাকে, সে কি নির্জ্জন বাস-কালে গভীর ভগবৎ-তত্ত্বে কালক্ষেপণ করে? না সে কারাগারে বসিয়া প্রতিবেশীকে তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছে বলিয়া, প্রতিফল দিবার মৎলব আঁটিতে থাকে। আমরা সেইরূপ সংসার-কারাগারে আবদ্ধ জীব। আমরা নির্জ্জন বাস ইচ্ছা করিলেই বা কি হইবে? মন নির্জ্জন হওয়া চাই। আমি দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া, ঈশ্বর চিন্তা ও ধ্যান করিব বলিয়া বসিলাম, হয়ত ধ্যেয় মূর্ত্তিকে চিন্তা করিবার জন্য মনকে নানা বিষয় কার্য্য হইতে আকর্ষণ করিয়া, ক্ষণেকের জন্য টানিয়া রাখিলাম; কিন্তু চক্ষুর পলক ফেলিতে না ফেলিতে দেখি, মন আমার মনে নাই, অর্গলবদ্ধ গৃহের চতুষ্কোণের কোন স্থানে নাই, বাহিরে পিতা মাতায় নাই, পুত্র-কলত্রে নাই, আত্মীয়-স্বজনে নাই, বন্ধু-বান্ধবে নাই। তখন খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি, চিরস্মরণীয় স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবুর মানস-পুত্র কমলাকান্তের মত, হয়ত কাহারও দুগ্ধ ভাণ্ডের মধ্যে, আর না হয় বাজারের ভিতর, কিম্বা যদি অন্য কোথায়ও না থাকে, তাহা হইলে "মুল্‌তুবী" কাগজ পত্রের ভিতর। পুনরায়

মনকে জোর করিয়া আনিলাম ; ভাবিলাম এইবার নিশ্চয় মনকে কোথাও যাইতে দিব না। কিন্তু এই যা, এবার মন অন্য কোথাও যাইল না বটে, কিন্তু গৃহিনীর পাকশালায় ঘুরিতে লাগিল। এইরূপে মনকে লইয়া টানাটানি করিতেই মুহূর্ত্ত ক্ষণ লগ্ন নষ্ট হইল। কাজেই এত আড়ম্বর সবই বৃথা হইল, নির্জ্জন বাসের কোন ফলই হইল না। মন রহিয়াছে সংসারের ভিতর, আর বাহিরে ঠাট-টমক দেখাইয়া, লোক জনকে জানাইয়া, ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া নিজ্জন বাস বা চিন্তা কিছুই নহে। মনে নির্জ্জনতা না হইলে, বাহ্যে নিজ্জনতা কেবলমাত্র আত্ম-প্রবঞ্চনা। সমস্ত প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করিয়া মনেতে বিনাশ করিতে পারিলে, তবেই নির্জ্জন বাসের ফল উপলব্ধি হইবে। অথবা সমস্ত বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তিকে অন্তর্ম্মুখী করিয়া কেবলমাত্র ভাগবতী প্রবৃত্তিকে জাগরিত বা প্রবুদ্ধ করিতে পারিলে, তবে নির্জ্জন বাসের উপকারিতা বুঝিতে পারা যায়। নচেৎ আজীবন অন্ধকার ঘরে চুপ করিয়া বাসয়া থাকিলে কিছুই হইবে না। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মনে নির্জ্জনতা না হইলে কিছুই হইবে না; ইহাতে যেন না বুঝেন যে মনে কিছুই থাকিবে না। অবশ্য মনে বিষয়াদির চিন্তা, আত্মীয়-পরিবারের চিন্তা কিছুই থাকিবে না বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে মনে কেবল ভগবৎ চিন্তাকেই জাগরিত করিয়া রাখিতে হইবে। যখন দেখিব ও বুঝিব আমাদের মন সমস্ত বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছে, যখন পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের চিন্তায় মন উদ্বেলিত হইতেছে না, যখন বুঝিব মন, প্রাণ কি এক অজানা অচেনা বস্তুর জন্য সদাই চঞ্চল হইয়াছে, তখনই বুঝিব নিজ্জন বাসের উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। তখনই জানিব সামান্য চেষ্টা করিলেই চুম্বক-শৈলাভিমুখে লৌহের আকর্ষণের ন্যায় মন ভগবৎ চরণে সংলগ্ন হইবার জন্য উৎসুক হইয়াছে ; এবং অল্পক্ষণেই তাঁহাতে সংযুক্ত হইয়া যাইবে। একবার আমার গুরুদেবের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম যে কোন একটী সমাধিশীল সাধুর নিকট দুইটী তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ভক্ত শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার জন্য সমাগত হ'ন। তাহাদের কাতর বানীতে সাধুর সাধু হৃদয় আকৃষ্ট হয়। কিন্তু শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে পরীক্ষার কষ্টিপাথরে একবার কষিয়া লইতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি দুইজনকে দুইটী কপোত পক্ষী ও দুইখানি শাণিত তীক্ষ্ণ-ধার ছুরিকা দিয়া বলিলেন "যাও এই দুইটী কপোতকে কোনও জনপ্রাণী হীন নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়া বধ করিয়া লইয়া আইস, এবং যে অগ্রে আসিবে, তাহাকেই দীক্ষিত করিব।" দুইজন দুই দিকে চলিয়া গেলেন। একজন অনতি-বিলম্বেই তাহার কপোতটির ছিন্ন মস্তক লইয়া আসিয়া গুরুপদে অর্পণ করিয়া

বলিলেন,"গুরুদেব! একটী জনপ্রাণী-হীন বনান্তরালের ভিতর যাইয়া এই কপোতটীর বধ সাধন করিয়াছি, কেহই দেখিতে পায় নাই। আমার সঙ্গী এখনও আইসে নাই, অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দীক্ষা দিউন।" সাধু তাহার ব্যস্ততা দেখিয়া একটু হাসিলেন ও প্রবোধ দিয়া তাহার সঙ্গীর জন্য একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল, ভগবান মরিচিমালী অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলেন; ঠিক সেই সময় অপর যুবকটী জীবিত কপোতটিকে লইয়া আসিয়া অশ্রুপরিপুর্ণ লোচনে সাধুর পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া বলিলেন, "প্রভু আমার সদৃশ হতভাগ্য কেহই নাই। আমি সারাদিন বনে বনে ঘুরিয়াছি, কিন্তু কোথায়ও নির্জ্জন ভূমি দেখিতে পাইলাম না। সর্ব্বত্রই দেখিলাম এবং অনুভব করিলাম, যেন অসংখ্য জীবগণে পরিপূরিত; সকলই যেন তাঁহার সত্বায় সত্ববান! তাঁহার ঈশ্বরী লীলা সর্ব্বত্রই যেন এক অপূর্ব্বভাবে লীলা করিতেছে, মনে হইল যেন সেই চৈতন্যময়ের প্রভাবে সমগ্র ভূখণ্ড চেতনাযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। তরু, লতা ও গুল্মাদিতে তাঁহার চৈতন্য, নদী তড়াগ-সরোবরে তাঁহার চৈতন্য, পশু-পক্ষী মানবে তাঁহার চৈতন্য, এমন কি সামান্য ক্ষুদ্র উপলখণ্ডে কিংবা অত্যুচ্চ অভ্রভেদী মহীধরেও তাঁহার চৈতন্য উপলব্ধি হইল। সকল স্থানেই তাঁহাকে দেখিলাম; সুতরাং যেখানে সেই অনাদি অচিন্ত্য এক মহাপুরুষ লীলা করিতেছেন, সেখানে আমি কেমন করিয়া নির্জ্জন স্থান পাইব। কাজেই আপনার আদেশ প্রতিপালন করিতে অক্ষম হইলাম। ভাবিয়াছিলাম আপনার নিকট দীক্ষিত হইয়া জীবনের গন্তব্যপথ ঠিক করিয়া লইব, কিন্তু অদৃষ্টদোষে তাহা হইল না।" যুবা এবংবিধ নানা প্রকার বিলাপ করিয়া সাধুর পদদ্বয় বক্ষে ধারণ করিয়া অজস্র অশ্রুধারায় বক্ষ সিক্ত করিতে লাগিলেন। সাধু যুবকের এই প্রকার ভাবপ্রবণতা দেখিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন; এবং সেই যুবককে সস্নেহে ক্রোড়ে করিয়া বলিলেন "বৎস, তুমিই যথার্থ শিষ্য হইবার যোগ্য পাত্র। বুঝিলাম তোমার যাবতায় বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তি অন্তর্ম্মুখী হইয়া সর্ব্বত্রই ভগবৎ সত্বা দর্শনের উপযোগী হইয়াছে। আর অপর যুবকের ততদূর হয় নাই। তোমার হৃদয় যথার্থই কষিত হইয়া ভগবৎ-সেবার উপযোগী হইয়াছে। অতএব তোমাকেই শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলাম।" এতক্ষণে বুঝিলেন নির্জ্জনতা কোথায়। মনের অবস্থা এইরূপ যতক্ষণে না হইবে, নির্জ্জনবাসে নির্জ্জনে চিন্তায় কিছুই ফলোদয় হইবে না। আর যখন ঠিক এই অবস্থা আসিবে, তখন সংসারে যে কোন অবস্থায় থাকিলেও চিত্ত সদাই স্থির থাকিবে।

আমাদের না আছে স্থৈর্য্য না আছে ধৈর্য্য। বিচার করিতে বসিলে কত স্থির ধীর হওয়া প্রয়োজন তাহা বিচারবান্ পুরুষ মাত্রেই জানেন। কোনও একটী সিদ্ধান্তে হঠাৎ উপনীত হওয়া উচিত নহে। বিচার করিতে বসিলে দুই পক্ষ সমান ভাবে বিচার করিতে হইবে। কিন্তু সে বিচারে কত জ্ঞানের প্রয়োজন—বহুদর্শিতার আবশ্যক। আমাদের এই সঙ্কীর্ণ—অপরিমার্জ্জিত বুদ্ধি ও জ্ঞান লইয়া কোনও একটী ধর্ম্ম বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যে নিতান্তই মূর্খতার কার্য্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমি হয়ত কোন একটী মতের বা সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী, কাজেই সেই মতের সমর্থনকারী যত শ্লোক যত রচনা আবৃত্তি করিয়া অপরকে বুঝাইয়া দিলাম বটে। কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত ও সমীচীন, তাহা কে বলিবে? আমি যেমন আমার সিদ্ধান্তের অনুযায়ী শত শত ধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে শ্লোক আবৃত্তি করিলাম, তেমনি আমার প্রতিপক্ষ সহস্র সহস্র গ্রন্থ হইতে তাহার সমর্থনকারী সংখ্যাতীত শ্লোক আবৃত্তি না করিবেন তাহা কে বলিবে? কাজেই এ বিচার বড়ই শক্ত ব্যাপার। যে বিচারের সিদ্ধান্তে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন পরিচালিত হইবে, তাহার বিচার কি নিজের পছন্দমত গ্রন্থ পড়িয়া হইতে পারে? আমার যে গ্রন্থকে সহায় করিয়া আমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিব, সে গ্রন্থের শ্লোক হয়ত পরস্পরে বিরুদ্ধবাদী। তখন আমাদের অপরিমার্জ্জিত বুদ্ধি যে আরও বিকৃতিভাবাপন্ন না হইবে, তাহাই বা কে বলিবে? যিনি জ্ঞানমার্গের পথিক, তিনি শাস্ত্র-সাগর মন্থন করিয়া জ্ঞানগর্ভ শ্লোকগুলি আবৃত্তি করিবেন, যিনি ভক্তিমার্গের পথিক, তিনি ভক্তি-অমৃতোপম রচনার মালা গলায় পরাইয়া দিবেন। তখন মনে হইবে আমি ভক্ত হই কি জ্ঞানী হই। আমি বেদ পড়িলাম বেদান্ত পড়িলাম; আমি সাংখ্য পড়িলাম, পাতঞ্জল পড়িলাম; আমি ন্যায় পড়িলাম, দর্শন পড়িলাম; আমি "মিল্ পড়িলাম, 'টিণ্ডাল' পড়িলাম, আমি 'হক্স্লে' পড়িলাম, 'কম্‌টে' পড়িলাম; কিন্তু পড়ার মত পড়িতে পারিলাম না বলিয়া সমস্তই পণ্ডশ্রম হইল, সকলই বৃথা হইল। আবার যিনি বিচারকের আসনে সমাসীন হইয়া অপরের অপরাধের বিচার করিতেছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন দেখি নিজের সম্বন্ধে কি বিচার করিতেছেন? কোথা হইতে আসিলেন, কিসের জন্য আসিলেন, কেনই বা আসিলেন, আসিয়াই বা কি করিলেন—এ সমস্ত বিষয়ের সৎ মীমাংসা সৎ-বিচার তিনি কয়বার করিয়াছেন? এ বিষম সমস্যার, বিষম প্রহেলিকার মীমাংসা কি যেমন তেমন বিচারক করিতে পারেন? কয়টী লোক নিজে বিচার করিয়া

নিজে জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন ? যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে এই সুখময় সংসারে নরকের বিষম দৃশ্য দেখিতে হইত না। সকলেই ত' জানেন—অনৃত-ভাষণ, অহিতাচরণ, পরহিংসা, পরপীড়ন কোনও সভ্য-সমাজে আদৃত হয় না ; কিন্তু জানিয়া শুনিয়া বোধ করি অৰ্দ্ধেক লোক স্পষ্টতঃ উক্ত দোষে কলঙ্কিত, আর বাকি সাধুতার ভাণে, কপটতার ছলনায় সিদ্ধ-হস্ত। কেনা জানে—জীবহত্যা, নরহত্যা, ভ্রূণহত্যা, চৌর্য্য, দস্যুতা, পরদারাভিমর্ষণে, গুরুস্ত্রীগমনে অনন্তকালব্যাপী নরকবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেয় ; কিন্তু তাই বলিয়া কি সভ্যসমাজ হইতে উক্ত দোষগুলি উঠিয়া যাইতেছে। অধিকন্তু যে যে কার্য্য করে, সে তাহার নিজ বুদ্ধির উপযোগী একটা না একটা মত ঠিক করিয়াই রাখে। তাই যে হত্যা অপরাধে অপরাধী, সেও নিজ দোষ প্রক্ষালনের জন্য কূট-বুদ্ধি ব্যবহারজীবীদের আশ্রয় লইয়া নিজেকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করিতে চাহে। যে চোর বা দস্যু, সে চুরি বা দস্যুতা জীবনের প্রধান কার্য্য বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছে ; কিন্তু উক্ত কার্য্যগুলি যে গর্হিত ও পাপ সেইগুলি তাহাকে বুঝাইয়া না দিলে চলিবে কেন ? আমরাও ছলনায় কপটতায় 'ভাবের ঘরে চুরি' করিয়া থাকি, অতএব আমাদিগকেও সেই গুলি বুঝাইয়া দিতে হইবে।

যদি কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না, তখন উপাসনা আরাধনা করিব কাহার ? বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ, বিভিন্ন মত, বিভিন্ন পথ, কাজেই কোন্ পথে যাই। নানা ধর্ম্মের নানা সম্প্রদায় সকলেই নিজ নিজ মত লইয়া আমার নিকটে আসিতেছেন। বলুন দেখি, কোন্ মতে আমি স্বীকৃত হই, কোন্ পথেই বা যাই। পাঁচজনের পাঁচ কথায় সংসারের কাজ যখন ঠিক সুশৃঙ্খলায় চলে না, তখন এত বড় বিষয়টী পাঁচধর্ম্মের পাঁচটী মত লইয়া এক পথে চলিব কেমন করিয়া ? কাজেই আমার কিছুই হইল না। এক পথ না ধরিলে আমি ত' কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিব না। জানি, সকল পথ কি সকল মত সেই একই বিষয় লইয়া। সকল ধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য এক। কিন্তু তাই বলিয়া আমার মত জীবের মনে শান্তি আসে কৈ ? এখন কোন্ পথটী সহজ সুগম, তাহা আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া না দিলে, অল্পবুদ্ধি আমি, ঠিক করিব কেমন করিয়া ? আমার উন্মত্ত মন সংসারের নানা বিষয় লইয়া উন্মত্ত। বলুন দেখি কি করিয়া আমাদের এই বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তিগুলি সংযত করিয়া অন্তর্নিবিষ্ট করিতে পারি। আমাদের কি সেই শিক্ষা আছে, না যত্ন আছে। বাল্যকাল হইতে পুস্তকের কতগুলি ছত্র কণ্ঠস্থ করিতেছি, এবং তাহারই উদ্গীরণ করিয়া কোনও মতে

অন্ন-বস্ত্রের আয়োজন করিতেছি। আমরা প্রবৃত্তির তাড়নায় এতই বিমুগ্ধ যে কোন্‌টী সৎ, কোন্‌টী অসৎ, কোন্‌টী সু, কোন্‌টী কু কিছুই বুঝিতেছি না। আমরা প্রবৃত্তির বশে সকল বস্তুতেই আগ্রহ প্রকাশ করি, আবার বিফল মনোরথ হইয়া ম্লানমুখে ফিরিয়া আসি। সংসার-মেলায় নানাবিধ চাকচিক্যময় দ্রব্যসম্ভার স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে, ইহার মধ্যে কোন্ বস্তুটী আমাদের প্রয়োজনে আসিবে, তাহা বাছিয়া দেয় কে? বাহিরের চাকচিক্যময় সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইলে চলিবে না। আমরা নির্ব্বাচন বিষয়ে অতি শিশু, কাজেই যাঁহারা বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রবীণ, বিচক্ষণ ও বহুদর্শী তাঁহাদের উপর ভার দিতে হইবে, তাঁহারা বাছিয়া যে দ্রব্য আমাদের দিবেন, তাহাতেই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে। আমরা অস্মিতার বশীভূত হইয়া নিজে পছন্দ করিয়া পথ নির্ব্বাচন করিতে যাই, সেইজন্য সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ, শান্তির শীতল ছায়ার পরিবর্ত্তে অশান্তির জ্বালাময়ী তাপ আমাদের ভাগ্যে নিয়তই ঘটিতেছে। আমরা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া নয়ন-মন-মুগ্ধকর আকাশ পথের দৃশ্য লিপিবদ্ধ করিতে যাই, আমরা প্রাতঃকাল হইতে গভীর নীশিথকাল পর্য্যন্ত সংসারের নানাবিধ কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও কষ্ট বোধ করি না; কিন্তু একদণ্ড কাল নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয় ও কামনাশূন্য হইয়া ঈশ্বর ধ্যান বা ভগবানের নাম কীর্ত্তণ করিব, সে ক্ষমতা আমাদের নাই। তখন হয়ত মনে হয়, ঐ এক মুহূর্ত্তকালে আমরা না জানি কত কার্য্য শেষ করিতাম। অন্য সময় হয়ত সমস্ত দিন গল্প করিয়া, পরচর্চ্চায়, পরনিন্দায় রত থাকিয়া সংসার কোলাহলে মাতিয়া, অথবা অন্য কোন দ্যুত-ক্রীড়ায় মত্ত থাকিয়া, দুই প্রহর কাল স্বচ্ছন্দে নিরুদ্বেগে অতিবাহিত করিয়া থাকি। কিন্তু যত কষ্ট, যত উদ্বেগ ঐ একদণ্ড কাল। আমরা সমস্তদিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া নাটক, উপন্যাস, প্রহসন, গল্প, গুজবের বহি পাঠ করিতে কষ্ট বোধ করি না; কিন্তু যত তর্ক যত আপত্তি ঐ একটু সাধুর সহিত বাস করা, কি সাধুর কাছে যাওয়া কিম্বা সাধুর প্রস্তাব শুনা বা সৎবিষয়ের জিজ্ঞাসা।

২।—নিরাকরণ।

গ্রন্থ পড়িলাম কিন্তু কোনটী সৎ কোনটী অসৎ, তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। সাধু অন্বেষণে বাহির হইলাম, কিন্তু অদৃষ্ট দোষে তাহাও অপ্রাপ্য হইল। নির্জ্জনে বসিলাম, যত কুচিন্তা মনে আসিয়া উদয় হইল। বিচারে বসিলাম, কুসংস্কার বর্দ্ধিত এবং অপরিমার্জ্জিত বুদ্ধি লইয়া অপসিদ্ধান্তেই উপনীত হইলাম।

আর উপাসনা তাহাও কেবল বাক্যের প্রতিধ্বনিতে পরিসমাপ্ত হইল। কাজেই কিছুই হইল না। এতক্ষণে বুঝিলাম, আমরা নিজে কিছুই করিতে পারিব না। যতক্ষণ কেহ আমাদের পথ ঠিক করিয়া নির্দ্দেশ না করিয়া দিবেন, ততক্ষণ আমাদের কোন উপায় নাই। সংসারের অধম জীব আমরা, আমাদের ত' কথাই নাই; ধ্রুব, প্রহ্লাদ, ভগীরথ প্রভৃতি সকলেই প্রথমে গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া, তবে জীবনের গন্তব্য পথ ঠিক করিয়াছিলেন। মহাত্মা ভগীরথ যখন মহর্ষি কপিল শাপে ভস্মীভূত নিজ পিতৃ-পিতামহগণের উদ্ধারার্থে গঙ্গা দেবীর আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, শত বৎসর কৃচ্ছ্র সাধনায়ও গঙ্গার দর্শন পাইলেন না: তখনই না ভগবান নারদ আসিয়া সাধন-কৌশল শিখাইয়া দিলেন। যখন পঞ্চম বর্ষের শিশু ধ্রুব সুনীতি মায়ের অঞ্চলের নিধি ঘোরা দ্বিপ্রহরা রজনীতে "কোথায় পদ্ম পলাশলোচন হরি" এই কথা বলিতে বলিতে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, পথে কত মায়া, কত বিভীষিকা দেখিলেন, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। দুই নয়নে অশ্রুধারা, বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে, মুখে কেবল "কোথায় পদ্মপলাশলোচন হরি"; কিন্তু কৈ, এরূপ একাগ্রতা, ঐকান্তিকতা, দার্ঢ্যতা থাকা সত্বেও যে পর্য্যন্ত না তিনি দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সে পর্য্যন্ত তিনি ব্রহ্মপদ লাভ করিতে বা ভগবদ্দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই। ভগবানের অবতার শাক্যসিংহ কিম্বা প্রেমের অবতার চৈতন্য দেব, সকলকেই দীক্ষিত হইতে হইয়াছিল। যাহার পিতা-পিতামহগণ ভগবানের অন্তরঙ্গ নিজ আত্মীয় ছিলেন, সেই রাজাধিরাজ পরীক্ষিতকেও প্রবুদ্ধ করিবার জন্য শুকদেবকে আসিতে হইয়াছিল। সপ্তাহকাল গঙ্গাগর্ভে বাস করিয়া হরি কথা শ্রবণ, চিন্তন, ধ্যান করিয়া ও সাধুসঙ্গ করিয়া, শুকদেব মুখ নিঃসৃত ভাগবৎ শ্রবণ করিয়া পরে তিনি শ্রীকৃষ্ণে লীন হইয়াছিলেন। পাছে জীবনের অত্যল্পকাল সময়েও চিত্ত-চাঞ্চল্য না ঘটে, সেইজন্য ভগবান ব্রহ্মর্ষি জীবন্মুক্ত শুকদেবকে পরীক্ষিতের জীবন তরীর কর্ণধার করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আর আমাদের এই সুদীর্ঘ জীবনের জন্য একজন কর্ণধারের প্রয়োজন হইবে না ইহাই বা কেমন কথা। যিনি যত বড়ই সিদ্ধ ও বুদ্ধ হউন না কেন, তাঁহাকে প্রথমে যথারীতি দীক্ষিত হইয়া যথা-বিধি-সাধন প্রণালীর ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। ঘোর সংসারী হই অথবা যতি সন্ন্যাসীই হই, বিদ্যার্থীই হই, আর যাহাই হই না কেন, প্রথমে একজন পরি-চালক না হইলে চলিবে না। প্রবল বাত্যাহত উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গকারী মহা-সমুদ্রেই হউক অথবা নিষ্কম্প মৃদু মন্থর স্থির ধীর নদীতেই হউক, পার হইবার

জন্য যেমন একটি তরী আর শত সুদক্ষ ক্ষেপণক থাকিলেও একটি পরিচালক বা কর্ণধার চাই; তদ্রূপ শত কৃচ্ছ্র-সাধনশীল হঠ-যোগাদি করি কিংবা শান্তিময় নাম সাধনই করি, প্রত্যেক ধর্ম্মাচরণের জন্য একটী গুরু চাই।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, নিজে যখন শাস্ত্র পড়িতে পারি, তাহার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিতে পারি এবং অন্যকে তাহা বুঝাইতে পারি, তখন আর গুরুর প্রয়োজন কি। পুস্তক দেখিয়া পুস্তকলিখিত আচরণগুলি পালন করিলেই হইবে। ইহাতে পৃথক্ গুরুর আবার কি প্রয়োজন? ইহার উত্তরে আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যে, শাস্ত্র পড়িলে বা তাহার বর্ণবোধ হইলেই যে শাস্ত্রের গভীর উদ্দেশ্য সাধিত হইল, তাহা কে বলিবে? যিনি পণ্ডিত, পাণ্ডিত্যের অভিমানে যিনি সদাই স্ফীত আছেন, তিনি শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য কি বুঝিবেন? তিনি রচনার কোন্ স্থান ব্যাকরণ-দুষ্ট কোন্ স্থান যুক্তিযুক্ত নহে, তাহার বিচার করিতে তিনি সক্ষম; কিন্তু কোথায় ভক্তের প্রাণ ভেদ করিয়া ভক্ত-হৃদয়ের অন্তঃস্থল উদ্ভিন্ন করিয়া, কোন্ সুরের কোন্ রাগিণীতে "মা" অথবা 'হরি" এই সুধামাখা নামটী বাহির হইয়াছে, তাহা পণ্ডিতের সাধ্য কি যে বুঝিতে পারেন? পণ্ডিত রচনার বহির্ভাগ লইয়া ব্যস্ত, তিনি কি শাস্ত্রের গভীর হইতে গভীরতম প্রদেশে যাইতে পারেন? নারিকেলের উপরের নীরস বিশুষ্ক আবরণ লইয়াই ব্যস্ত; কিন্তু উহার গর্ভে যে অমৃতোপম সুস্বাদু পানীয় আছে, তাহা তিনি জানিতে পারেন না। ভক্তপ্রাণের আকুলি বিকুলির সময়, 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিবার সময় তাহার যতি-ছন্দ ঠিকই বা না রহিল, তাহাতেই বা কি? সে যখন প্রাণের যাতনা বলিবার ও জুড়াইবার স্থান পাইয়াছে, তখন হইলই বা তাহার রচনার ভুল, হইলই বা তাহার সন্ধি-সমাসের অশুদ্ধি। যাঁহার জন্য নিখিল শাস্ত্র রচিত হইয়াছে, যাঁহার শোভা-সৌন্দর্য্যের জন্য সন্ধি-সমাস গ্রন্থিবদ্ধ হইয়াছে, তাঁহাকেই যখন ভক্ত লাভ করিয়াছে, তখন তাহার ত' সমস্তই ঠিক হইয়া গেল। এত যে শাস্ত্র পাঠ, এত যে সাধনা, সমস্তই গুরুনির্দ্দিষ্ট পথে চালিত হইলে, তবেই নিজ গন্তব্য পথ ঠিক হইবে। আমরা যতই বুদ্ধিমান্, মেধাবী হই না কেন, সময়ে সময়ে এমন একটী প্রশ্ন বা ধাঁধা আসিতে পারে, যাহার সমাধান কিছুতেই করিতে পারি না; এমন সময় গুরু বা শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। তখন গুরু বা শিক্ষক মহাশয় এমন একটী কৌশল বা সঙ্কেত বলিয়া দেন, যে তাহাতেই আমাদের ধাঁধা সংশয় কাটিয়া যাইতে পারে। যখন সামান্য বিদ্যালয়ের সামান্য পরীক্ষার জন্য গুরুর সাহায্য প্রয়োজন হয়, তখন এই

নানা বিঘ্ন-সঙ্কুল বিশ্ব-বিত্তালয়ের বিষম পরীক্ষার জন্য যে সদ্‌গুরুর প্রয়োজন হইবে না, ইহা কিরূপে যুক্তি-সিদ্ধ হইতে পারে।

আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অজ্ঞাত, আমাদের শক্তিসামর্থ্যের বহির্ভূত অন্তর্নিহিত কোন্ শক্তি কোথায় কি প্রকারে কার্য্য করিতেছে, কোথায় কোন্ সুরে কি রাগ-রাগিণী কোন্ হৃদয় তন্ত্রীতে বাজিতেছে, তাহা স্থূলবুদ্ধি আমরা বুঝিতে পারি না। কোন্ বস্তু প্রাপ্ত হইলে, আমাদের মরম-মাঝারের চিরদিনের আকাঙ্ক্ষা, চিরদিনের বাসনা, জনমের মত ধুইয়া যাইবে, তাহা সকল সময়ে আমরা বুঝিতে পারি না। সেই জন্য ব্রহ্মবিদ্ বরিষ্ঠ গুরুদেবের সাহায্য প্রয়োজন। তিনি আমার প্রকৃত অভাব জানিয়া ও বুঝিয়া যাহা নির্দ্দেশ করিবেন, তাহাই যথাযথ সাধিত হইলে জীবনের উদ্দেশ্য আপনা আপনি সাধিত হইবে। ভগবৎসখা অর্জ্জুনকেও কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে হইয়াছিল,--"শিষ্য স্তেহহং সাধি মাং ত্বং প্রপন্নং"। আর আমরা অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া বলিয়া থাকি, পুস্তক-পাঠে মনোমত ইষ্টদেব নির্ব্বাচন করিয়া সাধনমার্গে উন্নতি করিতে পারিব। ইহা অপেক্ষা ধৃষ্টতার পরিচায়ক আর কি আছে।

গুরুর নিকট শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন ত' আছেই; অধিকন্তু গুরুর নিকট গুরুগৃহে বাস করা শাস্ত্র আদেশ করিয়াছেন। সদা সর্ব্বদা গুরুর নিকট বাস করিলে, তন্মুখনিঃসৃত অমৃতোপম উপদেশ অহরহঃ শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ভাবরাশি একে একে শিষ্যের হৃদয়-ক্ষেত্রে উপ্ত হইতে থাকে এবং শিষ্যও ক্রমশঃ সাধুহৃদয়-সম্পন্ন হইয়া উঠে। সাধু-হৃদয়ের সাধন-সিদ্ধ-সম্পন্ন তেজোরাশি শিষ্যের অন্তর্নিহিত মলিনতা সমস্তই ভস্মীভূত করিয়া দিবার সুবিধা হয়। দীক্ষা-গুরুর তাপসী-শক্তি শিষ্যের তামসী ভাবকে পূত-সলিলা-ভাগীরথী-প্রবাহের ন্যায় সমস্তই ধৌত করিয়া দেয়। গুরুর সাধনপ্রণালী, গুরুর ঈশ্বর-উপাসনায় অনুরাগ, শিষ্যের মনেও সেইভাব জাগরিত করিয়া দেয়। গুরু ও শিষ্য একত্রে বাস করায় স্বভাবসূত্রে পরস্পরে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। তাহাতে গুরুদেবও শিষ্যের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি বিশেষ করিয়া জানিবার সুবিধা পাইয়া থাকেন; এবং কিসে সেই প্রকৃতি ভগবৎ-প্রেমে অনুরাগী হইয়া সমধিক বিকশিত হয়, তদ্বিষয়ে গুরুদেব আরও যত্ন করেন এবং সাধনার কৌশলাদি শিক্ষা ও দান করিয়া থাকেন। কেবল ইহাই নহে, শিষ্য যাহাতে অপথে কি কুপথে যাইতে না পারে, তদ্বিষয়েও তিনি লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন। কি মানসিক, কি দৈহিক, কি নৈতিক, কি ঐহিক, কি পারত্রিক সমস্ত বিষয়ের প্রতি গুরু লক্ষ্য রাখিয়া

থাকেন এবং যাহাতে শিষ্যের সৎবৃত্তির স্ফুরণ হয়, যাহাতে ভগবৎ ভাব ও ভগবৎ প্রেম সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়, তদ্বিষয়ে শিক্ষা দিতে থাকেন। শিষ্যও তখন অনন্যগতি হইয়া গুরুদেবের শরণাপন্ন হয় ও তাঁহারই আদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়া ইহ জীবনে ধন্য ও পরজীবনে মুক্ত হয়েন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, যে এমন ব্রহ্মবিদ্ বরিষ্ঠ গুরুদেব পাই কোথা? ইহার উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি ও বলিতে চাহি, যে যখন মন প্রাণ সংসারের জ্বালামালায় অস্থির হইয়া উঠিবে; দুঃখ-দুর্ব্বিপত্তিতে অধৈর্য্য হইয়া চতুর্দ্দিক্ যখন শূন্যময় দেখিবে, যখন পিতা-মাতা ভ্রাতা-ভগ্নীতে তৃপ্তি না হইবে, পুত্র-কলত্রাদিতে সন্তোষ না পাইবে, সংসারের মনোমোহিনী ছবিতে মন মুগ্ধ না হইবে, সংসারের সুখ-ঐশ্বর্য্য শ্মশানের অঙ্গারস্তূপ বোধ হইতে থাকিবে, যখন মনের কামিনী-কাঞ্চনে অনুরাগ না থাকিবে, প্রাণের ভিতর হইতে অসহ্য অবর্ণনীয় যন্ত্রণা অনুভূত হইতে থাকিবে, যখন দারুণ উৎকণ্ঠা বা ভয় আসিয়া পাণ ব্যাকুলিত করিবে, হৃদয়ে একটা অসম্পূর্ণতা ভাব একটা শূন্যতার বিপুল ছায়া অনুভূত হইবে, যখন "কিছুই হইল না" "আসিয়া করিলাম কি" ইত্যাকার একটা হতাশার বিকট ছায়া হৃদয়কে ঘিরিতে আসিবে, যখন প্রাণের প্রতিগুহ্যতম প্রদেশ হইতে একটী অস্ফুট অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়া মন প্রাণকে উদ্বেলিত করিতে থাকিবে, তখনই জানিবে প্রাণের ভিতর হইতে প্রাণের ইষ্টদেব বাহিরে শ্রীগুরুরূপে প্রকটিত হইয়া জীবনের উদ্দেশ্য কি, গন্তব্য পথ কি, তাহা বুঝাইয়া দিবেন। সেই গুরুর সেবা করিলে, তাঁহারই কাছে দীক্ষিত হইলে, প্রাণের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা মিটিয়া যাইবে। তখন নিখিল শাস্ত্র পাঠ করিয়া যাহা না হইবে, তাঁহার প্রদত্ত এক বা দ্বি অক্ষর মন্ত্রে জীবনের সকল উদ্দেশ্য নির্দ্দিষ্ট হইবে। সমগ্র ভূখণ্ডের সকল সম্প্রদায়ের সাধু সেবা করিয়া যাহা না হইবে, সেই একমাত্র শ্রীগুরুসেবা করিয়া সাধুসঙ্গের সমস্ত ফলই প্রাপ্ত হইবে। সমস্ত বেদ বেদান্তের ও সমস্ত আগম পুরাণ পাঠে সমস্ত দেবদেবীর, সমস্ত যক্ষ পিশাচাদির মন্ত্র সাধন করিয়া, অথবা আজীবন শত শত কৃচ্ছ্র-সাধনশীল যাগ যজ্ঞ ব্রত নিয়মাদি পালন করিয়া যে উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হইবে, গুরুদেবের নির্দ্দিষ্ট 'প্রণব' মন্ত্র জপ সাধনে তাহার অপেক্ষা অসংখ্য গুণে ফললাভ করিবে। তখন আর নানা শাস্ত্র হইতে বৃথা কূট তর্ক করিয়া আত্ম-বঞ্চনা করিতে অথবা জিগীষা বৃত্তির পরিচয় দিতে ইচ্ছা হইবে না। তখন মন আর অন্য কোন শ্রুতিসুখকারী বাক্যে প্রধাবিত হইতে চাহিবে না, তখন সেই একভাবে সমস্ত ভাব ডুবিয়া যাইবে, তখন মন কোনও প্রকার দ্বন্দ্বে

না থাকিয়া কেবলমাত্র সেই আনন্দময়ীর চিৎ-আনন্দ-রসের অতল তলে ডুবাইয়া যাইবে। তখন শিষ্য কখন জ্ঞানীর সৎ-চিৎ-আনন্দ-নিকেতনে কখন বা ভক্তের প্রেম-নিকুঞ্জ-কাননে আবার কখনও বা তিনি ধ্যানস্তিমিত-নেত্র যোগীর সহিত একাসনে, আবার কখনও বা নিত্য-নৈমিত্তিক-ক্রিয়ারত কর্ম্মীর সহিত একত্র বাস করিতে থাকিবেন। কখনও বা তিনি 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ বলিয়া সর্ব্বজীবে দয়ার প্রচার করিতেছেন, আবার হয়ত দেখিবেন পরক্ষণেই নৃমুণ্ডমালিনী মায়ের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে মায়ের রাতুল চরণে সরক্ত জবা পুষ্পের অঞ্জলি দিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইতেছেন। নিজ ইষ্টদেবকে মুখ্য করিয়া, শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সহায় করিয়া, এইরূপে তিনি যথা তথা নিষ্কাম হইয়া বিচরণ করিতে থাকিবেন।

এতক্ষণে আমরা বুঝিলাম কি? আমরা বুঝিলাম এই যে, আমরা সমগ্র শাস্ত্র পড়িতে পারিব না, অথবা পারিলেও যথাযথ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না। আমরা নিজে অসাধু, কাজেই সাধন-সিদ্ধ-সম্পন্ন সাধু আমরা চিনিতে পারিব না। নির্জ্জনে বসিলেই সংসারের যত কুচিন্তা মনে আসিয়া উদয় হইবে; মলিন অসংস্কৃত বিকৃতবুদ্ধি লইয়া ভগবত্তত্ত্ব-বিচার অথবা গভীর গবেষণাপূর্ণ সাধুচিন্তা হইবে না। কেবল ইহা নহে, সাংসারিক আধি-ব্যাধি-বিজড়িত দুঃখ-দুর্ব্বিপত্তিতে ঘিরিয়া থাকিলেও আমরা মূকের মত চুপ করিয়া থাকি। আমরা দুইটী মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় আমাদের মরমের অরুন্তুদ যাতনা যে প্রকাশ করিব, সে ক্ষমতাও নাই; তখন আমাদের কাতর ক্রন্দন ব্যতীত আর কি আছে? কলির কলুষিত জীব আমরা, অকর্ম্মঠ ও অনধিকারী জীব আমরা, পাষাণ ও মলিনচিত্ত আমরা, আমাদের পক্ষে জগজ্জননীর কৃপা ভিন্ন উপায় আর কি আছে? আমরা ক্রন্দন করিয়া বলিব,'মা' আমরা লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে এই সাধের মানবজন্ম পাইয়াছি বটে, কিন্তু জীবনের প্রকৃত পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি। সংসারের খেলা-ধূলা করিতে করিতে নিজ বাড়ী হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। কোন্ পথে যাইলে আমি নিজ বাড়ী ফিরিয়া যাইব মা! আমাকে তাহাই বলিয়া দাও। মাগো, আমাকে অসহায় দেখিয়া পথের দুই পার্শ্বের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাহাদের নিজ বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য অবিরত ডাকিতেছে; কিন্তু মা, আমি তাহাদের বাড়ীতে যাইতে চাহি না, তাহাদের মাকে মা বলিতে চাহি না। মাগো! যে বাড়ীতে জ্ঞান-তপোনিষ্ঠ ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মিকী আদি মুনি ঋষিগণ গৃহের পরিচালনার ভার লইয়াছেন, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশরাদি ঋদ্ধি-সিদ্ধিসম্পন্ন মুনিগণ যে বাটীস্থ ব্যক্তিবর্গের উন্নতিকামনায় অহরহঃ নীতি শিক্ষাদান করিতেছেন,

যে বহিঃপ্রাঙ্গণে পিতৃভক্ত অভিমন্যু বৃষকেতু আদি বালকগণ, ধ্রুব প্রহ্লাদ নাচিকেতাদি ভক্ত শিশুগণ আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, যেখানে দেবর্ষি নারদ ও দেবদেব মহাদেব অহোরাত্র বিভুগানে বিভোর হইয়া গৃহস্থালীকে আনন্দ-নিকেতন করিয়া রাখিয়াছেন, যেখানে অনন্তজ্যোতির্ময়ী বিষ্ণুপ্রিয়া মহালক্ষ্মী চিরাভ্যস্ত চাঞ্চল্য ভুলিয়া ধনধান্য লইয়া বসিয়া আছেন, যেখানে স্মিত-বদনা কোটী শরদিন্দু-সৌন্দর্য্যচ্ছটা-নিষ্প্রভকারিণী বাগ্বাদিনী বীণাপাণি শিশুদিগের শিক্ষার ভার লইয়া আছেন এবং সপ্তস্বরে অহরহঃ মূর্চ্ছনা ও ঝঙ্কার দিতেছেন; যেখানে সকল-সিদ্ধিদাতা দেবগণপতি সুর-নরবন্দিত বিনায়ক আছেন; যেখানে বিশ্ববিজয়ী বীর-কেশরী অমিততেজা দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় শরাসনে শর সন্ধান করিয়া কামক্রোধাদি প্রবল রিপুবর্গের ভীতি উৎপাদন করিতেছেন, আর যেখানে মা! তুমি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী হইয়া অন্নপূর্ণারূপে জীবের জন্য দুগ্ধান্নপূর্ণ কাঞ্চন-দর্ব্বী হস্তে লইয়া বসিয়া আছ, আমাকে সেইখানে লইয়া যাও! মাগো! সংসারমেলাতে দিশাহারা—পথহারা হইয়া আর ঘুরিতে পারি না, বড়ই ক্লান্ত হইয়াছি; তাই মা, তোর কোলে গিয়া বসিবার জন্য প্রাণ সদাই কাঁদিতেছে। মা, একবার কোলে লইয়া পদ্মহস্ত বুলাইয়া দাও, তাহা হইলেই ত' আমার এই চির-সন্তপ্ত দেহে শীতল বারিধারার সিঞ্চন হইবে। মা, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে মর্ম্মগ্রন্থি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। মাগো, একবার কৃপা-নেত্রে চাহ মা, মা অধম-তারিণি! এ অধমের প্রতি একবার কৃপাকটাক্ষে চাহ মা! মাগো এ দিকে জীবনের সন্ধ্যাও আগতপ্রায়। অমানিশার ঘোর অন্ধকারের ন্যায় চতুর্দ্দিক্ নৈরাশ্যের ঘোর বিভীষিকায় ঘিরিয়া আসিতেছে; জানি না কখন কোন্ মুহূর্ত্তে ক্ষুদ্র জীবনতারাটী কালাকাশ পথ হইতে চিরদিনের জন্য খসিয়া পড়িবে! তা'ই মা, সময় থাকিতে তোর কোলে যাইয়া বসিতে চাহি। মাগো, তোমার ঐ চির সমুজ্জ্বল মহামহিমমণ্ডিত ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে, কিংবা বেদ বেদান্তের অবাঙ্মনসগোচর ব্রহ্মময়ী নামে আমার প্রয়োজন কি মা। আমি দীনহীন পথের ভিখারী, তুমিও ত' মা ভিখারীর ঘরণী; তা'ই বড় সাধ তোমার ঐ রত্ন-সিংহাসন ত্যাগ করিয়া, ভিখারিণী-বেশে আসিয়া আমার চির-সন্তপ্ত প্রাণে অমৃত ঢালিয়া দাও। মাগো, শ্রীমন্ত প্রাণভয়ে ভীত হইলে, তোমায় ডাকিবামাত্র যে অতি বৃদ্ধবেশে আসিয়া তাহাকে কোলে করিয়া বসিয়াছিলে! মাগো, সেই বেশে আসিয়া আমাকে একবার কোলে লও। মা কৃতান্ত-দলনি! কৃতান্ত-কিঙ্করেরা সতত আমাকে ভয় প্রদর্শন করি-

তেছে; মা তুমি থাকিতে আমার এই দুর্দ্দশা হইতেছে; এই দুঃখ বড় মরমে লাগিতেছে।

আমার উন্মত্ত মনোমাতঙ্গ পথভ্রষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটী করিতেছে মা, তুমি তোমার ঐ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চরণ-প্রহারে তাহাকে সুশাসিত করিয়া সুপথে চালিত কর! তুমিই শ্রীগুরুদেবরূপে আসিয়া অপথ কুপথ দেখাইয়া দাও। মা, আমি শাস্ত্র কি তাহা বুঝি না জ্ঞান ভক্তি কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না, তুমি আমাকে যে পথে চালাইবে, আমি সেই পথেই চলিব। মা, তুমি অন্তরে হৃষীকেশ, বাহিরে গুরুরূপে আবির্ভূতা হইয়া আমার হাত ধরিয়া লইয়া যাও। আমি তোমা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, তোমারই নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে থাকি। মা, আমি কুলগুরু চাহি না, কুল-দেবতা চাহি না, তুমি আমার গুরুর গুরু হইয়া, দেবের দেবতা হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও; আমি তোমার চির প্রেমময়ী, চির স্নেহময়ী মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে তোমার ঐ মধুময়ী 'মা' নাম গাহিতে গাহিতে, তোমারই অগাধ স্নেহের কথা স্মরণ করিতে করিতে জন্ম ও জীবন সার্থক করিয়া লই। মা, এ সংসারের আর কিছুই চাহি না। আমার সমস্ত সংশয় সন্দেহ ছিন্ন করিয়া, সমস্ত চেষ্টা যত্ন বিনাশ করিয়া, আমাকে তোমার ঐ পাদপদ্মে স্থান দাও! দেখো মা, যেন অন্তিমে তোমার ঐ 'মা' নাম গাহিতে গাহিতে এ নর-দেহ বিসর্জ্জন করিতে পারি। মা, এ দীনহীনের কি সে সাধ পূর্ণ হইবে না।

শ্রীনিবারণচন্দ্র নন্দন।

অর্থ]

দুর্গারাণী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হিরণ্ময়ী উষা যখন পূর্ব্বদিকের আকাশটি তাঁহার দিব্য সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত করিয়া সশৈল-কাননা শস্য-শামলা ধরার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন, যখন গ্রামের উপান্তবর্ত্তী আম্রকাননটি কোকিল-ঝঙ্কারে মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল, এবং পথপার্শ্ববর্ত্তী পলাশ বৃক্ষের শাখায় বসিয়া কেবল একটীমাত্র শ্যামা উল্লাসে প্রভাত-গীতি গাহিতেছিল, সেই আলোকান্ধার-বিমিশ্রিত সুমধুর ও সুশীতল শারদ প্রভাতে পলাশডাঙ্গা গ্রামের প্রান্তরমধ্যবর্ত্তী পথ বাহিয়া চারিটি পথিক চলিতেছিল। অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি পুরুষ; তাহার মাথায় একটী মোট ও দক্ষিণ হস্তে বাঁশের একটী দীর্ঘ যষ্টি। তাহার পশ্চাতে তিনটি স্ত্রীলোক;

তন্মধ্যে মধ্যবর্ত্তিনী দুইটী রমণীকে আকার, প্রকার ও পরিচ্ছদে সম্ভ্রান্তবংশীয়া যুবতী বলিয়া মনে হইতেছিল। সর্ব্ব পশ্চাদ্বর্ত্তিনী স্ত্রীলোকটী দাসী; তাহার বক্ষে একটী নিদ্রিত শিশু ও মস্তকে একটী পুঁটুলী। অন্ধকার ক্রোড়ে ঘুমন্ত বাল সূর্য্যের ন্যায়, দাসী ক্রোড়ে এই ঘুমন্ত শিশুটি শোভা পাইতেছিল।

প্রান্তরের মধ্যে কোথাও স্থলপদ্ম-বন, কোথাও শেফালিকা বন এবং কোথাও বা পলাশবন। এই সমস্ত বনের মধ্যবর্ত্তী পথ দিয়া পথিকেরা অগ্রসর হইতে লাগিল। কাহারও মুখে একটী বাক্য নাই; সহসা একটী যুবতী অপরাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "দিদি, শিউলি ফুলের কি চমৎকার গন্ধ দেখ! গাছের তলায় কে যেন ফুলের বিছানা পেতে রেখেছে! আমি চাট্টি ফুল কুড়িয়া নেব?"

অপরা যুবতী হাসিয়া বলিল—"রাণি, এখানে ফুল কুড়িয়ে কি হবে? পিসীমার বাড়ী চল; সেখানে দেখ্তে পাবে, তাঁদের বাড়ীর পাশেই পাহাড়; আর পাহাড়ের উপর কেবল শিউলি ফুলেরই বন। সেখানে যত ইচ্ছে ফুল কুড়োবে। এখনও আমাদের অনেকখান পথ হেঁটে যেতে হ'বে। প্রায় পাঁচ ক্রোশ পথ। এখন পা তুলে না চল্লে, আমরা সেখানে সকাল সকাল পৌছুতে পার্‌ব না। আর একটু পরেই এমন রোদ হ'বে যে আমাদের হাঁট্‌তে ভারী কষ্ট হ'বে। আজ পঞ্চমী; কাল ষষ্ঠীতে দেবীর উদ্বোধন। পিসীমা দু'দিন আগেই যাবার জন্যে ব'লেছিলেন। আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে বিমলা আজ চার পাঁচ দিন ব'সেছিল।"

পশ্চাদ্বর্ত্তিনী বিমলা দাসী সেই কথা শুনিয়া বলিল—"হুঁ গো, তুম্‌রা থর থর চল। দেখবে এখন গিন্নী আমাকে কত কেঁকাবোক্। দু'দিন আগে তুমাদের যাত্যে হ'তোক্; কিন্তুক্ তুমার বাবা তো নাই যাত্যে দিলোক্। এখন কি আমাদের বসে থাকা চলে? এখন ঘরে আমাদের কত কাম। দিন রাত্যের ভিতরে আমাদের টুক্‌বের নিশ্বাস ফেল্‌বারও যো নাই আছে।" *

রাণী বলিল—"ঘরে তো তোমার অনেক কাম আছে, তা' জানি। কিন্তু বাবা আমাদের না যেতে দিলে কি করব? তিনি কি আমাকে যেতে দিতে

---

* মানভূম জেলার ইতর শ্রেণীর এইরূপ ভাষা। ইহার অর্থ এইরূপ, 'হাঁ গো, তোমরা একটু শীঘ্র চল। দেখিবে এখন গৃহিণী আমাকে কত বকিবেন। তোমাদের দু'দিন আগে যেতে হ'তো; কিন্তু তোমার বাবা তো যেতে দিলেন না। এখন কি আমার বসিয়া থাকা চলে? এখন বাড়ীতে আমাদের কত কাজ। দিন রাত্রির মধ্যে আমাদের একটুও নিশ্বাস ফেলিবার অবসর নাই।" মানভূম এখন বেহারের অন্তর্গত হইলেও, বঙ্গমাতার এই নিরক্ষরা কন্যাটির ভাষা পাঠ করিয়া সহৃদয় পাঠকবর্গ নাসিকা সঙ্কুচিত করিবেন না, ইহাই অনুরোধ।লেখক।

চান? পিসীমার বাড়ী আমি কখনও যাইনি। বাবা আমাকে কিছুতেই পাঠাবেন না; আর আমিও না গিয়ে ছাড়্‌ব না। সেই জন্যেই তো দু'দিন দেরী হ'ল।"

বিমলা বলিল—"হুঁ গো, তোমার মাও বল্‌ছিল, এত বড় আইবুড়া বিটিছাটাকে কি ক'রে ভিন্‌ গাঁয়ে পাঠাব? এখন সব মাঠেই ধান; কুথাও গাড়ীর পথ নাই আছে। গাড়ীর পথ থাক্‌লে, না হয় গাড়ী ক'রে পাঠাতি।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে প্রায় অৰ্দ্ধ ক্রোশ পথ অতিক্রান্ত হইল। তখন বেশ ফর্শা হইয়া উঠিয়াছিল। সকলে প্রান্তর অতিক্রম করিয়া ধান্যক্ষেত্রের মধ্যবর্ত্তী আলি রাস্তার উপর দিয়া চলিতে লাগিল। আলি রাস্তার হরিৎ-তৃণ-রাজির উপ রশিশিরবিন্দুনিচয় উষালোকে মুক্তামালার ন্যায় শোভা পাইতেছিল, এবং যুবতীদ্বয়ের পদতলের প্রগাঢ় অলক্তকরাগ অল্পে অল্পে মুছিয়া ফেলিতেছিল। ধান্যশীর্ষ সমুদায়ও নৈশ-শিশিরপাতে সরস ও সতেজ হইয়া প্রাভাতিক মরুত-হিল্লোলে মৃদুমন্দ আন্দোলিত হইতেছিল এবং যেন ক্রীড়াচ্ছলেই শিশির বর্ষণ করিয়া যুবতীদ্বয়ের পরিধেয় বসনের অঞ্চলপ্রান্ত সিক্ত করিতেছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুর্গারাণী অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী। তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব এরূপ নির্দ্দোষ যে, মনে হয় বিধাতা তাহাকে নির্জ্জনে বসিয়া গড়িয়াছিলেন। বর্ণ তপ্ত-কাঞ্চনবৎ, কেশপাশ কুঞ্চিত ও ভ্রমরকৃষ্ণ কপাল, ভ্রূ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, অধরোষ্ঠ, চিবুক—সমস্তই মনোহর ও পরম রমণীয়। দন্তপংক্তি মুক্তাশ্রেণীর ন্যায় সুবিন্যস্ত। তাহার সুমধুর হাস্যমণ্ডিত মুখমণ্ডল দেখিলে তাহাকে কোনও দেবকন্যা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। আজ এই মনোহর শারদ-প্রভাতে প্রান্তরমধ্যে, সহসা তাহাকে একাকিনী দেখিলে মনে হইত, বুঝি আকাশ হইতে স্বয়ং উষাদেবী ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন; অথবা এই ধান্যক্ষেত্রমধ্যে তাহাকে একাকিনী বিচরণ করিতে দেখিলে মনে হইত, বুঝি স্বয়ং কমলাদেবী শস্যক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতেছেন। এরূপ সুন্দরী এবং সপ্তদশবর্ষীয়া অনূঢ়া যুবতী কন্যাকে পদব্রজে ভিন্ন গ্রামে পাঠাইতে তাহার পিতামাতা যে ইতস্ততঃ করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে।

রাণীর দিদি ভবানীও সুন্দরী। কিন্তু রাণীকে যদি সৌন্দর্য্যের 'কায়া' বলা হয়, তাহা হইলে ভবানী তাহার 'ছায়া' মাত্র। ভবানী রাণীর অপেক্ষা তিন চারি

বৎসরের বড় ; তাহার মুখমণ্ডলে সৌন্দর্য্য ঢল ঢল করিতেছে ; কিন্তু চিন্তা-কালিমা সেই সৌন্দর্য্যকে যেন কিছু ম্লান করিয়াছে।

অগ্রবর্ত্তী মোটবাহক পুরুষটি এতক্ষণ একটীও কথা বলে নাই। শস্যক্ষেত্র-সমূহের কিয়দংশ উত্তীর্ণ হইলে, সে ভবানীর দিকে ফিরিয়া বলিল—"বহিন্, ঐ ভাগে, পরেশ মুখুয্যার জমী। এমন জমী ই তল্লাটে নাই আছে। ধান কেমন তেজ বাঁধ্যেছে, ত্যাখ্! আহা, মুখুয্যাকে কি এমন জমীও ঘুচাত্যে হয়? আর না ঘুচায়েই বা কি করছে বল্? তোকে বিহা করতে মুখুয্যা দেড় হাজার টাকায় এই জমীটো হলা পোদ্দারকে বন্ধক দিঁয়েছিল। পোদ্দার বেটা ডাকাত বটে। সে শ টাকায় মাসে মাসে তিন টাকা ক'রে সুদ খাঁয়েছে। মুখুয্যা দু' তিন বছর সুদ ঠেল্লোক ; তারপর আর লারল্যোক্। এখন হলা এই জমীটো বিকে লিঁয়েছে। মুখুয্যার ই জমীটোতে যে ধান হ'তোক্, তাথে সে সম্বছর খাঁয়ে প'রে এক মরাই ধান বাঁধতোক্।"

ভবানী তাহার পিতার বৃদ্ধ মুনীষ ক্ষেতু মাহাতোর এই কথাগুলি নীরবে শুনিল। শুনিয়া একবার ধান্যক্ষেত্রসমূহের দিকে চাহিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। পর মুহূর্ত্তেই তাহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল, এবং তাহা হইতে টস্ টস্ করিয়া দুই চারি ফোঁটা জল পড়িল।

ভবানীর চক্ষে জল দেখিয়া দুর্গারাণীর হৃদয় অতিশয় ব্যথিত হইল। সহসা তাহার মুখমণ্ডলে ভাবান্তর লক্ষিত হইল। তাহার সুন্দর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল ; ক্ষুদ্র বিম্বাধরটি ক্রোধে ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। সে কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলিতে পারিল না।

বিমলা কিয়ৎক্ষণ নীরবে চলিতে লাগিল। পরে বলিল "বামুনগুলানের ই রীত নাই ভাল বটে। বামুনগুলান্ বিটির বিহাতে ঢের টাকা ল্যেয়। গরীব বামুনগুলানের তো বিহা নাই হয়। বাঁড়ুয্যা দুটো বিটির বিহাতে ঢের টাকা লিয়েছে ; আবার রাণীর বিহাতেও ঢের টাকা লিব্যেক্। এত বড় জুয়ান বিটিছা বটে ; টাকার লালচে এখনও বিহা নাই দিঁয়েছে।"

বিমলার কথা শুনিয়া রাণীর মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। তাহার চক্ষুদ্বয় হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। সে বিমলার দিকে চাহিয়া বলিল, "বিম্লি, চুপ্ ক'রে থাক্, বল্ছি।"

বিমলা যেন কিছু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। সে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "বহিন্, তুমি রুষ্ছো কেনে? রাগ রোষের কথা আমি নাই বল্ছি।

আমি মিছা নাই বল্‌ছি, সবাই কহে, তুমাদের বামুনদের ই রীতটো নাই ভাল বটে।"

রাণী ও বিমলার বিতণ্ডা মিটাইবার জন্য ভবানী বলিল "রাণি, বিমলা তো কিছু মন্দ কথা বল্‌ছে না। মেয়ে বিক্রী করা এদেশের বামুনদের মধ্যে একটা কুরীতি হ'য়েছে। শুনেছি, পূর্ব্বদেশে মেয়ের বিয়েতে মেয়ের বাপ ছেলের বাপকে অনেক টাকা দেয়। আর আমাদের দেশে ঠিক তা'র উল্টো।"

রাণী তখনও প্রকৃতিস্থা হয় নাই। সে ভবানীর কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠেই বলিল, "দেখ এই দুইটী রীতির মধ্যে কোনটীই ভাল নয়। আমাদের দেশে বৌ কিন্‌তে হয়; আর পূর্ব্বদেশে জামাই কিন্‌তে হয়। এই জন্যেই তো এদেশের ছেলের বাপ আর পূর্ব্বদেশের মেয়ের বাপ গরীব হ'য়ে পড়ে। দেশের এ কি রকম ধারা, আর দেশের লোকেরই বা কি রকম মতিগতি, তা জানি না।" এই বলিয়া রাণী সহসা নিস্তব্ধ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতে লাগিল "বাবার কেমন বিবেচনা দেখ না! মুখুয্যে মশায় তাঁ'র জমীজমা বন্ধক দিয়ে তোমাকে বিয়ে কর্‌লেন; এখন তাঁ'র সব গেছে। এখন তিনি দেশত্যাগী হ'য়ে কোথায় দশটি টাকা বেতনে চাকরী কর্‌ছেন। বড়দিদিরও কপাল পুড়ে গেছে। গাঙ্গুলী মশায় সর্ব্বস্ব বন্ধক দিয়ে তাঁকে বিয়ে কর্‌লেন; তারপর মহাজন সব বেচে কিনে নিলে। তিনি পেটের দায়ে কোথায় দিনাজপুরে চাক্‌রী কর্‌তে গেলেন, আর সেইখানে জ্বরে মারা পড়্‌লেন।" বলিতে বলিতে রাণীর চক্ষে জল আসিল ও সে অঞ্চলে মুখ চক্ষু আবৃত করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঈষৎ সংযত হইয়া বলিল, "মেয়েদের কষ্ট হ'লে কি বাপ-মায়ের মনে কষ্ট হয় না? আমি এক একবার ভাবি, যাদের টাকা নাই, তারা বিয়ে ক'র্‌তে যায় কেন? আর বাপ-মাকেও বলি, তাঁরা যে মেয়ে বেচেন, মেয়ে যদি বলে আমি বিয়ে ক'র্‌ব না, তো কি হয়?"

রাণীর এই কথা শুনিয়া ভবানীর ম্লানমুখে একটু হাসির রেখা ফুটিল। সে বলিল "তাও কি কখন হয়, রাণী! মেয়েরা কি মুখ ফুটে বাপ-মাকে কোনও কথা ব'ল্‌তে পারে? না আইবুড়ো থাক্‌ব বল্‌লেই আইবুড়ো থাকে?"

রাণী বলিল "কেন থাক্‌বে না? কুলীনদের কত মেয়ে যে আইবুড়ো থেকেই মরে যায়! মেয়েরা কি ছাগল-গরু যে বাপ-মা তাদের বেচে টাকা

নেবে?" তারপর ঈষৎ অনুচ্চ কণ্ঠে ভবানীর কাণের কাছে বলিল "কই, আমার বিয়েতে বাবা টাকা নিন্ দেখি, আর জোর ক'রে আমার বিয়ে দিন্ দেখি?"

রাণীর কথা শুনিয়া ভবানী একটু হাসিল? কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। রাণী বাল্যকাল হইতেই ভয়ানক একগুঁয়ে, তাহা ভবানী জানিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ধান্যক্ষেত্র সমূহ অতিক্রম করিয়া সকলে একটী বিস্তৃত ও উচ্চ টাঁড় জমীতে (প্রান্তরে) উপনীত হইল। এই বিস্তৃত প্রান্তরটি একটী পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে ক্রমশঃ আনত হইয়া ধান্যক্ষেত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। পর্ব্বতের সানুদেশে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামের চারিদিকেই ভুট্টার ক্ষেত্র, অড়হর ক্ষেত্র ও অতসী-ক্ষেত্র। অতসী বৃক্ষসমূহ পুষ্পিত হইয়া ভূমির উপর স্বর্ণের শোভা বিস্তার করিয়াছে। প্রভাত-অরুণের কণকময়ী কিরণমালা সেই স্বর্ণ-ক্ষেত্রসমূহের উপর নিপতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিয়াছে। রাণী এই মনোরম শোভা দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বাড়ী হইতে কখনও বাহির হয় নাই বা হইতে পায় নাই; এই কারণে এই শোভা তাহার নিকট অদৃষ্টপূর্ব্ব বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সে বালিকার মত উল্লসিত হইয়া বলিল "দিদি, ঐ দিকে চেয়ে দেখ, কি চমৎকার শোভা! আহা, ঐ গ্রামটি কি সুন্দর! আমাদের পলাশ-ডাঙ্গায় তো এমন শোভা কখনও দেখতে পাই না। আহা, এমনি একটী জায়গাতে ঘর বেঁধে বাস ক'রতে হয়!"

খোকা এতক্ষণ দাসীর ক্রোড়ে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া আসিতেছিল। সহসা মাসীমাতার উল্লাসময় কণ্ঠস্বর শ্রবণে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং চারিদিকে একবার চাহিয়া যেন কিছু চকিত ও ভীত হইয়া জননীর ক্রোড়ে যাইবার জন্ম ব্যগ্র হইল। রাণী তাহাকে ভবানীর ক্রোড়ে যাইতে না দিয়া আপনার ক্রোড়ে লইল এবং সস্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "খোকন, বল দেখি আমারা কোথায় যাচ্ছি, আর কোথায় এসেছি? ঐ দেখ, কেমন রাঙ্গা সূর্য্যি উঠেছে; ঐ দেখ, কেমন হল্‌দে ফুল ফুটেছে; ঐ দেখ, ঐ পাহাড়ের উপর কেমন মন্দির দেখা যাচ্ছে!" খোকন বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল। সে জাগিয়া আছে, না ঘুমাইতে ঘুমাইতে সুখের স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহা যেন বুঝিতে পারিল না।

রাণী আবার তাহাকে আদর করিয়া বলিতে লাগিল, "খোকন, আমি ঐ পাহাড়ের উপর একটী ঘর বেঁধে তোমাকে নিয়ে থাক্‌ব। তোমার হাত ধ'রে আমি মাঠে মাঠে বেড়াব, আর তোমায় কত ফুল তুলে দেব।—কেমন?"

খোকন হাসিয়া বলিল, "হাঁ, আর মাও থাক্‌বে।"

রাণী হাসিয়া বলিল, "কেন, তুমি তোমার মাসীর কাছে থাক্‌তে পার্‌বে না? মা নাই বা থাক্‌লো?

খোকন গম্ভীর স্বরে বলিল "না, মাও থাক্‌বে।"

রাণী হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা—বেশ বেশ মাও থাক্‌বে।" এই বলিয়া সে খোকাকে দুই বাহু দ্বারা বক্ষের উপর তুলিয়া তাহার মুখচুম্বন করিতে করিতে বলিল :—

"কিসের মাসী কিসের পিসী কিসের বৃন্দাবন?
সংসারে কি কোথাও আছে মার মত ধন?"

কিয়ৎক্ষণ পরে সকলেই গ্রামের সন্নিহিত হইল। অতসী-ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে রাণী খোকাকে কতকগুলি ফুল তুলিয়া দিল। গ্রামে সাঁওতাল প্রভৃতি ইতর জাতীয় ব্যক্তিগণ বাস করে; সেই কারণে গ্রামের ভিতর দিয়া যে পথ গিয়াছে, সেই পথে না গিয়া সকলে গ্রামের বাহিরের পথ ধরিয়া চলিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে পর্ব্বতের পাদমূলে উপনীত হইল।

পর্ব্বতটি দৈর্ঘ্যে প্রায় চারি ক্রোশ হইবে। পর্ব্বতশ্রেণী বেষ্টন করিয়া গেলে, তাহাদের গন্তব্য স্থান কৈলাসপুরে উপনীত হইতে সন্ধ্যা হইয়া যাইবে। কিন্তু পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া গেলে মধ্যাহ্নে সেখানে উপস্থিত হইতে পারা যায়। এই কারণে, কেতু মাহাতো পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া যাওয়াই স্থির করিল। পর্ব্বতপৃষ্ঠটি একস্থানে আনত হওয়ায়, তাহার উপর দিয়া যে পথ গিয়াছে, তদ্দ্বারা অল্প আয়াসে পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে পারা যায়। যাহারা পদব্রজে যায়, তাহারা এই পথই অবলম্বন করে; কিন্তু গো-যানে যাইতে হইলে, পর্ব্বত বেষ্টন করিয়া যাইতে হয়।

রাণী ইতিপূর্ব্বে আর কখনও পর্ব্বতে আরোহণ করে নাই। সুতরাং সে পর্ব্বতে উঠিতে অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল এবং কেতু ও বিমলার নিবারণ সত্বেও সে সকলের আগে আগে যাইতে লাগিল। খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া পর্ব্বতে আরোহণ করা আয়াস-সাধ্য বুঝিতে পারিয়া সে তাহাকে বিমলার ক্রোড়ে দিয়াছিল।

পর্ব্বতে আরোহণ করিতে করিতে তাহার পবিত্র নির্জ্জনতা এবং নূতন নূতন শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া রাণীর মন উল্লসিত ও হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে একটী অল্পবয়স্কা বালিকার মত আনন্দে চীৎকার করিয়া করতালি দিতে লাগিল, এবং এইরূপ মনোরম স্থানই দেবতাগণের বিহার-ভূমি, ইহা মনে করিয়া একবার উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "ওগো ঠাকুর! ওগো দেবতা! তোমরা কোথায়? দয়া করে তোমরা একবার আমাকে দর্শন দাও না!"

আল ও পর্ব্বতস্কন্ধের চূড়ায় উপনীত হইয়া রাণী ক্লান্তি দূর করিবার নিমিত্ত বৃক্ষ-চ্ছায়াসমন্বিত একটী শিলাতলে বসিয়া পর্ব্বতের উভয়পার্শ্ববর্ত্তী বিস্তৃত ভূ-ভাগের বিচিত্র শোভা দর্শনে চমৎকৃত হইতে লাগিল। তাহার দৃষ্টির সীমা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনোরাজ্যেরও সীমা যেন প্রসারিত হইতে লাগিল। পর্ব্বতের উভয় পার্শ্বের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী সুন্দর চিত্রপটের ন্যায় তাহার চক্ষুর সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল। সে প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যেন আত্মহারা হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই ভবানী, বিমলা ও ক্ষেতু সেই স্থলে দ্রুতপদে উপনীত হইল। ভবানী রাণীকে দেখিয়াই তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল "রাণি! তুই এখনও ছেলে-বেলাকার মত দুরন্ত রইলি? এত বড় আইবুড়ো মেয়ে, তুই একলা ছুটে ছুটে পাহাড়ে উঠ্‌ছিলি কেন? তোর একটু ভয় হচ্ছিল না? পাহাড়ে কত ঠাকুর দেবতা আছে, তা জানিস্?"

ভবানীর কথা শুনিয়া রাণী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং বলিল "দিদি, ঠাকুর-দেবতাকে কি কখনও ভয় হয়? তাঁরা যে দেবতা; তাঁরা যে সকলের মঙ্গল করেন। তাঁদি'কে ভয় কিসের? আমি যে তাঁদেরই দেখা পাবার জন্যে চেঁচিয়ে ডাক্‌ছিলাম।"

ভবানী সত্যসত্যই রাণীর চীৎকার শুনিয়াছিল এবং শুনিয়া মনে করিয়াছিল হয়ত' রাণী কিছু দেখিয়া ভয় পাইয়াছে; সেই কারণে তাহারা দ্রুতপদে তাহার অনুসরণ করিয়াছিল। এক্ষণে রাণীর কথা শুনিয়া ও তাহাকে হাসিতে দেখিয়া ভবানী যেন কিছু বিরক্ত হইয়া বলিল "তুই এক সৃষ্টিছাড়া মেয়ে, রাণি! তোকে আমি এঁটে উঠ্‌তে পার্‌ব না। পিসীমার বাড়ী যাচ্ছ, সেখানে পাহাড়ে কত ঠাকুর দেবতার মন্দির আছে; সেখানে তুমি যদি পাহাড়ের উপর এই রকম করে ছুটে ছুটে বেড়াও, তা হলে ভাল হ'বে না বলে

রাখ্ছি। তুমি যদি আমার কথার অবাধ্য হও তা' হ'লে, আমি তোমাকে তখনই বাড়ী পাঠিয়ে দেব।"

রাণী হাসিয়া বলিল "আচ্ছা।"

দূরে পর্ব্বতশৃঙ্গে যে একটী মন্দির দেখা যাইতেছিল, তাহা দেখাইয়া কেতু বলিল যে, ইহাই কৈলাসপুরের পাহাড় ও মন্দির, এবং ঐ পাহাড়ই তাহাদের গন্তব্য স্থান। ঐ স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য এখনও প্রায় তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে হইবে। মধ্যে কৃষ্ণপুর গ্রাম দেখা যাইতেছে, ঐ গ্রামের পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে তাহারা জল খাবার খাইয়া কৈলাসপুর যাইবে।

বেলা প্রায় আটটা বাজিয়াছিল সূর্য্যের তেজও ক্রমশঃ প্রখর হইয়া উঠিতেছিল। পর্ব্বতশৃঙ্গের সেই শিলাতলে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সকলে আবার পর্ব্বতের অপর দিকে অবতরণ করিতে লাগিল।

পর্ব্বতের পাদমূলে উপনীত হইতে না হইতে তাহারা দেখিল, একটী অশ্বারোহী ভদ্রলোক তাহাদের অভিমুখে আসিতেছেন এবং তাঁহার সহিত কথা কহিতে কহিতে একটী সুন্দর যুবাপুরুষও আসিতেছেন। আতপ-তাপ নিবারণের জন্য অশ্বারোহীর মস্তকে একটী উষ্ণীশ বাঁধা রহিয়াছে এবং পদব্রজে যে যুবকটি আসিতেছিলেন, তাঁহার গায়ে একটী শুভ্র উত্তরীয়, পায়ে জুতা এবং মস্তকে একটী শুভ্র ছত্র রহিয়াছে। ভবানী ও দুর্গারাণী এই আগন্তুক ভদ্রলোকদ্বয়কে দেখিয়া লজ্জায় যেন একটু সঙ্কুচিত হইল। রাণী যুবকের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া অশ্বারোহীর দিকে অনিমিষ লোচনে চাহিতে লাগিল এবং তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ঈষৎ হাসিয়া ভূতলে দৃষ্টি অবনত করিল। আগন্তুক ভদ্রলোকদ্বয়ও বিস্ময়ের সহিত এ যুবতীদ্বয়কে দেখিতেছিলেন, কিন্তু অশ্বারোহী ব্যক্তি রাণীকে ঈষৎ হাসিতে দেখিয়া সহসা অশ্বরশ্মি সংযত করিলেন, এবং বিস্মিতকণ্ঠে বলিলেন "কে, দুর্গারাণী না কি? তুমি এত বড় হ'য়েছ? তোমরা কোথায় যাচ্ছ?"

রাণী সলজ্জ বদনে বলিল—"কৈলাসপুরে।—পিসীমার বাড়ী।"

অশ্বারোহী বলিলেন—"ঘোষালদের বাড়ী? ওঃ, কাল যে আমি সেখানে ছিলাম। দুদিন আগে তোমাদের সেখানে যাবার কথা ছিল না? তোমরা না যাওয়াতে তোমার পিসেমশাই তোমাদের জন্য ভাব্ছিলেন। আজ আমি তোমাদের গ্রামে যাচ্ছি। তোমার বাবা বেশ ভাল আছেন তো? তোমাদের গ্রামের বালিকা-স্কুল তো এখনও বন্ধ হয় নাই?"

রাণী তেমনই সলজ্জভাবে বলিল—"আমি তো আর স্কুলে যাই না। কিন্তু শুনেছি, কালও স্কুল খোলা ছিল।"

অশ্বারোহী ব্যক্তি পার্শ্ববর্ত্তী যুবকের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"হরনাথ, ইনি পলাশডাঙ্গার যাদব বাঁড়ুয্যের কন্যা। এরই কথা তোমাকে বলেছিলাম। এই মেয়েটি সে বৎসর ছাত্রীবৃত্তি পরীক্ষায়, আমাদের এই পুরুলিয়া জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। দুর্গারাণী! ইনি তোমার সঙ্গে কে? তোমার দিদি বুঝি? আহা, তোমাদের, বিশেষতঃ ঐ ছেলেটির মুখ শুকিয়ে গেছে। রৌদ্রও প্রখর হ'য়েছে। যেতে তোমাদের ভারী কষ্ট হবে দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

হরনাথ, কেতু ও বিমলার দিকে চাহিয়া হঠাৎ বিমলাকে চিনিতে পারিলেন, এবং বলিলেন—"এই যে বিমলা র'য়েছ! বিমলা, তুমি এদের নিয়ে কৃষ্ণপুরে আমাদের বাড়ী যাও। বাড়ীতে মা আছেন। এরা খেয়েদেয়ে ও বিশ্রাম ক'রে বিকেল বেলায় কৈলাসপুরে যাবেন। কাল সকালে আমি সেখানে যাব।"

অশ্বারোহী ব্যক্তি পুরুলিয়া জেলার স্কুলসমূহের ডিপুটী ইন্সপেক্টার শ্রীনাথ বাবু। তিনি হরনাথকে বলিলেন,—"হরনাথ, তবে তুমি আর আমার সঙ্গে কেন আস্‌ছ? তুমি নিজে এদের সকলকে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে যাও।"

হরনাথ তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইলেন এবং সকলকে আসিয়া বলিতে অগ্রগামী হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হরনাথ তর্কবাচস্পতি নবদ্বীপ ও ৺কাশীধামে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অল্প বয়সেই এই জেলার মধ্যে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় সাতাইশ বৎসর হইবে। তিনি দেখিতে সুপুরুষ ও গৌরাঙ্গ। তাঁহার প্রশস্ত ললাট ও বিশাল চক্ষুই তাঁহার অসাধারণ ধী-শক্তির পরিচায়ক। তিনি এখনও অকৃতদার আছেন; তাঁহার প্রধান কারণ এই যে, এই প্রদেশের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ কন্যাপণ না লইয়া কেহই তাঁহাকে কন্যাদান করিতে সম্মত হ'ন নাই।

পলাশ ডাঙ্গার যাদব বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই প্রদেশের জঘন্য প্রথানুসারে শুক্র-বিক্রয়ী হইয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বে ইঁহাদের বংশে শুক্রবিক্রয়-দোষ ছিল না। ইনি ইঁহার প্রথম ও দ্বিতীয় কন্যার বিবাহে প্রায় তিন হাজার টাকা পণ গ্রহণ করিয়া, সেই টাকা সুদে খাটাইতেছেন। সুন্দরী দুর্গারাণীর বিবাহেও ইনি অনেক টাকা পণ গ্রহণ করিবেন, ইহা স্থির সঙ্কল্প করিয়া বসিয়া আছেন।

হরনাথ বাচস্পতির সহিত দুর্গারাণীর বিবাহের প্রস্তাব লইয়া একবার উভয় পক্ষে কথাবার্ত্তাও চলিয়াছিল, কিন্তু হরনাথ অবস্থাপন্ন লোক বলিয়া যাদব তাঁহার নিকট তিন সহস্র মুদ্রা কন্যাপণ চাহিয়াছিলেন। তিন হাজার টাকা পণ দিবার সামর্থ্য থাকিলেও, হরনাথ কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করিতে সম্মত ছিলেন না। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল, বরং তিনি আজীবন ব্রহ্মচারী থাকিবেন, তথাপি কন্যাপণ দিয়া বিবাহ করিবেন না।

স্কুলসমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই প্রদেশের বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-সমাজের এই দুরবস্থা দেখিয়া অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। যাহাতে এই কুপ্রথা দূরীভূত হয়, তজ্জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হ'ন নাই। হরনাথকে তিনি অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। দুর্গারাণীর সহিত যাহাতে তাঁহার বিবাহ হয়, তজ্জন্য তিনি ইতিপূর্ব্বে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যাদব বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাকে তৎসম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট উত্তর দেন নাই। আজও হরনাথের টোল পরিদর্শন করিতে আসিয়া, তিনি হরনাথের সহিত এই বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন এবং পলাশডাঙ্গায় গিয়া যাদবের নিকট আবার কথা পাড়িবেন, তাহার সঙ্কল্প করিতেছিলেন; এমন সময়ে দৈবক্রমে পর্ব্বতের পাদমূলে যাদবের কন্যাদের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। শ্রীনাথবাবু দুর্গারাণীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। অধীত বেদান্ত-শাস্ত্র, কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচারী হরনাথেরও মন যে কিছু বিচলিত হইল না, তাহা নহে।

দুর্গারাণীও ইতিপূর্ব্বে লোকমুখে হরনাথের রূপ গুণের কথা শুনিয়াছিল। শুনিয়া তাঁহার প্রতি তাহারও মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। স্বাধীনা হইলে সে হরনাথকেই পতিরূপে বরণ করিত; কিন্তু সে মাতাপিতার অধীন, তাঁহারা যাঁহার সহিত বিবাহ দিবেন, তিনিই তাহার স্বামী হইবেন। কিন্তু ভগিনীদের দুর্দ্দশা দেখিয়া, বিবাহের প্রতি তাহার কতকটা বিতৃষ্ণাও জন্মিয়াছিল। সে এক একবার মনে করিত, বিবাহ না করিয়া সে বরং চিরকাল অনূঢ়াই থাকিবে। কিন্তু আজ হরনাথকে স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার মন কেমন এক রকম হইয়া গেল। সে শ্রীনাথবাবুর প্রশ্নের দুই একটা উত্তর দিতে দিতেই অন্যমনস্কা হইয়া পড়িল।

হরনাথ সকলকে আসিতে বলিয়া অগ্রবর্ত্তী হইলে, রাণী আর দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া পথপার্শ্বে বসিয়া পড়িল। ভবানী সেই স্থানে দাঁড়াইয়া

দাঁড়াইয়া একবার রাণীর দিকে চাহিল এবং চিন্তাকুল মনে ভাবিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে ক্ষেতুকে বলিল,—"ক্ষেতু, পরের বাড়ী গিয়ে কাজ নাই; অন্য কোনও পথ দিয়ে তুমি আমাদের নিয়ে চল।"

বিমলা ছেলে কোলে করিয়া পাহাড়ে উঠিতে ও নামিতে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; এবং বিশ্রামের আবশ্যকতা অনুভব করিতেছিল। সে ভবানীর কথা শুনিয়া বলিল, "ও মা! তুম্‌রা হরঠাকুরের ঘরকে নাই যাবে, কি বল্‌ছো গো? হরঠাকুর ঘোষালের ভাগ্না বটে; না গেলে তোমার পিসে ও পিসী রাগ কর্‌বে যে!" ক্ষেতুও বলিল, কৈলাসপুরে যাইবার আর অন্য কোনও পথ নাই; তাহাদিগকে কৃষ্ণপুর হইয়া যাইতেই হইবে। অগত্যা সকলে কৃষ্ণপুর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। রাণী একেবারে নীরব ও গম্ভীর হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে তাহার যে স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহ দেখা গিয়াছিল, তাহা যেন সহসা অন্তর্হিত হইল। ভবানী রাণীর এই পরিবর্ত্তন বিশেষরূপে লক্ষ্য করিল, এবং মনে মনে সঙ্কল্প করিল, তাহারা কৃষ্ণপুর গ্রামের মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া বাহিরের পথ দিয়াই চলিয়া যাইবে; কিন্তু তাহারা গ্রামের সন্নিহিত হইবামাত্র দেখিল যে, একটী বর্ষীয়সী মহিলা ও কতিপয় যুবতী তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পথের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। সকলেই রাণী ও ভবানীকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু ভবানী বলিল, "আমরা এখন আপনাদের বাড়ী যেতে পার্‌ব না। কৈলাসপুর যেতে আর দেড়ক্রোশ মাত্র পথ বাকী আছে; এখনই আমরা সেখানে চলে যাব।" হরনাথের মাতা ভবানীর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "ও মা, সে কি কথা গো! এতখানি বেলা হ'য়ে গেছে; আহা, রোদে বাছাদের মুখ শুকিয়ে গেছে! তোমরা এ বেলা না খেয়ে যেতে পাবে না। রোদ পড়্‌লে তখন বিকেল বেলায় যাবে। তোমরা না খেয়ে গেলে, দাদা কি বল্‌বেন বল দেখি? আর তোমার পিসীমাই বা কি বল্‌বেন? চল, চল, আমাদের বাড়ী চল।"

ভবানীর আর ওজর আপত্তি চলিল না। গ্রামের যুবতীরা রাণীর রূপ দেখিয়া এক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল এবং পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিল, "আহা, মেয়ে তো নয়; যেন সাক্ষাৎ ভগবতী! দুর্গারাণী তো দুর্গারাণীই বটে! যেমন মেয়ে, তেমনই বর! এমন বরে বাপ মেয়ে দিতে চায় না গা?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাণী ও ভবানী যে তিন চারি ঘণ্টা কৃষ্ণপুরে কাটাইল, সেই সময়ের মধ্যে গ্রামের অনেক যুবতী ও মহিলার সহিত তাহাদের আলাপ হইল। হরনাথের জননীর আদর, যত্নে ও স্নেহে তাহারা মুগ্ধ হইল। কিন্তু রাণীর মনে একটা বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল; তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, হরনাথ এবং তাঁহার এই ঘরবাড়ী যেন তাহার কতকালের পরিচিত! এই ঘর, এই উঠান, ঐ পক্ষীর কলরবে মুখরিত বৃহৎ বকুল গাছটি এবং তাহার অন্তরালে ঐ বিষ্ণু মন্দিরটি সে যেন কখন্ কোথায় দেখিয়াছে! তাল পুকুরের বাঁধাঘাটে স্নান করিতে গিয়া তাহার মনের গোলযোগ আরও বাড়িয়া উঠিল। এই পুকুর, ঐ শালের বন, ঐ মাঠ, ঐ পাহাড়, সে যেন ইহার পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছে! তাহার মনে এ কি রকম গোলযোগ উপস্থিত হইল! সে তো জন্মাবধি বাড়ীর বাহিরে কখনও একটী পাও বাড়ায় নাই! স্নানান্তে বাঁধা ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া রাণী অনন্যমনে এই সমস্ত কথা ভাবিতেছিল, এমন সময়ে ভবানীর আহ্বানে তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে সুপ্তোত্থিতার ন্যায় ভবানীর অনুসরণ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিল। গৃহে উপনীত হইয়া বিষ্ণু মন্দিরে প্রণাম করিতে গিয়া তাহারা হরনাথের সম্মুখে পড়িল। হরনাথ পূজা করিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইতেছিলেন; এমন সময়ে সহসা ভবানী ও রাণীকে আসিতে দেখিয়া পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইলেন। রাণী তাঁহাকে দেখিবামাত্র লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল এবং তাহার দেহের শিরায় শিরায় ও ধমনীতে ধমনীতে বেগে উষ্ণ রক্ত-প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। রাণী ঠাকুরকে প্রণাম করিতে গিয়া প্রণামের মন্ত্র ভুলিয়া গেল, এবং মনের মধ্যে ঠাকুরের মূর্ত্তি দেখিতে না পাইয়া কেবল হরনাথের মূর্ত্তিই দেখিতে পাইল! বৈকালে তাহারা যখন কৃষ্ণপুর ত্যাগ করিল, তখন রাণী যেন কিছু প্রকৃতিস্থা হইল। সান্ধ্য শীতল সমীরণ সংস্পর্শে তাহার মস্তিষ্ক যেন অনেকটা সুশীতল হইল।

কৈলাসপুরে উপনীত হইলে, রাণীর মন বিস্ময় মিশ্রিত আনন্দে উৎফুল্ল হইল। বাড়ীর পার্শ্বেই প্রকাণ্ড পাহাড় এবং পাহাড়ের উপর কৈলাসনাথের মন্দির। পাহাড়ের প্রস্তরময় সোপানসমূহ অতিক্রম করিয়া মন্দিরে উপনীত হইতে হয়। পথের উভয় পার্শ্বেই শেফালিকা বন ও কূটজ বন। বন-মল্লিকার লতাবলী স্থানে স্থানে অপূর্ব্ব বিভাগ সমূহের সৃষ্টি করিয়াছে। পর্ব্বতের উপর বহু বৃক্ষলতা এবং স্থানে স্থানে নিবিড় বনও আছে; কিন্তু মন্দিরে সর্ব্বদা লোক

সমাগম হয় বলিয়াই হউক, কিম্বা স্থান-মাহাত্ম্য বশতঃই হউক, পাহাড়ের উপর কোথাও হিংস্র জন্তুর উপদ্রব নাই। কৈলাসনাথের সান্ধ্য আরতি দেখিবার জন্য দলে দলে নরনারী পর্ব্বতে আরোহণ করিতেছিল। রাণী এবং ভবানীও পিসী-মাতার সহিত ভগবানের সান্ধ্য আরতি দেখিবার জন্য মন্দিরে আরোহণ করিল।

কৈলাসনাথের মন্দিরের পার্শ্বেই ভৈরবের মন্দির; এবং অদূরে পর্ব্বত গাত্র কাটিয়া একটী প্রকাণ্ড গুহার মধ্যে কাত্যায়নীর মন্দির আছে। কাত্যায়নী দশভুজার মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিটি একটী বৃহৎ অখণ্ড প্রস্তর হইতে খোদিত হইয়াছে। একটী গুহার মধ্যে গণেশের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিও আছে। তাহাকে লোকে গণেশ-গুহা বলে। এই মন্দির সমূহ ব্যতীত পর্ব্বতের স্থানে স্থানে কালীর মন্দির, লক্ষ্মীর মন্দির এবং জগদ্ধাত্রীর মন্দির আছে। এই শেষোক্ত মন্দিরটি যেন অপেক্ষাকৃত আধুনিক। পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে বিষ্ণুমন্দিরও আছে; কিন্তু তাহা অতীব দুরারোহ। কোন্ প্রাচীনকালে কে এই মন্দির-নিচয় ও গুহা সমূহ প্রস্তুত করাইয়া, তন্মধ্যে এই বিগ্রহগুলি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তৎসম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী আছে, তন্মধ্যে একটী এই যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য বঙ্গদেশ বিজয় করিতে আসিয়া এই পর্ব্বতের সৌন্দর্য্যে অতিশয় মুগ্ধ হয়েন, এবং এই প্রদেশে কিয়দ্দিন বাস করিয়া এই মন্দির সমূহ নির্ম্মাণ করান! এই প্রদেশের ক্ষত্রিয় ভূম্যাধিকারিগণ আপনাদিগকে বিক্রমাদিত্যের বংশধর বলিয়া পরিচিত করেন। বহু প্রাচীনকাল হইতে ভগবান্ কৈলাসনাথ ও ভগবতী কাত্যয়নীর পূজা হইয়া আসিতেছে। ইহাঁদের নিত্য নৈমিত্তিক পূজার জন্য মূল্যবান্ দেবোত্তর ভূ-সম্পত্তি নিরূপিত আছে, তাহারই আয়ে পূজাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। কৈলাসপুরের ঘোষাল মহাশয়েরা বহুকাল হইতে এই পূজা কার্য্য সম্পাদন ও দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছেন। কাত্যায়নীর মন্দিরে শারদীয়া পূজার সময়ে ভগবতীর বিশিষ্ট ভাবে পূজা হয়; তৎপরে লক্ষ্মীর মন্দিরে লক্ষ্মীপূজা ও কালীমন্দিরে কালীপূজা এবং অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীর মন্দিরে জগদ্ধাত্রী দেবীরও পূজা বিশিষ্ট ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ভবানী তাহার জনক জননীর সহিত বহুবার কৈলাসপুরে পিসীমার বাটীতে আসিয়াছিল; কিন্তু রাণী কখনও এখানে আসে নাই। এই কারণে সে কৈলাসপুরের পাহাড় এবং পাহাড়ের উপর মন্দির নিচয় ও দেব-দেবীগণের মূর্ত্তি দেখিয়া চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইল। কৈলাসপুর তাহার নিকট সাক্ষাৎ

কৈলাসপুরীর মত প্রতিভাত হইতে লাগিল। দেবমূর্ত্তি সমূহ দর্শন করিয়া তাহার পবিত্র হৃদয়ে অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব ও ভক্তি জাগিয়া উঠিল। রাণী মনে করিতে লাগিল, এইস্থানে যেন সাক্ষাৎ স্বর্গ এবং পলাশ-ডাঙ্গা যেন নরক। সে পলাশ-ডাঙ্গার বাটীতে আর ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছাও করিল না।

অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া দুর্গারাণী তাহার পিস্তুতো ভ্রাতার পত্নী শৈলজার সহিত কৈলাস পর্ব্বতের মন্দাকিনী ধারায় স্নান করিতে গমন করিল। পার্ব্বত্য পথটি তাহার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী শেফালিকা বৃক্ষের শাখাচ্যুত পুষ্পরাশিতে আকীর্ণ হইয়াছিল, এবং পুষ্পের সুমধুর গন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত হইতেছিল। মল্লিকা ও কুটজ পুষ্প সমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া তাহাদের শুভ্র শোভায় পর্ব্বত গাত্র আলোকিত করিতেছিল। সেই উজ্জ্বল প্রভাত সময়ে পর্ব্বতারোহণ করিতে করিতে দুর্গারাণীর মনে হইতে লাগিল যেন, সে দেবলোকে গমন করিতেছে। কৈলাসনাথের প্রস্তরময় বিশাল মন্দিরটি বামভাগে রাখিয়া তাহারা একটী অপ্রশস্ত পথে কিয়দ্দূর গিয়া নানা বিহঙ্গম-মুখরিত একটী মনোহর আম্রকাননে উপনীত হইল। তাহা অতিক্রম করিয়া তাহারা একটী বিশাল বিল্ববনে উপস্থিত হইল। দুর্গারাণী সবিস্ময়ে দেখিল যে, সেই স্থানের দুরারোহ পর্ব্বত গাত্রটি অবিরল বিল্ববৃক্ষে সমাচ্ছাদিত। সেখানে অন্য কোনও জাতীয় বৃক্ষ নাই। ফল ভারাবনত পত্র-বহুল বিল্ববৃক্ষের এই মনোহর বন তাহার নিকট একটী অপূর্ব্ব দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হইল! গিরি গাত্রস্থিত অপ্রশস্ত পথ দিয়া গমন করিতে করিতে, দুর্গারাণী অদূরে একটী জল-প্রপাতের প্রচণ্ড পতন শব্দ শুনিতে পাইল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই প্রপাতের নিকটবর্ত্তী হইয়া সে যে দৃশ্য দেখিল, তাহা তাহার মানসপটে চির মুদ্রিত হইয়া গেল। একটী উচ্চ দুরারোহ ও নগ্ন পর্ব্বত শৃঙ্গের গাত্র বাহিয়া জলধারা প্রচণ্ড নিনাদে অনবরত ঝরিয়া পড়িতেছে। সেই জলধারা একটী গোলাকার বৃহৎ কৃষ্ণ প্রস্তরের উপর নিপতিত হইয়া, বেগে পর্ব্বত গাত্রের উপর চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সেই ধারা পর্ব্বত গাত্রের উচ্চস্তর হইতে নিম্নস্তরে অবতরণ করিবার সময়, এক গম্ভীর নিনাদে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে। দুর্গা রাণীকে চিত্রার্পিতার ন্যায় সেই ঝরণার দিকে সবিস্ময়ে চাহিতে দেখিয়া, শৈলজা বলিল "রাণি! তুমি শুনেছ যে বিষ্ণুর পাদপদ্ম হ'তে মন্দাকিনী বেরিয়ে শিবের মাথায় প'ড়েছিলেন। তারপর শিবের মাথা হ'তে ভূতলে নেমে, সেই মন্দাকিনী গঙ্গা নাম ধারণ করলেন। তারপর তিনি পাতালে

নেমে ভোগবতী নাম নিলেন। ঐ যে পাহাড়ের উচ্চ চূড়াটি দেখ্‌ছ, উহার নাম বৈকণ্ঠ। ঐখানে বিষ্ণুর মন্দির আছে। সে মন্দিরে উঠা বড় শক্ত। ঐখানে বিষ্ণুর পাদপদ্ম হ'তে মন্দাকিনী বেরিয়ে ঐ পাহাড়ের গা বেয়ে নাম্‌ছেন। নেমে, ঐ দেখ শিবের মাথায় পড়্‌ছেন। শিবের মাথা হ'তে নেমে ঐ দেখ মন্দাকিনী গঙ্গা হ'লেন। সাম্‌নে আমরা যে জলের স্রোত দেখ্‌ছি, ইনি গঙ্গা। তারপর দেখ, এই গঙ্গা পাহাড়ের নীচে পর্য্যন্ত নেমে ঐ গভীর বনে একটী খাদের মধ্যে লুকিয়ে গেছেন। সেইখানে তিনি ভোগবতী নাম ধারণ ক'রেছেন। মন্দাকিনীর ধারায় স্নান করা শিব ছাড়া কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। আমরা কেবল গঙ্গাধারায় স্নান করি। কিন্তু যিনি গঙ্গা, তিনিই মন্দাকিনা,আর তিনিই ভোগবতী। রাণি! এমন সুন্দর ও পবিত্র স্থান তুমি আর কোথাও দেখেছ? আমি রোজই গঙ্গা-ধারায় স্নান করি এবং এইখানে শিবপূজা ক'রে বাড়া যাই। এখন চল, আমরা গঙ্গাধারায় স্নান করি। এখানে কোনও ভয় নাই, আর এখানে জলের স্রোতও তেমন প্রবল নয়। আহা, কেমন পরিষ্কার জল দেখেছ! এই জল কখনও ঘোলা হয় না। এখন যেমন দেখ্‌ছ, বর্ষাকালে আর সব সময়েই তেমনি থাকে।"

দুর্গারাণী বিস্ময়ে, হর্ষে ও ভাবাবেগে নির্ব্বাক্ হইয়া এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতেছিল ও বৌদিদির কথা শুনিতেছিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, ঐ উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ সত্য সত্যই যেন বৈকণ্ঠধাম, এবং ঐ পর্ব্বত গাত্র বাহিনী এই নির্ঝরিণী যেন গঙ্গা। রামায়ণে যে গঙ্গাবতরণের কাহিনী পড়িয়াছিল; আজ সেই দৃশ্য সে স্বচক্ষে দেখিতে পাইল! সত্য বটে, ইহা প্রকৃত গঙ্গা নহে; কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল, হয়ত ইহা পুরাকালের সেই সত্য ঘটনার একটী সুন্দর ও স্বাভাবিক অভিনয়। কে বলিতে পারে, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ভগবান্ এই দৃশ্যের সৃষ্টি করেন নাই? এই কৈলাস গিরির পবিত্রতা যে সাক্ষাৎ কৈলাসেরই তুল্য এবং এই গঙ্গা যে প্রকৃত জাহ্নবীরই ন্যায় পবিত্র ও কলুষনাশিনী, সে বিষয়ে তাহার মনে কোনই সন্দেহ রহিল না। সে ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে সেই পূত জলধারায় শৈলজার সহিত স্নান করিয়া আপনাকে পবিত্র মনে করিল।

উভয়ে সিক্তবস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করিল। শৈল সেই পবিত্র-ধারায় জল একটী কলসে পূর্ণ করিয়া লইল। দুর্গারাণীও ঘটী পূর্ণ করিয়া জল লইল। তৎপরে উভয়ে নিকটবর্ত্তী এক বিল্ববৃক্ষের মূলে এক শিবলিঙ্গের সম্মুখে উপবিষ্টা হইয়া তাঁহার পূজার আয়োজন করিতে লাগিল। শৈল প্রত্যহ স্নানান্তে মহাদেবের পূজা করে। সে কতিপয় বিল্বপত্র চয়ন করিল, নিকটবর্ত্তী এক পরিচ্ছন্ন

শিলার পার্শ্বে একটী চন্দন কাষ্ঠ ছিল ; তাহা ঘসিয়া চন্দন সংগ্রহ করিল। কতিপয় শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিয়া জ্বলন্ত অঙ্গারগুলি একটী মৃৎপাত্রে রাখিয়া তাহাতে সুগন্ধি ধুপ নিক্ষেপ করিল। শিলাতলে একটী নিভৃত স্থানে একটী প্রদীপ ও তৈলপূর্ণ তৈলাধার ছিল; বর্ত্তিকা প্রস্তুত করিয়া সে প্রদীপটি জ্বালিল এবং অঞ্চলে বাঁধা কতকগুলি আতপ তণ্ডুল, একটী কলা ও কতিপয় বাতাসা বাহির করিয়া, সেই নির্ঝর বারি দ্বারা ভগবান্‌কে স্নান করাইয়া ভক্তিভরে তাঁহার পূজা করিল। দুর্গারাণী কখনও শিবপূজা করে নাই। বৌ-দিদিকে শিবপূজা করিতে দেখিয়া তাহারও শিবপূজা করিবার প্রবৃত্তি প্রবলা হইল। শৈল বলিল, "আজ তুমি মন্ত্রগুলি মুখস্থ করে নাও; কাল থেকে শিবের পূজো কর্‌বে।"

শুদ্ধ-স্নাতা ও রক্ত-পট্ট-বস্ত্র-পরিহিতা সুন্দরী দুর্গারাণীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া শৈল বিস্মিত মনে তাহাকে কিয়ৎক্ষণ দেখিল ; পরে বলিল দুর্গারাণি! তুমি দুর্গা-রাণীই বটে; কাল থেকে তুমি মহাদেবের পূজা ক'র; তাহ'লে মহাদেবের মত স্বামী পাবে। তুমি একটু ব'স? তোমার কপালে আমি চন্দনের অলকা এঁকে দিই।' এই বলিয়া শৈলজা একটী বিল্বপত্রের বোঁটা দ্বারা দুর্গারাণীর কপালে চন্দনের বিচিত্র অলকা আঁকিয়া দিল। অলকা-শোভিতা দুর্গারাণীকে দেখিয়া শৈলজার ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অপূর্ব্বভাবের উদয় হইল।

স্নানান্তে উভয়ে গল্প করিতে করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে পথিমধ্যে স্নানার্থী হরনাথের সহিত তাহাদের দেখা হইল। হরনাথ শৈলজাকে দেখিয়া বলিল, "এই যে, এর মধ্যেই বৌদিদির স্নান হ'য়ে গেছে!" শৈল হাসিয়া বলিল, "কোন্ দিন না হয়? তুমি বুঝি বাড়ী থেকে এখনই এলে?" তুমি আমাদের দুর্গারাণীকে দেখেছ?" হরনাথ গতকল্য তাহার একবিধ রূপ দেখিয়াছিলেন; আজ তাহার অন্যবিধ অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া, বিস্ময়ে চমকিত হইলেন। তিনি বলিলেন "হাঁ দেখেছি; ইনি সাক্ষাৎ দুর্গারাণীই বটে।" শৈল বলিল, "আর তুমিও তো সাক্ষাৎ হরনাথ। আমরা হরগৌরীর মিলন দেখ্‌বো কবে?" হরনাথ বলিলেন "যে দিন গৌরী প্রসন্ন হবেন।" শৈলজা হাসিয়া বলিল, "যে দিন গৌরী প্রসন্ন হবেন, না যে দিন হরনাথ প্রসন্ন হবেন?" হরনাথ হাসিয়া বলিলেন "শাস্ত্রের কথা তাই বটে; কিন্তু আজ কাল সব উল্টো।" শৈলজা বলিল "উল্টো নয়, উল্টো নয়; আমি দুর্গারাণীকে ব'লেছি, কাল থেকে সে শিবপূজা কর্‌বে, তা হ'লেই হরনাথ প্রসন্ন হবেন।" হরনাথ বলিলেন, "আপনার ব্যবস্থা উত্তম।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

৩য় ভাগ। কার্ত্তিক ১৩২১। ৭ম সংখ্যা।

মোক্ষ]

শ্রীশ্রীকালীরূপ বর্ণন।

(**Iconographical.**)*

যুগপৎ সমুদিত, কোটী সূর্য্য শোভান্বিত,
স্থির-ক্ষীর-অম্বুধির সুনীল হৃদয়ে।
কে আনি রাখিল ওই, তরুণ অরুণ দুই
দু'টী নীল-পদ্ম দিয়ে এমনে ঢাকিয়ে ?
প্রতি নীল ইন্দীবরে, অৰ্দ্ধ ইন্দু শোভা করে,
কোটী শশী আভা জিনি পঞ্চ পঞ্চ দলে ;
তদুপরি যুগ মীন, উৰ্দ্ধমুখ চারু পীন,
করভে ছলিতে বুঝি লুকাল মৃণালে ?

---

* হিন্দুর শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, তন্ত্র, জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রের ন্যায় শিল্প সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যার মধ্যেও আর্য্য ঋষিগণ সকলের প্রতিপাদ্য ও পরিসমাপ্তি একমাত্র ভগবানকেই লক্ষিত করেন। তত্ত্বদর্শনাভিলাষী মানব যাহাতে ভগবানেব স্বত্বা সর্ব্বে ও সর্ব্বকে ভগবানে লীন দেখিতে পান সেই নিমিত্ত তাঁহাদের ভাস্কর্য্য ও চিত্রশিল্পের সাহায্যে অভিষ্ট-দেব প্রতিমার গঠন সৌকর্য্যার্থে জগতের সৌন্দর্য্য সমাহারে অভীষ্ট দেবতার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করাইবার জন্য ও দেবতার সৌন্দর্য্যে জগৎকে বিভূষিত দেখাইবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি জাগতিক বস্তুর রূপ, গুণাদির সহিত তুলনায় দেবমূর্ত্তি গঠন প্রণালী বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। এই কবিতাটী সেই পন্থানুমোদিত উপমেয় বস্তুর বিশেষ ভাব সংগ্রহে লিখিত। পাঠক স্বীয় মানস-ফলকে ঐ সকল বস্তুর বর্ণ, গঠন, সৌন্দর্য্য, কাঠিন্য ও কোমলতা দ্বারা ইষ্টদেবের অলৌকিক দ্যুতি-বিভাষিত চিন্ময় মূর্ত্তি অঙ্কিত ও চিত্রিত করিয়া দেখিতে পারিলে আনন্দ-লাভ করিতে পারিবেন আশা করা যায়। উপম্য ও উপমেয়ের পর্য্যায় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ভাবে বুঝি তাই হবে, উভচর হ'য়ে তবে ;
কর্কট যুগল কেন রহে তার মাঝে ?
বিমুখী হইয়া তা'ই, করভ দুইটী ভাই,
যুক্ত-তুণ্ডে ভিন্ন-শুণ্ডে বিভঙ্গে বিরাজে।
চম্পকলি কাঞ্চি হারে, তা'দিগে বেড়িল কেরে,
নৃ-কর-কিঙ্কিণী শোভা যাই বলিহারি,
ঊর্দ্ধে সিংহ কটি'পরে, গোমুখ বিরাজে কিরে,
শিরোপরে ধরি দুই পয়োধর-গিরি ?
দুই গিরি পার্শ্ব ঘিরে, মন্দাকিনী বহে ধীরে,
ধর্ম্মিল্য-শৈবাল রক্ত-উৎপল শোভিত।
বুঝি সে আবর্ত্ত লীলা, দেখায় নৃমুণ্ডমালা
যুগ্ম-গজ-কুম্ভরূপ অংশোপরে স্থিত।
সহ দুই করি তুণ্ড, একি হেরি চারি শুণ্ড,
চারি বাহু নানা রত্ন ভূষণ ভূষিত।
তাহারই প্রান্ত ভাগে, রাম রম্ভা-শিশু আগে,
শোভে চম্পা-কলি কর-কমল সহিত।

স্থির ক্ষীর অম্বুধির সুনীল হৃদয়=রজতগিরিনিভ নীলকণ্ঠ মহাদেবের অঙ্গ-জ্যোতি ও গাম্ভীর্য্যাদি ভাব।

তরুণ অরুণ=রক্তবর্ণ পদতল। নীল পদ্ম=বর্ণ ও ন্যুব্জিকৃত ফুল্লপদ্মদলের অবনমিত গঠনের সহিত পদপৃষ্ঠের গঠনভঙ্গ। অর্দ্ধ ইন্দু=পদনখ। পঞ্চ পঙ্কদল=পাঁচ পাঁচ পদাঙ্গুলি (গঠনের উপমা)। মীন=জঙ্ঘা। করভ=করি শিশুর শুণ্ডের সহিত উরু ও শিরের সহিত নিতম্বের গঠন উপমা। কর্কট=জানু (হাঁটুর খিলা)।

চম্পকলি=(চাঁপার কলি) করাঙ্গুলি। সিংহকটি=সিংহের ন্যায় ক্ষীণকটী। গোমুখ=নাভীর কিঞ্চিত নিম্ন হইতে কণ্ঠাস্থির নিম্ন পর্য্যন্ত তনুর গঠন। পয়োধর গিরি=অমৃতপূর্ণ স্তন গঠনেও গিরির ন্যায়। মন্দাকিনী=গৈরিক বর্ণ। ধর্ম্মিল্য (কেশ) শৈবালের ন্যায় রক্তোৎপল লহ আবর্ত্তে রক্তাক্ত ছিন্নমুণ্ডের ন্যায় দেখায়। অংশ=স্কন্ধ, করি-শির সদৃশ গঠন। গজশুণ্ড=বাহুর গঠন। রাম রম্ভাশিশু=কফোনি হইতে কর পর্য্যন্ত বাল-কদলী কাণ্ডবৎ। কম্বু-কণ্ঠ=শঙ্খের ন্যায় বলি ও রবযুক্ত। শশি=বদনশশি গোষ্পদাঙ্কিত-চিবুক=অবনমিতমধ্য (টোল পড়া) চিবুক। বন্ধুজীব (বান্ধুলী ফুল)=অধরের গঠন। মুক্তামালা=দন্তপংক্তি। পক্কবিম্ব=গঠনে ও বর্ণে ওষ্ঠাধর। চ্যুতপত্র (আম্রপত্র)=জিহ্বা। শুকচঞ্চু=নাশিকার গঠন। বুকে=নাশিকার বুকে (অর্থাৎ ছিদ্রদ্বয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থানে) যোড়া ধনু—ভ্রূদ্বয়। নীলাব্জ—চ'খের তারা। কমল দল—চ'খের ভিম। গৃধ্র=কর্ণ (উপবিষ্টাবস্থার গঠন কর্ণাবয়বের সদৃশ) ধুমকেতু পুচ্ছ—কেশগুচ্ছ। নীলেন্দু॥ কপালের গঠন।

পং সং

অভয় বরদ যাম্যে, নৃমুণ্ড খর্পর বামে,
শান্তরৌদ্র একাধারে রহিয়াছে মিশি।
কণ্ঠ-নীল কম্বুপরে, এরূপে রাখিল কেরে,
কোটী ভানু-জ্যোতি-জিত হেন নীল শশী।
তার—অধোভাগে অনুপম, রত্ন ঘট মনোরম,
সুচারু গোস্পদ চিহ্ন তাহাতে অঙ্কিত।
তাহে বন্ধুজীব দলে, জড়ায়ে মুকুতা মালে,
পক্ক বিল্বফল দিয়া করিল সজ্জিত!
দোঁহার মাঝারে একি, ললিত লোলিত দেখি,
নবীন লোহিত চারু চ্যুত-পত্র দোলে।
সদ্য রক্তবিন্দু প্রায়, সিন্দূর শোভিত তায়,
কোন দেবে, কে পূজিবে এ বিধু-মণ্ডলে?
শুক-চঞ্চু নত মুখে— গুঞ্জামণি দোলে বুকে—
এমন আধারে জানি কোন দেব বসে?
আকুঞ্চিত জোড়া ধনু, তাহার আশ্রয়ে জনু,
রক্তাভ কমল দলে নালাব্জ বিকাশে।
স্পর্শি বাল নীল ইন্দু ভালে শোভে কলা বিন্দু
নীলেন্দুর অবনত দুই শৃঙ্গ পাশে।
শব যুগ্ম ধরি নখে, গৃধ্রদ্বয় নত মুখে,
বসে বুঝি আছে অই শিশু শব আশে।
সবার পশ্চাতে একি? ধূমকেতু-পুচ্ছ দেখি,
নবীন নীরদ কৃষ্ণ উড়ে মন্দ বায়।
কোটী সূর্য্য প্রভা জিনি, সুনীল বরণী ধনী,
মুক্তকেশ আগে খেলে দামিনী প্রভায়।
কে জানে এ নারী কেরে? দেখে প্রাণ মন হরে,
ইন্দ্রিয়, বাসনা বুদ্ধি ও পদে লোটায়।
ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, শিবা, গায়ত্রী, সাবিত্রী কিবা,
পরব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী রূপেতে খেলায়!

শ্রীচিন্তা—

স্বামীজির শ্যামাপূজা।

কাল রাত্রে স্বপ্নে স্বামীজির সাক্ষাৎলাভ হইল। দর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইয়া প্রণিপাত করিয়া বলিলাম "এবার বহরমপুরে দেবেন্দ্রের বাড়ীতে, বেশ ভাল করিয়া ৺কালীপূজা করিবার ইচ্ছা আছে, তৎসম্বন্ধে যদি কিছু উপদেশ দেন, ত' বড়ই ভাল হয়।"

স্বামি। তো'র মনোগত ভাব আমি বুঝিতে পারিয়াই আজ তোকে দেখা দিলাম। প্রথমে বল দেখি শ্রীকালীতত্ত্ব কি বুঝিয়াছিস্?

আমি। সত্যি কথা বল্‌তে কি, ঠাক্‌রুণের নামেই কেমন একটা ভয় হয়? তবে আমাদের শ্রীমতি আনি বেশান্ত ও লেডবিটার সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহাতে বুঝাযায়, অজ্ঞান বা বামমার্গের শক্তির নামই কালী। উহা স্বরূপ-চৈতন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ছায়ারূপা বিরুদ্ধ শক্তি। বিদূষী বেশান্ত এইজন্য তাঁহাকে তামসী বা জড়শক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

সামি। তবে পূজা করিস্ কেন?

আমি। তা' ঠিক বলিতে পারি না। যখন মায়ের রাঙ্গা পাদপদ্ম বা মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া দেখি, তখন প্রাণের ভিতর কি-জানি-কি-রকম একটী মিষ্ট আকর্ষণ জাগিয়া উঠে; এবং মনে হয় বাহ্যে মায়ের যে রূপ দেখিতেছি ইহার 'অভ্যন্তরে কি এক পরিপূর্ণ আনন্দ-ঘন সত্বার আভাস আছে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, ওটা আমাদের ভ্রান্তি বলিয়াই মনে হয়। আমোক্ষ মূলর বেশান্তান্ত পণ্ডিতগণের গবেষণা স্বীকার না করিয়াও থাকা যায় না। তা'ই সেই মহাভীতিপ্রদা সংহারকারিণীকে - মনকে চোখ ঠারিয়া—তুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হই,—কি জানি রণচণ্ডী উগ্রা হইলে সমস্ত সাধনাই পণ্ড হইয়া যাইবে।

স্বামি। তোদের বিদ্যা এই রকমই বটে। যা'দের চৌদ্দপুরুষে কেহ বিশিষ্ট আমিটীকে ত্যাগ করিতে পারে না, যা'দের ধর্ম্ম, কর্ম্ম সবই সেই ভেদাত্মক বিশিষ্টতার জন্য, যা'দের মধ্যে তোদের পরমপূজনীয় জর্ম্মানজাতি স্কুলে এবং কলেজে এই শিক্ষা দেন যে 'দয়া ধর্ম্ম প্রভৃতি কোমল প্রবৃত্তিগুলি দুর্ব্বলতার চিহ্নমাত্র ও মানব ঐ সমস্ত পরিহার-পূর্ব্বক স্বীয় অভিষ্ট-সিদ্ধির পথে উপস্থিত সহস্র সহস্র বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক জগদ্ব্যাপী সমরানল প্রজ্বলিত করত কোটী মানবের প্রাণনাশ করিয়াও যদি স্বার্থসিদ্ধি করিতে হয় তাহা অবশ্য করিবে'—সেই আসুরিক উপদেষ্টার হৃদয়ে কখনই মহাবিদ্যা আদ্যা ভগবতীর মহিমা

প্রকটিত হইতে পারে না। তো'কে তুই একটা কথা মাত্র বলিব, সমাহিত চিত্তে শুনিয়া যা।

চিদানন্দঘন শ্রীভগবানের চৈতন্যকেই দেবী বলে। হিন্দুগণ ইঁহারই অর্চ্চনা করে। ইনিই খ্রীষ্টানদের Eternal Virgin, মিশরে Isis, প্রভৃতি নানা নামে অভিহিতা হন। ভগবান্‌কে পাইতে ও জানিতে গেলে তাঁহারই চৈতন্যের সাহায্য ভিন্ন পারা যায় না।

আমি। এ'ত খুব সহজ কথা। এই বিভিন্ন ভাবের চৈতন্য শক্তিকেই বিভিন্ন মূর্ত্তিতে ইঙ্গিত করা হয়। কিন্তু যে মূর্ত্তির ক্রিয়া ধ্বংস ও বিনাশ, তাঁহাকে মানব কি করিয়া ভক্তি করিতে পারে?

স্বামি। বহুক্ষণ অনাহার পিড়ীত ব্যক্তি যেমন প্রদত্ত আহার্য্যের দোষ গুণ বিচার করিতে যায় না, সেইরূপ প্রকৃতপক্ষে যাহার প্রাণ ভগবানের জন্য লালায়িত হয়, সে বাহ্যভাবের বিলাস লইয়া মুগ্ধ হয় না। দূরদেশ প্রত্যাগত স্বামী গৃহে আগমন করিলে, পতিব্রতা রমণী যেমন তাঁহার পরিচ্ছদের দিকে দৃষ্টি করে না, সেরূপ যাহাদের চিত্ত ভগবানের শুদ্ধ নিষ্কল পরব্রহ্মরূপে সংলগ্ন তাহারা আনন্দময়ীর পরব্রহ্মরূপেসিদ্ধা মূর্ত্তির স্বরূপ দেখিতেই উদগ্রীব; কারণ তাহারা জানে যে বাহ্য ভাবটি বিলাস মাত্র। যাহারা ঘরে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, তাহারা শ্রীভগবানের মায়াবিভূতির মধ্যে কোন্ ভাবটীকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবে? যে ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিলে বাহ্যিক সুখ সমৃদ্ধি সিদ্ধ হয়, যাহার সেবায় সাধক লোক হইতে লোকান্তরে গমন করত চৈতন্যময়ীর বাহ্য বিলাসের তরঙ্গ-ভঙ্গে নৃত্য করিতে থাকে, সেই ভাবের খেলার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কি স্বরূপে পৌছান যায়? এই বাহ্য বিলাসকে আমরা প্রকৃতি বলি। ইহার সাহায্যে সাধক অল্পে অল্পে বাহিরে আগমন পূর্ব্বক সর্ব্বের সহিত খেলা করিতে থাকে। প্রকৃত ভগবদ্‌বুদ্ধি না থাকিলে তাহার সাধনা ঈদৃশ খেলাতেই পরিসমাপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু যখন আর খেলা দেখিতে ভাল লাগে না, যখন সেই খেলাকে এক অধিকরণে অবসান বা শেষ করিবার নিমিত্ত "সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদিসংস্থিতে স্বর্গাপবর্গদে" দেবীকে দেখিতে পাইবে, তখন প্রকৃত বুদ্ধি যে বাহিরের ভাবগুলিকে 'স' বা একরূপ শ্রীভগবানে অবসান করে, ইহা বুঝিয়া জনগণের বুদ্ধিরূপে সংস্থিত ও বাহ্যভাবে সংলগ্নচিত্ত মানবের পক্ষে স্বর্গদায়িনী এবং অপর পক্ষে শ্রীভগবানে অনুরক্তচিত্ত সাধকের অপবর্গদায়িনী বুদ্ধিরূপা প্রবণতার সাহায্য গ্রহণ করিয়া সাধক বলিয়া উঠে

"তন্নোধিয়ো প্রচোদয়াৎ"—"মা এরূপভাবে খেল, যাহাতে প্রকট চতুর্দ্দশভুবনাত্মক বিশ্বের মধ্যে—অস্থিরের মধ্যে স্থির, চঞ্চলের ভিতর শাশ্বত, অগতির গতি শ্রীভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব চিত্তে প্রস্ফুটিত হইতে পারে।"

আমি। এ'ত খুব ভাল কথাই ; ইহার সহিত মাঁয়ের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির কি সম্বন্ধ আছে ?

স্বামি। পল্লবগ্রাহীর মত দেখিলে কিছুই নাই। দেখ সাধারণ জগতেও প্রেমিককে কি শিখিতে হয় জানিস্ ? "প্রাণে যার সয় না ব্যথা, সে কেন কয় প্রেমের কথা ?" "সুখ হল না বলে কি প্রেম ত্যজিব ?" ইহাই প্রেমিক কবিগণের উক্তি। এইজন্যই বৈষ্ণব বলিলেন "শ্যাম তুঁহু মম মরণ সমান।" তো'রা আঁৎকে উঠে বলবি "কি 'প্রম' গো! "তুঁহু মোর—মরণ সমান!!" "Drink to me with thine eyes" এই কথাটা শুনে আমাদের একজন কবি বলেছিলেন "বাবা, কি বিকট প্রেম !! তুমি আমায় খেয়ে ফেল, আমি তোমায় খেয়ে ফেলি। "এই হায় এর মর্ম্ম।" নাটুকে ভাবের প্রেমে, নটরাজের বাহিরের খেলাই অবশ্য বটে ; তাহাতে পূর্ণিমার চাঁদ চাই, মৃদুল মলয় সমীরণ চাই, প্রস্ফুটিত কুসুমদাম চাই, কোকিল কূজন ও ভ্রমরগুঞ্জন চাই। কিন্তু যাহারা প্রেম বুঝিয়াছে, তাঁহারা প্রকৃতির এই বাহ্য সৌন্দর্য্যের বিলাসগুলিকে ত' আর বাহ্য ভাবে দেখেন না। সঙ্গীতের সুরগুলি যেরূপ ঘনভাবে মিশিয়া যাইয়া রাগ রাগিণীতে পরিসমাপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ যাহাদের ভিতরে ভগবৎ-প্রবণতা বা বুদ্ধি জাগরিত হইয়াছে, তাহারাই বাহ্য বিলাসগুলিকে অন্তর্য্যামী ভগবানে নিঃশেষে মিশাইয়া ফেলিতে পারে। ফুল্ল-শারদ-পূর্ণিমা-সুশোভিত বৃন্দাবনে রাসলীলায় একটি গোপীকাও নাটুকে-ভাবে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিবার প্রয়াসিনী হয় নাই। কারণ শ্রীভগবানে অপহৃতহৃদয়া গোপীনীগণের প্রাণে, বাহিরের সৌন্দর্য্য রাশিও আর ত' ভোগলিপ্সা বা কামকে কিছুতেই জাগ্রত করিতে পারিল না। "নহি মর্য্যাপিতচেতাং কাম কামায় কল্পতে।" ভিতরের টানে,—প্রেমময়ের প্রেমময় আকর্ষণে,—আর ত' বহির্দ্দৃষ্টির অবসর নাই ; আর ত' পক্বতির বিলাস দর্শনের সময় নাই। তখন সব যে ঘন হইয়া সেই পর-পুরুষে বিলীন হইয়া যাইতেছে।

এত গেল প্রেমিকের কথা। কিন্তু যে প্রেমের অক্ষর পরিচয় করিতে ও ভাষা শিখিতে যায়,—তাহার ত' এখনও বাহ্য ভাব আছে। তা'র যে এখনও 'বহু' আছে ; 'বহু' আছে বলিয়াই 'এক'ত এখনও স্থির হয় নাই। এখনও ত' জ্ঞান

হয় নাই ;—এখনও ত আত্মার অভেদ বুদ্ধি বা বিদ্যা-তত্ত্ব লাভ হয় নাই ;—এখনওত বাহ্য বস্তুগুলিকে একেরই পদচিহ্ন বলিয়া বুঝিতে পারা যায় নাই। যখন এই পরাভিসারিণী প্রেমের গতি জাগিয়া উঠে, যখন ব্যক্ত জগতের 'ক' হইতে 'ল' পর্য্যন্ত ঘন হইয়া, 'শক্তি' ও 'বুদ্ধি'রূপে স্থিতা ভগবচ্ছক্তির সাহায্যে 'ক্লীং'রূপে শ্রীভগবানের অভিমুখে ধাবিত হয়, তখনই ত কাম-বীজের সাধনা। কিন্তু সে প্রেম আসিবার আগে সর্ব্বাত্মিকাবুদ্ধি জাগরিত হওয়া চাই ; বাহিরের বর্ণমালা-গুলি অন্যান্য একরূপে—পরাগতি রূপে—মিশিয়া ঘন একের দিকে যাওয়াত চাই। ইহাই 'র' ও 'ল'য়ের প্রভেদ ; বাস্তবিক প্রভেদ নাই। "রলয়োরভেদঃ"। কারণ উভয়েই ঘন পরাগতি আছে। তবে 'র'এর গতিতে এখনও 'দানা' আছে ; আর 'ল'টী যাহাকে ইংরাজীতে liquid sound বলে,—দানা-হীন হইয়াছে ; 'বহু' গুলি তখন তরল হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। এইরূপ ক্রীঁ বীজ ক্লীঁ এ পরিসমাপ্ত হয়। তার পর এই সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধিতে স্থির হইলে দেখা যায় যে সর্ব্বাত্মক বিশ্ব স্বতঃই সম্পূর্ণরূপে, নিঃশেষিত রূপে একে মিশিয়া যাইতেছে। ঘন হইয়া মিশাই চিত্তের 'তৈল-ধারাবৎ' গতি। চিনির পানা ও মিছিরির রস যেমন একই পদার্থ; তবে মিছিরির রসে আর দানাগুলির পার্থক্য দেখা যায় না ;—সেই রূপ জগৎ ভাবের মধ্যে ভগবানের অনুভূতি ও "সংহৃতি রূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে"-রূপা ঘন প্রবণতার একটু পার্থক্য আছে।

আমি। পার্থক্যটি কি আর একটু বুঝাইয়া দিলে ভাল হয়।

স্বামি। পার্থক্যটি এখন বুঝাইবার সময় নহে! তবে সামান্য ভাবে এইটুকু জানিয়া রাখ যে, সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধি অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের ন্যায়। অর্জ্জুন নানা প্রকার রূপ দেখিলেন ; তাঁহার দর্শনে বহুত্বের ও ভেদের কিঞ্চিৎ আভাস আছে ; তবে ঐ বহুগুলি একে নিধন হইয়া যাইতেছে। সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধিতে গতি আছে ; বিশেষ গুলি সেই গতির বলে একের দিকে মিশিতে যায়। আধার ভাবে একে উপলব্ধি হইলেও উহাতে জ্ঞানের যেন একটু চ্ছেদ রহিয়া যায়। 'সর্ব্ব যে আত্মা ও আত্মার' এই বোধ বা গতি বুদ্ধির প্রকৃত খেলা। আর কতকগুলি বহুর মধ্যে ঐকদেশিক একত্ব জ্ঞানকে সার্ব্বজনীন জ্ঞান বলে। সার্ব্বজনীনতার (universatity) একত্ব আছে ; কিন্তু একই যে আত্মা তাহা স্থির হয় নাই। দেবী আনন্দময়ী সর্ব্বাত্মিকা।

আমি। দেবী সর্ব্বাত্মিকা! তাঁ'র ভাব আর একটু বুঝাইয়া দিন।

স্বামী। শাস্ত্র যেখানে দেবীর কথা বলিয়াছেন সেখানে যদি বাহিরের—

আমাদের অহং বোধের বাহিরে স্থিত তত্ত্ব বলিয়া তাঁহাকে ভাবা যায়, তাহা হইলে শাস্ত্রার্থ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। যে সৌভাগ্যমান ব্যক্তি দেবীর খেলা দেখিয়াছেন ও দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছেন, তিনিও দেবীকে বাহিরের পদার্থ বলিয়া ভাবিলে প্রকৃত বোধ হইতে দূরে সরিয়া পড়েন। অনেকেই মনে করেন যে, 'আমিটী' লইয়া সাধনা করিতে করিতে আকস্মাৎ কোথা হইতে 'আত্মার' বিকাশ হইবে। কিন্তু শুদ্ধ দ্রষ্টাস্বরূপ আমি বোধটীকেই যদি ভগবানের 'রূপ' বলিয়া ভাবিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে যে কি পশু মনুষ্য কি দেবতা সকলেই এক 'আমিটী'; তাহার কোনও অবনতি বা উন্নতি নাই। আমরা যাহাকে উন্নতি বা অবনতি বলি, সেটা কেবল 'সর্ব্বের' সহিত সম্বন্ধ লইয়া সর্ব্বাত্মিকা ভারতীর উৎকর্ষ বা অপকর্ষের সহিত জীব আপনার উন্নতি বা অবনতী কল্পনা করে। আজ আমি একা দশজনের সহিত কুস্তি করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করিতে পারিব; কিন্তু যখন বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইবে তখন পারিব না। সে জন্য ভুল হয় আমিটি বুঝি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। আমিতে বল প্রভৃতির আরোপ কেবল বাহিরের সর্ব্বের সহিত সম্পর্কের জন্যই ঘটিয়া থাকে। সর্ব্বকে কবলিত করিয়া ভেদাত্মক অহংএর প্রতিষ্ঠাই অহঙ্কার তত্ত্বের খেলা। তার পর যখন সার্ব্বজনীন জ্ঞান হইল, তখন আর বার্দ্ধক্যের দুঃখ থাকে না। কারণ তখন মানব একটু বুঝিতে পারে যে—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ;
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

কিন্তু কয়জন মানুষ প্রকৃত পক্ষে সেই সার্ব্বজনীন জ্ঞানে অধিষ্ঠিত আছেন? তাহা হইলে আর জগতে শোক, দুঃখ, বিবাদ, বিসম্বাদ থাকে কেন? অনিবার্য্য সার্ব্বজনীন নিয়ম সকল যখন মানব অসঙ্কোচে স্বীকার করিয়া লইতে পারে, তখনই বুঝা যায় যে সে 'অন্তঃস্বত্ত্বা' হইয়াছে ;—ভিতরে কি এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থ দেখিতে পাইয়াছে যাহার আকর্ষণে বাহিরে পদার্থ গুলির মান বা মূল্য কমিয়া যায়। জীবনে হাসিও আছে, কান্নাও আছে, সুখও আছে, শোকও আছে। উহা ত' খেলার কথা; তাহা লইয়া হর্ষ বা বিমর্ষ ভাব পোষণ করা কেন? যখন হামাগুড়ি ছাড়িয়া হাটিতে শিখিয়াছিলে, যখন খেলা ছাড়িয়া পড়িতে শিখিয়াছিলে, তখনও এই সকল পরিবর্ত্তনে ত' হাঁসি নাই কান্না নাই। তবে অন্য পরিবর্ত্তনে অত বিপর্যস্ত হইয়া যাও কেন? কয়জন ধর্ম্মবীর ও প্রচারক এই তত্ত্বটী বুঝিতে পারিয়াছেন?

তাহার পর এই সার্ব্বজনীন জ্ঞানের আসনে মহামায়ার প্রতিমা স্থাপিত করিতে হইবে। তখন বুঝিতে হইবে যে 'সর্ব্বের' উৎপত্তি ও লয়ান্তে যেরূপ খেলাই হউক না কেন, এই খেলা কেবল মাত্র এক নিষ্কল আত্মাকে দেখাইবার জন্যই হইতেছে। 'সবই যে আত্মার' ইহা বিদ্যাতত্ত্ব; ইট ছুড়িয়া দিলে মাটিতে পড়ে, বীজ পুতিলে গাছ হয়, যৌবনে কাম প্রবৃত্তি জাগে,—এ সব সার্ব্বজনীন জ্ঞান। কিন্তু যখন মাধ্যাকর্ষণ, বাজশক্তি প্রভৃতি তত্ত্বগুলির ভিতর একই আত্মার আভাস দেখিতে পাওয়া যায়, তখনই মায়ের মূর্ত্তি গড়া হইল। প্রত্যাহৃত-চিত্ত, ধ্যান-নিরত সাধকগণই এই তত্ত্ব বুঝিতে পারেন! এই সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধি ভেদ-ভাবে স্থিত মানবের বড় প্রিয় নহে! তুমি বিদ্বান 'থিয়সফিষ্ট' হইয়া আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া যে কার্য্য সিদ্ধ করিলে, আমি নিরক্ষর হইয়াও ভক্তিভরে পুষ্প ফলাদি দ্বারা মূর্ত্তি পূজা করিয়াও সেই ফল পাইলাম,—ইহা স্বীকার করিতে শিক্ষিত ভায়ার বড়ই কষ্ট হয়। ভগবানই যে সর্ব্ব জীবের, সর্ব্ব ভাবের, গতি—ইহা কি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছ? তাহা হইলে অজামিলের পুত্র-বোধে 'নারায়ণ' নামোচ্চারণ,—ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত ব্যাধের ক্ষুধানিবন্ধন শিবালঙ্গের উপর বারি পাতন, ও শিশুপালের আত্মা ভগবানের অঙ্গ-জ্যোতিতে মিশাইয়া যাওয়া, প্রভৃতি ব্যাপার গুলিকে একটু অনৈসর্গিক বলিয়া ভাব কেন? রাসলীলার আধ্যা-ত্মিক ব্যাখ্যা করিতে যাও কেন? কামের আত্মা কি ভগবান নহেন? দ্বেষের গতি কি তাঁহাতেই পরিসমাপ্ত হয় না? যাহার হৃদয়ে ভগবৎ-বুদ্ধি প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সে ভগবানের প্রতি যে ভাবই প্রয়োগ করুক না কেন, তাহাতে ভগবানেরই পূজা হয়। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, স্ববশে বা পরবশে অগ্নিকে স্পর্শ করিলেই, অগ্নির স্বরূপ-তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। এই প্রকার বোধই সর্ব্বাত্মিকার প্রথম অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তি গুলিকে দশ মহাবিদ্যা বলে। ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ,—চারিটী খেলাই আনন্দময়ী খেলিতেছেন, যখন এই ভাবে দেখিতে পারিবে, তখন দুর্গাপূজা করিও। মহাকালী ভাবের খেলাকেই 'আদ্যা' নামে অভিহিত করা হয়। যখন তিনি এ ভাবে খেলেন, তখন আর চারিটী ফলের দিকে দৃষ্টি থাকে না। তখন সমস্ত গতিই ঘন হইয়া অবশেষ-শূন্য ভাবে ভগবানের পরিসমাপ্ত হয়। জ্ঞানে যতটুকু অবশিষ্ট থাকে, ততটুকু ত' বাহিরে আসিয়া 'লোক' ভাবের সৃষ্টি করে।

আমি। কি বলিতেছেন কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

স্বামি। তোদের ভাষায় না বল্লে তোরা ত' বুঝ্‌বিনি। যে আনন্দ-শক্তির

প্রেরণায় স্ত্রীর কাছে যাস্, সেই আনন্দ ভাবটী যদি পূর্ণ বুঝিতে পারিস্, তখন দেখ্‌বি যে তাহাতে কোনও বাহ্য বস্তুর অপেক্ষা নাই! ঐ আনন্দ আমাদের ভিতর স্বতঃই, সর্ব্বদাই, প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; কিন্তু আমাদের জ্ঞান অত ঘন হয় না; আনন্দের বোধটি পূর্ণ বা ভরপুর হইয়া ফুটে না। তা'ই সে আনন্দে তাহার, 'নিমিত্ত কারণ' ও 'ক্রিয়া' প্রভৃতি বুদ্ধি জাগিয়া উঠে। স্বপ্নদোষ রোগে আনন্দ অনুভূত হয়; অথচ দেখ স্থূল বস্তু নাই; সূক্ষ্ম ভাবে বস্তু-বুদ্ধি আছে। সেই জন্য উহা (astral) ভুবর্লোকের খেলা। স্বর্গ-চৈতন্যে আবার বাসনাটুকুও নাই; কাজেই কেবল মানসিক ভাবেই, ঐ আনন্দের বিকাশ হয়। অথচ তোরা পণ্ডিত, ভাবিস্ ইন্দ্র বুঝি ইন্দ্রাণী প্রভৃতি কত রমণী লইয়া তোদের মত সুখ বোধ করে। সেখানে কেবল স্ত্রী ও পুরুষ এই বুদ্ধির উপর অবস্থিত হইয়াই আনন্দের অনুভূতি হয়; কিন্তু লিঙ্গ বা মূর্ত্তির পার্থক্য নাই; শরীরের সংস্পর্শ নাই; কারণ, স্থূল দেহ বুদ্ধি নাই। প্রণয়িনার প্রণয়-কটাক্ষে যে তো'দের ভাবান্তর হয়, সেটা কি স্থূলের খেলা, না, মনের খেলা? অথচ যে রাসলীলায় বিশ্ব-দেবতাগণও স্থান পান না, সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং ব্রহ্মা যাহা কেবল বাহির হইতেই দেখেন, ওরে মূর্খ! সেটা কি অঙ্গ সঙ্গ?

সর্ব্বাত্মিকা ভাবটীও সেইরূপ। সর্ব্বাত্মিকা ভাবে প্রকৃত পক্ষে 'বাহ্য সর্ব্ব' নাই। এমন কি সার্ব্বজনীন জ্ঞানে—যাকে তোরা abstract বা 'অবিশেষ জ্ঞান' বলিস্—'বিশেষ বুদ্ধি' প্রকটরূপে থাকেনা। একটী ইট মাটিতে পড়িতে দেখিয়া কি ভাবিস যে "কাল গাছ পড়িতে, পরশ্ব ঘোড়া পড়িতে দেখিয়াছিলাম?" অথচ সার্ব্বজনীন মাধ্যাকর্ষণবশে সকল জিনিসেরই পতনশীলতা সিদ্ধ হইয়া গেল। সার্ব্বজনীন জ্ঞানই চৈতন্যময়ীর প্রথম বিকাশ বলিয়া, উহাতেও তাঁহার পরাভাবের বীজ আছে।

আমি। তাহা হইলে 'সর্ব্বাত্মিকা' জ্ঞানের আবশ্যকতা কি?

স্বামি। সার্ব্বজনীন জ্ঞানে পরাভাবের বীজ আছে সত্য, কিন্তু উহার ভিতরে বিশেষরূপে পরিসমাপ্ত হইবার একটী প্রবণতা বা শক্তি আছে। বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলিতে গেলে, উহার একত্ব unstable equilibriumএ অর্থাৎ বাহ্যভাবে স্থিতিশীল। 'সকলেই মরে' এই জ্ঞানটী, যাই রাম মরিল, অমনি 'রামও মরে' এইরূপে স্থির হইয়া গেল। সার্ব্বজনীন জ্ঞানে 'জন' বা বিশেষের অভিমুখী প্রবৃত্তি আছে। সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধিটী অন্যরূপ। উহা চৈতন্যময়ীর দ্বিতীয় পাদ; উহাতে ঘন একত্ব জ্ঞানটী আর বাহ্য বস্তুভাবে সিদ্ধ

হয় না,—আত্মা বা ভগবদ্ভাবে মিশিয়া যায়। দেহী মাত্রেরই মৃত্যু আছে এই সার্ব্বজনীন জ্ঞানটী, প্রাকৃত ও 'জীব বা দেহী যে অবধ্য' এইরূপে পরিসমাপ্ত হয়। একে মরণ ধর্ম্মটী বিশেষের সহিত সংলগ্ন হইয়া আত্মার অমরত্ব সিদ্ধ করে। সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধিই চৈতন্যময়ীর বিপরীত বিহার। তা'ই তন্ত্র চৈতন্যময়ীর রূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া তাঁহার আধারের স্থানে দেখিতে পাইল যে, তি'ন তাঁহার স্বরূপ-পকাশের নিম্নভাগে মহাকালের সহিত বিপরীত ভাবে রমণ করেন, * * মহাকালেনচ সমং বিপরীত-রতাতুরাম্।" (তন্ত্রসার—শ্যামা ধ্যান্।) এই বিপরীত ভাবের রতি বলিয়াই আমাদিগের নিকট তাঁহার মূর্ত্তি নৃমুণ্ড-মালিনী, বিশেষের বিনাশ-সাধিনী ভয়ঙ্করী বলিয়া মনে হয়। 'বিশেষ' গুলির বিশেষত্ব রক্ষা করতঃ 'কলন' বা প্রকাশকেই সৃষ্টি ও স্থিতি বলে। 'বিশেষ' গুলি হইতে সে বিবক্ষা দূর করিয়া, তাহাদিগকে ঘন করিয়া মিশাইলে, আমাদের নিকট সেই কলন-ক্রিয়া ভয়ঙ্করী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ইহাও চৈতন্যময়ীব প্রকৃত ভাব নহে। যখন তিনি তৃতীয় পাদ বিক্ষেপ করেন, তখন আর 'সর্ব্ব' ভাবের কিছুই থাকে না; তখন কেবল শুদ্ধ, অতিগ ও নিষ্কল ভগবৎ-স্বরূপই ফুটিয়া উঠে। তাহাতে আর মায়া নাই; জগত নাই; বিভ্রম নাই। সর্ব্বাত্মিকা জ্ঞানে জগৎ দগ্ধ-বস্ত্র-অবভাসরূপে থাকে। কিন্তু চৈতন্যময়ীর যে পাদে তিনি পরব্রহ্মরূপে সিদ্ধা হয়েন, তাহাতে সেইটুকুও থাকে না। তখন তিনি সদানন্দ-স্বরূপ আনন্দঘন পরব্রহ্মের আনন্দ-স্বরূপে ঘন হইয়া, নিজ মায়া-বিলাস পবিত্যাগ কবিয়া, সৎ বা সন্ধীনি, চিৎ বা বোধরূপা ও আনন্দ বা হ্লাদিনী রূপ তিন ভাবে ও এই তিন ভাবের অনন্ত বিলাস মূর্ত্তি বা সঙ্গিনীগণের সহিত পরমাত্মায় বিহার করেন। তাহার সেই ধাম বা জ্যোতিতে আর সূর্য্যচন্দ্র থাকে না, পাবক বা বহ্নিও থাকে না। আমাদের পক্ষে এই ধাম বা কলা, অমাবস্যার চন্দ্রের ন্যায় জগদ্ভাব হইতে বিচ্যুত; তাই ঘোর কালো বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পকৃত পক্ষে সে ত, কালো নয়; সে যে "জ্যোতিষামপি তদ্‌জ্যোতি" শুভ্রা, হিরণ্যজ্যোতি। কিন্তু তাহার এ মূর্ত্তি সকলে দেখিতে পায়না। যখন 'সবই আত্মা' এ জ্ঞান সিদ্ধ হইতে আর কিছু বাকী থাকে না,—যখন সাধক নিগ্রন্থ হইয়া যায়,—তখনই হ্রীং বীজাত্মক বা হ্-রি স্বরূপ পরাভাবের বিকাশ দেখিতে পায়। তখন সে দেখে যে সহস্র সূর্য্য যুগপৎ সমুদিত হইলে যে জ্যোতি বিকীরিত হইয়া উঠে, সেই জ্যোতিও চিদানন্দময়ীর অঙ্গ জ্যোতির সমীপে নিষ্প্রভ হইয়া যায়,—তখন দেখে যে জগতে ও সাধনা

মার্গে যে দুই ভাবের আনন্দের বিকাশ হয়, সেই দুই আনন্দই আনন্দময়ী ৺কালীর পদনখের জ্যোতিমাত্র।

আমি। একবার কৃপা করিয়া মায়ের এই মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রকাশিত করিয়া দিন।

স্বামি। তথাস্তু।

* * * *

আমি। একি—একি! বড় ভয় করিতেছে! অথচ কেমন আনন্দ হইতেছে! আমার 'আমিটী' কোথায় যেন আর যে খুঁজিয়া পাইতেছিনা। রক্ষা করুন্, রক্ষা করুন্, সহ্য করিতে পারিতেছি না।

স্বামি। মায়ের বামপদের বিশিষ্ট-ভাবটী একবারে ত্যাগ কর। তাঁহার দক্ষিণ পদেই চিত্ত সম্পূর্ণরূপে ভক্তিভরে সংলগ্ন কর।

* * * *

আমি। একি হল, ভয় কোথায় চলিয়া গেল। এ কি পরিপূর্ণতার সমুদ্র!! এযে সবই ভগবান; আপনিও ভগবান, আমিও ভগবান,—ভগবান সবই।

স্বামি। দেবাদিদেবকে আশ্রয় করিয়া, মা আমার, তাঁহার প্রথম বাম পাদ যতক্ষণ মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠানের উপর রাখেন, তখন তাঁহার খেলা বড় মিষ্ট বোধ হয়। তখন জীব তাহার প্রজনন্ কার্য্য দেখিতে পায়, ও পরে 'বহু'জনের ভিতরে সার্ব্বজনীন জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু হিন্দুরা ও মূর্ত্তির পূজা করে না; কারণ উহা স-কল। যাহারা বিশেষাভিমুখী বামাচারী, তাহারা বাম পাদের পূজা করে। সেইজন্য দক্ষিণাকালিকা মূর্ত্তিতে দেখ, মা আমার, হর-হৃদয়-চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া, তথায় তাঁহার দক্ষিণ পাদ স্থাপন করিয়াছেন, আর বাম পাদটী বিশেষের বিলাসক্ষেত্র স্বাধিষ্ঠান ও মূলাধার হইতে তুলিয়া লইবার উপক্রম করিতেছেন। তো'রা সর্ব্বাত্মিকা জ্ঞানে একেবারে ভয়ে বিহ্বল হইয়া যাস্ বলিয়া পাদটী একেবারে পূর্ণ ভাবে তোলেন নাই; তা'ই একটু একটু বিশেষের ভাব পাইয়া স্থির থাকিতে পারিস্। কিন্তু ও পাদের দিকে চিত্ত সন্নিবেশ করিলে পূজা করা হয় না। যে সাহস করিয়া মাকে বাম পাদ তুলিতে বলিতে পা'রে, এবং তাঁহার শুদ্ধা সর্ব্বাত্মিকা দক্ষিণ পাদে থাকিতে পারে, সেই প্রকৃত ভক্ত; এবং তাহারই মহাকালীর পূজা সার্থক। তাহার পর, যখন সর্ব্বাত্মিকা ভাবে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া আনন্দময়ীর প্রতি অহৈতুকী ভক্তি জাগিয়া উঠে,—যখন সাধক অকিঞ্চন হইয়া 'আমির' একটুও চৈতন্যময়ীর

বাহিরে রাখিতে চাহো না, তখন ভাগবতের ভাষায়, মা জগদম্বার আর একভাব জাগিয়া উঠে ;—

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসর পদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়োদহরম্।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥ ভাঃ ১০।৮৭।১৮

ঋষি মার্গের মধ্যে যাঁহাদের দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত স্থূল, তাহারা উদর বা 'মণিপুর' ক্ষেত্রস্থ ভগবদ্ভাবের উপাসনা করেন। উদরের বহ্নিতে যেরূপ ভুক্তান্নের পরিণতি হইয়া দেহাদির গঠন হয়, তদ্রূপ মণিপুর-চক্রস্থ ভগবৎ-চৈতন্যে সৃষ্টিস্থিতি প্রভৃতির পরিনাম স্থির হয় ; ইহাই ব্রহ্মার ক্ষেত্র। তারপর আরুণি মার্গের সাধকগণ হৃদয়-দহর (আকাশ) রূপ চৈতন্যের উপাসনা করেন। এই হৃদয়কে ভাগবত পরিসর-পদ্ধতি বলিয়া অভিহিত করিলেন। স্থূল ভাবে দেখিলে "পরিতঃ সরন্তি প্রসর্পন্তীতি পরিসরাঃ নাড্যঃ ; তাসাং পদ্ধতিং মার্গং প্রসরণ-স্থানমিত্যর্থ"—শ্রীধর। এইরূপে 'পরিসর পদ্ধতি' শব্দ সিদ্ধ হয়। কিন্তু নাড়ীগুলি ত' বাস্তবিক স্থূল পদার্থ নহে ; উহারা বাস্তবিক চৈতন্যের প্রবণতা মাত্র। চৈতন্যের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটী অনন্ত ভাবে বিতম্বত হয়, এইজন্য তাহাদের নাম 'পরিসর'। এই অনন্ত ভাবরাশির গতি যখন 'হৃদি+অয়ম ইতি হৃদয়ম'—আমাদের হৃদয়েই আছেন এরূপ ভগবানের অভিমুখে প্রেরিত হয়, তখন তাহারা সেই সূক্ষ্মতম ভগবৎ-ভাবে আসিয়া স্থির হয়, তখন আর বাহ্য খেলা থাকে না। প্রবৃত্তি মার্গে হৃদয় হইতে এই জ্ঞানরাশি আপন আপন ভাবে, বস্তুরূপে গূঢ় শ্রীভগবানেরই পদাঙ্ক অনুসরণে,'কাম' নামে অভিহিত হইয়া বাহিরে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। সাধক যখন সমস্ত কামের পরিসমাপ্তি ভগবানের অন্বেষণে প্রযুক্ত করিয়া এইভাবে শক্তি ও গতিরাশিকে হৃদয়ে সমাহিত করেন,—যখন

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ গীতা ২।৫৫।

যখন সমস্ত মনোগত কামকে—যে কাম মনের ভিতর থাকিয়া মনের প্রেরক হইয়া মনকে পরিনমিত করে, সেই কাম যখন হৃদয়স্থ চৈতন্যময়ীর দ্বিতীয় পাদে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, যখন আর মনে 'বিশিষ্ট অহং' 'মম' প্রভৃতি কোনও রূপ অভিসন্ধি থাকেনা, যখন বিশিষ্ট বৃত্তিগুলি মায়ের দ্বিতীয় পাদে অভিব্যক্ত সর্ব্বাত্মিকা ভাবে লীন হয়, সেই বিশেশ্বর মহাশ্মশানক্ষেত্রে

আনন্দময়ীকে ভয়ঙ্করী বলিয়া মনে হয়। তারপর যখন সাধক বুঝিতে পারে, যে সর্ব্বাত্মিকা ভাবেই প্রকৃত রস আছে, তখন সাধক যদি সাহস করিয়া আনন্দময়ীকে "মা তোমার সর্ব্বাত্মিকা খেলা সংহার কর; মা কাত্যায়ণী মহামায়ে সর্ব্বের ভাবে আর তৃপ্তি হয় না; মা সেই পর-পুরুষকে একবার দাও মা; তোমার ব্যক্ত বিলাসের মধ্যে আমি ত' আর কিছু চাহিনা" একথা বলিতে পারে, তখন সাধকের হৃদয়-চৈতন্যে এক অপরূপ ধাম বা জ্যোতির আবির্ভাব হইবে। "ততো হৃদয়াৎ ভো অনন্ত তব ধাম উপলব্ধি-স্থানম্ সুষুম্নাখ্যাম্ পরমম্ জ্যোতির্ম্ময়ম্ শিরোমূর্দ্ধানং প্রতি উদগাৎ উদসর্পৎ হৃদয়স্য মধ্যাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রং প্রত্যুদ্গতম ইত্যর্থ'—শ্রীধর অর্থাৎ হৃদয় হইতে সর্ব্বাত্মিকা বৃদ্ধিতে সিদ্ধ হইয়া সাধকের ভিতর শ্রীভগবানের অনন্ততা, অসীমতা ও পরাভাবের উপলব্ধি-স্থান স্বরূপ এক জ্যোতির্ম্ময়ী—জানিনা কি বলিব—মূর্ত্তি, না, গতি,—ফুটিয়া উঠে। ঐ গতি ব্রহ্মরন্ধ্রের প্রতি ধাবিত। ঐ গতিতে 'আমিকে' ছাড়িয়া দিলে, আর কৃতান্ত-মুখে পড়িতে হয় না।

বুঝিলি কি? সার্ব্বজনীন ভাবে স্থিত মন কেবল ধানের সদৃশ-প্রবাহতার স্রোতে শ্রীভগবানের দিকে প্রযুক্ত হইলে হৃদয় চৈতন্যে পঁহুছিতে পারে। অকিঞ্চন, 'তৃণাদপি সুনীচ' না হইলে, বিশিষ্ট, 'অহং'এর মোহ একেবারে চৈতন্যময়ীর পদযুগে বলিদান না দিলে, হৃদয়ে পঁহুছান যায় না। এই হৃদয়স্থ ভগবানের প্রকাশ ভাব বা নাম,—সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যস্থ কেয়ূর-কুণ্ডলবান নারায়ণ। তাই ভগবান বলিলেন।

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য মনোহৃদি নিরুদ্ধ্য চ। গীতা

তারপর প্রোজ্ঝিত-কৈতব (প্রকৃষ্টরূপে উৎক্ষিপ্ত কৈতব) হইয়া সর্ব্বভাবের বীজটীও পরিত্যাগ করিতে হইবে। শ্রুতি চ বলেন "সর্ব্বভাব পরিত্যাগো সমাধি ইতি উচ্যতে।" 'সর্ব্ব' ঘন হইয়া সেই একেই মিশা চাই। তখনই সম্পূর্ণরূপে ও নিঃশেষিত রূপে (সম + আ + ধা) বা সমাধিতে শ্রীভগবানে থাকিতে পারা যায়। বাহ্যভাবে কামের গ্রন্থি ও বিশিষ্ট ভাবে 'অহং' এর পিপাসাকে 'হৃদয় গ্রন্থি' বলে। 'সর্ব্ব যে কেবল শ্রীভগবানেরই জন্য', ইহা বুঝিয়া,—সাধক যদি এইবার বলিতে পারেন,—

হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষণ অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥ ঈশোপ।১৫।

হে ভগবন, হে সর্ব্বভাবের পরিপোষক ও আধার-স্বরূপ! পরমাত্মন! তোমার

জ্যোতির্ম্ময় 'সর্ব্ব'-প্রকাশক চৈতন্যের ক্রীড়া বা রশ্মি সমুদয় একবার সংহরণ কর ; আমার 'সর্ব্বের' সাধ মিটিয়াছে। আমি বুঝিয়াছি,– তুমিই সর্ব্বের আত্মা, আমারও নাথ ও পতি। নাথ! এইবার তোমার জ্যোতির্ম্ময়-রূপ একটিবার সরাইয়া লও; আমি তোমার নিষ্কল বিশ্বাতিগ 'আমি' বা কালরূপের কলা দেখিতে চাই।" যখন সাধক আনন্দময়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারেন' উঠ মা আনন্দময়ি! খোল মা কুটীর দ্বার'—তখনই আনন্দময়ী, ভগবৎ-স্বরূপ-চৈতন্য-স্বরূপিণী মহামায়া উমা, হৈমবতী মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া তাঁহার তৃতীয় পাদ বিক্ষেপ করিবেন। বলিতে পার তোমাদের বাহ্য চিত্রের ভাষায়, মায়ের তৃতীয় পাদ কোথায় আছে? হর-হৃদয়েই বা ভগবানের হৃদয়-চৈতন্যেই তাহার দ্বিতীয় প্রকাশ স্থান; কারণ তিনিই হর-হৃদি-বিলাসিনী। বলিতে পার মা তৃতীয় পাদ বিক্ষেপ করিলে, উহা তদীয় প্রকাশক্ষেত্র বা আধার রূপ শ্রীভগবানের কোন স্থানে তোমাকে লইয়া যাইবে? তৃতীয় পাদটী তাঁহার স্বরূপ-ক্ষেত্র সহস্র রেই পাতিত হইবে, এবং আনন্দময়ী বাস্তবিক অভেদ হইয়া স্বীয় ব্রহ্মরূপে সিদ্ধা হইয়া সেখানে নিত্য বিরাজিতা আছেন। তিনি যেন হর-হৃদয়কে আধার করিয়া, উমারূপে, প্রকাশ ভাব অতিক্রম করতঃ, সদানন্দ-স্বরূপিনী হইয়া, সর্ব্বভাব-বিবর্জ্জিতা হইয়া, সঙ্গিনীগণের সহিত বিরাজ করিতেছেন! এই দেখ তাঁহার মূর্ত্তি!

আমি। কই! আমি যে দেখিতে পাইতেছি না।

স্বামি। তুই হাঁ করিয়া শুনিবি; আমি যে বোধটুকু তোর ভিতর সংক্রমণ করিতে চাহিতেছি, তাহা লইবি না। মনকে এইবার শ্রীভগবানের পাদপদ্মে ত্যাগ কর, বুদ্ধিকে তাঁহার চরণারবিন্দে উৎসর্গ কর। ভয় নাই। ঐরূপ ভাবেই করিতে হইবে। কোনও সঙ্কল্প বা আকাঙ্ক্ষা যেন না থাকে। ভগবান ত' বলিয়াছেন—

মষ্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়
নিবশিষ্যসি মষ্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ। গীতা

'বৈষ্ণব' ভাবে বলিতে গেলে, তাঁহার 'রূপ' সাগরে ঝাঁপ দেও। 'শাক্ত'ভাবে বলিতে গেলে মা উমার শরণ গ্রহণ কর; তিনি যে "ওঁ+আ (সমন্তাৎ)। একবার ব্রজ-গোপীকার ন্যায় কেবল মাত্র তাহারই শরণ গ্রহণ কর, তিনি নিশ্চয়ই (আ) নন্দ ও (গোপয়তি ইতি) গোপের তনয়কে মিলাইয়া দিবেন। এইরূপ 'সর্ব্বের আহরণ' করেন বলিয়াই, সেই সর্ব্বের আহরক, সুতরাং প্রসিদ্ধ চৌর (নারায়ণ ইতি প্রসিদ্ধ চৌরঃ) হরিতে স্থাপন করেন বলিয়াই 'হ্রীং'

বীজ। অনন্ত মায়ার খেলা এই এককে দেখাইবার জন্য। এই আহরণ করিয়া তিনিই পরব্রহ্মরূপ পরম-বিশেষ পদার্থে উপরতা হ'ন বলিয়া, সর্ব্বকে নিঃশেষে পরম বিশেষ ভগবানে পরিসমাপ্ত করেন বলিয়া, তাহার সেই পরব্রহ্ম-নির্দ্দেশক হুং বীজ। 'হুঁ ইতি নির্দ্দেশে' (ছান্দোগ্য শাঙ্কর ভাষ্য)। তা'ই তন্ত্র বলিয়াছেন—যে তন্ত্রের নামে তো'রা আঁৎকে উঠিস্—

বীজত্রয়া শাম্ভবী সা কেবলং জ্ঞানচিৎ-কলা
শব্দবীজদ্বয়েনৈব শব্দরাশি প্রবোধিনী ॥
লজ্জাবীজদ্বয়েনৈব সৃষ্টিস্থিত্যন্ত-কারিণী
সম্বোধন পদেনৈব সদাসন্নিধিকারিণী ॥
স্বাহায়া জগতাং মাতা সর্ব্বপাপ প্রনাশিনী।

এই তিন বীজই জগদম্বার তিন পাদ। প্রথম বীজে, মা আমার, 'সর্ব্ব' বা প্রকাশ ভাব স্ফুরিত করিয়া ভগবানের প্রকট মহিমা সিদ্ধ করিতেছেন। দ্বিতীয় বীজে 'পশ্যন্তী'রূপা পরমাগতিতে, সর্ব্বাত্মিকা ভাবে, বিশ্বের অস্ত বা বিশ্রামস্থান দেখাইয়া দেন। তৃতীয় বীজে সর্ব্বের মোহ বা পাপ বিনাশ করতঃ স্বরূপের সান্নিধ্য প্রদান করেন। সৃষ্টীর সময়ে শ্রীভগবান যে ক্রমানুসারে তাঁহার তিনটী পাদ বা প্রণবের মাত্র প্রকট করেন, যাহাকে লক্ষ্য করতঃ শ্রুতি বলেন "ইদং বিষ্ণু বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং,"—সেই ক্রমের বিপরীত ভাবে খেলাই মায়ের প্রকৃত বিলাস। তা'ই তিনি বিপরীত রতাতুরা হইয়াছেন। তাই (উৎ+ ষ্ণিক) 'উষ্ণিকই' তাঁহার ছন্দ, হৃদয় তাহার প্রকাশ স্থান। তাঁহার পাদ সমূহ ভগবানের নির্দ্দেশ করে বলিয়াই, 'হুং' ই তাঁহার শক্তি বা প্রবণতা। সর্ব্বাত্মিকা ভাবে প্রতিষ্ঠিতা বলিয়া, তাঁহার মূল আধার; বিচ্ছিন্ন সর্ব্বভাবকে ঘন করিয়া প্রথম পাদে তাহার মূর্ত্তি বা অঙ্গ গঠন করেন বলিয়াই "ক্রীং" তাঁহার কীলক। স্বয়ং মহাদেবই তাঁহার মন্ত্রের ঋষি বা তাঁহার খেলার দ্রষ্টা। তা'ই তন্ত্র আবার বলিলেন "শিরসি ভৈরব ঋষয়ে নমঃ; মুখে উষ্ণীক ছন্দসে নমঃ, হৃদি দক্ষিণা কালিকায়ৈঃ দেবতায় নমঃ; গুহ্যে হ্রীং বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ হুং শক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে ক্রীং কীলকায় নমঃ॥ ঐ দেখ মা তাঁহার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করত, হর হৃদি-বিলাসিনী উমা-স্বরূপে প্রকটিতা হইতেছে। আমিটাকে ছাড়িয়াছি দাও। সেই 'পরিপূর্ণ ভবারি'রূপ পরম 'আমি' যখন নিত্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তখন আর একটা ভেদ বিশিষ্ট 'আমি' রাখিবার প্রয়াস কেন?"

* * * *

পান্থা—



শঙ্কর উরে কে মা বিহরে
রমা রঙ্গিণী সনে।

কি দেখিলাম,—কেমন ছিলাম—মায়ের তৃতীয় পাদ কোথায় যাইয়া রহিল, তাহা আর বলিতে পারিব না। তবে মা আমার, তৃতীয় পাদ বিক্ষেপের সময় যে ভাবে স্ফুরিত হইয়াছিলেন, তাহার একটী অপরিস্ফুট আভাস মাত্র চিত্ররূপে, অকিঞ্চন নিবৃত্তি-পরায়ণ ও শ্রীভগবানে জাতি কুল মান প্রভৃতি ত্যাগ করিতে যাহাদের প্রাণ সদাই কাঁদিতেছে, সেইরূপ সুধীগণকে উপহার দিলাম। জানিনা মহাভাবময়ী চৈতন্যময়ী মহামায়ার সেই কৈবল্য-দায়িনী স্বরূপাভিব্যক্তির, কতটুকু আমাদের মরলোকের ভাষায় বর্ণিত ও স্থূলাভিমুখী চিন্তার সাহায্যে, অঙ্কিত চিত্রে অঙ্কন করিতে সক্ষম হইয়াছি। তবে ভরসা এই যে—

বদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু সর্ব্বত্র তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি॥

হরিঃ ওঁ তৎসৎ।

উপেন্দ্র-পরায়ণ শ্রীযোগানন্দ ভারতী।

মোক্ষ]

অন্বেষণ।

পরাণ মাঝারে অতৃপ্ত বাসনা,
রহিয়াছে সঙ্গোপন।
দিশাহারা হৃদে উৎসুক পরাণে
করি তাই অন্বেষণ॥
প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, আকুল-পিয়াসা,
রেখেছি বাঞ্ছিত তরে।
সাজায়ে সতত অতি সযতনে,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে॥
মর্ম্ম পট জুড়ে তাহারি সে ছবি,
থাকিলেও সদা আঁকা।
অসংযত চিত্ত,—মানস মলিন,
তা'ই গো মিলেনা দেখা॥

চপলার মত ক্ষণ-দীপ্তি দিয়ে,
অনন্তে মিশিয়ে যায়।
ভীষণ আঁধারে ক্ষীণ-জ্যোতিঃ তার,
ঝলকে নয়ন হায়!!
দ্বিগুণ আবেশে কেঁপে উঠে প্রাণ,
দুরু দুরু করে হিয়া।
চির আকাঙ্খিত কোথা তুমি মোর,
ঢাল শান্তি দেখা দিয়া॥
রাখিয়াছি হৃদি—শূন্য সিংহাসন,
তোমারে লইতে বরি'।
এস হে সুহৃদ! মানস-মোহন
অন্তর কালিমা হরি'॥

শ্রীরমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত।

আত্মতত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এই জীবকে অনেক দুঃখ প্রদান করিবে এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি আছে? এক্ষণে এই অর্থ স্পষ্ট করিবার নিমিত্ত অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা সঙ্গ বিষয় দুঃখের কারণতা নিরূপিত হইতেছে। তথায় বাস্তবিক সর্ব্ব-সঙ্গ-রহিত যে নির্গুণ আত্মা, সেই আত্মা ও অবিদ্যাদি কল্পিত সঙ্গ বশতঃ নানাপ্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই সঙ্গই সর্ব্ব জীবের অনর্থের কারণ; কিম্বা স্বভাবতঃ শীতল যে জল, সেই জল যখন অগ্নির সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়, তখন সেই জলও উষ্ণভাব প্রাপ্ত হয়। আর স্বভাবতঃ ছেদন ভাব রহিত যে বৃক্ষ, সেই বৃক্ষ যখন কুঠারের সঙ্গ প্রাপ্ত হয়, তখন সেই বৃক্ষ ছেদন ভাব প্রাপ্ত হয়। আর স্বভাবতঃ অন্তর্মুখ যে মন, সেই মন যখন বিষয় সঙ্গ প্রাপ্ত হয়, তখন সেই মন বহির্মুখতা প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্ব পাপ কর্ম্ম যুক্ত যে পাপী পুরুষ, সেই পুরুষ যখন দুষ্ট পুরুষের সঙ্গ প্রাপ্ত হয়, তখনই সেই পাপী পুরুষ সেই পাপের দুঃখরূপ ফল অনুভব করে এবং স্বভাবতঃ দুঃখ রহিত যে ধর্ম্মাত্মা পুরুষ সেই ধর্ম্মাত্মা যখন দুঃখী পুরুষের সঙ্গ প্রাপ্ত হয়, তখন সেই ধর্ম্মাত্মা পুরুষও নানাপ্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ কাম দোষ রহিত যে পুরুষ, সেই পুরুষ, যখন কামী পুরুষের সঙ্গ লাভ করে, তখন সেই পুরুষও কাম দোষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মানুষ চোরের সঙ্গে থাকিলে চোর হইয়া থাকে। অম্লরস যুক্ত তেঁতুল ও লেবু প্রভৃতির দর্শনরূপ সঙ্গ হইতে এই পুরুষের মুখের লালা দ্রবীভূত হইয়া যায়। আর স্বাভাবিক নির্ম্মল যে সূর্য্য ও চন্দ্র, তাহা রাহুর সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া রাহুগ্রস্ত হয়; তখন আর নির্ম্মলতা থাকে না। স্বভাবতঃ ক্রিয়া-রহিত যে লৌহ, যখন চুম্বক পাষাণের সঙ্গ প্রাপ্ত হয়, তখন সেই লৌহ নানাপ্রকার গমন আগমনাদি ক্রিয়া প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ এই জীব, স্ত্রী পুত্রাদি পদার্থের সঙ্গ লাভ করিয়া নানাপ্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, ইহলোকে জড় রূপে প্রসিদ্ধ যে লৌহাদি পদার্থ সেই লৌহাদি জড় পদার্থ ও চুম্বকাদি জড় পদার্থের সঙ্গ বশতঃ যখন নানাপ্রকার বিকার প্রাপ্ত হয়, তখন এই চেতন জীব, স্ত্রী পুত্রাদি চেতন পদার্থের সঙ্গ দ্বারা নানাপ্রকার বিকার প্রাপ্ত হইবে, এ বিষয় আর কি বক্তব্য আছে! সুতরাং 'অহং মম' অভিমানরূপ সঙ্গ যুক্ত এই শরীর সর্ব্ব জীবের দুঃখের কারণ। এই

বিষয়ে আমি যাজ্ঞবল্ক্যই দৃষ্টান্ত স্থল। কারণ পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় আমি যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বসঙ্গ রহিত ছিলাম, সুতরাং আমার কিছুমাত্রও বিক্ষেপ প্রাপ্তি হয় নাই। সেই আমি যাজ্ঞবল্ক্য এখন স্ত্রী পুত্রাদির সঙ্গ করিয়া নানাপ্রকার বিক্ষেপ প্রাপ্ত হইতেছি। তাহাতে এই জানা যাইতেছে যে এই সঙ্গই পরম দুঃখের কারণ। এক্ষণে স্ত্রী পুত্রাদির সঙ্গ বিষয়ে অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা বিক্ষেপের কারণতা নিরূপণ করা যাইতেছে। পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় আমি যাজ্ঞবল্ক্য নিজের শরীর বিষ্ঠার ন্যায় মলিন জানিয়া অত্যন্ত বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; আর অত্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ করিয়া আমি অরণ্যে তপস্যা করিয়াছিলাম। সেই বনে স্বর্গের অপ্সরা আসিয়া নানাপ্রকার হাব ভাব কটাক্ষ দ্বারা আমার ধৈর্য্য বিচলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। পরন্তু সেই অপ্সরাদিগের হাব ভাব কটাক্ষ দেখিয়া আমার ধৈর্য্য বিচলিত হয় নাই। সেই অপ্সরাগণ কিরূপ? তাহারা কামরূপ ভারাক্রান্ত হইয়া মন্দ মন্দ গতিতে গমনাগমন করিতেছিল। তাহাদের শরীরের সুগন্ধে কেতকী চম্পকাদি পুষ্পের গন্ধও লজ্জা পায়। তাহাদের শরীরের সৌন্দর্য্য সুবর্ণের পুষ্পকেও পরাজয় করে এবং পীনোন্নত যে স্তন যুগল এবং জঘনস্থান তাহা হইতে সমীরণ পরিধেয় বস্ত্র হরণ করিয়া (উড়াইয়া) লইয়া যাইতেছে। তাহাদের মুখ মণ্ডল পৌর্ণমাসী চন্দ্রের ন্যায় আভাযুক্ত, এবং চন্দ্র-সদৃশ উজ্জ্বল যে বস্ত্র ও ভূষণ তদ্দ্বারা তাহাদের শরীর শোভায়মান। এরূপ অপ্সরাগণ আপনাদের কটাক্ষ দ্বারা আমার ধৈর্য্য নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হয় নাই। সেই অপ্সরাদিগের কঠাক্ষ কিরূপ? সেই কটাক্ষ কামী পুরুষদিগের ধৈর্য্য বিনাশকারী এবং তাহাদের সহিত সম্ভোগ ইচ্ছারূপ উৎকৃষ্ট অভিপ্রায় প্রকাশকারী। কিন্তু সেই অপ্সরাদিগের মধুর বচন দ্বারাও আমার ধৈর্য্য নিবৃত্তি করিতে পারে নাই। তাহাদের বচন কিরূপ? অত্যন্ত কোমল এবং মন্দ মন্দ হাস্য যুক্ত এবং কামী পুরুষের মন হরণকারী। তাহাদের বাক্যের অর্থ প্রসিদ্ধ এবং অভিপ্রায় গম্ভীর, এবং ঘৃতের ন্যায় কামরূপ অগ্নি প্রজ্জ্বলনকারী এবং সুদীর্ঘ ললিত স্বর দ্বারা উচ্চারিত। এরূপ মধুর শব্দ দ্বারা এবং পদদ্বয় স্থিত নুপূরাদি ভূষণের নিরন্তর শব্দ দ্বারা সেই অপ্সরাগণ আমার ধৈর্য্য নিবৃত্তি করিতে পারে নাই। সেই অপ্সরাগণ আপনাদের হস্ত পদাদির অঙ্গ ভঙ্গী করিয়াও আমার ধৈর্য্য নিবৃত্তি করিতে পারে নাই। সেই অপ্সরাদিগের অঙ্গ কিরূপ? বায়ু দ্বারা এবং চলন দ্বারা শিথিল ভাব প্রাপ্ত যে দুকুলাদি বস্ত্র এবং কাঁঞ্চি, কঙ্কণ, অঙ্গদ্ প্রভৃতি ভূষণ দ্বারা সুশোভিত, এবং রোমাঞ্চরূপী কাঁচুলী বিশিষ্ট। অঙ্গ-ভঙ্গী পূর্ব্বক

চন্দন, সুগম শ্রমরূপ ভাব দ্বারা বিহ্বল এবং দ্রবীভাব প্রাপ্ত মস্তকে সিন্দুর এবং নেত্রে অঞ্জন দ্বারা পরিশোভিত। ললাটোপরিস্থিত কুঙ্কুম চন্দনাদি পদার্থ যুক্ত এবং সুগন্ধ পুষ্পদ্বারা গ্রথিত যে কেশ, সেই কেশ-গ্রন্থি আলুলায়িত হওয়াতে অত্যন্ত শোভায়মান এবং হাস্য বাদিত্র গীতাদি দ্বারা সুশোভিত। এরূপ অপ্সরা-দিগের মনোরম অঙ্গভঙ্গী দ্বারাও আমার ধৈর্য্য নিবৃত্তি করিতে পারে নাই। এবং সেই অপ্সরাগণ তাহাদের মনোহর স্থান দ্বারাও আমার ধৈর্য্য নিবৃত্তি করিতে পারে নাই। সেই স্থান কিরূপ? কোকিলাদি পক্ষীর মধুর শব্দ দ্বারা কল্লোলিত এবং চির বসন্ত ঋতু যুক্ত; মন্দাকিনী গঙ্গার সমীপতা নিবন্ধন অত্যন্ত কোমল এবং বালুকা রাশি পরিপুর্ণ এবং দেবতাদিগের দ্বারা সেবিত। ইত্যাদি নানা-প্রকার উপায়ে সেই অপ্সরাগণ আমার ধৈর্য্য নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, পরন্তু সেই অপ্সরাগণের দ্বারা আমার ধৈর্য্য নিবৃত্তি হয় নাই। সেই আমার ধৈর্য্য এখন বৃদ্ধাবস্থায় কেবল ভ্রান্তি দ্বারা নষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

সেই ভ্রান্তি নিরূপণ করা যাইতেছে। এক্ষণে বৃদ্ধাবস্থায় যে স্ত্রী আমার ধৈর্য্য নিবৃত্তি করিয়াছিল, সেই স্ত্রীর শরীর আমার শরীর হইতে কিছুমাত্রও ভিন্ন নহে। কিন্তু যেরূপ রুধির, মাংস, পূয, বিষ্ঠা, মুত্র, নাড়ী, মজ্জা, অস্থি ইত্যাদি মলিন বস্তুর সমষ্টি আমার শরীর, সেইরূপ এই আমার স্ত্রাদিগের শরীর ও রুধির মাংসাদি মলিন বস্তুর সমষ্টি রূপ। সুতরাং এরূপ মলিন স্ত্রীর শরীরকে যদি আমি সুখের সাধন জ্ঞান করি, তাহা কেবল ভ্রান্তি দ্বারা মানিতে হয়। কিম্বা, আমি যাজ্ঞবল্ক্য আপনার শরীরকে বারম্বার মৃত্তিকা জলাদি দ্বারা প্রক্ষালন করি, তথাপি এই আমার শরীর শুদ্ধ হয় না, কিন্তু সর্ব্বদা দুর্গন্ধ দ্বারা অশুদ্ধ থাকে; আর এই স্ত্রীও আমার ন্যায় মৃত্তিকা জলাদি দ্বারা আপনার শরীর সর্ব্বদা প্রক্ষালন করে না, তবে এই স্ত্রীর শরীর কি প্রকারে শুদ্ধ হইবে? সুতরাং এই স্ত্রীর শরীর সর্ব্বদাই অশুদ্ধ থাকে। এরূপ অশুদ্ধ স্ত্রীর শরীরকে যদি সুখের কারণ স্বীকার করিয়া থাকি, তাহা কেবল ভ্রান্তি দ্বারাই স্বীকার করিয়াছি। যিনি বিবেকী ও বিরক্ত পুরুষ হইবেন, তিনি আপনার এবং স্ত্রীদিগের শরীরকে সর্ব্বদা অশুদ্ধই জানিবেন ইহাতে সন্দেহ কি? 'স্থানাদ্বীজাদুপষ্টম্ভান্নিষ্যন্দান্নিধনা-দপি। কায়মাসেচ শৌচত্বাৎ পণ্ডিতাহ্যশুচি বিদুঃ। অর্থ, এই শরীর মাতার উদররূপ স্থানে থাকে এবং পিতামাতার শুক্র শোণিত রূপ বীজ হইতে উৎপন্ন হয় এবং অন্ন পানাদি রসের পরিণাম। নেত্রাদি নব দ্বার হইতে যাহার মল নির্গত হয় এবং অশুচির কারণ এবং স্বভাবতঃ শুদ্ধত্ব রহিত। এই কারণে

বিবেকী মহাত্মা পুরুষ এই শরীরকে অশুচি বলিয়া জানে। কিম্বা যৌবন অবস্থা প্রাপ্ত যে স্ত্রীলোকের পীনোন্নত পয়োধর যাহাকে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি সুবর্ণ কমলের সহিত উপমা দিয়াছেন, সেই স্তন কিরূপ? যেরূপ আমাদিগের কোন রোগের বশে হৃদয় দেশে মাংসের গ্রন্থি হয়, সেইরূপ মাংসের গ্রন্থির সমান সেই স্ত্রীলোকের স্তনদ্বয়। এরূপ মাংসের গ্রন্থিরূপ স্তনে যে আমার সুখের কারণতা জ্ঞান হইয়াছে, সেই জ্ঞান ভ্রান্তি মূলক। কিম্বা কেবল স্তন ছাড়িয়া দিলে স্ত্রীর শরীর ও পুরুষের শরীর সমান। আর বাস্তবিক বিচার করিয়া দেখিলে এই স্তনদ্বারা ও স্ত্রীলোকের শরীরে বিলক্ষণতা সম্ভব নহে। কারণ পুরুষের কটী স্থানের নিম্নভাগে মাংসের গ্রন্থিরূপ যে উপস্থ আছে, সেই উপস্থে এবং স্ত্রীর-স্তনে কিঞ্চিন্মাত্রও প্রভেদ নাই। কিম্বা পুরুষের যে পায়ুছিদ্র এবং স্ত্রী-লোকের যে কোন ছিদ্র এই উভয় ছিদ্র মল বহির্গত হইবার দ্বার। সুতরাং এই উভয় ছিদ্রেও কিঞ্চিন্মাত্র বিলক্ষণতা নাই। সুতরাং এই সিদ্ধ হইতেছে যে স্ত্রীর শরীরে দুটী পায়ুদ্বার আছে, আর পুরুষের শরীরে একটি পায়ুদ্বার আছে। এরূপ স্ত্রীলোকের শরীরে, "এই স্ত্রী আমার সুখের সাধন" এইরূপ সুখ-সাধনতা জ্ঞান যে আমার হইয়াছিল, সেই জ্ঞান ভ্রান্তিরূপ। কারণ বিচার দৃষ্টি করিয়া দেখিলে এই স্ত্রীর শরীর গ্লানি উৎপত্তি করতঃ বিবেকী পুরুষের পশ্চাৎ তাপের কারণ। এরূপ দুঃখের সাধনতা রূপ স্ত্রীর শরীরে, সুখ সাধনতা বুদ্ধি ভ্রান্তিরূপই হইতেছে। যেরূপ সর্প ভাব হইতে রহিত রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি ভ্রান্তিরূপ। কিম্বা! ইহলোকে অবিবেকী পামর পুরুষও অন্য পুরুষের সমীপস্থিত আপনার স্ত্রীর সহিত সম্ভোগ করে না। আর আমি যাজ্ঞবল্ক্য সেই স্ত্রী হৃদয় দেশস্থিত যে অন্তর্য্যামী আত্মারূপ পুরুষ, তিনি অত্যন্ত সমীপে বিদ্যমান থাকিলেও নির্লজ্জ হইয়া স্ত্রীর সহিত সম্ভোগ করিয়াছিলাম। সুতরাং সেই পামর পুরুষ অপেক্ষাও আমি যাজ্ঞবল্ক্য নিকৃষ্ট। এক্ষণে এই বিষয়ে সুখের কারণ বিচার করা যাইতেছে। স্ত্রী পুরুষের যে পরস্পর সংযোগ সম্বন্ধ, সেই সংযোগ সম্বন্ধ এই জীবের বিষয়-জন্য সুখের কারণ নহে। কিন্তু 'এই স্ত্রী আমার বিষয় সুখের সাধন' এই প্রকার যে পুরুষের এবং স্ত্রীর ভাবনা সেই ভাবনাই সেই পুরুষের এবং স্ত্রীর বিষয় সুখের সাধন। কারণ যদি কখনও স্ত্রী পুরুষের সংযোগ সম্বন্ধই সেই বিষয় সুখের কারণ হইত, তাহা হইলে স্নেহ পূর্ব্বক আপনার যুবতী মাতাকে আলিঙ্গনকারী যে যুবাপুত্র এবং স্নেহ পূর্ব্বক আপনার যুবা পুত্রকে আলিঙ্গনকারিণী যে যুবতী মাতা তাহাদের

দুইজনের এই বিষয় সুখ হওয়া উচিত। এবং পরস্পর দ্বেষ ভাবাপন্ন যে যুবতী স্ত্রী ও যুবা পুরুষ, তাহাদের দৈব যোগে পরস্পর আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইলেও সেই বিষয়-জন্য সুখ হওয়া উচিত। কিন্তু সেই পুত্রাদি পুরুষের আপনার মাতাদি স্ত্রীর সহিত আলিঙ্গন করিয়া সেইরূপ সুখ প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে স্ত্রী শরীর ও পুরুষ শরীরের পরস্পর সংযোগ সম্বন্ধ এই বিষয় সুখের কারণ নহে; কিন্তু পূর্ব্ব কথিত ভাবনাই এই বিষয় সুখের কারণ। স্ত্রীর শরীর, পুরুষের শরীর, এবং সেই উভয়ের পরস্পর সংযোগ সম্বন্ধ এই তিনটী সেই বিষয় সুখের কারণ নহে। যে আত্ম-স্বরূপ আনন্দের লেশমাত্র আনন্দ দ্বারা ব্রহ্মাদি লোক আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এরূপ আনন্দের সমুদ্র, স্বয়ং-জ্যোতি, আত্মা সর্ব্বদা আমার হৃদ্দেশে বিরাজমান রহিয়াছেন, সেই আনন্দস্বরূপ আত্মাকে উপেক্ষা করিয়া আমি যাজ্ঞবল্ক্য, যেরূপ ভূতাবিষ্ট পুরুষ এই ভূমিতে নানা প্রকার নৃত্য করে সেইরূপ এই নারীরূপ নরক ভূমিতে নানা প্রকার নৃত্য করিতেছিলাম। কারণ আত্মারূপ নিত্য সুখ উপেক্ষা করিয়া, স্ত্রীরূপ নরকে যে আমার সুখ-বুদ্ধি আছে, সেই সুখ-বুদ্ধি আমার মূর্খতা জানাইতেছে। কারণ ইহলোকে যে পুরুষ উৎকৃষ্ট পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট পদার্থ গ্রহণ করে, সেই পুরুষকে সকল লোকে মূর্খ বলে। ইহ লোকে মহান্ পুরুষের যে অবজ্ঞা, সেই অবজ্ঞাই সেই মহান্ পুরুষের হনন বলিতে হইবে। আর সূর্য্য চন্দ্রমাদকে আপনার আজ্ঞাতে নিয়োগকারী যে এই আনন্দস্বরূপ অন্তর্যামী আত্মা তিনি সর্ব্বাপেক্ষা মহান্; সেই মহান্ আত্মাকে আমি যাজ্ঞবল্ক্য বিষয় সুখ প্রাপ্তির জন্য উপেক্ষা করিয়া দিয়াছি, এই উপেক্ষারূপ অবজ্ঞাই সেই আত্মার হনন সন্দেহ নাই। আর আত্ম হত্যাকারীর ন্যায় পাপাত্মা ইহলোকে কেহ নাই। সুতরাং নিজের আত্মাকে হননকারী আমি যাজ্ঞবল্ক্য অত্যন্ত পাপাত্মা! ইহলোকে অবিবেকী পামর পুরুষ আনন্দস্বরূপ আত্মাকে জানে না, এই কারণে সেই পামর পুরুষ স্ত্রী পুত্র ধনাদি পদার্থে আসক্তি করিয়া বহির্মুখ হয়। কিন্তু আমি যাজ্ঞবল্ক্য গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশে আনন্দ-স্বরূপ আত্মাকে জানিয়াও, এই স্ত্রী পুত্র ধনাদি পদার্থে আসক্তি করিয়া বহির্মুখ হইয়াছি। সুতরাং আমি যাজ্ঞবল্ক্য অবিবেকী পামর পুরুষ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। ইহলোকে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত যে পামর পুরুষ, সেই পামর পুরুষও আপনার স্ত্রীকে বৃদ্ধা দেখিয়া, সেই বৃদ্ধা স্ত্রীকে সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু আমি যাজ্ঞবল্ক্য

এই বৃদ্ধা স্ত্রীর সহিত সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। সুতরাং আমি পামর পুরুষ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। কিম্বা যে স্ত্রীতে আমার আসক্তি হইতেছে সেই স্ত্রী কিরূপ? শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় যাহার শরীর এবং আমার ন্যায় যাহার উদর, এবং পুত্রদিগকে স্তন্য পান করাইয়া যাহার স্তন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে সূর্য্য ভগবান্ যে আমাকে গৃহস্থাশ্রম করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তাহা পুত্র উৎপত্তির জন্য এবং বেদবিদ্যা সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্য আজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেই আজ্ঞা পরিপূর্ণ হইলে পরও আমি বৃথা কাল অতিবাহিত করিয়াছি। ইহা তাঁহার আজ্ঞা ছিলনা; আমি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার বিদ্যার সম্প্রদায় অনেক প্রবর্ত্ত করিয়াছি। কারণ চারি বেদ প্রচার করিতে সমর্থ অনেক ব্রাহ্মণ তো আমার শিষ্য এবং কত ব্রাহ্মণ তো আমার শিষ্যের শিষ্য; আরও কত ব্রাহ্মণ তো আমার প্রশিষ্যের শিষ্য। এই প্রকার সমস্ত ব্রাহ্মণ মিলিয়া অনেক কোটী ব্রাহ্মণ আমার শিষ্য পরম্পরা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি যাজ্ঞবল্ক্য আমার স্ত্রী পুত্রাদির সুখের এবং ধনের আসক্তি করিয়া এই গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করি নাই। এই স্ত্রী পুত্র ধনাদির বিষয় সকল বিচার করিতে করিতে আমি যাজ্ঞবল্ক্য অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি, তথাপি আমার চিত্ত এই সংসার হইতে উপরত্ত হইতেছে না। কিন্তু অদ্যাবধিও আমার চিত্ত সংসারের দিকে ধাবমান হইতেছে। সুতরাং স্ত্রী পুত্র ধনাদি পদার্থের সঙ্গই এই জীবের অনর্থের মূল। সুতরাং এই সিদ্ধ হইতেছে যে স্ত্রী পুত্র ধনাদি পদার্থের সঙ্গই আসক্তি দ্বারা এই জীবের সর্ব্ব অনর্থের কারণ। সুতরাং যে ব্যক্তির করামলকের ন্যায় সংশয় বিপর্য্যয় রহিত আত্ম সাক্ষাৎকার হইয়াছে, সেই বিদ্বান্ পুরুষ ও স্ত্রী পুত্র ধনাদি পদার্থের সঙ্গ কথনও করিবেনা! ইহাদের মধ্যেও স্ত্রীর সঙ্গ কথনও করিবেনা। সেই স্ত্রীর মধ্যেও যুবতী স্ত্রীর সঙ্গ এই পুরুষ কথনও করিবেনা। কারণ মরণান্তর পাপী জীবের যে নরক প্রাপ্তি হয়, সেই নরক স্থাবর। সুতরাং সেই নরক ত্যাগ করিলে পর সেই পাপী জীবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসে না। কিন্তু এই স্ত্রী ত' দুই পদ দ্বারা চলিতে সমর্থ, মূর্ত্তিমান নরক। সুতরাং সেই স্ত্রীরূপ নরক ত্যাগ করিলে পরও এই পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করে। এরূপ স্ত্রীরূপ ঘোর নরকে যদি কথনও সর্ব্ব শাস্ত্রবেত্তা বিদ্বান্ পুরুষও পড়ে, তবে সেই বিদ্বান্ পুরুষও সেই স্ত্রীরূপ নরক হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন না। সেই বিদ্বান্ পুরুষের মধ্যে আমি যাজ্ঞবল্ক্যই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত

রূপ। সুতরাং যোগারূঢ় পুরুষেরও স্ত্রীর সঙ্গ প্রযুক্ত অধঃপতন হয়, এই যে বার্ত্তা সর্ব্ব শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে তাহা যথার্থ। যেরূপ ইহলোকে গ্রামে লইয়া যাইবার রাস্তা থাকে, সেইরূপ নরক রূপ গ্রামে লইয়া যাইবার জন্য এই স্ত্রীর শরীররূপ মার্গ আছে। সুতরাং মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য যে আত্মজ্ঞান রূপ মার্গ, সেই মার্গ প্রাপ্তির ইচ্ছা যে পুরুষ করে, সেই মুমুক্ষু এই স্ত্রীরূপ নরকের পথ অবশ্য পরিত্যাগ করিবে। ইহলোকে যে অধিকারী পুরুষ সংন্যাস আশ্রম রূপ মার্গ দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি ইচ্ছা করে, সেই অধিকারী পুরুষের সেই সংন্যাস রূপ মার্গে এক স্ত্রী হইতেই ভয় থাকে। আর সেই স্ত্রী ব্যতিরেকে অন্য কোন সিংহ, সর্প, চৌর, রাজা, জল, অগ্নি, বিষ, আধি, ব্যাধি, দেবভূত ইত্যাদি কিছু হইতে এই অধিকারী পুরুষের ভয় নাই। তথায় সন্ন্যাসীদিগের স্ত্রীলোক হইতে যে ভয় হয়; এ বিষয়ে এই কারণ যে, বহির্মুখ পুরুষের আত্মসাক্ষাৎকার হয় না এই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। সেই বহির্মুখতা যেরূপ স্ত্রীলোকের সংসর্গ হইতে হয়, সেরূপ অন্য কোনও পদার্থের সংসর্গ হইতে হয় না। কারণ যেমন করিয়া এই স্ত্রীলোকের স্মরণ করা যায়, সেই স্মরণই এই পুরুষের চিত্তে কাম উৎপাদন করে। যখন সেই স্ত্রীর স্মরণই এই পুরুষের কাম উদ্রেক করে, তখন সেই স্ত্রীর দর্শন হইতে এবং বাক্য হইতে এবং স্পর্শ হইতে এই পুরুষের চিত্তে কাম উৎপত্তি হইবে এ বিষয়ে আর কি বক্তব্য আছে? সুতরাং আত্মসাক্ষাৎকার জন্য যে অধিকারী পুরুষ সংন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই অধিকারী পুরুষ শরীর বাণী মন দ্বারা কখনও সেই স্ত্রীর সঙ্গ না করেন। যদি কখনও এই অধিকারী পুরুষ সংন্যাস আশ্রম ধারণ করিয়া স্ত্রীর সঙ্গ করেন, তাহা হইলে যেরূপ অগ্নির সম্বন্ধ হইতে ঘৃত দ্রবীভূত হয়, সেইরূপ এই সংন্যাসীর চিত্তও আপনার ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিয়া দ্রবীভাব প্রাপ্ত হইবে; তদ্দ্বারা এই সংন্যাসী মোক্ষ মার্গ হইতে পতিত হইবেন। সুতরাং সংন্যাসীগণ সর্ব্ব প্রকারে স্ত্রীলোকের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন। কিম্বা ইহলোকে প্রসিদ্ধ সর্পাদির বিষ, নিবৃত্তি করিবার জন্য যদ্যপি শাস্ত্র নানাপ্রকার উপায় কথন করিয়াছেন, তথাপি সেই স্ত্রীরূপ সর্পের বিষ নিবৃত্তি করিবার একই উপায় শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। সেই উপায় এই :— শরীর দ্বারা সেই স্ত্রীকে স্পর্শ করিবে না, এবং মন দ্বারা সেই স্ত্রীর স্মরণ করিবে না, এবং বাগাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই স্ত্রীর সহিত সম্ভাষণাদি করিবে না। এই প্রকার উপায় ব্যতিরেকে অন্য কোনও উপায় এই স্ত্রীরূপ সর্পের বিষ

নিবৃত্তি করিতে সমর্থ নহে। সুতরাং আমি যাজ্ঞবল্ক্য সংন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিব। কারণ বাসনা বশতঃই জীবের জন্ম হইয়া থাকে। যেরূপ জাগ্রত অবস্থায় যে পদার্থে দৃঢ় বাসনা থাকিবে, সেই পদার্থ এই পুরুষ স্বপ্নাবস্থায় দেখিবে,—সেইরূপ মৃত্যু সময়েও এই পুরুষের যেরূপ দৃঢ় বাসনা হইবে, সেই বাসনা অনুসারেই সেই পুরুষ অন্য শরীর প্রাপ্ত হইবে। আর সেই অন্য শরীরেও এই জীব পূর্ব্ব জন্মের কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি সংস্কাররূপ বাসনা অনুসারে পুনঃ কাম ক্রোধাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই কাম ক্রোধাদি সংস্কার রূপ বাসনা বশতঃ এই জীব পুনঃ জন্ম প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে জীব স্ত্রী প্রভৃতির সংসর্গ করিলে অনেক প্রকার জন্ম প্রাপ্ত হইবে। কিম্বা স্ত্রী প্রভৃতির সঙ্গ দ্বারা এই পুরুষের চিত্তে কাম ক্রোধাদি বিকার উৎপন্ন হয়। আর সেই কাম ক্রোধাদি বিকার প্রযুক্ত এই পুরুষের চিত্ত অশুদ্ধ ভাব প্রাপ্ত হয়। আর সেই অশুদ্ধ চিত্তে আত্মজ্ঞান পূর্ব্বে উৎপন্ন হইলেও, শিথিল হইয়া যায়। তাৎপর্য্য এই যে, আত্মজ্ঞানও পূর্ব্বে উৎপন্ন হইলে যখন অশুদ্ধ চিত্ত শিথিল হইয়া যায়, তখন সেই অশুদ্ধ চিত্তে নবীন জ্ঞান উৎপত্তির কি আশা আছে? সুতরাং এই সিদ্ধ হইতেছে যে স্ত্রী পুত্রাদি পদার্থের সঙ্গ প্রযুক্ত এই পুরুষে কাম ক্রোধাদি বিকার উৎপন্ন হয়। সেই কাম ক্রোধাদি বিকার দ্বারা এই পুরুষ ব্রহ্ম জ্ঞান হইতে এবং কর্ম্ম উপাসনারূপ দুই মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বারম্বার কীট পতঙ্গাদি শরীর প্রাপ্তিরূপ এবং নরক প্রাপ্তিরূপ তৃতীয় মার্গ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার স্ত্রী সঙ্গ হইতে পুরুষ কোটী কল্প পর্য্যন্ত নানা প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হয়। কিম্বা যেরূপ এই পুরুষ স্ত্রী সঙ্গ বশতঃ কামাদি উৎপত্তি দ্বারা অনেক জন্ম দুঃখ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিষয়াসক্ত কামী পুরুষের সঙ্গ হইতেও এই জীব সেই প্রকার দুঃখ পাইয়া থাকে। কারণ সেই বিষয়াসক্ত কামী পুরুষ সর্ব্বদা স্ত্রী সম্বন্ধীয় কামেরই বর্ণনা করে। সেই কামী পুরুষের বচন হইতে সেই পুরুষের অবশ্যই স্ত্রীকাম স্মরণ রূপ জ্ঞান হইবে, এবং সেই স্মরণ দ্বারা সেই স্ত্রীরূপ অগ্নি সেই পুরুষের চিত্তকে অবশ্য দগ্ধ করিবে। সেই দগ্ধ চিত্তে আত্মার বিচার হইতে পারে না।

হে শিষ্য! এই প্রকার স্ত্রী প্রভৃতি পদার্থের সঙ্গ বিষয় নানাপ্রকার দোষ বিচার করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য মুনি স্ত্রীপুত্র ধনাদি পদার্থের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার জন্য সংন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। পরন্তু যাজ্ঞবল্ক্য মুনি অত্যন্ত কৃপালু। তিনি ভাবিলেন স্ত্রীদিগের সহিত বহুকাল

রহিয়াছি। সুতরাং শাস্ত্রের রীতি অনুসারে এই স্ত্রীগণ আমার মিত্র স্বরূপ। সুতরাং এই স্ত্রীদিগের উপর আমার উপকার করা উচিত। কাত্যায়নীর ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার নাই। সুতরাং উহার জীবনোপায়ের বন্দোবস্ত করিলেই হইবে। আর আমার মৈত্রেয়ী নামক যে অন্য স্ত্রী সেই মৈত্রেয়ী সংসারের জন্ম মরণাদি দুঃখ দেখিয়া সর্ব্বদা শোকাতুরা থাকেন। এবং এই মৈত্রেয়ী সর্ব্বদা মোক্ষ অভিলাষ করেন। আর এই মৈত্রেয়ী যৌবন অবস্থাতেও কামাদ বিকার প্রাপ্ত হন নাই। এই মৈত্রেয়ীর নিজের শরীরের উপর, কিম্বা পতি পুত্রাদির উপর কিছুমাত্রও স্নেহ নাই। কিন্তু পতিব্রতা স্ত্রীর পতিসেবা শাস্ত্রে লিখিত আছে এবং তাহাই পতিব্রতার স্ত্রীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, এজন্য পতি সেবায় রত থাকেন। ধনাদিতেও ইনি অত্যন্ত নিস্পৃহ। সুতরাং এই মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারিণী সুতরাং এই মৈত্রেয়ীকে প্রথমে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়া পশ্চাৎ আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র, (৺কাশীধাম)।

মোক্ষ]

তোমায় ছাড়িয়ে।

তোমায় ছাড়িয়ে প্রভো!
পেয়েছি অনেক ব্যথা।
সকলি হেরেছ তুমি,
গাথিয়ে করম-গাথা॥
অশ্রু-জলে ভেসে ভেসে,
বিষাদে কেটেছে দিন।
শোকে দুঃখে পড়ে হায়!
পরাণ হয়েছে ক্ষীণ॥
অনুতাপ-দাবানল,
এ হৃদি করেছে ছাই।
এবে প্রভো! বুঝিলাম,
তোমা বিনে গতি নাই॥

দিয়েছিলে আশীর্ব্বাদ,
করেছি সম্ভোগ কত।
হাতে স্বর্গ দিয়েছিলে,
করে যত্ন নানা মত॥
উপেক্ষিয়ে মোহে হায়!
ফেলেছিনু সবি দূরে।
সংশয় নিরাশ মোরে,
করেছিল ভব ঘুরে॥
আবার দিয়েছ যদি,
কৃপা-হস্ত প্রসারিয়ে।
নিয়োনাকো পিতঃ! আর,
দীন সুতে ফাঁকি দিয়ে॥

ফেলিওনা মোহে কভু, বঞ্চিতে অধম সুতে,—
এই দাসে—অভাজনে। দীন সেবক-"রঞ্জনে" ॥

শ্রীরমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত।

মোক্ষ]

অদৃশ্য।

কে তুমি আমার আড়ালে বাস কর্‌চ? তোমাকে চখে দেখ্‌তে পাচ্চিনা বটে, কিন্তু প্রাণে বেশ অনুভব করচি। কায়া দেখ্‌তে পাচ্চিনা, কিন্তু ছায়া তো লুকাতে পার্‌চ না। ওগো চতুর, কে তুমি? কে আমার সঙ্গে এরূপ রহস্য আরম্ভ করেছ? যখনি নীলাম্বরে অগণ্য নক্ষত্র চিক্‌মিক্ করে উঠে, চন্দ্রিমা কখন একটু মেঘের মাঝে লুকাইয়া থাকে—আবার হাসিতে হাসিতে তখনি বাহির হয়, সেও কি মেঘের সঙ্গে তোমার মত লুকোচুরি খেলে? অগণ্য নক্ষত্রের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কোথায় সে লুকায়? তুমিও তেমনি সমস্ত হৃদয়ের মাঝখানে থাকিয়া সমস্ত হৃদয়কে ফাঁকি দিয়া বেশ বেড়াইয়া বেড়াইতেছ তো? সূর্য্যের প্রথমোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বগগন যখন সিন্দুররাগে রঞ্জিত হয়ে উঠে, সাগরের সুনীল জলরাশির বিক্ষোভিত তরঙ্গ হইতে কেমন একখানি অপূর্ব্ব ছবি ফুটিয়া উঠে—মনে হয় ঠিক এই ছবিখানিকে লইয়া কে যেন খেলা করচে। নব প্রভাতের আগমন বার্ত্তা জানাবার জন্য কিছু আগেই চঞ্চলা উষা নাচিতে নাচিতে হাঁসিতে হাঁসিতে কোন্ অন্ধকারের অদৃশ্য গৃহ হ'তে বাহির হইয়া আসিয়াছে;—তাহার সে হাঁসিতে কত যুথি, যাঁতি, মল্লিকা, মালতী, সেফালিকা ফুটিয়া উঠিল;—মৃদু গন্ধবহ তাহাদের গাত্র হইতে গন্ধ হরণ করিয়া উষার গাত্র বস্ত্রে মাখাইয়া দিয়া চলিয়া গেল;—দিগাঙ্গনারা উষার সমস্ত গাত্রে কুসুম সুরভির সুবাস পাইয়া হাঁসিয়া উঠিল;—কুঞ্জবনে কোকিলেরা কাহার 'সাড়া' পাইয়া পঞ্চম সুরে গান ধরিয়া বসিল; সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে একটা আনন্দের স্রোত বহিয়া গেল! এ আনন্দ কার? এত প্রকাশ কার? কা'কে দেখে সকলের এত আনন্দ? এইবার তো ধরা পড়েছ। আর লুকিয়ে লুকিয়ে রং তামাসা করিলে চলিবে না! আচ্ছা তোমার একি আনন্দ! পটান্তরাল হ'তে একি তোমার কৌতুক? আমাকে রাজার সাজে সাজাও, কখন ভিখারীর বেশ পরাও, এ তোমার কি আমোদ! আমি এত ক্ষুদ্র তবুও আমার সঙ্গে

খেল্‌তে, তামাসা কর্‌তে তোমার সম্ভ্রমের কোন হানি হয় না? তবে কি তুমি প্রৌঢ়ও নয়, বিজ্ঞও নয়—একটি ছোট্ট ছেলের মত? তা বই কি! কতদিন ধরে দেখছি, কত কাল কেটে গেল তবু তোমার ছেলেমানুষি ঘুচিল কৈ? আমি দেখ্‌তে দেখ্‌তে বড় হ'লাম বৃদ্ধ হ'লাম, আবার এই জীর্ণ হতে বসেছি—কে তুমি অপরূপ কিশোর—অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালী পুরুষ, গীতগন্ধ ভরা—আমার হৃদয়-কুঞ্জে বসিয়া বসিয়া কত সুরই ভাঁজিতেছ—কত খেলাই খেলিতেছ? ওগো তুমি কি তোমার খেলা কখন বন্ধ করিবে না?

আচ্ছা যদি এত খেল্‌তেই ভালবাস, এত আড়ালে আড়ালে থাক কেন? কখন সম্পূর্ণ অবয়বটা তোমার দেখ্‌তে পেলাম না। কখন পৃষ্ঠখানি, কখন লম্বিত বেণীটি, কখন হাতখানি কখন মিষ্ট কণ্ঠ সুরটি, কখন পাদপদ্মের লাল আভাটুকু, কখন নয়ন কোণে হাঁসির রেখাটি, কখন বিদ্যুতের মত সুন্দর মুখশ্রীটি ফুটিয়া উঠে;—ফুটিয়া তুমি যে আছ এইটুকু বুঝাইয়া আবার অদৃশ্য গৃহে সরিয়া পড়। চক্ষু তোমাকে দেখ্‌বে বলে তাকিয়ে তাকিয়ে অন্ধ হয়ে গেল; কর্ণ তোমার কথা শুন্‌বার আশায় স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা কর্‌তে কর্‌তে বধির হয়ে গেল; অঙ্গ তোমার পরশ লাগিয়া চিরজীবন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিবশ হইয়া গেল। হে চঞ্চল! হে দুরন্ত! তবু তো তুমি ধরা দিলে না?

ধরা দিবেই না, এই কি তোমার নিয়ম? আমি চিরদিন চখের জলে বক্ষ ভাসাইব, আর তুমি আড়ালে বসিয়া বাঁশী বাজাইবে, ইহাই কি খুব সঙ্গত? আমি যদি তোমার ধরা পাবার অযোগ্যই হই, তুমি যদি খুব বড়ই হও—অসীম অনন্তই হও, আর আমার মনোবুদ্ধির অগোচর হও তবে তোমার রূপ কেন প্রকাশ করলে? কেন তোমার জন্য মনের মধ্যে এত ব্যাকুলতা গেঁথে দিলে? আমি মনে করেছিলাম, তুমি সূর্য্যের চেয়েও কত বড়। কত সূর্য্য, আকাশের গায়ে নক্ষত্রের মত, তোমার মধ্যে ঝিক্‌মিক্ করচে—তুমি এতই বড়!! আর আমি—যে পৃথিবী সূর্য্যের কাছে একটি নগণ্য পদার্থ বল্লে হয়—আমি সেই পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্রতম অংশে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র একটি জীব মাত্র, সমুদ্রধারে একটি বালুকা কণার মত; তুমি কি তা'র কিছু খবর রাখ? এই যে দেশের সম্রাট যিনি, তিনি তাঁর কটা প্রজাকেই চেনেন এবং তাহাদের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখে তাঁর কি-ই বা আসিয়া যায়। আমি ভাব্‌তাম তুমিও ঠিক সেই রকম! তাতে এই একটু আনন্দ হতো যে তোমার দৃষ্টির বহির্ভূত হয়ে এক রকম ভালই হয়েছে; মনের যা খুসি তাই কর্‌ব—কাহাকেও সমীহ কর্‌তে হবে না। তুমি

আপনার মহিমার মধ্যে বিরাজ করছ, আমি আপনার ক্ষুদ্রত্ব লইয়া এক কোণে পড়িয়া আছি। কিন্তু একি অদ্ভুত লীলা তোমার! আমি যে এত ক্ষুদ্র আর এই যে বালুকাকণা কত ক্ষুদ্রতম—তুমি কাহাকেও বাদ দাও নাই? সকলের সঙ্গেই সুপরিচিত হয়ে আছ! এত ক্ষুদ্রের নিকটেও আপনার পূর্ণতা লইয়া সর্ব্বদা বিরাজমান! দীন বলিয়া ঘৃণা কর নাই! এত ক্ষুদ্রকে লইয়াও সমানের মত ব্যবহার করিতেছ!—'সখা' বলিয়া ডাকিতেছ?

আমি ভাবতাম তুমি বিশ্ব জুড়ে অনন্ত অসীম হয়ে পড়ে আছ;—আমার মতন লোক ডাকলে কি আর তোমার সাড়া পাবে? হরি! হরি! এই যে না ডাকতেই এসে উপস্থিত! আমি পাশ কাটাতে চাই, আমি ছাড়তে চাই,—তুমি যে ছাড়চ না! একি তোমার অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। আমি ভাবতাম আমার আবার তুমি খবর রাখছ? তা'তে একরকম নিশ্চিন্ত ছিলাম না যে তা নয়। এখন একি দেখ্‌চি, তুমি আমার সব খবর রাখ, আমার মনের—আমার ঘরের কোন কথাই জান্‌তে তোমার বাকী নাই! আচ্ছা এত বড় ছিলে—এত ছোট হয়ে এলে কি করে? অবশ্যই ছোট হয়েছ—তা না হলে আমার কাছে থাক কি করে? 'সর্ব্বের মধ্যে' না হয়ে 'সর্ব্বব্যাপী' যে তুমি—আবার এইশরীরের প্রত্যেক ক্ষুদ্র অংশে সেই বোধরূপে তুমি! ওহে আমার রসরাজ রসিক শেখর প্রেমময়—একি তোমার লীলা, নাথ? হাঁগো এই কি তোমার মায়া? আমি তোমার পানে তাকাবো না বল্লে কি হবে—তুমি যে ভুল্‌তে দাও না! আমি তোমার পানে তাকাবো না বল্লে কি হবে—তুমি যে আঁখির দৃষ্টিকে কেড়ে নাও? আচ্ছা এত নগণ্য এত ক্ষুদ্র আমি, আমাকে নিয়ে তোমার এ রহস্য কেন?

কি করে এ কথা প্রাণকে বুঝাব—কি করে এ কথা বিশ্বাস কর'ব, যে তুমি ও আমাকে চাও? কিন্তু এ যে প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি আমাকে তুমি এক মুহূর্ত্ত ছেড়ে নাই—আমার সমস্ত চিন্তা, কর্ম্ম, সবই তুমি জান—কিছুতেই তোমাকে ফাঁকি দেওয়া চলে না!!

হে মায়াবী! একবার তোমার গাত্রবাস খানি উন্মোচন কর—মুখের ঘোমটা খানি সরাইয়া দাও—আমি তোমার নিরাবরণ মুখশ্রী জন্মের মত একবার দেখিয়া লই!

হে পাগল! আমার এ কথাটি শুনিবে তো? রক্ত-কমল-রাগ-রঞ্জিত তোমার পা দুখানির ছায়া আর একবার আমাকে দেখাবে কি? তেমনি করে

সখা! তোমার পরশমণি বাঁকা নয়নে আর একটীবার কি চাহিবে? আমার নয়ন ভুলানো, হৃদয় জুড়ানো, তোমার মোহন মূরতি আর কতকাল লুকাইয়া রাখিবে? একবার চকিতের মত এস,—একবার হৃদয়ে হৃদয় পরশ করিয়া—আপনাতে আপনি ভুলিয়া যাই!!

উন্মাদ

ধর্ম্ম]

বিদ্যাবিলাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অধ্যাপক সমাজে বিষম 'নিমাই-আতঙ্ক' জন্মিয়াছে। পড়াইতে পড়াইতে নিমায়ের নাম শুনিতেই তাঁহাদের বুদ্ধি আগুন হইয়া যায়, সুপঠিত বিদ্যা ভুল হইয়া যায়। কেবল পশার বজায় রাখিবার জন্য মুখে নিমায়ের নিন্দা করেন, কিন্তু সকলেই মনে মনে বলেন,—

এতাদৃশ পাণ্ডিত্য কি মনুষ্যের হয়।
প্রাকৃত মনুষ্য কভু এ পুরুষ নয়॥

উদ্ধত নিমায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসার ভয়ে বেচারিদের পথ ঘাট একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। স্বপ্নেও কেহ আর নিমায়ের ছায়া মাড়ান না; কিন্তু কি মুস্কিল! নিমাই পণ্ডিত শিষ্যমণ্ডলী লইয়া ঐ ৺গঙ্গাতীরেই যে হানা দিয়া থাকেন। গঙ্গাস্নান না করিয়াও ত' উপায় নাই; অথচ গঙ্গাতীরে গেলেই নিমায়ের হাতে পড়িতে হইবে। আবার পণ্ডিতের চেহারা দেখিলেই ব্যঙ্গ স্বরে নিমাই বলিতে থাকেন, "কলিতে পণ্ডিতের ত' অভাব নাই, বড় বড় লেঙ্গটীরও অভাব নাই; যাঁহার সন্ধিমাত্র জ্ঞান নাই তিনিও একজন বিদ্যাবাগীশ।"

প্রভু কহে সন্ধিকার্য্য নাহিক যাহার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য্য পদবী তাহার॥
হেনজন দেখি ফাঁকি বলুক আমার।
তবে জানি ভট্ট মিশ্র পদবী তাহার॥

এরূপ বাক্যবাণে পণ্ডিতেরা একে বারে জর জর হইয়া উঠিলেন। লজ্জিত পণ্ডিতগণের বিশেষ অন্তর্জালা আরম্ভ হইল। তাঁহারা ভগ্নকটি সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন ও বিষ উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন; সহস্র মুখে নিমাইয়ের নিন্দা করিতেছেন। কেহ বলিলেন নিমাইয়ের পাণ্ডিত্য খুব গম্ভীর

নহে, তবে চতুরতা বুদ্ধি খুব প্রখর। অপর মাৎসর্য্যপূর্ণ পণ্ডিত বলিলেন, "বুদ্ধিই বা এমন কি বেশী—তা নয়, তবে উহার নিশ্চয় কোন সিদ্ধি জানা আছে; উহাতেই দেখিতেছি অন্যের বুদ্ধি জড় হইয়া যায়।" তৃতীয় তর্কবাগীশ বলিলেন, "সিদ্ধি অমনি মুখের কথা কিনা; ষোল বছরের ছেলে উহার আবার কি সিদ্ধি হইবে? সে সব কিছু নয়, তবে তোমরা জান না ছোট বেলা থেকে নিমাই 'দেবপুষ্ট' বটে, তাহাকে হারাইতে হইলে দেব শক্তির প্রয়োজন।" তিন চারিজন একেবারে শিখা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, সে সব আমরা কিছুই মানিনা, নিমাইকে বেশ বুঝা গিয়াছে উহার শাস্ত্র বিদ্যা সবই ফাঁকি, ফাঁকি বই তার আর কিছুই পুঁজি নাই; ঐ উপরের চটকুটা কোন রকমে ভেদ করতে পারলে দেখতে পাবে, নিমাই একেবারে গো রাখাল। তখন যুক্তি স্থির হইল একবার উহাকে সপ্তরথীতে ঘেরিতে হইবে, উহার সহিত একজনে লড়িয়া কিছু করা যাইবে না। গঙ্গাতীরে সতর্কিত ভাবে নিমাইকে আক্রমণ করা হইবে যুক্তি স্থির হইল।

নিমাই বিদ্যাসাগর।

পাঠক! অই দেখ তোমাদের নিমাই পণ্ডিত শিষ্য পরিবেষ্টিত হইয়া সুরধুনী-সৈকতে চাঁদের বাজার মিলাইয়া বসিয়া আছেন। সে অপরূপ রূপ-মাধুরী দেখিয়া কবি শ্রীবৃন্দাবন দাস মহা বিপদে ঠেকিয়াছেন; কোন উপমা পাইতেছেন না, ছটফটি ও যাইতেছে না।

> কোটিমুখে সেই শোভা না পারি কহিতে।
> উপমাও তার নাহি দেখি ত্রিজগতে॥

প্রথমে চাঁদ মুখ দেখিয়াই গগণ চন্দ্রের কথা মনে উঠিল; কিন্তু তাহা সকলঙ্ক, আবার হ্রাস বৃদ্ধি আছে। তাঁহার গৌরচন্দ্র যে অকলঙ্ক নিত্য পূর্ণ। তারপরে অপরূপ রূপশ্রী দেখিয়াই কামদেবের কথা মনে হইল। তাহা ও একেবারেই বর্জ্জিত; সে নাম মনে হইলে চিত্তের বিকার জন্মে ভব বন্ধন বর্দ্ধিত হয়; আর গৌর হরিনামে চিত্তের প্রসাদ জন্মে সর্ব্বস্ব ক্ষয় হয়। শেষে গুণের কথা মনে খুব জাগিল, ভাবিলেন সাক্ষাৎ দেবগুরু বৃহস্পতি; কিন্তু তাহাও হইল না। তিনি যে পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট, তিনি দেবের সহায়, দৈত্যের বিপক্ষ আমাদের নিমাই পণ্ডিত যে সবার সহায়, জগতের হিত-কর্ত্তা, জগদ্গুরু। ত্রিভুবন ঘুরিয়া অবশেষে বৃন্দাবন দাস শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া তবে নিবৃত্ত হইলেন; বলিলেন—

> কালিন্দীর তীরে যেন শ্রীনন্দ কুমার।
> গোপ বৃন্দ মধ্যে বসি করেন বিহার॥

কিন্তু অন্য কবি ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিয়াছেন,—

আমার গৌরাঙ্গের তুলনা গৌরাঙ্গে রহিল, অতুলন গৌর কিশোর ॥

প্রচ্ছন্ন প্রভুর রূপে গঙ্গাতীর আলো করিয়া আছেন। কিন্তু নিমায়ের মুখে 'কৃষ্ণ বিষ্ণু' কিছুই নাই ; কেবল পাণ্ডিত্যের গরিমা বাহির হইতেছে,

আমা প্রবোধিতে পারে হেন শক্তি কার।

এ হেন অহঙ্কার বাক্য নবদ্বীপে কেহ কখন বলিতে পারেন নাই ; পারিবে বলিয়াও কেহ ভাবে নাই। এই গর্ব্ব-বাক্য পণ্ডিতদের মর্ম্মে বাণের ন্যায় বিঁধিতেছে। আজ বিদ্যাবাগীশেরা সব দল পাকাইয়া আসিয়াছেন, পথিমধ্যে অনেকেই খুব লম্ফ ঝম্ফ দিতেছিলেন ; এখন শ্রীমূর্ত্তি দেখিতেই সকলের মাথা হেট হইয়া আসিতেছে, আর সকলেই পিছাইতেছেন। কাঁচপোকা দেখিলে তেলাপোকার যেরূপ দুর্গতি হয়, পণ্ডিতদের তাহাই হইল।

হেন কে সাধ্বস জন্মে প্রভুকে দেখিয়া।
সবেই করেন ভকদিকে নম্র হৈয়া ॥

সাহসে ভর করিয়া কোন রকমে তাঁহারা আসে পাশে বসিলেন ; কিন্তু প্রশ্ন করিবেন কি ? তাঁহারা বিভিন্ন শাস্ত্রের অগাধ পাণ্ডিত নিমাইকে ঠকাইবার, জন্য বাছিয়া বাছিয়া, বেদ বেদান্ত, সাংখ্য পাতঞ্জল, কাব্য অলঙ্কার, হইতে যে সমস্ত কূট প্রশ্ন মুখে করিয়া আসিয়াছিলেন, নিমাই তাঁহাদের প্রাত কটাক্ষ করিয়া সেইগুলি লইয়া ভোজবাজি আরম্ভ করিয়াছেন : শাস্ত্র-যুক্তি দিয়া একবার খণ্ডন করিতেছেন, আবার অন্যরকমে স্থাপনা করিতেছেন—

অধ্যাপক প্রতি সব কটাক্ষ করিয়া।
ব্যাখ্যা করে প্রভু গঙ্গাসমীপে বসিয়া ॥
'হয়' ব্যাখ্যা 'নয়' করে, 'নয়' করে 'হয়'।
সকল খণ্ডিয়া শেষে সকল স্থাপয় ॥ ১৮ ভাঃ

দেখিয়া শুনিয়া বিদ্যাবাগীশের একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছেন ; না বুঝিতেই নিরস্ত্র—নির্জ্জিত ! তখন বোকা হইয়া মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছেন। ব্রজের হারুয়া রাখাল বালকের মত

"খেলায় হারিয়া তখন পলাইতে চায়"

একজন বলিলেন, 'কেমন দেখিলেত দেবজুষ্ট কি না ?

কেহ বলে "এত তেজ ব্রাহ্মণের নহে"। ২৮ ভাঃ

অন্য জন বলিতেছেন, "ঠিক বলেছ ভায়া ; বড় ! যে কেহ নয়, সাক্ষাৎ বিষ্ণু

"কেহ বলে এ ব্রাহ্মণ বিষ্ণু অংশ হয়।" চৈ ভাঃ

অংশ ; যাঁহারা 'কেষ্ট বিষ্টু' মানেন না তাঁহারা বলিলেন 'শাস্ত্রে যে বিপ্র রাজা হইবার কথা আছে, নিশ্চয় সেই এই রাজ-চক্রবর্ত্তী পুরুষ।'

কেহ বলে বিপ্ররাজা হইবেক গৌড়ে।
সেই এই, হেন বুঝি, কখনো না নড়ে।

সর্ব্বশাস্ত্রে নিমায়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, তৎসম্বন্ধে আর কোন মতভেদ রহিল না। একবাক্যে পণ্ডিতেরা সকলেই স্বীকার করিলেন নিমাই বিদ্যাসাগর। তাঁহাদের জ্ঞান গরিমা ঘুচিয়া গেল ; মন্ত্রমুগ্ধের মত, সাক্ষাৎ বৃহস্পতি জ্ঞানে, সকলে নিমায়ের চরণে বিলুণ্ঠিত হইলেন।

পরম পণ্ডিত জ্ঞান হইল সবার।
সবেই করেন তখন সম্ভ্রম অপার॥
পণ্ডিত দেখয়ে বৃহস্পতির সমান।
বৃদ্ধ আদি পাদপদ্মে করয়ে প্রণাম॥

পড়ুয়ার ঝাঁকে এ সংবাদ পৌঁছিতেই পরদিনই সমগ্র নবদ্বীপ ছাইয়া পড়িল। নিমাই বিদ্যাসাগরের জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল

"জয় জয় অধ্যাপক শিরোরত্ন বিপ্ররাজ।" চৈ ভাঃ

নিমাই পণ্ডিতের বিদ্যার গরবে নদেবাসী সকলেই আনন্দিত। কেবল ভক্ত-বৃন্দের হরিষে বিষাদ। মহাদাম্ভিক, কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ, পণ্ডিতগুলার গর্ব্ব খর্ব্ব হই-হইয়াছে, ইহাতে আনন্দ, কিন্তু নিমায়ের মুখেও ত' কৃষ্ণ নাম শুনেন নাই, তাহাই পরম বিষাদ। তাই তাঁহারা হর্ষে ও ক্ষোভে বলিলেন—

মনুষ্যের এমত পাণ্ডিত্য দেখি নাঞি।
কৃষ্ণ না ভজেন সবে এই দুঃখ পাই॥
কেহে বল হেনরূপ হেন বিদ্যা যার।
না ভজিলে কৃষ্ণ নাহি কোন উপকার॥

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিলেন, প্রচ্ছন্ন প্রভুর পতিতপাবন লীলার প্রথম অধ্যায় হইয়া গেল।

হেন মতে বিদ্যারসে শ্রীগৌরাঙ্গ নাথ।
বৈসেন সবার করি বিদ্যা-গর্ব্বপাত॥ চৈঃ ভাঃ

নবদ্বীপের বিপদ।

এই সময় নবদ্বীপ পণ্ডিত সমাজে আর এক মহা আতঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হইল। এতদিন নিমায়ের কাছে হারিলেও তবু নবদ্বীপের গৌরব নষ্ট হয় নাই; কিন্তু এইবার বুঝি তাহাও যায়। হাতী ঘোড়া, লোক লস্কর, লইয়া দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মিরী নবদ্বীপে আসিয়া থানা করিলেন। চারিদিকে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র, মহা শক্তিধর, কেহ বলিতেছে মহা তান্ত্রিক সিদ্ধ পুরুষ, মন্ত্রবলে সরস্বতীকে বশীভূত করিয়াছেন। তাঁহার ললাটের ফোঁটা দেখিলেই প্রতিদ্বন্দ্বীর সব বুদ্ধি জড় হইয়া যায়। মৎস্য সমাজে বৃহদাকার মহাশৈল অতর্কিত ভাবে প্রবেশ করিলে, যেমন চারিদিকে হুড়াহুড়ি ছুটাছুটি পড়িয়া যায়, নবদ্বীপের বিদ্বৎ-সমাজে পড়ুয়াদলের মধ্যে একটা ভয়ানক ছুটাছুটি ও বকাবকি পড়িয়া গিয়াছে। পণ্ডিত মণ্ডলীর আহার নিদ্রা শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের অনেকের শিরঃপীড়া প্রবল হইয়াছে, অনেকের শূল বেদনা ঘন ঘন জাগাইতেছে, কাজেই পাঠ শেষ দিয়া তাঁহারা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন। নবদ্বীপের অনাদিকালের অখণ্ড প্রতিপত্তি বুঝি এইবার ভাসিয়া গেল।

পরম সমৃদ্ধ অশ্ব গজযুক্ত হই।
সবা জিনি নবদ্বীপে গেলা দিগ্বিজয়ী॥
প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি পণ্ডিত সভায়।
মহা ধ্বনি উপজিল সর্ব্ব নদীয়ায়॥

এমন দিগ্‌গজ পণ্ডিত কেহ কখন দেখে নাই। নবদ্বীপের মধ্যখানে দিগ্বিজয়ীর তাম্বু পড়িয়াছে, তাহাতে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে,—

"দিগ্বিজয়ী আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী চায়।
নহে জয় পত্র মাগে পণ্ডিত সভায়"॥

জয়-ডঙ্কা অনবরত বাজিতেছে; আর নকিব ঐ বলিয়া অবিরাম ফুকরাইতেছে। পথে ঘাটে বড় আর সে মহা দাম্ভিক পণ্ডিত মূর্ত্তি দেখিবার যো নাই। পণ্ডিতেরা অনেকেই গঙ্গাস্নান ছাড়িয়াছেন; যে কেহ অভ্যাস দোষে বাহির হন, তাঁহারাও অতি প্রত্যূষে—লোক সমাগমের পূর্ব্বেই গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ভিতরে ভিতরে বিদ্যাবাগীশেরা পরামর্শ সভা করিতেছেন, বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাজাইয়া কত যুক্তি আঁটিতেছেন; কিন্তু কেহই সম্মুখীন হইতে স্বীকার

করিতেছেন না। যাঁহার মুখে স্বয়ং সরস্বতী বিরাজিতা, তাঁহার কাছে সাধ করিয়া অপমান হইতে কে যাইবে? পণ্ডিত মহলে মহা চিন্তা হইয়াছে।

সহস্র সহস্র মহা ভট্টাচার্য্য।
সবে চিন্তেন মনে ছাড়ি সর্ব্বকার্য্য॥
নবদ্বীপ দিগ্বিজয়ী যাইবে জিনিয়া।
সংসারেই অপ্রতিষ্ঠা ঘুষিব শুণিয়া॥
যুঝিতে বা কার শক্তি আছে তার সনে।
সরস্বতী বক্তা যার জিহ্বায় আপনে॥
চতুর্দ্দিকে সবেই করেন কোলাহল।
বুঝি বাস্ত এই যত্নে যার বিদ্যাবল॥

গুরুতর বিপদে সমাগত দেখিয়া পণ্ডিত সকলের বুদ্ধি একবারে অগুলাইয়া গিয়াছে। তখন বৃদ্ধ ন্যায়বাগীশ মহাশয় শিখা সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "বৃদ্ধস্য বচনম্ গ্রাহ্যং বিপদকালেহ্যপস্থিতে। ইহাপেক্ষা নবদ্বীপের আর বেশী বিপদ হইতে পারে না। এখন তোমরা এই বৃদ্ধের কথা শুন। আইস সকলে এই সময়ে বালক নিমাই পণ্ডিতের শরণাগত হই; নিমাই পণ্ডিতও বড় কম নহেন, মহা ঐশ্বরিক শক্তি সম্পন্ন। হয়তো তাহা হইতে এ যাত্রা নবদ্বীপের মুখ রক্ষা হইতে পারে, সবে চল তাঁহাকে ধরা যাউক।"

মার্জ্জিত বুদ্ধি তর্কবাগীশ মহাশয় বলিলেন "উত্তম বুদ্ধি হইয়াছে, বাঘে সিংহে লড়াই হউক, যে হারে—সেই উত্তম"। তর্কবাগীশ মহাশয় সদ্য সদ্যই নিমাই পণ্ডিতের নিকট যারপর নাই লাঞ্ছিত হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহার সে অন্তঃর্জ্বালা এখনও যায় নাই। শেষে এই বুদ্ধি স্থির হইল 'নিমাই পণ্ডিত যেরূপ উদ্ধত, তাহাতে তাঁহার কাছে যাইয়া দরবার করিতে হইবে না, সকলে যেমন গা ঢাকা দিয়া আছেন, সেইরূপই থাকুন, দেখিবেন ২।১ দিন মধ্যেই সিংহ শার্দ্দূলে বেশ বাধিয়া যাইবে। বরং তলে তলে দিগ্বিজয়ীর কাছে সংবাদ পাঠান হউক যে নিমাই পণ্ডিতই নবদ্বীপের মাথা, তিনিই নবদ্বীপ-পুরন্দর, তাঁহাকে জয় করিলেই নবদ্বীপ জয় করা হইল। আর নিমায়ের কাণেও শিষ্যকে দিয়া দিগ্বিজয়ীর অহঙ্কারের কথা অলঙ্কারে বলিয়া পাঠান হউক। শেষে এই বুদ্ধিই স্থিরীকৃত হইল। অনেকেই মনে মনে গৌরাঙ্গ শরণ লইলেন। বৃদ্ধ ন্যায়বাগীশ ত' মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিলেন, 'মা চণ্ডি! নিমাই পণ্ডিত হৈতে নবদ্বীপ যেন রক্ষা হয়।'

ঐশ্বর্য্য মদে গর্ব্বিত সুরপতি ইন্দ্র দেবরাজের হস্ত হইতে কিরূপে শ্রীবৃন্দাবন রক্ষা হইবে, সেই চিন্তায় ব্রজবাসীগণ যেমন শ্রীনন্দদুলালের শরণ লইয়াছিলেন, আজ নবদ্বীপ মহিমা রক্ষার চিন্তায় নদে বাসীরা সেইরূপ শচীর দুলালের শরণ লইলেন।

নবদ্বীপের পথে ঘাটে, হাটে, বাজারে অই দিগ্বিজয়ীর কথা ভিন্ন আর কথা নাই। ঘরের কুলবধুরাও ঐ দিগ্বিজয়ীর কথা ও নদের পণ্ডিতের দুর্দ্দশার কথা লইয়া হাঁসাহাসি করিতেছেন।

"শুন ভাই সব এই কহি তত্ত্বকথা।
অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্ব্বথা॥

নদের পণ্ডিতেরা বড় বাড়াইয়াছিলেন, 'ধরা সরা জ্ঞান করিতেছিলেন;' সাধুভক্ত-ভক্তদের লাঞ্ছনা করিতে ছাড়েন নাই। ভগবান এত গর্ব্ব সইবেন কেন, আমাদের নিমাই পণ্ডিতের কাছে ত' প্রতিদিন যাহা হইবার হইতেছে, এইবার একেবারে দর্প চূর্ণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপের নামও ডুবিল। নবদ্বীপের চিরদিনের মহিমা যাইবে, ইহা কিন্তু সকলেরই মনে বাজিল। অনেকেই বলিলেন "দেখি মা মঙ্গলচণ্ডী কি করেন।" নিমাই পণ্ডিতের দিকে সকলেই আশা করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। ক্রমশঃ।

শ্রীবামাচরণ বসু।

কাম]

ভ্রান্তি।

মানবজীবনের বিচিত্র গতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ভ্রমান্ধ মানব কি এক উদ্দাম বাসনায়, বিশ্বের অণু হইতে মহৎ পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের অন্বেষণে ছুটিতেছে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বালুকাকণা হইতে দূর গগন-গাত্র-বিরাজিত নক্ষত্রপুঞ্জও যেন তাহার প্রয়োজনের দ্রব্য। কি এক অতৃপ্তির তাড়নায় মানব যেন অস্থির; সারা বিশ্ব আলোড়ন করিয়াও সে যেন সুখ পায় না। একটির পর একটি করিয়া ভ্রান্তির ঘোরে সমস্ত পার্থিব দ্রব্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিসের অনুসন্ধানে সে যেন ছুটিয়া বেড়াইতে চায়। কে জানে, বিষয়ের পর বিষয়, সুখের উপর সুখ, আনন্দের পর আনন্দ ভোগ করিয়াও কেন মানবের ব্যাকুল-চিত্ত তৃপ্ত হইতে চাহে না? দুঃখময় পদার্থকে জানিয়া শুনিয়াও সে কেন দুঃখকে

আলিঙ্গন করিয়া দুঃখের চক্রে নিষ্পেষিত হয়? সংসার জলধির শ্রবণ বিদারী রোমাঞ্চকারী ভয়াবহ কল্লোল শুনিয়াও সে কেন কুলুকুলুনাদিনী নির্ঝরিণী পার্শ্বে শ্যাম শোভা সম্পন্ন তপোবনে,—শান্তির নিভৃত আলয়ে, শান্তি সাধনায় নিরত থাকিতে চাহে না? চাহিলেও কেন কোন গুপ্ত বাসনা ধীরে ধীরে তাহাকে সংসার সাগরের মোহাবর্ত্তে ফেলিয়া দেয়! জীবন সংগ্রামের নিত্য নব ঘাত-প্রতিঘাতে হৃদয় যখন অস্থির হইয়া পড়ে, সংসার দাবানলের জ্বালাময়ী অগ্নিশিখায় সে যখন নিরন্তর দগ্ধ হইতে থাকে; প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যাথায় যখন শোকার্ত্ত হইয়া সংসার-গণ্ডীর বাহিরে পালাইয়া যায়;—সংসারকে কারাগার মনে করিয়া সে যখন কারামুক্তির আশায় ভক্তি-পরিপ্লুত বাষ্প-গদগদ কণ্ঠে প্রেমময় বিধাতার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে যোগাসনে সমাসীন হয়, তখন কে আবার তাহার যোগবিঘ্ন ঘটাইয়া তাহাকে সংসার-জলধির বাসনা তরঙ্গে ফেলিয়া দেয়? অহরহঃ বিষয় বিষে জর্জ্জরিত হইয়াও, সে কেন আবার বিষয়ের মধ্যে সুখানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়? মানব চাহে কি? এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত সহজ হইলেও, মানবের অপ্রবুদ্ধ কামনা-বাসনা কলুষিত মন ভ্রান্তির নিবিড় কুজ্ঝটিকারাশি ভেদ করিয়া, কামনা-বাসনার অতীত প্রদেশে, তাহার চিরবাঞ্ছিতের সন্ধানে, সেই সত্য-স্বরূপের চিরমঙ্গল রাজ্যের দ্বারদেশে যাইতে সমর্থ নহে। যাইবে কেমনে? ভ্রান্তি-অমানিশার ঘনান্ধকারে কখনও সেই দুর্গম পথে গমন করা যায় না। ভ্রান্ত মানব চায় ভ্রান্তির মধ্য দিয়া সেই অভ্রান্তকে খুঁজিতে। তাই বুঝি তাহার অভ্রান্ত স্বরূপকে ভ্রান্তির আবরণে আচ্ছাদন করিয়া, স্ব স্বরূপ ভুলিয়া, কাহার অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ ধাবিত হয়! সুখের জন্য ব্যাকুল হইয়া সুখ ভ্রমে দুঃখকে আলিঙ্গন করিয়া, ক্রন্দনের উচ্চরোলে বিশ্ব-বিমোহনের মনোমোহন সঙ্গীত শুনিতে পায় না। উপযুক্ত পথ প্রদর্শকের দ্বারা চালিত না হইয়া, স্বেচ্ছাচারিতার প্রবল আকর্ষণে স্বতঃই আকৃষ্ট হয়, এবং সহজ-সুযোগ্য পন্থাকে দুরারোহ করিয়া তুলে। সুপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুপথে গমন করে, এবং নিবিড় বনানীর কণ্টকাকীর্ণ পথে উপস্থিত হইয়া ক্ষতবিক্ষত হয়। বিশ্বপিতার কাছে কি চাহিতে কি চাহিয়া বসে। অদূরদর্শী বালক যেমন যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই পিতার নিকট চায়, আবার পরক্ষণেই তাহা ফেলিয়া দিয়া অন্য দ্রব্যের 'বায়না' ধরিয়া বসে, আমরাও তদ্রূপ খেয়ালী; ভ্রান্ত বুদ্ধির ফলে কি চাহিতে কি চাহিয়া বসিতেছি। অভাবের স্বরূপ উপলব্ধি না করিয়া, ধীর প্রশান্তভাবে না বুঝিয়া, বিচার করিয়া না দেখিয়া, মানবের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের অন্তরালে যে তিমিরাতীত শুদ্ধ জ্ঞানময় মহান্ পুরুষ আছেন, শ্রুতি

যাঁহাকে "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যাঁহাকে জানিলে জীব মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার লাভ করে,—সেই ধ্রুব বস্তুকে হৃদয়ে অনুভব করিতে না চাহিয়া হয়ত চাহিয়া বসিলাম,—

"পত্নীং মনোরময়ং দেহি মনোবৃত্ত্যানুসারিণীম।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশোদেহি দ্বিষো জহি॥" (চণ্ডী)

আমরা ভ্রান্তির ঘোরে যাহা আপাততঃ সুখকর তাহাই চাহি। সংসারে আমাদের প্রকৃত কিসের অভাব, আমরা তাহা জানিনা; বোধহয় জানিবার শক্তিও আমাদের নাই। অবিদ্যার ঘনান্ধকারে আমরা দূর ভবিষ্যতের দিকে তাকাইতে পারি না; কেবল বর্ত্তমান জীবনের সুখ সাচ্ছন্দ্যের প্রতিই লক্ষ্য করিয়া থাকি। আমাদের বর্ত্তমান জীবনের লক্ষ্য কয়েকটী সাধারণ বিষয় লইয়াই আবদ্ধ আছে। আমরা (সাধারণ মানব) এই কয়েকটী বিষয় বেশ যত্নে পালন করিয়া আসিতেছি। জগতের যে সব উচ্চ মহান্ আদর্শ আছে, যাহা লইয়া মানবের মানবত্ব, আমরা সে বিষয়ে আদৌ লক্ষ্য করি না। আমাদের জীবনের লক্ষ্য—অর্থোপার্জ্জন, পুত্রোৎপাদন, সুখ-সাচ্ছন্দ্যে দু'দিন 'হাই তুলিয়া' 'তুড়ি দিয়া' কাটান। তারপর একদিন অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু আসিয়া আমাদের জীবনের যবনিকা পাত করে। এই যেন আমাদের জীবন—এই যেন আমাদের জীবনের কার্য্য খেলা। আমাদের চিন্তা মৃত্যুর পূর্ব্ববস্থা লইয়া; মৃত্যুর পরবস্থা আমাদের চিন্তনীয় নহে। কেননা জীবনের শেষ চিত্র মানবের নয়নে আদৌ সুখকর নহে; তাহা যেন স্বতঃই দুঃখকর, বিষাদময়। তাই সুখৈষী মানব, জীবনে যেখানে দুঃখ, সেখানে বিষাদ, তাহার চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া, জীবনে যেখানে সুখ, যেখানে আনন্দ, সেইখানে চিন্তায় মগ্ন থাকিতে চায়। জীবনে কিসে সুখ, কিসে দুঃখ তাহা বিচার করিবার সামর্থ্য থাকিলেও, ভাল করিয়া না দেখিয়া অনন্ত দুঃখের মধ্যে এক কণিকা সুখের অন্বেষণে ঘুরিয়া যায়। ভ্রমান্ধ মানব সুখের জন্য এমনই লালায়িত, যে আপাততঃ তুচ্ছ সুখের কামনায় সে ব্যস্ত থাকে; সংসারে যে ভূমা সুখ আছে, তাহার সাধনায় মুহূর্ত্তকালও নিরত থাকিতে চাহেনা। কিন্তু বিশ্বেশ্বরের করুণায় এমনই অনন্ত প্রস্রবন, যে যেরূপেই হউক, আমরা একান্ত মনে যখন যাহা চাই, তাহাই তিনি পূরণ করিয়া দেন। তাঁহাদের সেই সদা মুক্তহস্ত প্রার্থিতের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সদাই উত্তোলিত থাকে। সিদ্ধিদাতার সিদ্ধি দানেই কার্য্য। যাহার যে বিষয়ে যেমন সাধনা, তাহার তাহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

তাই বুঝি মহাশক্তির নিকট ঘোর স্বার্থপর দস্যু তস্করের অভীষ্ট সিদ্ধির সাধনাও সিদ্ধিদায়িনী হইয়া থাকে। না হইবে কেন? ঋষিও বলিয়াছেন,—

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" ॥

মানব যখন যে বিষয় লাভের জন্য দৃঢ়ভাবে চিন্তা করিবে তখন তাহাই তাহার করায়ত্ত হইবে; ইহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ। আমাদের চিন্তা সমষ্টি সাধারণতঃ বহির্মুখী; চিত্তের বহির্মুখতা অজ্ঞানতা বা ভ্রান্তির ফল। জ্ঞান চিত্তকে অন্তর্মুখী করিয়া একাগ্রতা আনয়ন করে, এবং সত্য বস্তুর সন্ধান বলিয়া দেয়। আমরা অবিদ্যাগ্রস্ত মানব, তাই আমাদের চিত্তের অস্থিরতা বশতঃ আমাদের কাম্য খুঁজিয়া পাই নাই; শুধুই এক জ্বালাময়ী লালসার তাড়নে তাড়িত হইয়া অনিত্য অসার পদার্থে——একবার ধনে, একবার মানে, একবার বিষয়ের মধ্যে, কখনও বা নীচ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদনের মধ্যে আমাদের সেই কাম্য পদার্থটীকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। ভ্রান্তির ঘোরে জগৎ সংসার আলোড়ন করিয়া বিফল মনোরথ হইতেছি, কিন্তু কোথাও আমাদের আশা মিটিতেছেনা। আমাদের ব্যাকুল প্রাণের আকুল পিপাসা মিটাইবার জন্য যেখানেই পিপাসার অমৃত বারির সন্ধানে ছুটিয়া যাই, সেইখানেই নিরাশা ও নিষ্ফলতা পদে পদে ব্যথিত করে।

ভ্রান্তির নিয়মই এই। যতদিন আমরা ভ্রান্তির বজ্র-দৃঢ় প্রাচীর উলঙ্ঘন করিতে না পারিব, ততদিন আমাদের সফলতা বহু দূরে। ভ্রান্তির অন্ধকারে আমরা জগতের সত্য বস্তু দেখিতে পাই না; সর্ব্বত্রই যেন এক মায়ার আবরণ সত্যের স্বরূপ আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়া বিভিন্ন রূপ দেখাইতেছে। মায়া মরীচিকার এই দুর্ভেদ্য রহস্য জাল ছিন্ন করা সাধারণ মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে। এই যে বিবিধ বিচিত্রময়ী বিরাট বিশাল জগৎ আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি, কে বলিতে পারে যে ইহাই ইহার প্রকৃত স্বরূপ? এই জগৎ সংসার যখন অবিদ্যা সম্ভূত, "আমি" "আমার" জ্ঞান যখন অবিদ্যাভূত, তখন জগতের বস্তু সকলের জ্ঞানও যে মিথ্যা নহে, তাহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? আমরা একদেশদর্শি যুক্তির আশ্রয়ে আজ যাহাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছি, কাল আবার তাহাই বিভিন্ন তার্কিকের যুক্তিতে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। একদল দার্শনিকের মত, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আমাদের মনেরই বিভিন্ন অনুভূতি মাত্র; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার কোন বাস্তব সত্তা নাই। আর একদল বলিতেছেন, "তুমি এই পরিদৃশ্যমান জগতের বুকের

উপর দাঁড়াইয়া, জাগতিক ভাষা বুদ্ধির সাহায্যে এই জগতের সত্ত্বা উড়াইয়া দিতে চাও, ইহা ত' কম সাহসের কথা নহে। 'এই জগতের কোন সত্ত্বা নাই, এরূপ ধারণা বাতুলতা মাত্র। বাস্তবিক এই জগতের বাস্তব সত্ত্বা আছে।" আমরা সর্ব্বত্রই দুইটী বিভিন্ন দলের অস্তিত্ব দেখিতে পাই; প্রত্যেক দলের মত পরস্পর বিবদমান। কিন্তু যেখানে দ্বৈত, যেখানে ভেদ, যেখানে বিবাদ, সেইখানেই ভ্রান্তি বর্ত্তমান। মানবের ইন্দ্রিয়াদি সহযোগে জাত জ্ঞানই ভ্রম-প্রমাদ সঙ্কুল হইবার কথা। ভ্রম কি? কোনও বস্তুর অসম্যক্ দর্শন, বা এক-বস্তুকে অন্যরূপ দর্শনই, ভ্রম। কিন্তু দুঃখের বিষয় মানবের মধ্যে এই দোষ নিত্য বর্ত্তমান। সুতরাং অবিদ্যাগ্রস্ত মানব জগতের নির্ণীত তত্ত্ব যে অসম্পূর্ণ ও ভ্রমপ্রমাদ সঙ্কুল হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? সাধারণ স্বল্প শক্তিসম্পন্ন অল্পজ্ঞ মানবের বহু উচ্চে যে সকল জ্ঞান বিজ্ঞানবিৎ মহাপুরুষ আছেন, তাঁহাদের বিচার বুদ্ধি ও অনুভূতি বিভিন্নমুখী। তাঁহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় সর্ব্বত্র এক হইলেও, একজন আর একজনের ভ্রম নিরসনে ব্যস্ত। ইহার কারণ কি? দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন ঋষিদিগের মত বিরোধের কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া মাদৃশ সামান্য ব্যক্তির ক্ষমতাতীত। যাঁহাদের জ্ঞান বুদ্ধি ও অনুভূতি অভ্রান্ত, সেই ঈশ্বরকল্প ঋষিদিগের মত ও পথ ভিন্ন কেন, এই প্রশ্ন অনেক সময়ে অনেক ব্যক্তির মনে সংশয়ের সঞ্চার করিয়া আসিতেছে। আজ পর্য্যন্ত বোধ হয় এই মত-বিরোধের কারণ নির্দ্দেশ হয় নাই; হইবে কি না জানি না।

আমরা সাধারণ জ্ঞানে দেখিতে পাই, একই বস্তুর বিভিন্ন মূর্ত্তি দর্শন অবিদ্যা বা ভ্রান্তির প্রভাব ছাড়া আর কি হইতে পারে? যাহা সত্য, তাহা নিত্য সত্য; সত্য কখন একবার সত্য ও একবার মিথ্যা হইতে পারে না। যদি কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন দ্রষ্টা কর্ত্তৃক একই বস্তু বিভিন্ন মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বস্তুর অযাথার্থ্য প্রতিপন্ন না হইয়া দ্রষ্টার ভ্রান্তির কারণ নির্দ্দেশই সমীচীন। কোথায় সে অবিদ্যা বা ভ্রান্তির শেষ তাহা কে জানে? মানব জ্ঞান বলে ভ্রান্তির আবরণ ভেদ করিয়া জগতের অনেক তত্ত্ব অবগত হইতে পারে, কিন্তু তত্রাচ শতশত তত্ত্ব মানব জ্ঞানের অতীত রহিয়া যাইবে। কবিবর নবীনচন্দ্র এই কথা ভগবান বুদ্ধদেবের শ্রীমুখ দিয়া বলিয়াছেন;—

প্রচ্ছন্ন যে মহাতত্ত্ব মানব নয়ন
দেখিবে না। আবরণ পর আবরণ

মানবের জ্ঞানবলে হবে উত্তোলিত ;
রবে তবু আবরণ পর আবরণ।

তাই বলিতেছিলাম এই মায়াময় জগৎ প্রপঞ্চের অবিদ্যা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে এবং স্ব-স্বরূপ দেখিয়া মুক্ত হয়। কিন্তু এই অবিদ্যার নাশ করা বড় সহজ নহে। অগণিত পুস্তকরাশি পাঠ করিলে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা হইতে অবিদ্যার নাশ হয় না। কোটী কোটী জন্মের সাধনবলে ভাগ্যোদয় হইলে, সদ্‌গুরু কৃপায় অবিদ্যাপাশ ছিন্ন করিবার পন্থা মিলিয়া থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে জ্ঞানোদয় হইলে মুক্তিলাভ হয়। জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়। "জ্ঞানাৎমুক্তি" (সাংখ্যসূত্র)।

মোক্ষলাভ করিতে হইলে ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য সদ্‌গুরুর কৃপাকণা লাভ করিতে রীতিমত সাধনার প্রয়োজন। গুরুই একমাত্র তিমিরান্ধকে জ্ঞানাঞ্জন-রূপ শলাকা দ্বারা চক্ষু উন্মীলিত করিযা দিতে পারেন ;—অন্যে নহে। সাধন মার্গে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলে, যখন প্রকৃত দীক্ষার কাল আইসে, সেই সময়ে গুরুদেব আপনা হইতেই দর্শন দিয়া থাকেন। মোক্ষেচ্ছু ব্যক্তি অবশ্য সাধনার দ্বারা আপনাকে দীক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত করিবেন। সাধনার নানা স্তর আছে। বিষয়লোলুপ মানবকে প্রথমতঃ বিষয়ের চিন্তা হইতে দূরে থাকা প্রয়োজন ; তজ্জন্য তাঁহার অধ্যাত্মশাস্ত্র পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। "তপস্যা, অধ্যাত্ম শাস্ত্র পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। "তপস্যা, অধ্যাত্ম শাস্ত্র পাঠ এবং ঈশ্বরে সমুদায় কর্ম্মফল সমর্পণ করাকে ক্রিয়াযোগ কহে।"—তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ—(পাতঞ্জল যোগসূত্র)। অধ্যাত্ম শাস্ত্র পাঠ সাধনার প্রথম অবস্থা বটে ; কিন্তু ইহা প্রকৃত সাধনা নহে। তবে এই অধ্যাত্ম শাস্ত্র পাঠের ফলে মনকে আকর্ষণ করিয়া সাধনার পথেই লইয়া যায়। আজকালকার দিনে অনেকেই দুই চার খানি অধ্যাত্ম শাস্ত্র পাঠ করিয়া সাধক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, এবং সাধক বলিয়া পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। সাধন সৌধের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে হইলে যম, নিয়ম· আসন' ধ্যান, ধারণা, প্রত্যাহার প্রভৃতি যে সকল যোগাঙ্গ পালনের নিয়ম আছে, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আর এই সকল যোগাঙ্গ পালন করিতে করিতে জ্ঞান প্রদীপ্ত হইয়া উঠে ; এই সকল জ্ঞানলাভের সোপান পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র অধ্যাত্ম শাস্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ণজ্ঞান লাভের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। সত্য বটে শাস্ত্র অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ ; কিন্তু সে সব শাস্ত্রের

গূঢ় মর্ম্ম যোগী-সন্ন্যাসী ব্যতীত কেহই অবগত হইতে সমর্থ নহেন। তবে ইহাও অতীত প্রদেশে না যাইলে—অবিদ্যা পাশ ছিন্ন না করিলে, জ্ঞানের অত্যুজ্জ্বল আলোক দৃষ্ট হয় না—ভ্রান্তির আচরণ উত্তোলিত হয় না, বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়েই বিসংবাদী। বিদ্যা দ্বারা মায়াভ্রান্তি দূর করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে হয়; আর অবিদ্যা জ্ঞানের পথ রুদ্ধ করিয়া ভ্রান্তি মোহের পথে লইয়া যায় বিদ্যা তাহাই, যাহা অবিদ্যাকে দূর করিয়া সেই শুদ্ধ জ্ঞানময় অক্ষর পুরুষকে ধরাইয়া—চিনাইয়া দেয়। অবিদ্যা কাহাকে বলে? যোগদর্শনের পিতাস্বরূপ ভগবান পতঞ্জলি বলেন;—

"অনিত্যাশুচি দুঃখ নাত মাসু নিত্যশুচি সুখাতম খ্যাতির বিস্থা॥" ৫॥

"অনিত্য, অপবিত্র, দুঃখকর ও আত্মা ভিন্ন পদার্থে যে নিত্য শুচি, সুখকর ও আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়, তাহাকে অবিদ্যা বলে।" এই অবিদ্যা প্রভাবে জীব জগতের নিত্য বস্তু দেখিতে পায় না। শুক্তিতে রজত ভ্রমের ন্যায়, সর্পে রজ্জু-ভ্রমের ন্যায়, এক বস্তুতে অন্যরূপ দেখিয়া থাকে। অবিদ্যা বা ভ্রান্তির বন্ধন হইতে উদ্ধার লাভ করাই আমাদের জীবনের প্রধান কার্য্য। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য সে নিত্যশাস্ত্র পাঠে বিপুল শ্রেয়ঃ লাভ হইয়া থাকে, এবং বিশ্বাসী ভক্ত পাঠকের মনে নিত্য নূতন ভাবের সঞ্চার করিয়া দেয়। আধ্যাত্ম শাস্ত্রে মন্ত্র-বিন্যাসের এবং মন্ত্রের এমন অদ্ভুত শক্তি আছে যে, তদ্দ্বারা শাস্ত্রের সম্যক অর্থাব-গতি না হইলেও, কেবল নিত্য পাঠের ফলে অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে কালে শান্তির পথে লইয়া যায়। কিন্তু কোন ও উন্নতিশীল সাধক, কেবল মাত্র শাস্ত্র পাঠ অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারেন না। শাস্ত্রে, অতিরিক্ত শাস্ত্র-পাঠকেও সাধন মার্গের বিঘ্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শুধু শাস্ত্রপাঠে জ্ঞানের দ্বার সম্যক্ উদ্ঘাটিত হয় না, তৎসহ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়। "শাস্ত্রাণ্যধিত্যাপি ভবন্তি মূর্খা."—শাস্ত্রপাঠ করিলেও মূর্খ জ্ঞানী হয় না। "যস্তু ক্রিয়াবান পুরুষঃ স বিদ্বান"—যিনি ক্রিয়াবান তিনিই পণ্ডিত।

অবিদ্যা দূর করিয়া মোক্ষ লাভ করিতে হইলে কেবল মাত্র জ্ঞানের সাধনই যথেষ্ট নহে; কেবল মাত্র জ্ঞানালোচনায় মোক্ষ লাভ হয় না। কর্ম্মের ভিতর দিয়া জ্ঞান লাভ করিতে হয়। কিন্তু কেবলমাত্র কর্ম্মও অনুষ্ঠেয় নহে; কেননা নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্ম, জ্ঞান পথের বিরোধী। অতএব মোক্ষেচ্ছু সাধক, জ্ঞান ও কর্ম্মকেও একত্রে অনুষ্ঠেয় জানিয়া উভয়ের অনুষ্ঠান করিবেন। এ সম্বন্ধে ঈশোপানিষৎ বলিয়াছেন;——

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥"

(জ্ঞান ও কর্ম্ম ক্রমান্বয়ে অনুষ্ঠেয় জানিয়াও) যাহারা (কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক কেবল জ্ঞানদ্বারা) মোক্ষের নিমিত্ত যত্ন করে, তাহারা (চিত্ত শুদ্ধির অভাবে) গাঢ় তামস লোকে গমন করে। আবার যাহারা (জ্ঞান ত্যাগ পূর্ব্বক কেবল কর্ম্ম দ্বারা) ভোগের নিমিত্ত যত্ন করে, তাহারা (তত্ত্ব জ্ঞানের অভাবে) তদপেক্ষা গাঢ় তামস লোকে গমন করে। (৺শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচস্পতি মহাশয়ের অনুবাদ)। কর্ম্মদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং জ্ঞানের দ্বারা তত্ত্ব জ্ঞানের উন্মেষ হয়। চিত্ত শুদ্ধি না হইলে কখন সত্যলাভ হয় না। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্ব প্রযত্নে চিত্ত শুদ্ধির প্রয়োজন। চিত্ত শুদ্ধির কি?—বাসনার ক্ষয়। কামনা যুক্ত মন অশুদ্ধ, এবং কাম-মুক্ত মন শুদ্ধ। 'অশুদ্ধং কামঃ সঙ্কল্পং শুদ্ধং কাম বিবর্জ্জিতম্।" অতএব বাসনার ক্ষয়ই চিত্তশুদ্ধির উপায়। যতদিন ষড় রিপুর আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করা না যাইবে, ততদিন চিত্ত শুদ্ধ হইবে না, সংসার বন্ধনও মোচন হইবে না। কামিনী-বাসনা পরায়ণ ব্যক্তির হৃদয়ে কখন সত্যের স্নিগ্ধালোক জ্বলিতে পায় না। ঐ শুনুন সন্ন্যাসী গাহিতেছেন,—

পশিতে পারেনা কভু তথা সত্য,
কাম লোভ বশে যেই হৃদি মত্ত ;
কামিনীতে করে স্ত্রীবুদ্ধি যে জন,
হয় না তাহার বন্ধন মোচন ;
কিম্বা কিছু দ্রব্যে যার অধিকার
হউক সামান্য—বন্ধন অপার
ক্রোধের শৃঙ্খল কিম্বা পায়ে যার,
হইতে না পারে কভু মায়া পার।"

মায়াই অবিদ্যা বা ভ্রান্তি। এই মায়া মরীচিকাই আমাদিগকে অহরহঃ প্রলুব্ধ করিতেছে। মায়াই আমাদিগের বন্ধনের কারণ। অতএব আমাদিগকে ধীরে ধীরে সংসারের সকল প্রকার বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে। সংসার আসক্তি বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে। সংসার আসক্তি বাসনা হইতেই জন্ম গ্রহণ করে। আবার বাসনার উৎপত্তি রিপুর উত্তেজনা হইতে; সুতরাং মায়া পার হইতে হইলে, ভ্রান্তি দূর করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রকারে রিপুগণকে দমন করা প্রয়োজন।

সংসারে যত কঠিন কর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে রিপুনিচয়কে দমন করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। দুর্দ্দমনীয় রিপুগণকে দমন করিবার একমাত্র উপায় প্রত্যাহার। প্রত্যাহার কাহাকে বলে? ভগবান পতঞ্জলি বলেন—"স্ব স্ব বিষয়াসমপ্রয়োগে চিত্তস্ব-স্বরূপানুকার ইতিন্দ্রিয়ানাং প্রত্যাহার" অর্থাৎ যখন ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের নিজ নিজ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া চিত্তের স্বরূপ গ্রহণ করে, তখন তাহাকে প্রত্যাহার বলে। প্রত্যাহার হইতেই ইন্দ্রিয়গণ সম্পূর্ণরূপে জিত হইয়া থাকে। "ততঃ পরমবশ্যতেন্দ্রিয়ানাম্"—(যোগসূত্র ৫৫) ইন্দ্রিয়গণ জিত হইলেই আমাদের মনোজয় হইল। মনোজয় হইলে এ জগতে আমাদের আর অসাধ্য রহিল কি? আমাদের শোক, দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, মায়ামোহ—সকলই মনের মন লইয়াই আমাদের শোক, দুঃখ, হর্ষ বিষাদ: মনই আমাদের বন্ধন ও মোক্ষ কারণ। যথা:—

"মন এবং মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তৈ নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম॥" (ব্রহ্মবিন্দুপনিষৎ)

"মনই মানবের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ। বিষয়াসক্ত মন বন্ধনের এবং বিষয়ে অনাসক্ত মন মোক্ষের কারণ।

একমাত্র অনাসক্তিই যখন মানবের মোক্ষের কারণ, তখন এই নশ্বর সংসারে ক্ষণভঙ্গুর মানব জীবনে এত আসক্তি কেন? অনেকেই জানেন, ত্যাগেই প্রকৃত সুখ, আসক্তিতে দুঃখ। তবে কেন ত্যাগ না আসিয়া আসক্তি মানবকে বন্ধন করে? সকলেই বাল্যকাল হইতে উপদেশ পাইয়া আসিতেছেন, "চুরি করিও না, মিথ্যা বলিও না, সদা সত্য কথা বলিবে, কখন ও কাহাকে কুবাক্য বলিওনা, কুবাক্য বলা বড় দোষ" ইত্যাদি কিন্তু কয়টী লোক লোক এই উপদেশ পালন করিয়া আসিতেছে? সকলেই অল্পবিস্তার ধর্ম্ম জানেন, কিন্তু কদাপি কাহারও তাহাতে মতি হয়। সকলেই জানেন অধর্ম্মে কখন মঙ্গল হয় না; উহাতে নাশ অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু কয়টী লোক ঐ পথ হইতে নিবৃত্ত হয়? মানব সব জানে, বুঝে, অথচ সে কুপথ ছাড়িয়া সুপথে যাইতে পারে না। উপদেশের অভাবে সংসারের খুব কম লোকেরই অধঃপতন হইয়া থাকে। এমন কি যিনি উপদেষ্টা, যাঁহার নীতিপূর্ণ উপদেশ সংসারের অনেক উপকার করিয়াছে, সেই সকল নীতি হয়ত তাঁহার চরিত্রের একা কোনও উন্নতি করিতে পারে নাই। আমরা সব জানি, অথচ কিছুই জানি না; সব বুঝি অথচ কিছুই বুঝি না। উপদেশ দিলে বেশ বুঝিতে পারি, পালন করিবার সময় কিছুই পালন করিতে পারি না। ইহা কি? ইহা আর কি? ইহা সেই ভ্রান্তি—মহামায়ার মায়া। যেমন বিকারগ্রস্ত

রোগীর অন্তরে জ্ঞান থাকে, বাহিরে কিছু বলিতে গেলেই নানা গোলমাল করিয়া ফেলে,—পিতাকে ভ্রাতা বলিয়া আত্মীয় স্বজনের ভীতি উৎপাদন করে, আমরাও তদ্রূপ সসার কিছু কিছু তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেও এক পথ ধরিতে যাইয়া আর এক পথ ধরিয়া বসি;—ভাল করিতে যাইয়া মন্দ করিয়া ফেলি। মায়ার ঘোর কাটাইব মনে করিলেও কাটাইতে পারি না। এই মায়া যেন আমাদিগকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। মায়ামুক্তির শতসহস্র পথ থাকিলেও, সেই মহামায়ার করুণা বিনা এই মায়া বা ভ্রান্তি হইতে উদ্ধার পাইব না। তাঁহাকে জানিতে না পারিলে তাঁহার মায়া হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে না। ভগবান গীতাতে বলিয়াছেন;—

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে" ॥

"অলৌকিক গুণময়ী নিতান্ত দুস্তরা আমার যে মায়া, সে সকল ব্যক্তি আমাকে আশ্রয় করে, তাহারা এই মায়া অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়া থাকে।' সুতরাং আমাদিগকে মায়ামুক্তি হইবার জন্য সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকেই আশ্রয় না করিলে, তাঁহার করুণা না হইলে আমরা কোন মতে এই ভ্রান্তির বন্ধন হইতে উদ্ধার পাইব না। তাঁহাকে আশ্রয় করিতে হইবে—জানিতে হইবে, নচেৎ আমাদের ভ্রান্তি দূর হইবে না। কিন্তু আমরা বাসনাপর, ইন্দ্রিয়সুখে পরিতৃপ্ত, আমরা সেই সত্যকে নীহারাবৃত করিয়া রাখিয়াছি, আমরা তাঁহাকে জানিব কি প্রকারে? তাঁহাকে জানিবার অনেক প্রকৃষ্ট উপায় আছে—থাকুক! আমরা একমাত্র তাঁহার প্রসাদেই তাঁহাকে জানিয়া ভ্রান্তির আচরণ হইতে উদ্ধার পাইতেও পারি, অন্য প্রকারে নহে। তিনি প্রকাশই হউন বা অপ্রকাশই তাঁহার প্রসাদ ভিন্ন অপর কোনরূপে তাঁহাকে জানা যায় না।

কথংনু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি ন ভাতি বা।　　(কঠ ২।২।১৪)।

আমি কি করিতে কি করিতেছি, জানি না। ভ্রান্তির আঁধারে স্বখাদ-সলিলে ডুবিয়া মরিতেছি। আমরা নিতান্ত দুর্ব্বল, মোহ-তিমিরে আচ্ছন্ন, চিন্তায় লক্ষ্যহীন। তাই দেব, বড় কৃপাপ্রার্থী, তুমি না উদ্ধারিলে, ভ্রান্তি আঁধার না ঘুচাইলে কে ঘুচাইবে? কবির কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়,—

"চিন্তা-স্রোতে ভেসে ভেসে হইয়াছি লক্ষ্যহীন,
কি করিতে পারি আর, আমি যে দীনের দীন,

হৃদয়-মন্দির মম হইয়াছে অন্ধকার,
জ্যোতির্ম্ময় বিনা বল ঘুচাইবে কে আঁধার"।

শ্রীহৃদয়নাথ মিত্র।

হরিদ্বার।

পঞ্চতীর্থ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

৫। কনখল।—তীর্থোৎপত্তি প্রসঙ্গে কনখলের কথা লিখিয়াছি। এখানেই দক্ষেশ্বর মহাদেব ও সতীকুণ্ড বিরাজমান। পাণ্ডারা বলেন কনখলেই দক্ষ-যজ্ঞ হইয়াছিল। আমরা পৌরাণিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, "যজ্ঞক্ষেত্র দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত" ছিল। কনখল তাহার মধ্যে কেন্দ্রস্থল, এখানেই "সতীর দেহত্যাগ" স্থান—সতীকুণ্ড বিরাজমান। সুতরাং কনখল যে হিন্দুর চক্ষে পবিত্রতম তীর্থ তাহাতে সন্দেহ কি? ইহার প্রত্যেক ধূলি কণা, হিন্দুর চক্ষে মণিমাণিক্য অপেক্ষা মূল্যবান; কারণ তাহা সতীদেহের সংস্রবে পবিত্রীকৃত। স্বভাব সৌন্দর্য্যেও কনখল মনোরম। সহরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ইহা মায়ানিবৃত্তির স্থান। তাই নিবৃত্তিপরায়ণ বহু সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রম এইস্থলে বিরাজমান। গঙ্গার ধারে ধারে বৃক্ষলতা সমাচ্ছন্ন সারি সারি উদ্যানবাটিকা। ইহার মধ্যে অধিকাংশই উদাসী সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রম, আখড়া এবং মঠ। মঠ-গুলিতে সংস্কৃত পাঠশালা ও সদাবর্ত্ত আছে। অনেক আশ্রমেই প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক এবং ভজনসাধন পরায়ণ সাধু সন্ন্যাসী এখনও বিদ্যমান আছেন। হরিদ্বার ও কনখল সংস্কৃত বিদ্যা চর্চ্চার একটী প্রধান কেন্দ্রস্থল; তাহার মধ্যে অধিকাংশ মঠ ও বিদ্যালয়ই কনখলে প্রতিষ্ঠিত। এখানে অনেকগুলি অন্নসত্রও আছে। কনখলের গঙ্গাতীরে, সাধু মহাত্মা এবং রাজা মহারাজাগণের প্রতিষ্ঠিত অনেক উচ্চ চূড়া সমন্বিত সুন্দর সুন্দর দেবমন্দির আছে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শাস্ত্রবচনে আমরা দেখিয়াছি যে,—"যাঁহার চিত্ত দুষ্ট, তিনি তীর্থস্নান দ্বারা শুদ্ধ হয়েন না" কিন্তু কনখলের এমনই মহিমা যে খল ব্যক্তিও এস্থানে স্নান করিলে পরমগতি প্রাপ্ত হয়েন। তা'ই ইহার নাম 'কনখল'।—

খলঃ কো নাম মুক্তিং বৈ ভজতে তত্র মজ্জনাৎ।

অতঃ কনখলং তীর্থং নাম্না চক্রু মুনীশ্বরাঃ॥　　　কেদার খণ্ড।

এমন খল কে আছেন যিনি এই কনখল তীর্থে স্নান করিলে মুক্তিলাভ করেন না। এইজন্য ঋষিবর ইহার নাম কনখল রাখিয়াছেন। কালীদাসের মেঘদূত মহাভারত এবং প্রায় সকল পুরাণেই কনখলের মহিমার উল্লেখ আছে। শাস্ত্রে যে কোন ঋষি বা মহাত্মার তীর্থ ভ্রমণকাহিনী বিবৃত আছে, তাহাতেই কনখল ভ্রমণের প্রসঙ্গ আছে। কনখলে গঙ্গাস্নান মহা-পুণ্যজনক।

"কুরুক্ষেত্র সমাগঙ্গা যত্র তত্রাবগাহিতা।
বিশেষে বৈ কনখলে প্রয়াগে পরমং মহাৎ॥

মহাভারত বনপর্ব্ব—৮৬ অধ্যায়।

*　　*　　*　　*　　*

ততঃ কনখলে স্নাত্বা ত্রিরাত্রোপষিতো নরঃ।
অশ্বমেধমেবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি॥

মহাভারত বনপর্ব্ব—৮৪ অধ্যায়।

কনখলে গমনপূর্ব্বক ত্রিরা উপবাস ও স্নান করিলে মনুষ্য অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়।—

তীর্থং কনখলং পুণ্যং মহাপাতকনাশনং।
যত্র দেবেন রুদ্রেণ যজ্ঞো দক্ষস্য নাশিতঃ॥
তত্র গঙ্গামুপস্পৃশ্য শুচির্ভাব সমন্বিতঃ।
মুচ্যতে সর্ব্ব পাপৈস্তু ব্রহ্মলোকে বসেন্নরঃ॥

কূর্ম্মপুরাণ—৩৬ অধ্যায়।

কনখল মহাপাতক নাশক ও পুণ্যবর্দ্ধক তীর্থ। এইস্থানে দেবাদিদেব রুদ্র দক্ষের যজ্ঞ নষ্ট করিয়াছিলেন। ঐ তীর্থে শুচী ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিলে মানব সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং ব্রহ্মলোকে বাস করে।

বামনপুরাণে প্রহ্লাদের তীর্থভ্রমণ কাহিনীতে কনখল তীর্থের উল্লেখ আছে।—

"তং দৃষ্ট্বার্চ্চ্য হরিং চাসৌ তীর্থং কনখলং যযৌ।
তত্রার্চ্চ্য ভদ্রকালীশং বীরভদ্রং চ দানবঃ॥

হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ড হইতে কনখল প্রায় ৩ মাইল দক্ষিণে। ১২ই জ্যৈষ্ঠ

প্রাতঃকালে ঘোড়াগাড়ী (Tonga) আরোহণে আমরা কনখল রওয়ানা হইলাম। ভাড়া জন প্রতি /০ এক আনা হিসাবে লাগিল। আসিবার সময়ও ঐরূপ। পাকা রাস্তাটি অতি সুন্দর চারিদিকের দৃশ্য বৈচিত্র্য ও মনোরম; বিশেষতঃ ক্যানেলের উপবিস্থিত সেতু পার হইবার সময় হরিদ্বারের দৃশ্যটী বড় মনোরম বোধ হইল। মনে হইল যদি ফটোক্যামেরা' থাকিত তবে একটী ছবি তুলিয়া রাখিতাম।

কনখলের রাজঘাটেই স্নন-তর্পণাদি করিতে হয়। এই ঘাটেই গঙ্গার সহিত নীলধারার সঙ্গম হওয়ায় ইহা প্রয়াগতীর্থে পরিণত হইয়াছে। ঘাটটী সুন্দররূপে বাঁধান, উপরেই সুন্দর মন্দিরাবলী। সম্মুখেই নীলপর্ব্বতের মনোরম দৃশ্য। সম্মিলিত গঙ্গার স্রোত অতিশয় প্রবল। লৌহশৃঙ্খল ধারণে আমরা অতি সাবধানে স্নান-তর্পণাদি করিলাম। তীর্থগুরু সংকল্প মন্ত্রের সহিত গঙ্গামাহাত্ম্য সূচক নিম্নলিখিত পৌরাণিক বচনটি আবৃত্তি করিলেন।—

"দৃষ্টাজন্ম শতং পাপং পীত্বা জন্মশতদ্বয়ং।
স্নাত্বা জন্মসহস্রেকং হরতি গঙ্গা কলৌযুগে॥"

কনখলে বানরের বড় উৎপাত। সুতরাং স্নানকালে বস্ত্রাদি সাবধানে রাখা আবশ্যক। অতঃপর ঘাটের উপরেই (১) শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির (২) ৺শিব মন্দির (৩) ৺সত্যনারায়ণ মন্দিরে চরণপাদুকা (৪) শ্রীরামজানকীর মন্দির (৫) গঙ্গাতীরে সতীঘাটে শিবলিঙ্গ ও (৬) বেদব্যাসের মন্দিরে নানারূপ সুন্দর সুন্দর দেবমূর্ত্তি আমরা দর্শন করিয়া পরম আনন্দলাভ করিলাম। রাজঘাটের উপরই যে রাধাকৃষ্ণের মন্দিরটী আছে তাহার কারুকার্য্য অতি চমৎকার। ভিত্তিগাত্রে অতি চমৎকার ভাবে কালীয়-দমন, গজেন্দ্রউদ্ধার, বৃন্দাবন বিহার প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের লীলা সমুহ চিত্রিত। ইহার সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইলাম। মনে হইল সর্ব্বসৌন্দর্য্যের যিনি আধার, যাঁহা হইতে সকল সৌন্দর্য্যের উদ্ভব, যিনি চির-মধুর ও চির-সুন্দর তাঁহার মন্দির এইরূপই সুন্দর হওয়া আবশ্যক। এই মন্দির কোন দানশীলা রাণীর প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি এবং শ্বেত-প্রস্তর নির্ম্মিতা শ্রীরাধার মূর্ত্তিটী এত মনোরম ও ভক্তি উদ্দীপক যে আমাদের প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। অতঃপর কিঞ্চিৎ দূরে কনখলের বাজারের দক্ষিণাংশে দক্ষেশ্বর মহাদেবের দর্শন করিলাম। দক্ষেশ্বরের পুরাতন মন্দিরটী ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় বর্ত্তমান মন্দিরটী ১৭৭০ শকাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই স্থানটী বৃহৎ বৃক্ষ-ছায়া-সমন্বিত অতি সুন্দর সাধন ভজনের উপযোগী নীরব নির্জ্জন

তপোবনের ন্যায়। নিকটেই বীরভদ্র এবং ভদ্রকালীর মূর্ত্তি। মহাবীর হনুমানের প্রকাণ্ড প্রস্তর মূর্ত্তি দ্রষ্টব্য। মহাবীরের পদতলে কালনেমী। মহাবীর সিন্দূরে, এবং কালনেমী কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত। মূর্ত্তিটী ৫।৬ হাত উচ্চ হইবে। দক্ষেশ্বর মন্দিরের পশ্চাতে একটী ক্ষুদ্র কুণ্ড আছে, ইহাই পাণ্ডারা যজ্ঞ-কুণ্ড বা সতীর দেহত্যাগ স্থান বলিয়া দেখান। ইহাতে কিঞ্চিৎ বিভূতি রক্ষিত আছে, * তাহাই যাত্রীগণকে দিয়া দক্ষিণা আদায় করেন। যাত্রীরা এই ভস্ম সতীদেহাবশেষ জ্ঞানে সযত্নে গৃহে লইয়া আসেন। এইটী কিন্তু প্রকৃত সতীকুণ্ড নহে; সতীকুণ্ড এখান হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে একটী বনমধ্যে আছে। আমরা যখন দক্ষেশ্বর মহাদেব দর্শনে যাইতেছিলাম, সেই সময় এক গৈরিক-পরিহিতা বঙ্গদেশীয়া সন্ন্যাসিনীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাদিগকে স্বতঃপ্রবৃত্তা হইয়া বলেন,—"বাবা! এই মন্দিরের পশ্চাতে পাণ্ডারা যে সতীকুণ্ড দেখাইবেন, তাহা প্রকৃত সতীকুণ্ড নহে। প্রকৃত সতীকুণ্ড এখান হইতে এক মাইল দূরে। যখন এই মহাতীর্থে আসিয়াছ, তখন তাহা দেখিতে ভুলিও না। কারণ শাস্ত্রে আছে, সতীকুণ্ড দর্শনে সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত হয়। বিশেষতঃ মায়েরা সতীকুণ্ড দর্শন ও জলস্পর্শ করিলে, আদর্শ সতীর ন্যায় পতিব্রতা হইবেন।" সতীকুণ্ড যাইবার পথে আমরা 'পান-চক্কির' অর্থাৎ জলের স্রোতের বেগে জাঁতা ঘুরাইয়া গম্ পেষার কারখানা দেখিলাম। হিমালয়ে স্মরণাতীত কাল হইতে জলের স্রোতের সাহায্যে গম ভাঙ্গা, কাঠ মসৃণ করা ও খোদাইর কার্য্য হইয়া থাকে। তাহার নমুনা এখানে পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন; একটী ঘরে সারি সারি জাঁতা বসান আছে। এই ঘরটির নিম্নদেশ ফাঁপা; ঘরের নিম্নদেশ দিয়া ক্যানেলের জল দুই তিন হাত উচ্চ হইতে পড়িয়া সবেগে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। জাঁতাগুলির মধ্যদেশ দিয়া একটী লৌহ দণ্ড ২।৩ হাত নিম্নে জল স্রোতের মধ্যে স্থাপিত। উক্ত লৌহদণ্ডে কতকগুলি পাখা বক্রভাবে লাগান আছে। জলের বেগ পাখাগুলিতে লাগায় দণ্ডটী অনবরত ঘূরিতেছে। এই দণ্ডের ঘূর্ণনে জাঁতার উপরিস্থ প্রস্তর খণ্ড আঁটা থাকায় জাঁতা পেষা হইতেছে। এইরূপ জলের স্রোতের বেগে নানারূপ কার্য্যের একটী বৃহৎ কারখানা রুড়্কীতে আছে। তথায় মেসিন্ সকল ক্যানেলের প্রবাহে পরিচালিত হইয়া নানারূপ কার্য্য করে। আম্রকানন ও বন জঙ্গল অতিক্রম করিয়া আমরা সতীকুণ্ডে পৌছিলাম। ইহা

---

* ভাদ্র আশ্বিন সংখ্যক "পন্থায়" দক্ষেশ্বর মন্দিরের চিত্র দ্রষ্টব্য।

একটী প্রকাণ্ড কুণ্ড, এখনও জল কতকটা আছে। এই সতীকুণ্ড নির্জ্জন বনমধ্যে অবস্থিত। সতীকুণ্ডের তীরে একটী বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে ২ আমাদের সেই পুরাকালের কাহিনী মনে পড়িল ;—মনে পড়িল ভ্রান্ত দক্ষ রাজার শিবহীন যজ্ঞ-কাহিনী, আর মনে পড়িল পতিনিন্দা শ্রবণে সতীকুণ্ডের 'আদর্শ মহামায়া আদ্যাশক্তির এই কুণ্ডে দেহত্যাগ। শিবহীন যজ্ঞের অর্থাৎ ভগবানকে ছাড়িয়া যে কোন কার্য্য করা যায়, তাহার পরিণাম এইরূপ শোচনীয়ই হয়। ভাবিতে ভাবিতে আমরা যেন সেই প্রাচীন দৃশ্য মানস নয়নে দেখিতে লাগিলাম। মনে হইল আদ্যাশক্তির দেহ-সংস্পর্শে পবিত্রীকৃত এই রজঃরাশি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া ধন্য হই। অধুনা সতীকুণ্ডে অতি অল্প যাত্রীই আসিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ইহা একরূপ অজ্ঞাতই ছিল : এবং বনজঙ্গলে পরিবৃত থাকায় পাণ্ডারা কাহাকেও ইহার সন্ধান দিতেন না। সতীকুণ্ডের একধারে একটী মৃত্তিকা স্তূপের উপর প্রাচীনত্বের নিদর্শন কয়েকটী সিন্দুর লেপিত ভগ্ন প্রস্তর মূর্ত্তি। একটী মস্তক-বিহীন মূর্ত্তিকে পাণ্ডারা দক্ষের মূর্ত্তি বলিয়া দেখান। কেহ কেহ বা বলেন এগুলি বুদ্ধ মূর্ত্তি ; এবং এখানে প্রাচীনকালে একটী বৌদ্ধ স্তূপ ছিল। যাহা হউক আনন্দের বিষয় হরিদ্বারের পণ্ডা পান্নালাল কুম্ভকর্ণ সতীকুণ্ডের তীরে দশ বিঘা জমি লইয়া মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইতেছেন। বোম্বাই হইতে দক্ষযজ্ঞের দৃশ্য অঙ্কিত করাইয়া চিত্র আনাইয়াছেন। মন্দিরে দক্ষযজ্ঞের দৃশ্য স্মারক মূর্ত্তি ও চিত্রাদি রক্ষিত হইয়াছে। পাণ্ডাজী বলিলেন, 'কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে প্রতি রবিবার সতীকুণ্ডে একটী মেলা হয়।' অতঃপর আমরা পদব্রজে কণ্‌খল বাজারে পৌছিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ ক'রিয়া এক্কারোহণে বেলা প্রায় একটায় হরিদ্বারে আমাদের বাসায় পৌছিলাম। (ক্রমশঃ)

শ্রীপান্নালাল সিংহ।

শক্তিতত্ত্ব।

এই বিশাল ভারতবর্ষে আমাদের আর্য্যজাতি যে, কত অনন্ত বিষয়ে উন্নতির চরম সোপানে অধিরূঢ় হইয়াছিল, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহের কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। সকল বিষয়ের মধ্যে এক অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান বা বেদান্ত প্রতিপাদ্য আত্মতত্ত্ব শ্রেষ্ঠতম, এই পরমতত্ত্ব ভারতীয় ঋষিগণই সুকঠোর

তপশ্চরণ দ্বারা অলৌকিক শক্তি বলে সমগ্র ধরামণ্ডলকে দিয়াছিলেন। এইরূপ লোকত্তর প্রতিভা, তপোবল কিম্বা যোগচর্য্যা অথবা ব্রহ্মচর্য্য, সত্যনিষ্ঠা ভিন্ন মানবের কথনও উদয় হয় না। সেরূপ চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জ্যোতি-বিজ্ঞান শিল্পবিজ্ঞান * প্রভৃতি আর্য্য ঋষিরাই মানবজাতির মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। এই ভারতই যে অশেষ ঐশ্বর্য্য বা সুখসম্পদের আকর, তাহা আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাশীলগণও স্বীকার করেন।

ভারতীয় সভ্যতার পূর্ণ বিকাশের সময় ভারতের জনগণের প্রতি হৃদয়ে যে ধর্ম্ম বিজ্ঞান উদ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার ভূয়ো নিদর্শন দেখিয়া এখনও বিদেশীয় বিদ্বদ্গণ মুগ্ধ হন। সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে বিশাল ভারতবর্ষে অনন্ত লোকের মধ্যে ঈশ্বরোপাসনা নানা শ্রেণীতে নানা প্রকারে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের মধ্যে এরূপ একটী ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, তন্ত্রশাস্ত্র ও তদুক্ত শক্তির আরাধনা অতি আধুনিক; তাহা বৈদিক যুগে ছিলনা। তন্ত্রশাস্ত্রের সঙ্গে প্রাচীন বেদশাস্ত্রের সম্বন্ধও অতি বিরল; অর্থাৎ স্মৃতি পুরাণের মূল বা আকর যেরূপ বেদশাস্ত্রে, তদ্রূপ তন্ত্রের মূলীভূত বেদ নয়। এই বিষয়ে 'বৈদিক-শক্তি' রহস্য নামক পুস্তকে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিব। বৈদিক যুগে যে শক্তির উপাসনা ছিল, তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া স্মৃতি পুরাণের পরবর্ত্তীকালে তন্ত্রশাস্ত্রের বিস্তার ও উপাসনা হিন্দু সমাজে ব্যাপক হইয়া এখনও রহিয়াছে। বৈদিক কালের উপাসনা দেবীসূক্ত, শ্রীসূক্ত, অশ্বামন্ত্র, রাত্রী-সূক্ত, পাবমানীসূক্ত, পৃথ্বীসূক্ত প্রভৃতির দ্বারা জানা যায়। তদানীং বশিষ্ঠর্ষি তারাদেবীর উপাসক এবং রাজর্ষি বিশ্বামিত্র শক্তি আরাধনা বলে 'বিজয়া ও জয়া' বিদ্যায় সুসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে প্রজাপতি ও শ্রীরামচন্দ্র শক্তির আরাধনা করিয়া স্বীয় অভীষ্ট সাধন করিয়াছিলেন—ইহা মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত আছে।

(*) ভারতীয় শিল্প নৈপুণ্য সম্বন্ধে শিল্পশাস্ত্রের বহু আর্য্যগ্রন্থ বিদ্যমান আছে, এমন কি শুক্ল যজুর্ব্বেদের (শতরুদ্রীতে) রুদ্রাধ্যায়ে শিল্পের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে মহর্ষি পরাশরের 'পরাশরীয় শিল্পশাস্ত্র' মহর্ষি অগস্ত্যের 'আগস্ত্য শিল্পশাস্ত্র,' ময়-প্রণীত শিল্পশাস্ত্র (বৃহৎসংহিতোক্ত) সারস্বত শিল্প শাস্ত্র, বৃহৎকাশ্যপীয় শিল্পশাস্ত্র. লঘুকাশ্যপীয় শিল্প শাস্ত্র. শিল্পময়ূর, ব্রাহ্মীয় শিল্পশাস্ত্র, মূলস্তম্ভশাস্ত্র মূর্ত্তিধ্যান শাস্ত্র, কুমার বাস্তু শাস্ত্র, মণ্ডল সূত্রধারীকৃত শিল্প শাস্ত্র এই সকল গ্রন্থে মূর্ত্তিতত্ত্ব, চিত্রাঙ্কন; সূত্রপাতন, দেবমূর্ত্তিতত্ত্ব, বাস্তু শিল্পসৌধ, রাজধানী, আপনাদি নির্ম্মাণ, বাপী, তড়াগ, সরোবর, সেতু. দেবায়তন, মঠ, আরাম প্রভৃতির তত্ত্ব সুবিস্তৃত ভাবে আছে।

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে, শ্রীমদ্দেবীভাগবতে, কালীকাপুরাণে এবং নন্দীকেশ্বর পুরাণে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে, কাশীখণ্ডেও দেবীর আবির্ভাব এবং তাঁহার তত্ত্ব, অকালে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পূজা, প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ আছে। মহাভাগবত-পুরাণে লিখিত আছে যে শ্রীরামচন্দ্র অষ্টোত্তর শত নীলপদ্ম দ্বারা মায়ের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হন; কিন্তু মহাদেবী তাহাকে ছলনা করিয়া তাহার হৃদয়ের ভাব বুঝিবার নিমিত্ত একটী পদ্ম লুকাইয়া রাখেন; সে সময় শ্রীরামচন্দ্র সমাহৃত পদ্মের সঙ্কল্পানুসারে সংখ্যা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত আপনার একটী চক্ষু উৎপাটন করিয়া দেবীর পাদপদ্মে সমর্পন করিতে উদ্যত হন। তৎক্ষণাৎ দেবী তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া মনোরথ পূর্ণ করেন। দেবী পুরাণে ভগবতীর অর্চ্চনা বিষয়ে যাহা আছে, তাহা অতি সামান্য। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, সম্পূর্ণ দেবী পুরাণ এখন আর পাওয়া যায় না। রাজর্ষি সুরথ লক্ষ জীব বলি দ্বারা মায়ের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু লক্ষ জীব-নাশের অপরাধে মরণের পর নিহত জীবগণ অসি হস্তে আসিয়া রাজর্ষি সুরথকে আঘাত করিয়াছিল। এই প্রস্তাবটী পুরাণ শাস্ত্রে কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না; অতএব ভিত্তিহীন বলিয়া বোধ হয়। মহাভারতও ভগবতী দুর্গাদেবীর নাম বা মাহাত্ম্য শূন্য নয়। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্টির বিরাট রাজ্যের সমীপে শেষ একবৎসর কাল নির্ব্বিঘ্নে যাপনের নিমিত্ত সর্ব্বানন্দময়ী ভগবতীকে কায়মনোবাক্যে স্তব করিয়াছিলেন। ইহা দ্বাপরের শেষের কথা। পরম ভক্তি-সুধার্ণব শ্রীমৎভাগবতে শাপভ্রষ্ট দেববালাগণও মরজগতে অমরেশের অনীর্ব্বচনীয় লীলা উপভোগের নিমিত্ত ভগবতী কাত্যায়নীর আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে।

শ্রীমদ্দেবীভাগবতে সকল শাস্ত্র বর্ণিত ভগবতীর মাহাত্ম্য সমূহ একত্র সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। দেবী ভাগবতে বর্ণিত প্রায় সকল বিষয়ই বৈদিক সূক্তমূলক ও বেদান্ততত্ত্ব পূর্ণ। মনীষি শৈব নীলকণ্ঠ তাঁহার দেবীভাগবতের টীকায় সেই সকল শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। দেবী ভাগবতের টীকায় বিস্তৃত ভূমিকা পড়িলেই এই বিষয়ে সকল রহস্য অবগত হইতে পারা যায়। সূত সংহিতান্তর্গত সূত গীতার ভাষ্যে শ্রীমৎ সায়নাচার্য্য যেরূপ অধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা বিবৃত করিয়াছেন, তদ্রূপ দেবীভগবতোক্ত দেবীগীতার (৭ম স্কন্ধ ১০ ম অঃ) নীলকণ্ঠ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ব্যাখ্যায় বৈদিক দেবীতত্ত্ব অতি বিস্তৃত ভাবে গবেষণা পূর্ব্বক প্রদর্শন করিয়াছেন।

যে পঞ্চ দেবোপাসনা সনাতন বেদশাস্ত্রে গীত, যজ্ঞ, ও স্তোত্ররূপে ছিল, তাহাই স্মার্ত্ত বা পৌরাণিক যুগে বিভিন্নমার্গে নানাভাবে সুপ্রস্থত হইয়া আর্য্য সমাজে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তাহার নামান্তরে তন্ত্রশাস্ত্র বা আগম শাস্ত্রের দেশময় জয়ঢক্কা ধ্বনি। এই আগম শাস্ত্র, সময়ে সময়ে আগম, তন্ত্র, যামল, উড্ডীশ, আচার প্রভৃতি নামে বিভিন্ন হইয়া, বহু সহস্র গ্রন্থের দ্বারা দেশব্যাপক স্বীয় কলেবর বৃদ্ধি করিয়া ফেলিয়াছিল। তান্ত্রিক উপাসনায় অল্লায়াশে সরল পথে সহজ সাধ্য কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করা যায় বলিয়া, বৈদিক উপাসনা হইতে কোন কোন স্থানে তান্ত্রিক উপাসনার প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়।

অদূরদর্শী অনেকের ধারণা আছে যে, তন্ত্রে কেবল জীবহত্যা ও মদ্যাদি-ব্যবহারের কথাই আছে; তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাঁহাদের ধারণা ভ্রমাত্মক, বহু প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থে আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণাদি যোগানুষ্ঠান, যাগযজ্ঞ, পূজা, জপ, স্তব, সম, দম, প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি ভগবৎ ভক্তি ও তাঁহার সেবা, আরাধনা, অতি বিপুলভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

কতকগুলি সম্প্রদায়েব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অসাধু-লোক কর্ত্তৃক আধুনিক তন্ত্রশাস্ত্রের যে প্রকরণ পুস্তকের সৃষ্টি হইয়াছে, সেগুলি তত্ত্বচিন্তাশীল নৈষ্ঠিক জনগণের অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে; এবং তন্ত্রে বামাচারের কার্য্যাবলীর বিস্তার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অঘোরী, অবধূত-সন্ন্যাসী ব্যক্তি বিশেষের জন্য; তাহা সাধারণের বা বিমল তত্ত্বজ্ঞানের জন্য নয়। সে সমুদয়ের উপদেষ্টা ও উপদেশ্য সম্প্রতি আছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ। চারি বেদের মধ্যে অথর্ব্ববেদেই তন্ত্রের মৌলিকতা অধিক পরিমাণে বদ্ধিত হইয়াছিল; তাহা অথর্ব্ববেদ পাঠে জান যায়। অথর্ব্ববেদের খৈলক-সূক্ত (পরিশেষ সূক্তনিচয়) ও মহানারায়ণ উপনিষদাদিতে তান্ত্রিকভাবের সমধিক উন্মেষ ও তত্ত্ব বিদ্যমান আছে। অথর্ব্ববেদকে আধুনিক বলিবারও উপায় বিশেষ নাই। কেন না যজুর্ব্বেদের পরিশেষে "শতপথ ব্রাহ্মণ" (বাজসনেয়সংহিতা); শতপথ ব্রাহ্মণের শেষভাগে "বৃহদারণ্যক উপনিষদ" এবং উপনিষদের মধ্যে প্রাচীনতম—'ছান্দোগ্য উপনিষদ"। এই দুইখানি ও অপর বহু উপনিষদে অথর্ব্ববেদের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কোন্ বেদ আগে, কোন্ বেদ পরে,—এই বিচারের কোন সৎ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। আমার বোধ হয় অথর্ব্বাঙ্গিরসের গীতিকা (মন্ত্র) সকল অতি প্রাচীনকাল হইতেই যজ্ঞীয় নানাপ্রকার বিঘ্ন দূরীকরণ ও মানবের ত্রিবিধ (দিব্য, আন্তরীক্ষ্য, ভৌম,) উৎপাতাদির শান্তির জন্য যাগ কার্য্যাদিতে প্রযুক্ত হইত। প্রতীচ্য

পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, অথর্ব্ববেদের চতুর্থ বেদরূপে পরিণতি 'শতপথ ব্রাহ্মণাদি' বিরচণের উত্তরকালে সংঘটিত হইয়াছে ; ইহা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। এ বিষয় স্পষ্টভাবে, "বৈদিকতত্ত্ব কথা" নামক সংস্কৃত ভাষা নিবদ্ধ—পুস্তকে বলিবার ইচ্ছা রহিল। অথর্ব্বসংহিতায় আর্য্য-অনার্য্য উভয়-শ্রেণীর আচরিত নানাবিধ রীতি-নীতি আচারাদি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের মহার্ঘ্য সম্পত্তিরূপে পরিণত করিয়াছে। অথচ যাহা বৈদিক সংহিতায় কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না, তাদৃশ বহুতর সাধারণের অত্যুপকারক প্রাচীনতম, প্রকৃত কথা "অথর্ব্বসংহিতায়" পাওয়া যায়। অথর্ব্বসংহিতার উপাসনা সূচক সূক্তগুলি সকল সময়েই শ্রদ্ধেয়। 'বৃহৎ দেবতায়' উক্ত আছে যে, "সম্পূর্ণং ঋষিবাক্যন্তু সূক্তমিত্যভিধীয়তে" বা ছন্দোময় সম্পূর্ণ ঋষিবাক্যের নাম সূক্ত।

তন্ত্র বলিলে যে, দুই চারি খানি গ্রন্থকে বুঝায় (অর্থাৎ তন্ত্র শাস্ত্রকে বুঝায়) এমন নয়। যদ্দ্বারা মোক্ষ বা নির্ব্বাণের অবরোধ হয়, আচার্য্যগণ তাহাকেই তন্ত্রনামে অভিহিত করিয়াছেন। "তন্ত্র্যতে ব্যুৎপাদ্যতে মোক্ষসাধনমনেন ইতি তন্ত্রং মোক্ষপ্রতিপাদকং শাস্ত্রং" স্বামী নারায়ণতীর্থ এইরূপ ভাবে তন্ত্রশব্দের অর্থ অবধারিত করিয়াছেন। দার্শনিক সময়ে ও তাহার পূর্ব্ব সময়ে তন্ত্রশব্দ, শাস্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হইত ; যথা সাংখ্য দর্শনে—"ষষ্ঠিতন্ত্রম্" "তন্ত্রং প্রোবাচ" (ব্যাসভাষ্য পাতঞ্জল দর্শন)। পুরাণ শাস্ত্রেও শাস্ত্র এই অর্থে তন্ত্রশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ; যথা "ন্যায়তন্ত্রাণ্যনেকানি সাংখ্য ভাস্যোক্ত প্রমাণ" 'পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অপ্পায়দীক্ষিত ও উক্ত অর্থে তন্ত্র শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ;—যথা 'তন্ত্রাণ্যধীত্য সকলানি সদাহবদাতম্।'

ষড়্দর্শনের মধ্যে নানাশাস্ত্র সমাহিত সাংখ্য দর্শনই সর্ব্বাগ্রে সমধিক ভাবে শক্তিবাদের বা তন্ত্রোক্ত মূল প্রকৃতির সমর্থণ করে। শৈব দর্শন ও সাংখ্য দর্শন এই উভয় দর্শনই তন্ত্রের বিশেষভাবে উপজীব্য।

দেবী ভাগবতের সপ্তম স্কন্দের দেবী গীতাধ্যায়ে উক্ত আছে যে, তন্ত্র দ্বিবিধ, বেদানুযায়ী ও বেদ প্রতিকূল, (বেদবিরুদ্ধ)। বৈদিকগণ বেদের অনুকূল তন্ত্রমত গ্রহণ করিবেন, এবং তাহার বিরুদ্ধাংশ ত্যাগ করিবে। এ সম্বন্ধে মহর্ষি মনুও বলিয়াছেন যে, "যাবেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ঃ" ইত্যাদি বচনদ্বারা বেদ বহির্ভূৎ স্মৃতি পর্য্যন্ত ত্যাগের যোগ্য। কূর্ম্ম পুরাণেও * ভগবতী স্বয়ং

* কূর্ম্ম পুরাণে দেবীবাক্যং (দেবী ভাঃ ৭ম, স্কন্দ) দ্বাদশাধ্যায়। "মমৈবাজ্ঞাপরাশক্তির্ব্বেদসংজ্ঞা পুরাতনী। ঋগ, যজুঃ সামরূপেণ সর্গাদৌ সংপ্রবর্ত্ততে ॥"

বলিয়াছেন—"আমার আজ্ঞা (আদেশ) স্বরূপ পুরাতন বেদ অর্থাৎ ঋগ্, যজু, সাম প্রভৃতি সৃষ্টির আদিতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব রাজার আদেশের ন্যায় জগদীশ্বরীর আজ্ঞ-শ্রুতিও মানবের সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়। বায়ু সংহিতাতে উক্ত আছে যে ‡ শৈবাগম দুই প্রকার, শ্রৌত ও অশ্রৌত; বেদের সারময় যে, (বেদের অবিরুদ্ধ) তাহা শ্রৌত; বেদ-ভিন্ন অশ্রৌত। যাহা শ্রৌত (শ্রুতির অনুকূল), তাহা বৈদিকের গ্রাহ্য, ইহা 'সূতসংহিতায়'ও ব্যক্ত আছে। আর যাঁহারা তন্ত্রের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করেন, তাহাদের গতি কেবল তন্ত্রের গণ্ডিতে। তবে যে সকল শ্রুতি-বিরুদ্ধ বলিয়া অভিশপ্ত হইয়াছে, সেগুলি দক্ষ ও ভৃগুমুনির শাপে অধমত্ব প্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণের ক্রমে বেদে আস্তিক্য বুদ্ধি জন্মাইবার জন্য প্রকাশিত হইয়াছে। বাম, কপালক, কৌলক ও ভৈরব তন্ত্র এই কয়খানি বিরোধিগণের মোহের নিমিত্ত মহাদেব প্রণয়ণ করিয়াছেন ‡ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার 'মলমাসতত্ত্বে' (৬৪) চৌষট্টি খানি তন্ত্রের উল্লেখ ও প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন।

"যে সকল ব্রাহ্মণ দক্ষ, ভৃগু, দধীচি মুনির শাপে দগ্ধ হইয়া বেদমার্গ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত অর্থাৎ অন্য জন্মে বেদাধিকার প্রাপ্ত হওয়ার জন্য ঈশ্বরের কোনরূপ উপাসনা করা কর্ত্তব্য—এই মনে করিয়া দেবাদিদেব শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, শাক্ত এবং গাণপত্য এই পঞ্চ প্রকার আগম প্রণয়ণ করিয়াছেন।

বহুকাল পূর্ব্বে কাশ্মীরে তন্ত্রের দর্শন "শৈবাগম" নামে একখানি গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল; তাহা এখন পাওয়া যায় না। কাশ্মীরে বহুকাল হইতে শৈব দর্শনের ও জগৎপিতা মাতা শিব শক্তির উপাসনার বিস্তৃতি রহিয়াছে; উক্ত শৈবাসগমের প্রথমে লিখিত আছে যে, আগম দ্বিবিধ, সৎ ও অসৎ, বেদ বিরুদ্ধে সৎ, অসৎ বেদের অনুকূল, কিন্তু শৈবাগম অদর্শনে উক্ত বিষয় কতদূর সত্য তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না; শৈব দর্শন ও শ্রীকণ্ঠ ভাষ্য, (ব্রহ্ম সূত্রের শৈবভাষ্য) তাহার ব্যাখ্যা শিবার্ক মণিদীপিকায় ঐরূপ কোন বিষয় দেখিতে পাই নাই।

---

‡ "শৈবাগমোহপি দ্বিবিধঃ শ্রৌতাশ্রৌতশ্চ তন্ময়ঃ। শ্রুতিসারময়ঃ শ্রৌতঃ স্বতন্ত্র ইতরো-মতঃ॥" বায়ুসংহিতায়াম্। "ন্যায় তন্ত্রাণ্যনেকানি তৈস্তৈরুক্তানি বাদিভিঃ। হেত্বাগমসদাচা-রৈর্যদ্যুক্তং তদুপাস্যতাম্॥" (তত্রৈব পুরাণে)

'শ্রৌতো গ্রাহ্যস্তু বৈদিকৈঃ" ইতি স্কান্দে সূতসংহিতায়াম্।

"তথাপি যোহংশো মার্গাণাম্ বেদেন নবিরুধ্যতে।"

সোহংশঃ প্রমাণমিত্যুক্তং॥

মীমাংসা দর্শনে শিষ্টাকোপাধিকরণে (৩৫ সূং) বার্ত্তিক প্রণেতা কুমারিল স্বামী বেদবিরুদ্ধ বলিয়া বৈষ্ণবাগম সমূহের কোন কোন অংশ যুক্তিপূর্ব্বক ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। আচার্য্য সুচরিত মিশ্রও বার্ত্তিককার বচনের প্রতি-ধ্বনি করিয়াছেন। বৈষ্ণবাগম বলিতে হয় শীর্ষপঞ্চরাত্র, নারদ পঞ্চরাত্র, গণেশ পঞ্চরাত্র, সাত্বতসংহিতা প্রভৃতিকে বুঝায়। বৃহৎ হয়-শীর্ষপঞ্চরাত্র গ্রন্থে পঞ্চরাত্র সম্বন্ধে বহু বৃত্তান্ত লিখিত আছে। এইগুলি বৈষ্ণব মতে তন্ত্রের মধ্যে পরিগণিত।

মহাশক্তির সত্তাতেই জগতের সত্তা; এই শক্তিই সকল বস্তুতে সূক্ষ্মভাবে অনুস্যূত ও পরিব্যাপ্ত। শক্তি মাহাত্ম্যে তাহাই কথিত আছে, "নিত্যৈবসা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।" এবং উক্ত মাহাত্ম্যে অপর একস্থানে কথিত হইয়াছে "যে দেবী সকল বস্তুতে (ভুতে) শক্তিরূপে সংস্থিত আছেন, তাঁহাকে নমস্কার। 'যদ্দ্বারা মানব সকল বিষয়ে জয় করিতে সমর্থ হয়, তাহাকে শক্তিনামে অভিহিত করা হয়। এই অর্থে শক্‌ধাতুর উত্তর ক্তিন্ প্রত্যয় হইয়া শক্তিশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই শক্তি অবস্থাভেদে, বস্তুভেদে, কালভেদে, ক্রিয়াভেদে এক হইয়াও নানাবস্তুতে নানাভাব প্রাপ্ত হয়। যথা "বায়ূর্যথৈকোভুবনং প্রবিষ্টোরূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব" "একং সৎ, বিপ্রাবহুধা বদন্তি" "একোহহং বহুস্যাম্ † এই মহাশক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসবিত্রী (‡)

প্রতীচ্য দেশীয় পণ্ডিতগণ ইহাতে Power Force এবং Energy এই তিনটি শব্দদ্বারা অভিহিত করিয়াছেন। আমাদের বৈয়াকরণ মহর্ষিগণের মতে উপাদান কারণ বা প্রকৃতিই মহাশক্তি। এই সম্বন্ধে (জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ, ১।৪।২০) পাণিনি, পতঞ্জলি, বররুচি, কৈয়ট, জয়াদিত্য, নাগেশ প্রভৃতির ঐক্যমত দেখাযায়। ষড়্দর্শনও তাহার ভাষ্য, প্রকরণ গ্রন্থে এই শক্তিকে নানাভাবে নানা কৌশলে স্বীকার করিয়াছে। ছয়জন আদি দার্শনিক মহর্ষির মধ্যে কেহই শক্তি পরিহার বা উপেক্ষা করিয়া যাইতে পারেন নাই। স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, শাস্ত্রে কতস্থানে মহাশক্তি মাহামায়ার বিবরণ ও অসংখ্য নাম, লীলা প্রভৃতি

---

† অন্যানি যানি শাস্ত্রানি লোকহস্মিন বিবিধানিচ।
শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধানি তামসান্যেব সর্ব্বশঃ ॥ ২৬।
বামং কাপালকঞ্চৈব কৌলকং ভৈরবাগমঃ।
শিবেন মোহনার্থায় প্রণীতোনান্য হেতুকঃ ॥ ২৭।
‡ দক্ষশাপাচ্চ গোঃশাপাদ্দধীচস্যাচশাপতঃ
দগ্ধাযে ব্রাহ্মণবরা বেদমার্গ বহিস্কৃতাঃ ইত্যাদি ॥
... ...আগমাশ্চ প্রণীতাঃ শঙ্করেণতু। (দেবী ভাগবতে ৭ ম স্কন্ধে)

বর্ণিত আছে, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উদ্ধৃত করা অসম্ভব, প্রতীচ্য দেশীয় পণ্ডিতগণ হারবার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি দার্শনিক গবেষণার প্রসঙ্গে অজ্ঞেয় বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিত্রী মহাশক্তি স্বীকার করিয়াছেন।

ভারতীয় সুধীমণ্ডলী এই শক্তির স্বীকার এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার উপাসনা, ধ্যান ধারণাদি দ্বারা অভীষ্ট সম্পাদন করিয়া, সিদ্ধ হইয়া বাহ্য ও অন্তর্জগতে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। সহস্র সহস্র গ্রন্থ পূর্ণ তন্ত্রশাস্ত্রেও ঐ মহাশক্তির মাহাত্ম্য খ্যাপিত হইয়াছে; এবং তদ্দ্বারা যে উপায়ে পরমেশত্ব পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্ত্র শাস্ত্রে তাহার সরল, সুগম, সহজ উপায় সম্যক্‌রূপে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

ভারতে বৌদ্ধ যুগেও (বিবেক, বৈরাগ্য, বিজ্ঞান, সাম্য, মৈত্রীর প্রবাহকালে) তন্ত্র সাগরের প্রবাহ তীব্রভাবে বহিয়াছিল। বৌদ্ধ শাস্ত্রের ধারণী শাস্ত্র হইতে বৌদ্ধ তন্ত্রের বিস্তৃতি হয়। বৌদ্ধ তন্ত্র প্রায়ই হিন্দু তন্ত্র-শাস্ত্রের অনুরূপ; বৌদ্ধ তন্ত্রের মধ্যে সাধনমালা, চতুর্বিংশতি সহস্রিকা, মায়ূরী প্রভৃতিতে তন্ত্রোক্ত প্রায় সকল বিষয়ই বর্ণিত আছে। বুদ্ধদেবের অনেক প্রকার প্রভেদ আছে অর্থাৎ—মনুষ্য বুদ্ধ, ধ্যানী বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ প্রভৃতি। সাধরণ হিসাবে পাঁচ মনুষ্য বুদ্ধ, যথা—ক্রকুচণ্ড, কনকমুণি, কশ্যপ, গৌতম, মৈত্রেয়। ধ্যানী বুদ্ধ,—বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্ন-সম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধ। বোধিসত্ত্ব—সমন্তভদ্র, বজ্রপাণি, রত্নপাণি, পদ্মপাণি, বিশ্বপাণি। ইহাদের মধ্যে ধ্যানীবুদ্ধ দ্বারাই বুদ্ধের আধ্যাত্মিক ভাব পূর্ণ বিকশিত হয়। প্রত্যেক কল্পে প্রত্যেক বুদ্ধের হস্তে যতপ্রকার মুদ্রা আছে সকল মুদ্রার বিবরণ 'সাধনমালা তন্ত্রে' মন্ত্র, উপাসনা, পুরশ্চরণ প্রণালী প্রভৃতি সহযোগে আছে। বৌদ্ধতন্ত্রের বিস্তৃতি পূর্ণভাবে নেপালে হইয়াছিল; সেখানে সহস্র সহস্র গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে।

অনেকে বলিয়া থাকেন নেপাল হইতেই মিথিলাদেশে তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা ও কার্য্যাবলী আইসে, সম্প্রতি মিথিলাতে পনর আনা হিন্দুই তান্ত্রিকাচার সম্পন্ন। মিথিলায় দুইজন মহা সিদ্ধপুরুষ ছিলেন; ৺রঘুনাথ ঠাকুর মহোদয় ও ৺মহেশ ঠাকুর মহাশয়। এই দু'য়ের মধ্যে স্বীয় সিদ্ধি প্রভাবে তদানীন্তন 'বাদসাহ" হইতে একজন রাজকীয় সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মৈথিল-সিদ্ধ পুরুষপ্রবর ৺নৃসিংহ ঠাকুর মহাশয় প্রণীত "তারা ভক্তিসুধা লহরী" নামক তন্ত্রগ্রন্থ গভীর গবেষণা পূর্ণ ও শ্রদ্ধেয়। এই গ্রন্থে তন্ত্রের "প্রামাণ্য কাণ্ড" বিশেষ প্রশংসনীয়। 'মহেশ ঠাকুর' প্রণীত "দুর্গা প্রদীপ" নামক গ্রন্থে ভগবদ্দেবী মাহাত্ম্য বিশেষ-

রূপে বর্ণিত ও আলোচিত আছে। ভারতে তান্ত্রিক যোগীগণের মধ্যে কত শত সিদ্ধ পুরুষ যে চলিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। দক্ষিণ ভারতে ত্রিপুরাদেবীর উপাসনা এখনও বিদ্বৎ সমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে। নানা শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্রে-নিপুণ ও তদনুষ্ঠান পরায়ণ এই কয়েকজন ঋষিকল্প ব্যক্তিকে দেখিতে পাই,—স্বনামখ্যাত অপ্পয়-দীক্ষিত নাগেশ ভট্ট (নাগোজী), পরম শৈব শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্ট (মহাভারত প্রভৃতির টীকাকার)। তন্ত্রের আবির্ভাব সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি, সম্প্রতি আরও দুই চারিটী কথা বলিবার আছে। দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বেও তান্ত্রিক মতে শক্তি অর্চ্চনা হইত। সেই কালের উৎকীর্ণ শীলা প্রতিমার দ্বারা ইহা জানা যায়, মৌর্য্য রাজগণ শক্তির উপাসক ছিলেন। চালুক্য নৃপগণ সপ্ত মাতৃকাশক্তির অর্চ্চণাকারী ছিলেন; ললিতবিস্তরে (৫০২—৫০৭ পৃষ্ঠায়) অপরাজিতা শক্তি প্রভৃতির নাম উল্লিখিত আছে। বৌদ্ধ-সমাজের শক্তিপূজার পূর্ব্বে মহাভারতের সময়ে শক্তির উপাসনা ছিল; যথা—(মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্বে) "হ্রীঁ, শ্রীঁ, গার্গীঞ্চ গান্ধারীং যোগিনীং যোগদাং সদা"। নেপালের সাধনমালা তন্ত্রে লিখিত আছে যে আচার্য্য নাগার্জ্জুন ভোটদেশীয় এক জটা নাম্নী তারাদেবীর মূর্ত্তি উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন। নেপালের বজ্রাচার্য্যগণ এখন তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে শক্তির আরাধনা অর্থাৎ তারাদেবীর স্তোত্রাদি পাঠ করেন। যামলে উক্ত আছে যে মহর্ষি বশিষ্ট কর্ত্তৃক চীনদেশ হইতে তারাতত্ত্ব আনীত হইয়াছিল। আচার্য্য নাগার্জ্জুন প্রবর্ত্তিত মহাযান সম্প্রদায়ে কুলাল-আম্নায়ে—পঞ্চবেদ, পঞ্চযোগী, পঞ্চপীঠ, পঞ্চাম্নায়ের উল্লেখ আছে! উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উদ্ধাম্নায় এই পঞ্চ আম্নায় পঞ্চ মহেশ্বর বা ধ্যানীবুদ্ধ। প্রাক্‌জ্যোতিষপুরে (আসামে) অতি প্রাচীন কাল হইতে শক্তি উপাসনা প্রচলিত আছে। বঙ্গদেশে মহারাজ বল্লালসেন শক্তি-মন্ত্রের উপাসক ছিলেন, তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেনও শিবশক্তির পূজক ছিলেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয় শক্তির উপাসক ছিলেন, তৎপরে কৃষ্ণানন্দ-আগমবাগীশ, তন্ত্রশাস্ত্রের ও তাহার সাধনাদি কার্য্যাবলীর বাহুল্য ঘটাইয়া যান। তিনি সুপণ্ডিত, সুসাধক (নবদ্বীপে লব্ধজন্মা) ছিলেন, তাহার তন্ত্রসার তন্ত্রশাস্ত্রের গভীর গবেষণা পরিপূর্ণ গ্রন্থ। তাহার পরে অনেকেই অতি বৃহৎ তান্ত্রিক সংগ্রহ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মেহারে (নোয়াখালী জেলায়) একশত বৎসর পূর্ব্বে এক সিদ্ধ মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। তাহার সিদ্ধ-পীঠ মেহার নামক স্থানে এখনও জাগ্রত রহিয়াছে। তাঁহার বিরচিত "সর্ব্বোল্লাসতন্ত্র"

অতি পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বপূর্ণ। সর্ব্বানন্দ ঠাকুর মহোদয়ের বংশে এখনও সাধনা-তৎপর শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রচারক ৺স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায় মহোদয়ও মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে ব্রহ্মের স্তব গ্রহণ করিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্রে দ্বৈত ও অদ্বৈত এই উভয় মত-পোষক প্রকরণ ও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞানগুরু ভগবান শঙ্করাচার্য্যও পরিশেষে শক্তি প্রাধান্য স্বীকার করিয়া "আনন্দ-লহরী" নামক গভীর গবেষণা পূর্ণ বৃহৎ শক্তিস্তব রচনা করিয়া শাক্তমত সুদৃঢ় করিয়া গিয়াছেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য পূর্ণ স্তবের দ্বৈত এবং অদ্বৈত ও মন্ত্রোদ্ধারের বিষয়ে নানা ব্যাখ্যা আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। বুক নরেন্দ্র-সচিব শ্রীমৎ সায়নাচার্য্য বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর) স্তূতসংহিতা ভাষ্যে শক্তিতত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

সাম্প্রাদায়িক উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের (মত বা শাস্ত্রে) বিজ্ঞান করিয়া গিয়াছে; যথা—সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে—"লিঙ্গার্চ্চন পরাঃ শৈবা নাস্তিকাঃ সম্প্রকীর্ত্তিতঃ," ইহা মাধ্য সম্প্রদায়ে বৈষ্ণবগণের (শৈবের প্রতি)। আবার শৈবগণও বৈষ্ণবগণের প্রতি পাল্‌টায় বলিয়াছেন—'তপ্ত-মুদ্রাঙ্কিতন্নুর্নাস্তিকং ধর্ম্মমাশ্রিতঃ"। "পশুতুল্যঃ সবিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বকর্ম্ম সুগর্হিতঃ"॥ এইরূপ স্মার্ত্ত ও পৌরাণিকগণ কোন কোন স্থানে তন্ত্রের সৎ ও অসৎ বিষয়ের

*। চন্দ্রশেখর তীর্থের প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের সমাসন্ন ভূমিতে চট্টগ্রামে কতিপয় মহাশক্তি-সাধনা-সিদ্ধ পুরুষ জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন, (১) কাশ্যপীয় ৺রুদ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য—ইনি স্বীয় কঠোর সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তাহার প্রভাবে শঙ্খনদীর উপশাখার গতি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। এইরূপ সাধক ও ভক্ত ৺শুকাম্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও স্বীয় অভিনব খানত সরোবরে একটী মৃত পতিত পশুকে জীবিত করিয়াছিলেন। ইহাঁদের বংশধরেরা এখন বিখ্যাত ও সাধনা তৎপর আছেন। (২) অপর মহারাজ ভট্টাচার্য্য—ইনিও (রাঢ়ী শ্রেণী) এবং শক্তিমন্ত্র-সিদ্ধ ছিলেন, এক সময় চট্টগ্রামের কোনও সম্ভ্রান্ত বংশীয় ভূপতি তাঁহার সিদ্ধমন্ত্রের পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত অতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন, ইহার উৎসুক্য চরিতার্থ করিবার জন্য উক্ত মহারাজ ভট্টাচার্য্য মহাশয় নির্ভয়ে সেই মুহূর্ত্তেই নিজের সিদ্ধ মন্ত্র একটী বোধিদ্রুম পত্রে লিখিয়া নিকটবর্ত্তী স্রোতস্বিনী নদীতে ভাসাইয়া ছিলেন। অনন্তর মন্ত্রযুক্ত পত্রটি সরিৎ প্রবাহের প্রতিকূলে তীব্রবেগে ধাবিত হইতেছে দেখিয়া ঐ মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক মহারাজ ভট্টাচার্য্যের (রাজাবাহাদুর) শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। (৩ চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী বদান্য প্রবর সুপণ্ডিত মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন গুপ্ত বিদ্যারত্ন বাহাদুরের পিতামহ স্বর্গীয় ৺রায় শরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত বাহাদুরও শক্তিমন্ত্র সুসিদ্ধ এবং সন্ন্যাসীপ্রায় ছিলেন; তিনি স্বকীয় সাধনার উপদেশ সমূহ শেষ সময়ে সুযোগ্য পৌত্রকে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি তন্ত্রশাস্ত্রে খুব পণ্ডিত ছিলেন। নিজের অতুল বিত্তের প্রতি তাঁহার কখনও দৃষ্টি ছিল না জীবনের অধিক সময়ই তীর্থে ও সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে অতিবাহিত করিতেন। স্বীয় ভবনে উপাস্যদেবতা পীঠাধিষ্ঠাত্রীরূপে এখনও বিরাজমান আছেন॥

বিচার না করিয়া নিন্দা করিয়াছেন; তদ্রূপ কোন কোন তন্ত্রেও স্মৃতি পুরাণের নিন্দা দেখিতেছি। আর শাক্ত-বৈষ্ণবের তো পরস্পর অপ্রীতির কথার পরিসীমা নাই। বোধ হয় স্ব স্ব সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি ও প্রাধান্য কীর্ত্তন প্রসঙ্গেই অপরের নিন্দা (অধীরতা হেতু) আসিয়া উপস্থিত হইত, ইহা ভিন্ন অন্য কোন (পরস্পর নিন্দা চর্চ্চার) হেতু দেখিতেছি না। এই বৈদিক শক্তি তত্ত্ব প্রবন্ধে বেদ উপনিষদ্ (অপর) স্মৃতি, পুরাণাদির প্রমাণ অধিক পরিমানে থাকা সত্ত্বেও উদ্ধৃত করিয়া দিলাম না; ইহার দ্বিতীয় প্রবন্ধে সে সমস্ত অনুক্ত প্রমানাবলী উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা রহিল। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এই মাত্র যে—বৈদিক যুগেও শক্তির আরাধনা হইত, কেবল তান্ত্রিক সময়ে নয়। ভারতের বাহিরে হিন্দু উপনিবেশ সমূহে যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বালি, চীন, মরিসস্ প্রভৃতিতে যে সকল প্রাচীন দেব মন্দিরের এখনও পরিশেষ আছে, সে সকল মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ বহু শক্তি মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে, এবং ঐ সকল দেশীয় হিন্দুগণ শক্তির উপাসনা করিত, যে তাহার ভূয়ো নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন তির্ব্বত, চীনদেশীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিশেষে শক্তি দেবতাব আরাধনা প্রচলিত আছে। (ক্রমশঃ)

বিদ্যারত্নোপাধিক—শ্রীঈশ্বর চন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শনতীর্থ।

অর্থ]

দুর্গারাণী।

(পূর্ব্ব প্রকা শতের পর)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শৈলজা দুর্গারাণীকে সঙ্গে লইয়া কৈলাসনাথের মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিল; তৎপরে উভয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া ভৈরবের মন্দিরে গেল; সেখান হইতে গণেশ গুহাতে গমন করিয়া ভগবান্ গণপতিকে প্রণাম করিল। তৎপরে কালী, জগদ্ধাত্রী ও লক্ষ্মীর মন্দিরে দেবতাদিগকে প্রণাম করিয়া সর্ব্বশেষে কাত্যায়নীর মন্দিরে গমন করিল। এই মন্দিরটি পর্ব্বতের নিম্নভাগে অবস্থিত। ইহার প্রাঙ্গন উন্মুক্ত ও প্রশস্ত; তাহার চতুর্দ্দিকে বিল্ববৃক্ষ, জবাবৃক্ষ, করবী বৃক্ষ, স্থলপদ্ম বন ও শেফালিকা বন। ঠাকুর দালান ও দেবীর মন্দির পর্ব্বত গাত্র হইতে খোদিত। স্তম্ভশ্রেণী বিচিত্র কারুকার্য্যময়

ও দেখিতে পরম রমণীয়। তাহাদের উপরিভাগে প্রস্তর মধ্যে দেবীলীলা উৎকীর্ণ হইয়াছে। দেবীর মূর্ত্তিও মনোহারিণী। ভাস্কর এই মূর্ত্তি খোদিত করিতে অদ্ভুত শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছে। আজ ষষ্ঠ্যাদি সঙ্কল্প হইবে; এইজন্ত মন্দির ও ঠাকুর দালান সুমার্জ্জিত হইয়াছে এবং দেবী নানাবিধ মূল্যবান ভূষণে সুসজ্জিত হইয়াছেন। বৃদ্ধ পুরোহিত দেবীর সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া নিমীলিত নেত্রে আগমনী গাহিতে ছিলেন:—

"গা তোল, গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল,
ঐ এল পাষাণি, তোর ঈশানী।"

এমন সময়ে শৈলজা ও দুর্গারাণী ঠাকুর দালানে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবতীকে প্রণাম করিল। বৃদ্ধ হঠাৎ নয়ন মেলিয়া অলৌকিক রূপ লাবণ্যবতী দুর্গারাণীকে দেখিয়া বিস্ময়ে যেন বিহ্বল হইলেন। পরে বধুমাতার সহিত তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মা, তুমি কে গো?"

দুর্গারাণী কি উত্তর দিবে, প্রথমে তাহা স্থির করিতে পারিল না। পরে বলিল "আমার নাম দুর্গারাণী।"

বৃদ্ধের চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি বলিলেন,—"তোমার নাম দুর্গারাণী"? আচ্ছা, এমন নাম তুই কোথায় পেলি মা? এ যে সত্য সত্যই তুই আমার দুর্গারাণী! মা আমার কতস্থানে কতরূপে বেড়াচ্ছে গো! বোস্ মা বোস্; বৌমা, তুমিও বসো।"

উভয়েই তাঁহার সম্মুখে বসিল। বৃদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে শৈলজা সংক্ষেপে দুর্গারাণীর পরিচয় প্রদান করিল। তাহা শুনিয়া বৃদ্ধ আহ্লাদে গদ্গদকণ্ঠ হইয়া বলিলেন,—"মা দুর্গারাণি, তুই সাক্ষাৎ উমা। মহাদেবকে পতিরূপে পাবার জন্ত মা আমার কৈলাসে যেমন তপস্যা ক'রেছিলেন, তুইও আজ তেমনি এই কৈলাস গিরিতে তপস্বিনী বেশে এসেছিস্। বাবা কৈলাসনাথ তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বেন। মা তুইও যেমন দুর্গারাণী, তেমনই আমাদের হরনাথও সাক্ষাৎ শিব। তুই তারই যোগ্য, আর সেও তোরই যোগ্য। এই যে! বাবা হরনাথের কথা বল্‌তে বল্‌তেই তিনি এসে হাজির! বাবা হরনাথ, তুমি আমার মা দুর্গারাণীকে দেখেছ? দেখ দেখি, আমার মায়ের কেমন রূপ! আচ্ছা, আমার মাকে কখন আমার বাবার পাশে দাঁড়াতে দেখ্‌বো? কবে আমি তোদের মিলন দেখে হরগৌরীর মিলন প্রত্যক্ষ কর্‌বো?"

হরনাথ বৃদ্ধ পুরোহিতের উচ্ছ্বাস দর্শনে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "মুখুয্যে

মশাই, সবই বাবা কৈলাসনাথের ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হয় না এবং তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। দুর্গারাণীকে আমি দেখেছি এবং গুণের কথাও শুনেছি। এঁর মত ধর্ম্ম পত্নীলাভ করা সৌভাগ্যের কথা সন্দেহ নাই; কিন্তু ভাগ্যবল চাই।"

বৃদ্ধ পুরোহিত বলিয়া উঠিলেন,—"ওরে বাবা, আমি তোর ভাগ্য আর এঁর ভাগ্যও দেখ্‌তে পাচ্ছি। বাবা কৈলাসনাথ তোমাদের উভয়কে উভয়ের জন্য অভিপ্রেত ক'রেছেন। আমি আজ পঞ্চাশ বৎসর ধ'রে বাবা কৈলাসনাথ আর মা ভগবতীর পূজা ক'র্‌ছি। আমার কথা কখনও মিথ্যা হ'বার নয়।" ঠিক্ সেই সময়ে গৃহকোণে একটা টিক্‌টিকী ডাকিয়া উঠিল এবং একটী কোকিল সহসা কুহু কুহু রবে সেই স্থান ঝঙ্কৃত করিয়া উঠিল। *

বৃদ্ধ পুরোহিত বলিয়া উঠিলেন,—"তারা—তারা, জগদম্বা! তুই মা সত্য।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পূজার কয়েকদিন কাত্যায়নীর মন্দিরে বিলক্ষণ সমারোহ হইল। চারি পাঁচ ক্রোশ দূর হইতেও বহু নরনারী জগন্মাতার পূজা দেখিতে আসিল। প্রত্যহ ব্রাহ্মণ ভোজন ও দরিদ্র ভোজন হইতে লাগিল। আনন্দময়ীর পূজোৎসবে সকলে আনন্দময় হইল। কাত্যায়নীর মূর্ত্তি চির প্রতিষ্ঠিতা। সুতরাং তাঁহার আহ্বানও নাই, বিসর্জ্জনও নাই। তাঁহার মন্দিরে এবং অন্যান্য মন্দিরেও যেরূপ নিত্য পূজা হয়, সেইরূপ পূজা হইতে লাগিল। হরনাথ পূজার পর কৃষ্ণপুরে গমন করিলেন। যে কয়েকদিন তিনি কৈলাসপুরে ছিলেন, দুর্গারাণী অন্যান্য মহিলাদের সহিত কাত্যায়নীর মন্দিরে পূজা ও আরতি দেখিতে আসিয়া প্রত্যহ অলক্ষিতে তাঁহ'কে দেখিয়া যাইত। হরনাথের দেবোপম সৌম্য ও সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া দুর্গারাণী নিজ হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভাবোচ্ছ্বাস অনুভব করিতে লাগিল।

পূজার পর হরনাথ নিজ বাটীতে গমন করিলে দুর্গারাণী চারিদিক যেন শূন্য দেখিতে লাগিল। মন্দাকিনী ধারায় স্নান করিয়া শিব পূজা করিবার সময় সে মানস চক্ষে কেবল হরনাথকেই দেখিতে পাইত। কাত্যায়নীর মন্দিরে হরনাথ যে স্থানটিতে বসিয়া পূজার মন্ত্র বুঝাইতেন, দুর্গারাণী সেই স্থানটি শূন্য

---

* শরৎকালের কোকিলের কুহুস্বর শ্রবণে পাঠক পাঠিকাবর্গ চমকিত হইবেন না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার ছোট নাগপুরের অনেক স্থানে বারমাস কোকিল ডাকে। যে কৈলাস গিরিকে চির বসন্ত বিদ্যমান, সেখানে যে বসন্তসখাও থাকিবে তাহার আর বিচিত্রতা কি?

দেখিয়া হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করিত। বৌ-দিদির সহিত প্রথম দিন মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া গৃহে ফিরিবার সময় যে স্থানে হরনাথের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয়, সেই স্থানটি তাহার সুমধুর স্মৃতির সহিত বিজড়িত হইয়াছিল। সে প্রত্যহ সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইত, কিম্বা শৈলজা সঙ্গে থাকিলে মৃদু মন্দ গতিতে চলিত এবং মনে করিত হয়ত তাঁহার সহিত আবার সেই স্থানে হঠাৎ সাক্ষাৎ হইবে? সে কাত্যায়নীর মন্দিরে আসিয়া বৃদ্ধ পুরোহিতের সহিত গল্প করিতে করিতে যখন পূজার জন্য পুষ্পমালা ও বিল্বপত্র মালা গাঁথিত, তখন কাহারও সামান্য পদশব্দে চমকিত হইয়া মনে করিত বুঝি হরনাথ মন্দিরে প্রবিষ্ট হইতেছেন! হরনাথের সেই দিনের সেই কথাটি সর্ব্বদাই তাহার হৃদয়ে জাগিতেছিল। 'দুর্গারাণীর মত ধর্ম্মপত্নী লাভ করা সৌভাগ্যের কথা সন্দেহ নাই; কিন্তু ভাগ্যবল চাই।" দুর্গারাণী সেই কথার অর্থ ভালরূপে বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে ভাবিত "কার ভাগ্যবল? তাঁর না আমার? আমি কি তাঁর যোগ্য? কত তপস্যা ক'র্‌লে তাঁর মত স্বামী পাওয়া যায়। আমার কি গুণ আছে? আমার কি গুণের কথা তিনি ব'ল্‌লেন? ছি, ছি, ছি—তাঁর কথা শুনে আমার বড় লজ্জা হ'য়েছিল। তাঁর মত স্বামী পেলে আমিই সৌভাগ্যবতী হ'ব। তাঁর আর সৌভাগ্য কি?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দুর্গারাণী কখন কখন কৃষ্ণপুরে হরনাথের বাটীর কথা চিন্তা করিত। বাটীটি কেমন সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাটীর প্রশস্ত উঠানের মধ্যে নিবিড় পত্র পল্লব সমন্বিত বকুল গাছটি পক্ষীর কলরবে সর্ব্বদাই কেমন মুখরিত! হরনাথের গৃহে রাশীকৃত কত বই ও পুঁথি। এই সমস্ত বই তিনি পড়িয়াছেন! হরনাথের জননী কেমন স্নেহময়ী! আচ্ছা, তিনি একাকিনীই সংসারের সমস্ত কাজ কর্ম্ম করেন, এবং একাকিনীই রন্ধন করিয়া সকলকে ও টোলের ছাত্রগণকে খাওয়ান। দুর্গারাণী যখন সেখানে যাইবে, তখন তাহার পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইবে। দুর্গারাণী নিজেই রন্ধন করিয়া স্বামীকে ও তাঁহার ছাত্রগণকে খাওয়াইবে, এবং স্বামীর অবসর সময়ে তাঁহার কাছে বসিয়া কত শাস্ত্রের কথা ও কত দেবদেবীর কথা শুনিবে। দুর্গারাণী আরও ভাবিত, সে প্রত্যহ প্রত্যুষে তালপুকুরের সেই বাঁধা ঘাটে স্নান করিয়া সর্ব্বাগ্রে শিবের পূজা করিবে, তারপর গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। যে দিন পাহাড়ের নীচে শ্রীনাথবাবু ও হরনাথের সহিত তাহাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেদিনের কথা দুর্গারাণী এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলে নাই। সে কি সুন্দর ও চমৎকার ব্যাপার! স্বামীর সহিত তাহার সেই প্রথম সাক্ষাৎ! হরনাথকে

দেখিয়া তাহার কত লজ্জা ও আনন্দ হইয়াছিল! হরনাথও তাহাকে দেখিয়া কেমন এক রকম হইয়া গিয়াছিলেন। বিবাহের পর সেই ঘটনার কথা তুলিয়া দুর্গারাণী হরনাথকে কত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে; কিন্তু দুর্গারাণী হরনাথের প্রশ্নের কোনও যথার্থ উত্তর দিবে না; সে ভারি মজা হইবে!

"ও রাণি, ও রাণি, সন্ধ্যে হ'য়ে গেল; এখনও তুমি একলাটি এখানে ব'সে র'য়েছ যে!" অকস্মাৎ শৈলজার কণ্ঠস্বর শুনিয়া দুর্গারাণী চমকিত হইয়া উঠিল। কোজাগর লক্ষ্মীপূজার জন্য শৈল তাহাকে মন্দাকিনী হইতে এক কলস জল আনিতে বলিয়াছিল। কিন্তু সেদিন সে মন্দাকিনীর ধারে একটী শিলাতলে বসিয়া বসিয়া উক্তরূপ চিন্তাস্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়াছিল। কখন যে সূর্য্যদেব অস্তগমন করিয়াছেন এবং পূর্ণিমার চন্দ্র ধীরে ধীরে আকাশ কোলে উদিত হইতেছিলেন, তাহা সে লক্ষ্য করে নাই। বৌ-দিদির কণ্ঠস্বর শ্রবণে সহসা তাহার চমক ভাঙ্গিল, এবং সে অতিশয় লজ্জিতা হইয়া তাড়াতাড়ি মন্দাকিনী জলে কলস পূর্ণ করিল। শৈল হাসিতে হাসিতে বলিল "একলাটি ব'সে ব'সে এত কি ভাব্‌ছিলে? তোমার বরকে বুঝি? তোমার বরকে ক'দিন দেখ্‌তে না পেয়ে তুমি যে শুকিয়ে গেলে!"

দুর্গারাণী অপ্রতিভ হইয়াছিল, কিন্তু একটু হাস্যের ভান করিয়া বলিল "তোমার কি ধারার যে কথা, বৌ-দিদি! কেন, তাঁকে ছাড়া আর কিছু ভাববার নাই বুঝি?"

শৈল বলিল,—"নিশ্চয় নাই। তোমার মন এখন হরময় হ'য়েছে। তিনিও দুর্গাময় হ'য়েছেন। ঠাকুরপোর সঙ্গে তোমার দেখা হ'য়েছে?"

দুর্গারাণী বিস্মিত হইয়া বলিল,—"তুমি ক্ষেপেছ না কি? তিনি রইলেন কৃষ্ণপুরে, আর আমি রইলাম এখানে। তাঁর সঙ্গে মনে মনে দেখা হ'বে না কি?"

শৈলজা বলিল "মনে মনে তো দিবানিশি দেখা হ'চ্ছেই। এখন চোখে চোখে দেখা করবে চল। তিনি লক্ষ্মী পূজো ক'রাতে এসেছেন। লক্ষ্মীর মন্দিরে গেলেই তাঁর সঙ্গে দেখা হ'বে। চল, আমিও সেখানে যাচ্ছি।

দুর্গারাণী লজ্জায় কক্ষ হইতে কলস নামাইয়া দিয়া বলিল, "না, আমি এখন সেখানে যাব না। তুমি যাও।" এই বলিয়া পাশ কাটাইয়া বাটীর দিকে দ্রুতপদে নামিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

৩য় ভাগ। অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩২১। ৮ম ও ৯ম সংখ্যা।

(মোক্ষ)

স্তব্ধা।

১

মানস-লোচনে পেখল রাই ;
'অপর বধূ সঞ্জে মিলল কানাই।'
কহইতে লাগল ভুলি' অভিমান,—
কামিনী অন্তর কো বিহি জান ?

২

"আজু কোই কুলবতী, হাম'সে গুণবতী পাওল মধুরিপু সঙ্গ ?
তোষয়িতে তছু মন করতহি সুযতন রসরাজ কতহুঁ তরঙ্গ !

৩

"ধনী মুখমণ্ডল লেই নিজ করতল রচতহি তিলক মধুর ;
শোহই—যৈছন কালিম-লাঞ্ছন সমুজল বদন বিধুর !

৪

"জলদ পটল নিভ রুচির চিকুর ধরি" হিঙ্গুল-অঙ্গুলী মাহ
আনত মুখে, তঁহি কুরুবক-ফুলদলে কবরী বনাওত নাহ।

৫

"মৃগ-মদে রঞ্জয়ি তারা-হার দোলয়ি গণতহি হৃদয় কি ঘাত ;
গুরু তছু কম্পন করতহি জ্ঞাপন মাতল মরম কি বাত।

৬

"নায়িকা-পাণিতল জনু নলিনীদল, ভুজযুগ বিশদ মৃণাল ;
তঁহি পর অলি যনি মরকত-কাঁকনি দেওত নন্দ-দুলাল।

৭

"প্রেম-পুলকময়ী তা'কর অরুণিম কিশলয়-রুচির চরণ ;
ধারয়ি হৃদিমাহ, যাবক রঞ্জিতে রঞ্জই উরস আপন।

৮

"এত লখল যব, লাজহি নীরব বালি-বদনে মৃদুহাস,
নয়ন নিমীলয়ি গদ গদ কূজয়ি ঘন ঘন ছোড়ত শ্বাস।

৯

"তৈখন মঝু পঁহু হাসয়ি লহু লহু বাহু পসারয়ি দেলি,
সব কছু পাশরি' ভীত কপোতিনী নাহ-হৃদয়ে নীড় নেলি।

১০

"কতি সুখ-ভাগিনী শ্যাম-সোহাগিনী যা' পর অনুকুল কান্ত,
মাধব-বঞ্চিতা— ভুজঙ্গ তনতহি— লুটাওব তছু পদ-প্রান্ত।"

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

মোক্ষ]

উপনিষদ্-প্রতিপাদ্য ভূমা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

অনুভব।

"মনো নিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ জ্ঞান-প্রবাহা-বিমলাদি-গঙ্গা"— শঙ্করাচার্য্যঃ।

যেখানে এই সমস্ত নাই, ইহার বৃত্তিও নাই, তাহার পরে যাহা শেষ সূক্ষ্ম থাকে, তাহা আকাশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম, নির্ম্মল, অনন্ত, পরম শূন্য, যেথানে শূন্যেরও অভাব, শান্ত, এক অদ্বিতীয়, বায়ু ব্যতিরেকে, আত্মা মাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস প্রশ্বাস যুক্ত, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, জ্ঞানাত্মক, স্বয়ংবেদ্য

পেখল-দেখিল, সঙ্গে-সঙ্গে, বিহি-বিধি, জান জানে, কোই-কোন, সো-সে-আমা হইতে, তছু-তাহার, লেই-লইয়া, শোহই-শোভে, যৈছন-যেমন, সমুজল-সমুজ্জ্বল, বিধুর-চন্দ্রের, মাহ মধ্যে, তঁহি-তাহাতে, নাহ-নাথ, মৃগমদে-কস্তুরীতে, মাতল-মত্ত, যনি-যেন, তা'কর-তাহার, যাবক অলক্ত, এত-এইসব, লখল-লখিল, লাজহি-লজ্জায়, বালি-বালা, তৈখন-তখনি, পঁহু-প্রভু, লহু-লঘু,

নির্গুণ ব্রহ্ম।

"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ সূক্ষ্মঃ সদানন্দো নিরাময়ঃ।
বিকার রহিতঃ সাক্ষী শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ॥"

ব্রহ্মের চমৎকার বা চমক্ বৈদূর্য্যমণির ন্যায় শক্তির স্ফুরণোন্মুখতা। ইহা স্বাভাবিক সর্ব্বেশ। যখন বোধের বশে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় ক্ষয় হয়, তখন যাহা শেষ থাকে, তাহা সম্বিৎতত্ব বা আত্মতত্ব। ব্রহ্ম আদি নাম দ্বারা কথিত শুদ্ধ, আকাশ হইতে সূক্ষ্ম, যাহার সমক্ষে আকাশও স্থূল, যেরূপ অণুর সমক্ষে সুমেরু স্থূল।

সম্বিৎতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব।

সৃষ্টিক্রমঃ। "আদৌ সচ্চিদানন্দাল্লীনা শক্তিরুচ্ছূনরূপতয়াঽভিব্যক্তা"।

তাহাতে যে বেদনা শক্তি আভাস রূপে স্ফুরিত হয় তাহার নাম চেতন।

সম্বেদন—"পার্থক্যেন ব্যবহার্য্যোঽভূৎ"।

ব্রহ্মের চমক্ দর্শন দ্বারা বালকের বৈতাল দর্শনের ন্যায় তাহার নাটকে "অহমস্মি" রূপে আপনাকে 'অহং' জ্ঞান করিতে লাগিলেন; অর্থাৎ ব্রহ্মের চমক্‌কে "আমি" বলিয়া বোধ। এই 'অহং জ্ঞানের' সহিত চেতন-কলা বা স্পন্দ-কলা মিলিত হইয়া নিত্য।

মহামায়া বা পরাশক্তি।

"তস্মাদ্বিনির্গতা নিত্যা সর্ব্বগা বিশ্ব-সম্ভবা"। "সর্ব্বমাপোময়ং জগৎ"। "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিঃ"।

"শিবেচ্ছয়া পরাশক্তিঃ শিবতত্ত্বৈকতাং গতা।
ততঃ পরিস্ফুরত্যাদৌ স্বর্গে তৈলং তিলাদিব॥"

পরাশক্তির দুই অবস্থা—পূর্ব্বাবস্থা এবং উত্তরাবস্থা। যখন শিবোন্মুখী বা নিরাময় পদোন্মুখী 'হং'রূপ তখন তাহাকে পরাশক্তি কহে। এবং যখন প্রবুদ্ধ হন, তখন তিনি নাদাত্মক হয়েন।

পরাশক্তি (ত্রিপাদ পুরুষ)　　　নাদাত্মক (একপাদ)

নাদ—

"পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।"

নাদ (পূর্ব্বাবস্থা)

চেতন আকাশে মহামায়ার স্বত্ব-বৃত্তি দ্বারা সৎ চিৎ আনন্দরূপ জ্ঞানে পরব্রহ্মের লাটে স্থিতি।

পরমাত্মা

মুখ্যসমানাধিকরণ "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য দ্বারা উভয়ের একতা এবং পরমাকাশে স্থিতি

বিন্দু (উত্তরাবস্থা)

মহামায়ার স্বত্ত-বৃত্তি দ্বারা (চৈত্য) সৎ চিৎ আনন্দের বৃত্তিকে আপ্ তেজ অন্ন রূপ জ্ঞানে আনন্দকে অন্য বস্তু রূপে দর্শন।

প্রত্যগাত্মা

জীব সংজ্ঞা—(অবিদ্যা উপহিত চৈতন্য)

নাদের ঘনীভাব ক্রিয়া প্রধান অবস্থা। স্বপ্ন নগরীর ন্যায় চিদ্‌ঘন আত্মার আশ্রয়ে উৎপন্ন হইয়া জীব আপনার শরীরকে দেখে।

সত্য | জ্ঞান | অনন্ত | আনন্দ

চিন্মাত্র জ্যোতির সন্নিধি বশতঃ সেই তত্ত্ব-সংজ্ঞা নাদ ঘনীভূত হইয়া বিচিকীর্ষু অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি সম্পন্ন হইয়া বিন্দুতা প্রাপ্ত হন। ঐ বিন্দু চিদ্‌শক্তি উভয়াত্মক। ক্ষোভ ক্ষোভক এবং সম্বন্ধ রূপে ত্রিবিধ।

ঈশ্বর (সমষ্টি অজ্ঞানে অভিব্যক্ত)

ক্ষেত্রজ্ঞ | সাক্ষী | কূটস্থ | অন্তর্য্যামী

ক্রিয়াশক্তি প্রধান বিন্দুরূপী প্রকৃতি হইতে অখণ্ড শব্দ ব্রহ্মাত্মা "খ" (নাদ মাত্র)। এই শব্দ ব্রহ্ম - শব্দার্থ রূপ অণ্ডের স্ফোটও নহে এবং শব্দ রূপ বাহ্য স্ফোটও নহে, উভয় শব্দের জড়ত্ব হেতু এবং তাহাদের সম্বন্ধে ব্রহ্ম শব্দের অনর্থকত্ব হেতু শব্দ ব্রহ্ম চৈতন্যই হন। এই শব্দ ব্রহ্ম পরা নামক শব্দাবস্থা চৈতন্যরূপী কুণ্ডলিনী শক্তি।

জীবাত্মা—(ব্রহ্মরন্ধ্রে অভিব্যক্ত)

আদি যে জীব স্ফুরিত হইয়াছে, অথচ প্রমাদ প্রাপ্ত হয় নাই।

আপনার স্বরূপ বিষয়ে অহং প্রত্যয় রহিয়াছে এই কারণে ঈশ্বর। তাঁহার এই নিশ্চয় থাকে যে আমি সনাতন নিত্য শুদ্ধ পরম আনন্দ স্বরূপ অব্যক্তরূপ পরম পুরুষ। এই শুদ্ধ-স্বত্ব প্রধান মায়া বিশিষ্ট বা প্রতিবিম্বিত চৈতন্য, যিনি সকল ব্যষ্টি জীবের হৃদয়ে থাকিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মানুসারে জানাইতেছেন। "ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জ্জুন তিষ্ঠতি।" ইত্যাদি।

শিবাত্মক হেতু	শক্ত্যাত্মক হেতু	সম্বন্ধরূপে
বিন্দু সংজ্ঞা	বীজ সংজ্ঞা	নাদ সংজ্ঞা

এই নাদ ও বিন্দু পূর্ব্বোক্ত নাদ ও বিন্দু হইতে ভিন্ন। পূর্ব্বোক্ত নাদ ও বিন্দু কারণ রূপ, এই নাদ ও বিন্দু কার্য্য রূপ। এই তিন হইতে তিন শক্তি।

ইচ্ছাশক্তি	ক্রিয়াশক্তি	জ্ঞানশক্তি
রুদ্র (১)	ব্রহ্মা (২)	বিষ্ণু (৩)

"মাহাত্ম শক্তিং স্বগুণৈ নিগূঢ়াং মুনয়ো বিদন্ স্বভাবাবিষ্ট-ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া চ।"

অথ অর্থ সৃষ্টি-

শম্ভুর শক্তি ভাব প্রাপ্ত অন্ন (অব্যাকৃত) হইতে অরূপ কাল সহায় দ্বারা মায়াত্মন বিন্দুরূপ প্রাপ্ত সৃষ্টিস্থিতি ধ্বংস নিগ্রহ অনুগ্রহ

এই উভয়ের মধ্যে সামানাধিকরণ

আদি জীব উৎপন্ন হইয়া যে যে প্রকার সঙ্কল্প করিয়াছেন সেইরূপ হইয়া স্থিত হইয়াছেন। বাস্তবিক আদি জীব সমেত সমস্ত অসৎ। পরমাকাশের এক নিমিষে উৎপত্তি আর উন্মেষে লয়। কেবল অহঙ্কারের সহিত বাসনার সম্বন্ধ হওয়াতে আকার দর্শন। এই মলিন স্বত্ব প্রধান অবিদ্যা বিশিষ্ট বা প্রতিবিম্বিত চৈতন্য জীবাত্মা ব্যষ্টি. যিনি কর্ম্মানুসারে নানারূপে জন্ম মরণ পথে পরিভ্রমণ করেন।

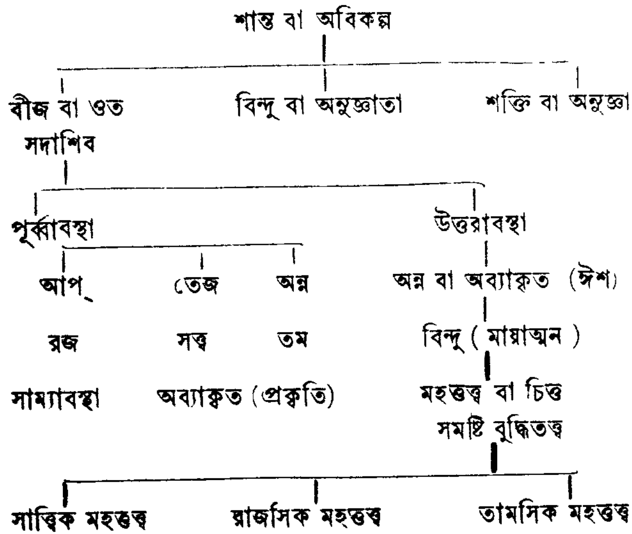
পরাশব্দ (মূলাধারে অভিব্যক্ত)

"সূক্ষ্মা কুণ্ডলিনী মধ্যা জ্যোতির্ম্ময়-স্বরূপিণী।
অশ্রোত্র বিষয়া তস্মাদুগ্ধ কূণ্ডূর্দ্ধগামিনী ॥"

পশ্যন্তি	মধ্যমা	বৈখরী
(স্বাধিষ্ঠানে অভিব্যক্ত)	(হৃদয়ে অভিব্যক্ত)	(জিহ্বাতে অভিব্যক্ত)

"স্বয়ম্প্রকাশা পশ্যন্ত সুষুম্নাশ্রিতা ভবেৎ।
শৈব হৃৎপঙ্কজং প্রাপ্য মধ্যমা নাদরূপিনী ॥
ততঃ সঙ্কল্পমাত্রাস্যাদিবিভক্তোর্দ্ধগামিনী।
সৈবোরঃ কণ্ঠতালুস্থা শিরোঘ্রাণরদস্থিতা ॥
জিহ্বা মূলোষ্ঠ নিষ্ঠ যুত রূপ বর্ণ পরিগ্রহা।
সর্ব্ব প্রপঞ্চ জননী শ্রোত্রগ্রাহ্যা তু বৈখরী ॥"

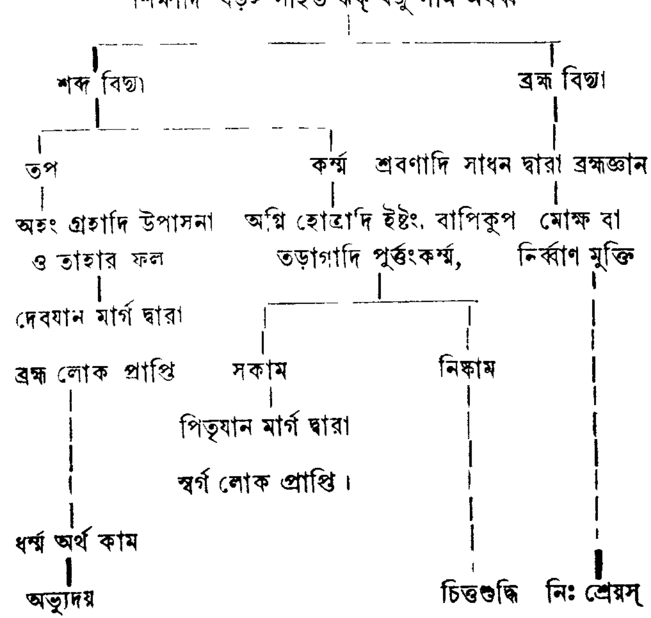
কার্য্য পঞ্চকের কর্ত্তা অতএব জগন্নির্ম্মাণ বীজ রূপ জগৎ সাক্ষী সদাশিব উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তৎপরে ক্রমশঃ ঈশ, রুদ্র, বিষ্ণু, ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সমস্ত সৃষ্টির মূলরূপ অব্যাকৃত হইতে সৃষ্টি উন্মুখ বিন্দু, বিন্দু মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হইল।



ইয়ং শব্দ সৃষ্টিঃ——বেদরাশি

"অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতং ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গীরসঃ" (বেদঃ)

"বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ" চণ্ডী



বিষ্ণু (৩) — বৈকারিক অহঙ্কার — দেবতাগণ, দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মন ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

ব্রহ্মা (২) — তৈজস অহঙ্কার — দশ ইন্দ্রিয়

রুদ্র (১) — ভূতাদি তামস্ অহঙ্কার — আপ্, তেজ, অন্ন এই তিনের ত্রিবৃৎকরণ দ্বারা অপঞ্চীকৃত আকাশ।

অপঞ্চীকৃত আকাশ

কার্য্যগুণ (শব্দ তন্মাত্র)

অপঞ্চীকৃত বায়ু

কারণ গুণ — শব্দ

কার্য্যগুণ — স্পর্শ তন্মাত্র

অপঞ্চীকৃত তেজ

কারণ গুণ — শব্দ ও স্পর্শ

কার্য্যগুণ — রূপ তন্মাত্র

অপঞ্চীকৃত জল

কারণ গুণ — শব্দ স্পর্শ রূপ

কার্য্যগুণ — রস তন্মাত্র

অপঞ্চীকৃত পৃথিবী

কারণ গুণ — শব্দ স্পর্শ রূপ রস

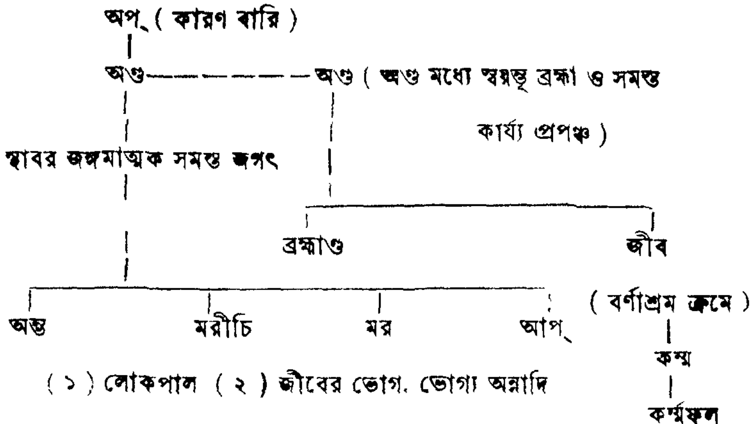
কার্য্যগুণ — গন্ধ তন্মাত্র

অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত।

এইরূপে অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতে পরব্রহ্মের অধিষ্ঠান হেতু প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বরূপে পঞ্চীকরণ দ্বারা পঞ্চ স্থূল মহাভূত সৃষ্ট হইল।

আকাশ — বায়ু — তেজ — জল — পৃথিবী

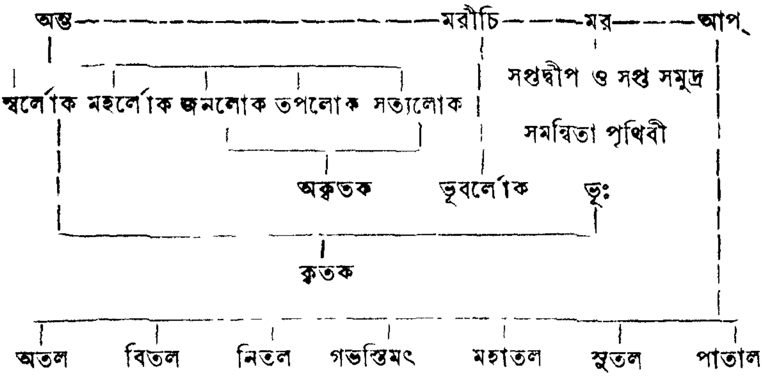
পঞ্চীকৃত আপ্ বহুল পঞ্চ মহাভূত হইতে (অপ্)



(১) লোকপাল (২) জীবের ভোগ. ভোগ্য অন্নাদি

(৩) ভোক্তাস্থান দেব, মনুষ্য পশু আদি স্থূল শরীর।

"অপ্ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজ মবাসৃজৎ।
তদণ্ড মভবদ্ধৈমং সহস্রাংশু সমপ্রভম্॥" (মনু)



মহামায়ার পূজা।

"যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং, চরাচরং ভাতি মনোবিলাসম্॥"
"সচ্চেদসুখৈকং জগদাত্মরূপং. সা কাশিকাহং নিজবোধরূপং॥ শঙ্করাচার্য্যঃ,

ছান্দোগ্য উপনিষদোক্ত নারদ ও সনৎকুমার বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া এক্ষণে সর্ব্ব জ্ঞানের সমুদ্র গৌরীশকে ভগবান বশিষ্ট দেব ভূমা বিষয়ক সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং চন্দ্রকলাধারী তাঁহাকে যাহা উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করা যাইতেছে। বশিষ্ট বলিলেন "হে ভগবন্ আপনি ভূত

ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিন কালের ঈশ্বর এবং সর্ব্ব কারণের কারণ; আপনার প্রসাদে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সমর্থ হইয়াছি। হে মহাদেব! যাহা কিছু আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন চিত্তে তত্ত্ব বিষয়ে উদ্বেগ ত্যাগ করিয়া শীঘ্র বলুন। হে সর্ব্ব-পাপ নাশক এবং সর্ব্ব-কল্যাণ বর্দ্ধক! দেব অর্চ্চনার বিধান আমাকে উপদেশ দিন।" ঈশ্বর বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ! যে দেব-অর্চ্চনা শ্রেষ্ঠ, যাহা করিলে মনুষ্য সংসার-সমুদ্র হইতে পার হইয়া যায় তাহা শ্রবণ কর। হে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ! পুণ্ডরীকাক্ষ যিনি বিষ্ণু, তিনি দেব নহেন, ত্রিলোচন যিনি শিব, তিনিও দেব নহেন, পদ্মযোনি যিনি ব্রহ্মা, তিনিও দেব নহেন, এবং সহস্রাক্ষ ইন্দ্রও দেব নহেন, পবনও দেব নহেন, সূর্য্যও দেব নহেন। অগ্নি, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, তুমি, আমি, এই দেহ, চিত্ত এবং রূপ কেহই দেব নহে; অকৃত্রিম, অনাদি অনন্ত সম্বিদ্ রূপই দেবনামে কথিত হন। অপর আকারাদি পরিচ্ছিন্ন রূপ, তাহা বাস্তবিক কিছুই নহে। এক অকৃত্রিম অনাদি অনন্ত চেতনরূপ দেব আছেন, সেই দেব মহামায়া শব্দ দ্বারা অভিহিত হন; তাঁহার যে পূজা, তাহাই পূজা। সেই দেব সর্ব্বত্র বিরাজিত জানিবে। যাঁহা হইতে এই সমস্ত হইয়াছে, যাহার সত্তা সান্ত আত্মরূপ; "সর্ব্ব স্থানে তাঁহাকেই দেখিবে" এই তাঁহার পূজা। যিনি সেই সম্বিৎ-তত্ত্বকে জানেন না, তাঁহার জন্য আকারের অর্চ্চনা কথিত হইয়াছে। যেরূপ যে ব্যক্তি যোজন পর্য্যন্ত না চলিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে এক ক্রোশ, দুই ক্রোশ চলা ভাল, সেইরূপ যে ব্যক্তি অকৃত্রিম দেবের পূজা করিতে সমর্থ নহেন, তাঁহার পক্ষে সাকার পূজাই ভাল। হে ব্রাহ্মণ! যাঁহার ভাবনা যিনি করেন, তাঁহার সেই অনুসারে ফল লাভ হয়। যিনি প্রচ্ছন্নের উপাসনা করেন, তাঁহার ফলও প্রচ্ছন্ন লাভ হয়; এবং যিনি অকৃত্রিম আনন্দ অনন্তদেবের উপাসনা করেন, তাঁহার ঐ পরমাত্মা রূপ ফল লাভ হয়। হে সাধো! অকৃত্রিম ফল ত্যাগ করিয়া কৃত্রিমকে যে চাহে সে কি করে? যেরূপ কেহ মন্দার বৃক্ষের বন ত্যাগ করিয়া করঞ্জুর বন প্রাপ্ত হয়, সে সেইরূপ করিয়া থাকে। সেই দেব কিরূপ, এবং তাঁহার পূজাই বা কি? এবং পূজা কিরূপেই বা হয় তাহা শুন। তিন ফুল আছে, সেই ফুল দ্বারা তাঁহার পূজা হয়। (১) এক বোধ (২) এক সাম্য, (৩) এক শম এই তিন পুষ্প। সম্যক্ জ্ঞানের নাম বোধ অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব যেরূপ সেইরূপ জানা। সাম্য অর্থে এই যে, সর্ব্ব স্থলে পূর্ণ দর্শন। শম অর্থে চিত্ত নিবৃত্তি করা অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব ব্যতিরেকে অন্য কিছু

স্ফুরণ না হয়। এই তিন ফুল দ্বারা জীব চিন্মাত্র শুদ্ধ দেবের পূজা হইয়া থাকে। হে মুনীশ্বর। বোধ, সাম্য ও শম এই তিন পুষ্প দ্বারা আত্মা দেবের পূজা করা ইহাই দেবের পূজা। সাকার অর্চ্চন দ্বারা অর্চ্চনা হয় না। যিনি আত্ম সম্বিৎ চিন্মাত্র, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অপর জড়কে যে অর্চ্চনা করে, সে চিরকাল ক্লেশ ভোগ করে অর্থাৎ জন্ম মরণ রূপ সংসারে ভ্রমণ করে। হে ব্রাহ্মণ! জ্ঞেয় পুরুষের যে যথার্থ জ্ঞান, তাহা আত্ম ধ্যান ব্যতিরেকে অন্য পূজন অর্চ্চন বালকের ক্রীড়ার ন্যায় মানে। আত্মা ও ভগবান একই দেব। তিনি 'শব পরম কারণ রূপ সর্ব্বদা তাঁহারই জ্ঞান, অর্চ্চন পূজন কর্ত্তব্য; অপর পূজা কিছুই নাই। ঋগ্বেদ প্রমাণে জানা যায় "আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরং কিং চ নাম।" সেই এক অদ্বিতীয় বায়ু ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস প্রশ্বাস যুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ঐতরেয় যথা—"আত্মা বৈ ইদমেকমগ্র আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চন মষৎ"। সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মাই ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। চেতন আকাশ অবয়ব স্বভাব নামে তুমি এক আত্মাদেবকে জান; অপর পূজ্য, পূজক, পূজা এই ত্রিপুটী দ্বারা আত্মা দেবের পূজা হয় না। বশিষ্ঠ বলিলেন, "হে ভগবন্! চেতন আকাশ মাত্র। আত্মার যেরূপ জগৎ এবং চেতনকে যেরূপে জীব কহা যায় তাহা আপনি বলুন। ঈশ্বর বলিলেন চেতন আকাশ প্রসিদ্ধই আছে। যিনি সকল প্রকৃতি হইতে রহিত, যিনি মহাকল্পে শেষ থাকেন, তিনি নিজেই কোন রূপ হন। যেই কিছু দ্বারা এই জগৎ হইয়াছে। ঋগ্বেদ্ প্রমাণে জানা যায় তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে সলিলং সর্ব্বমা ইদং তুচ্ছনাত্বভিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্, মহিনা জায়তৈকং"। অর্থ—অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল, চতুর্দ্দিকে জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যা প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন। এক্ষণে দুর্ভাগ্যবশতঃ ভগবানের প্রথমতা (হিরণ্যগর্ভঃ প্রথমঃ শরীরী) বর্ণন করিবার জন্য প্রথম মনু ভগবান উক্ত সৃষ্টি ক্রম আশ্রয় করিয়া সেই সৃষ্টিকালের পূর্ব্ব অবস্থা বর্ণন করা যাইতেছে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই সম্পূর্ণ কার্য্য জগৎ আপনার উৎপত্তির পূর্ব্বে তম রূপ হইয়াছিল। "তম এব ইদমগ্র আসীৎ" সেই তম কিরূপ? প্রত্যক্ষ প্রমাণের অযোগ্য এবং কার্য্য রূপ হেতু হইতে অনুমান করিবার অযোগ্য এবং শব্দ দ্বারাও বর্ণন করা যায় না; এবং সুষুপ্ত পুরুষের ন্যায় কার্য্য করিতে অসমর্থ। পর ছায়াতে বালকের বৈতাল জ্ঞানের ন্যায় এরূপ তম এই জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে হইয়াছিল।

এখানে তমের সমান আচরণ করিতে সমর্থ যে অব্যাকৃত মায়া, অবিদ্যা ইত্যাদি শব্দের বাচ্য অর্থ রূপ জ্ঞান, সেই অজ্ঞান উপহিত সত্য বস্তুর নাম তম। এক্ষণে এই অর্থে "নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং কিন্তুহভূদমঃ" এই শ্রুতির অর্থ প্রমাণ রূপে বর্ণন করা যাইতেছে। হে ব্রাহ্মণ ইহলোকে অসৎ শব্দ দ্বারা কথন করিবার যোগ্য যে অভাব, সেই অভাবও এই জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না। এবং ইহলোকে সৎ শব্দ দ্বারা কথন করিবার যোগ্য যে ভাব পদার্থ, সেই ভাব পদার্থও এই জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না। ইহলোকের তেজের বিরোধী রূপ প্রসিদ্ধ যে অন্ধকার, সেই অন্ধকারও এই জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না। আর এই আকাশাদি পঞ্চভূতও ছিল না। এই দিন ও রাত্রি ছিল না এবং প্রাতঃকাল ও সায়ংকাল এই দুই প্রকার সন্ধ্যা এই জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বেও ছিল না। এই দুই প্রকার সন্ধ্যার চিহ্ন রূপ যে সূর্য্য চন্দ্রমা ইত্যাদি তেজও এই জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না। কিন্তু প্রসিদ্ধ তমের ন্যায় আত্মার স্বরূপ আচ্ছাদন করিতে সমর্থ কারণ-তত্ত্ব এই জগতের পূর্ব্বে হইয়াছিল। যেরূপ বালক আপন পরছায়াতে বৈতাল কল্পনা করিয়া নিজেই ভয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ঐ মিথ্যা বৈতাল নিজের স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ পরমাত্মা বা প্রত্যগাত্মা নিজের সঙ্কল্প দ্বারা আবৃত হইয়া আপনাকেই জগৎ রূপে বোধ করিয়া থাকেন; বাস্তবিক উহা অন্য বস্তু—কিছুই নহে। এই কারণ-তত্ত্ব মৃত্যু রূপেও জ্ঞাত নহে এবং অমৃত রূপেও জ্ঞাত নহে। এখানে সংহার করিতে সমর্থ তাহার নাম মৃত্যু এবং বৃদ্ধির কারণ রূপ যে আহুতির পরিণাম তাহার নাম অমৃত। সেই মৃত্যু ও অমৃত উভয়ে দ্বৈত অবস্থায় থাকে, অদ্বৈত অবস্থায় থাকে না। পুনঃ সেই কারণ-তত্ত্ব কিরূপ? এই জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে অস্পষ্ট নাম রূপ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই কারণে বেদান্ত শাস্ত্রে এই কারণ-তত্ত্ব অব্যাকৃত নামে কথিত হইয়াছে। সেই অব্যাকৃত নামক তত্ত্ব এই সমস্ত জগতের নাম রূপের কারণ। কিন্তু সেই অব্যাকৃত নিজে কারণের অপেক্ষা রহিত এক অদ্বিতীয় রূপ। এজন্য শ্রুতিতে ইহা স্বপর নির্ব্বাহক নামে উক্ত হইয়াছে। ইহা কেবল শ্রুতি বাক্য গম্য এবং সর্ব্ব লক্ষণ রহিত। আর ইহলোকে বাস্তব এবং বিদ্যমান পদার্থ কারণ হইয়া থাকে। অবাস্তব এবং অবিদ্যমান পদার্থ কারণ হইবে না; কিন্তু এই অব্যাকৃত নামক তত্ত্ব তো বাস্তবিক অবিদ্যমান হইয়াও এই জগতের কারণ হইতেছে। ইহলোকে অনাদি ভাব রূপ পদার্থের অবিনাশীপণা প্রসিদ্ধ আছে। যেরূপ আত্মা অনাদি

তাব রূপ হওয়াতে অবিনাশী কিন্তু এই অব্যাকৃত নামক তত্ত্ব জড় রূপ হওয়াতে পরতন্ত্র হইয়াও অক্রিয় অসঙ্গ আত্মার সংস্রবে কর্ম্মাদির কারণ হইয়া থাকে। যেরূপ লৌহ জড় হইয়াও অক্রিয়, অসঙ্গ চুম্বকের সংস্রবে ক্রিয়াবান হয়, সেইরূপ অনির্ব্বচনীয়তার বোধক অনেক প্রকার দুর্ঘট লক্ষণ বিশিষ্ট শুদ্ধ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব যুক্ত অব্যাকৃত নামক কারণ যাহার শরীর, তিনি ঈশ্বর। সলিল হইতে যেরূপ ফেন বা বুদ্‌বুদাদির সৃষ্টি হয় এবং সেই ফেন বুদ্‌বুদাদি যেরূপ সলিলেই মিশিয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞান প্রবাহ রূপ জগৎ বীজ যে আত্মায় নাম রূপ অব্যাকৃত ভাবে লুক্কায়িত ছিল, সেই অব্যাকৃত নাম রূপ আত্মাই সঙ্কল্প বশে জগতের উপাদান কারণ। "সঙ্কল্লাদেব তু তৎশ্রুতেঃ" (ব্রহ্মসূত্র)। এখানে প্রসঙ্গ ক্রমে বিজ্ঞান বাদী বুদ্ধ মতের এবং বেদান্তমতের বৈলক্ষণ্য দেখা যাউক। বিজ্ঞান বাদ বেদের অভিমত বটে, কিন্তু বুদ্ধ যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন সে ভাবে নহে। উভয়ের মধ্যে বিশেষ এই যে বুদ্ধ বলেন প্রতিক্ষণে উৎপত্তি বিনাশশীল বুদ্ধি-বিজ্ঞানই আত্মা। বেদান্ত মতে বিজ্ঞান যে আত্মা একথা সত্য, কিন্তু সে বিজ্ঞান ক্ষণিক বুদ্ধিবৃত্তি নহে; পরন্তু "বিজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য কথিত নিত্য নির্ব্বিকল্প নির্ব্বিকার ব্রহ্ম বিজ্ঞান। বুদ্ধ বলেন দৃশ্যমান বাহ্য জগৎ সত্য নহে; ইহা কেবল আন্তর-বুদ্ধি বিজ্ঞানের বিলাস বা কল্পনা মাত্র। বেদান্ত মতে বাহ্য জগৎ—কেবল বাহ্য জগৎ কেন ব্রহ্মেতর পদার্থ মাত্রই মিথ্যা; কিন্তু [illegible] জগৎ তোমার আমার কল্পনা-প্রসূত নহে। পরন্তু "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদি শ্রুতিবোধিত সর্ব্বজ্ঞ শক্তি মহামায়া বা পরমেশ্বরের সঙ্কল্প প্রসূত। অতএব মূল সৃষ্টির ইচ্ছা, মায়া বা সিসৃক্ষা হইতেই জগতের সৃষ্টি। ঋগ্বেদে কথিত আছে "কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।" এ সৃষ্টি আত্মার সর্ব্বজ্ঞতা শক্তির একটা বিকাশ মাত্র। ঈশ্বরের তপস্যা জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে। "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ"। কার্য্যের বিকাশ ইহার অনেক পরে হইয়াছিল। যেরূপ কোন ইঞ্জিনিয়ার বিশাল রাজবাটীর আলেখ্য ইট, চুণ, কাঠ ব্যতিরেকে মনে মনে সম্পাদন করিতে পারেন, পরে মিস্ত্রীরা সেই আলেখ্য অনুসারে ইট চুণ, কাঠ দ্বারা রাজবাটী নির্ম্মাণ করে। সেইরূপ ভগবান সঙ্কল্প মাত্র জগতের আলোচনা প্রথমে করেন, পরে হিরণ্যগর্ভ (সমষ্টি মন) সেই সঙ্কল্পানুসারে মায়া উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে, নির্গুণ ব্রহ্মে শশশৃঙ্গবৎ জগতের লেশ মাত্রও নাই, পরমাত্মাতে রজ্জু সর্পবৎ কল্পিত রূপে জগৎ বিদ্যমান আছে এবং সমষ্টি পুর্য্যষ্টকাতে প্রতিবিম্বিত

আভাস আত্মা হিরণ্যগর্ভে স্থূল জগৎ লক্ষিত হয়। এই পঞ্চীকৃত "আপ্" প্রধান তরল পঞ্চভূতকে মনু ভগবান 'অপ্' শব্দেই ব্যবহার করিয়াছেন।

"অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ।
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশু সমপ্রভম্" ॥

এই অপ্‌কেই কারণ-বারি বলা যায়; ইহাকেই 'কারণার্ণব' বলিয়া থাকে। (মহাভারত হরিবংশ এবং বিষ্ণুপুরাণ ও কূর্ম্ম পুরাণাদিতে দ্রষ্টব্য)। ঈরূপ আত্মা হইতে যেরূপ জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, সেইরূপ বিলোমক্রমে জগৎ আত্মাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। সমস্ত জগৎ মায়ায় প্রলীন হইলে, মায়াও ঈশ্বরে বিলীন প্রায় হইয়া থাকে। তখন আবার কোন প্রকার ব্যাপার বা ক্রিয়া না থাকায়, কিছু নাই বলিয়া বোধ হয়। এইজন্য ঐ অবস্থাই মহা প্রলয় শব্দে কথিত হয়; ঈশ্বর নিজ শরীরে সমস্ত জগতের সংহার কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। আবার তিনি ব্রহ্মে যাইয়াই বিলীন হন। ব্রহ্মকুণ্ডে বিশ্ব প্রপঞ্চের হোমকারী ঈশ্বরকে গ্রহণ করিয়া পরমাত্মা ইন্দ্র নিজ মহিমায় হোম করেন। আবার সেই ইন্দ্রই জ্ঞান প্রবাহ বশতঃ তরঙ্গের উচ্চ নীচ জ্ঞানের ভাবে উন্মত্ত (একাগ্র) হওয়াতে সর্ব্বজ্ঞ স্বভাব প্রযুক্ত সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় বিজ্ঞতা হেতু সংকল্প বশতঃ মায়ায় অভিরমণ করিয়া অবশেষে ব্রহ্মের অজ্ঞান প্রযুক্ত মায়ার অধীন হইয়া বহু ইন্দ্র হইয়াছিলেন। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপোইয়ায়"। যখন ক্রোধের বশে কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহার পর যাহা শেষ থাকে তাহা সম্বিৎ-তত্ত্ব বা আত্ম-সত্ত্বা। ব্রহ্ম আদি নাম দ্বারা কথিত; তিনি শুদ্ধ, আকাশ হইতে সূক্ষ্ম; তাঁহাতে সৎ চিৎ আনন্দ পরমাত্মা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম শাস্ত্রকারগণ কল্পনা করিয়াছেন। যেখানে এই সমস্ত নাই, ইহার বৃত্তিও নাই, তাহার পরে যাহা শেষ সত্ত্বা থাকে, তাহা আকাশ হইতে সূক্ষ্ম নির্ম্মল অনন্ত পরম শূণ্য, যেখানে শূণ্যেরও অভাব তাহা নির্গুণ ব্রহ্ম। তাঁহাতে জগৎ শশশৃঙ্গ বা 'খ' পুষ্পবৎ মিথ্যা। পরে পূর্ব্বোক্ত সম্বিৎ-তত্ত্বে যখন বেদনা শক্তি আভাসরূপে স্ফুরিত হয়, তাহার নাম চেতন (সম্বেদন)। এই চৈতন্যোন্মুখ সম্বিৎ-তত্ত্ব 'অহং' ভাব প্রাপ্ত 'অহমস্মি' রূপে আপনাকে 'অহং' জ্ঞান করিতে লাগিলেন; যেরূপ স্বপ্নে পুরুষ আপনাকে হস্তীরূপে দেখেন। 'অহং' দেখিবার পর পুনঃ দেশ কাল আকাশ প্রভৃতি দেখিতে লাগিলেন। তখন চেতন-কলা জীব অবস্থা প্রাপ্ত হইল এবং বাসনা করিবার উপযুক্ত হইল। যখন জীব ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক হইয়া স্থিত হইল; শব্দ এবং

ক্রিয়া জ্ঞান সংযুক্ত হইল, তখন স্পন্দ-কলা চৈতন্য ভাব ছাড়িয়া চিত্ত ভাব ধারণ করিল। এক একের সহিত মিলিত হইয়া শীঘ্রই কল্পিত হইয়াছিল। তখন যে মন হইয়াছিল, সেই মন সঙ্কল্প রূপ মায়ার বীজ। তখন অণুবাহক (সূক্ষ্ম) শরীরে আত্মস্বরূপ হইয়া ব্রহ্ম-সত্তা স্থিত হইয়াছিলেন। যেরূপ বীজ পত্র ফুল ফলাদির আশ্রয় হয়, সেইরূপ এই পুর্য্যষ্টকা উহাই অণুবাহক দেহ, উহাই বায়ু সত্ত্বা, তেজ-সত্ত্বা, জল-সত্ত্বা, পিণ্ড-সত্ত্বা, দেশ-সত্ত্বা, কাল-সত্তা ও সর্ব্ব সত্ত্বার আশ্রয় হইল। বাস্তবিক কিছুই উৎপন্ন হইল না। পরমাত্ম সত্ত্বা আপনা আপনি আপনার বিষয়ে স্ফুরিত হইল। হে মুনীশ্বর! সাক্ষাৎ বিষয়ে যে সম্বেদন পৃথক রূপ হইয়া স্ফুরিত হয়, তাহা নিস্পন্দ হইয়া যখন স্বরূপকে জানিতে পারে, তখন নষ্ট হইয়া যায়। যেরূপ সঙ্কল্প রচিত নগর সঙ্কল্পের অভাব হইলে অভাব হইয়া যায়, সেইরূপ আত্মজ্ঞান দ্বারা সম্বেদনের অভাব হইয়া যায়। তখন সম্বেদন সম্বিৎ বিষয়ে লীন হইয়া যায়। ইহার যে ভিন্ন সত্ত্বা হইয়াছিল, তাহা আর কিছুমাত্রও থাকে না। হে মুনীশ্বর! যে প্রথম অণু, তন্মাত্রা ছিল, তাহা ভাবনার স্থূল দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বে যেরূপ যেরূপ দেশ কাল পদার্থ ভাবনা হইয়া যাইতেছিল, সেইরূপ সেইরূপ ভাসিতেছিল, যেরূপ গন্ধর্ব্ব নগর ভাসে, যেরূপ স্বপ্নপুর ভাসে, সেইরূপ ভাবনার বশে এই পদার্থ ভাসিতে থাকে। হে মুনীশ্বর! আনন্দে উন্মত্ত হইয়া আনন্দকে ব্রহ্মস্বরূপ না দেখিয়া তাহাকে স্বতন্ত্র বস্তুরূপে জ্ঞান কর ; এইরূপে স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হওয়াই জগৎরূপ ভ্রম জ্ঞানের হেতু। ব্রহ্মস্বরূপ আনন্দ একরস, কিন্তু আনন্দ বস্তু ত্রিগুণাত্মক, আনন্দ প্রবাহ, আনন্দ জ্যোতি, আনন্দ বস্তু। উহা ক্রিয়া তেজ ও বস্তুমূলক, সুতরাং অপ্ তেজ অন্নই উহার বীজ অর্থাৎ রজ সত্ত্ব তম গুণাত্মক। ইহাদের সত্ত্ব রজ তমের ভিন্ন ভিন্ন রূপ মিশ্রণে জগৎ কম্পিত হইয়াছিল।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে ভগবন্! এই জীব যে আদি সর্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং দেহ ভ্রম আপনার সহিত দেখিয়াছে, তাহার পর কিরূপে স্থিত হইয়াছে?

ঈশ্বর বলিলেন, হে মুনীশ্বর! পরমাকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, যেরূপ তোমাকে বলিয়াছি। সে আপনার সহিত শরীর দেখিতেছিল। স্বপ্ন নগরীর ন্যায় সর্ব্বগত চিদ্‌ঘন আত্মার আশ্রয়ে উৎপন্ন হইয়া জীব আপনার শরীরকে দেখিয়া থাকে। হে মুনীশ্বর! আদি যে জীব স্ফুরিত হইয়াছে, অথচ প্রমাদ প্রাপ্ত হয় নাই, আপনার স্বরূপ বিষয়ে অহং প্রত্যয় রহিয়াছে, এই কারণে ঈশ্বর হইয়া স্থিত রহিয়াছেন। তাঁহার এই নিশ্চয় থাকে যে

আমি সনাতন নিত্য শুদ্ধ পরম আনন্দস্বরূপ অব্যক্তরূপ পরম পুরুষ, এই প্রকার আদি জীবের নিশ্চয় ছিল। আত্মার সহিত তুলনায় তাঁহাকে জীব কহা হইয়াছে এবং সৃষ্ট জগতের অপেক্ষায় (তুলনায় তাঁহাকে ঈশ্বর কহা যায়। হে মুনীশ্বর! এই যে আদি জীব, তাহার মধ্যে কেহ বিষ্ণুরূপ হইয়া ব্রহ্মার নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কোন সৃষ্টিতে প্রথম ব্রহ্মা হইয়াছেন, বিষ্ণু রুদ্র তাঁহা হইতে হইয়াছে। কোন সৃষ্টিতে প্রথম রুদ্র হইয়াছে, বিষ্ণু ব্রহ্মা তাঁহা হইতে হইয়াছেন। চেতন আকাশে যেরূপ যেরূপ সংকল্প স্ফুরিত হইয়াছে, সেইরূপ হইয়া স্থিত হইয়াছেন। আদি জীব উৎপন্ন হইয়া যে যে প্রকার সঙ্কল্প করিয়াছেন, সেইরূপ হইয়া স্থিত হইয়াছেন। বাস্তবিক সমস্ত অসৎরূপ অজ্ঞান ভ্রম দ্বারা হইয়াছেন। যেরূপ পরছায়াতে বৈতাল সৎরূপে ভাসে, সেইরূপ অজ্ঞান বশতঃ সৎরূপ হইয়া ভাসে। যেরূপ গর্দ্দভ নিজের শব্দে নিজে ভীত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে থাকে, সেইরূপ নিজের সঙ্কল্পে নিজে জড়িত হইয়া জন্ম মরণ পথে পরিভ্রমণ করেন এবং দুঃখী হন। আদি পুরুষ সমেত যে সৃষ্টি, তাহা পরমাকাশের নিমেষ মধ্যে হইয়াছে আর উন্মেষে লয় হইয়া যায়। যেরূপ বৈদূর্য্যমণির চমক এক নিমেষে স্ফুরিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ লয় হইয়া যায়; পুনঃ অন্য স্থানে চমকিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ লয় হয়। সেই চমকের যে লাট, তাহাই জগৎরূপে প্রসিদ্ধ। স্ফুরণোন্মুখ সম্বিতের দৃষ্টিপথে পতিত হইলে স্পন্দরূপ ভ্রম জন্মে। ইহাই দৃষ্টি সৃষ্টিবাদ। এক নিমেষের প্রমাদ বশতঃ কল্পসমূহ ব্যতীত হইয়া যায় এবং পরমাণু পরমাণুতে সৃষ্টি স্ফুরিত হয়; কল্প এবং মহাকল্প তাহাতে ভাসে। এইরূপ সৃষ্টি তাঁহার স্পন্দ-কলাতে স্ফুরিত হইয়া চমৎকার হইয়া থাকে আবার যখন স্পন্দ-কলা স্বরূপের অন্তর্ব্বর্ত্তী হয়, তখন লীন হইয়া যায়; অর্থাৎ বহির্মুখী হইলে সৃষ্টি, অন্তর্মুখী হইলে প্রলয়। যেরূপ স্বপ্ন পদার্থ জাগ্রত অবস্থায় লয় হইয়া যায়, সেইরূপ জাগ্রত সৃষ্টি স্ফুরিত না হইলে লীন হইয়া যায়। হে মুনিশ্বর! জীব প্রতি স্ব স্ব সৃষ্টি লক্ষিত হয়; সেই সৃষ্টি কোন দেশ কাল নিবারণ করিতে পারে না। তাহার কারণ এই যে ঐ সৃষ্টি আপন আপন সঙ্কল্প বিষয়ে স্থিত থাকে। আত্মার এই মহা চমৎকার আছে যে, যেরূপ স্ফুরিত হয়, সেইরূপ চমৎকার হইয়া ভাসে। হে মুনীশ্বর! কিছুই জন্মে না বা কিছুই নাশ হয় না। স্বতঃ চেতন-তত্ত্ব আপনি আপন বিষয়ে চমকিত হইতে থাকে। শ্রুতি যথা "চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি।" যেরূপ স্বপ্ন নগর উৎপন্ন হইয়া নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ জগৎ

উৎপন্ন হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। রুদ্র হইতে বৃক্ষ পর্য্যন্ত সমস্তই এক ক্ষণ মধ্যে ঐ তত্ত্ব হইতে স্ফুরিত হইয়া আসিয়াছে। সুমেরু প্রভৃতিও আপনাদের স্থিতি বিষয়ে কেহ কাহাকে বাধা দিতে পারে না; কারণ উহা বাস্তবিক নাই। সুতরাং আত্মাতে সৃষ্টি আভাস রূপ। হে মুনীশ্বর! এই প্রকার সমস্ত জগৎ মায়ামাত্র। মাণ্ডুক্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে;—

"প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত, নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ।"
মায়ামযমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ॥

ভাবনা দ্বারা ভাসিয়া থাকে। যখন আত্মার অভ্যাস হইতে থাকে, তখন ভেদ কল্পনা মিটিয়া যায়। কেবল উপশম রূপ শিবতত্ত্ব ভাসিতে থাকে। সৎ অসৎ রূপ জগৎ বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করে। আত্মতত্ত্ব দূরও নহে, নিকটও নহে, অধঃ নহে, উর্দ্ধ নহে, পূর্ব্বও নহে, পশ্চিমও নহে। সৎ ও অসতের মধ্যে অনুভব রূপ সকলের জ্ঞাতা। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ তাঁহাকে বিষয় করিতে সমর্থ নহে; যেরূপ জল হইতে অগ্নি কদাপি বহির্গত হইতে পারে না। যেরূপ স্বপ্নে চিদাত্মাই সর্ব্বগত জগৎ রূপ হইয়া ভাসে, সেইরূপ জাগ্রত জগৎ ও চিদাকাশ রূপ। আদি সর্গ হইতে একাল পর্য্যন্ত আত্মা ব্যতিরেকে অন্য বস্তুর অভাব আছে। যেরূপ স্বপ্নে যে জগৎ ভাসে, তাহা সমস্ত চিদাকাশ রূপ অপর ইতর কল্পনা কিছু নাই; চিন্মাত্রই পাহাড় রূপ, চিন্মাত্রই আকাশ, চিন্মাত্রই সর্ব্ব জীব, চিন্মাত্রই সর্ব্ব ভূত, চিন্মাত্র ব্যতিরেকে ইতর কিছু নাই। সৃষ্টির আদি এবং অন্ত পর্য্যন্ত যাহা কিছু দ্বৈত কল্পনা ভাসে, তাহা ভ্রমমাত্র। যেরূপ স্বপ্নে কাহারও অঙ্গ কাটিলে তাহাতে কাহারও কিছু কাটা যায় না, নিদ্রাদোষ বশতঃ এরূপ ভাসে মাত্র, সেইরূপ এই জাগ্রত জগতও ভ্রম মাত্র।

হে মুনীশ্বর! আকাশ, পরমাকাশ, ব্রহ্মাকাশ এই তিন একেরই পর্য্যায়। যেরূপ স্বপ্নে সঙ্কল্প দ্বারা মায়াতে তাঁহা হইতে অনুভব (স্ফুরণ) হয়, তাহা সমস্ত চিদাকাশ; সেইরূপ এই জাগ্রত জগতও চিদাকাশ রূপ। যেরূপ স্বপ্নে আকাশ ব্যতিরেকে ইতর কিছু নাই, সেইরূপ জাগ্রত স্বপ্নও আত্ম-তত্ত্ব দ্বারা ভাসে। আত্মা ব্যতিরেকে অন্য দ্বিতীয় বস্তু কিছু নাই। হে মুনীশ্বর! যেরূপ স্বপ্নে চিদাকাশই ঘট পট প্রভৃতি হইয়া ভাসে, সেইরূপ স্থিতি প্রলয়াদি জগৎ চিদাত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। আত্মাই এইরূপে ভাসে। যেরূপ শুদ্ধ সম্বিৎ ভিন্ন অন্য নগর স্বপ্নে পাওয়া যায় না, সেইরূপ জাগ্রত কালে অনুভব ভিন্ন অন্য কিছু পাওয়া যায় না। হে মুনীশ্বর! ভাব অভাবরূপ পদার্থ তিন কালে

জগতে ভাসে, তাহা সমস্ত চিদাকাশ রূপ; আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নাই। হে মুনীশ্বর! এই যে দেব আমি তোমাকে বলিলাম, তাহা পরমার্থতঃ বলিলাম। তুমি, আমি এবং সর্ব্বভূত, জাতি, জগৎ এই সকলের যিনি দেব, তিনি চিদাকাশ পরমাত্মা। তাহা ভিন্ন অন্য কিছু নাই। যেরূপ সঙ্কল্প পুরে চিদাকাশই শরীর রূপ হইয়া ভাসেন, অন্য কিছু প্রস্তুত হয় না; সেইরূপ এই সব চিদাকাশ রূপ।

ঈশ্বর বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ! এই প্রকার এই সমস্ত বিশ্ব কেবল পরমাত্মা রূপ। পরমাত্মা ব্রহ্মই এক দেবরূপে কথিত হন। তাঁহারই পূজা সার। তাহা হইতে সর্ব্ব ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই দেব সর্ব্বজ্ঞ এবং সমস্তই তাহাতে স্থিত। তিনি অকৃত্রিম দেব অজ পরমানন্দ অখণ্ডরূপ। তাঁহাকে সাধনা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহা দ্বারা পরম সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে মুনীশ্বর! তুমি জাগ্রত হইয়াছ, এই কারণে এই প্রকার দেবার্চ্চনা আমি তোমাকে বলিলাম। পরন্তু যিনি অসম্যক্‌দর্শী বালক, যাঁহার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জন্মে নাই, কেবল চিত্তই আছে, তাহার নিমিত্ত ধুপ, দীপ, পুষ্প, কল্প, অর্চ্চনা শাস্ত্রে কথিত আছে আকার দ্বারা কল্পিত দেবের মিথ্যা কল্পনা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। হে মুনীশ্বর! আপনার সঙ্কল্প দ্বারা যে দেব নির্ম্মিত হয়, তাহাকে ধুপ দীপ পুষ্প দ্বারা যে পূজা করা যায়, তাহা ভাবনা মাত্র। তদ্দ্বারা তাহার সঙ্কল্প রচিত ফল লাভ হয়; তাহা বালক বুদ্ধির অর্চ্চনা। যাহারা তোমার মত লোক, তাহাদের পূজা এই, যাহা আমি তোমাকে সর্ব্বাত্মা ভাবনা করিয়া করিতে কহিলাম। হে মুনীশ্বর! আমার মতে তো অপর কোনও দেব নাই; একই পরমাত্মাদেব এই তিন ভুবনে আছেন; তিনি ভিন্ন অন্য দেব কেহ নাই।

তিনিই শিব, তিনিই অদ্বৈত এবং তিনিই সর্ব্ব পদ হইতে অতীত। তিনি সর্ব্ব সঙ্কল্প উল্লঙ্ঘন করিয়া অবস্থিতি করেন এবং সর্ব্ব সঙ্কল্পের অধিষ্ঠান তিনিই। তিনি দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছেদ শূন্য। সর্ব্ব প্রকার শান্তরূপ, এক চিন্মাত্র নির্ম্মল স্বরূপ। তাঁহাকেই দেবরূপে কহা যায়। মাণ্ডুক্য উপনিষদে তিনি এইরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। "অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ সিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং দেব।" অর্থ যিনি ওঙ্কারের চতুর্থ পাদ তিনি মাত্রা বিহীন এবং তিনিই পরমাত্মা। তিনি অব্যবহার্য্য যেহেতু সেই পরমাত্মা, বাক্য ও মনের অগোচর। অতএব সর্ব্ব প্রকার ব্যবহারের অন্ত; অর্থাৎ পরমাত্মার স্বরূপ নির্ণয়ে বাক্য এবং মন উভয়ই ক্ষীণ হয়। তিনি

সর্ব্ব প্রকার বিকার বিহীন মঙ্গলময়; কেবল পরমানন্দ স্বরূপ এবং অদ্বৈত, তাঁহার দ্বিতীয় কেহ নাই। এই পরমাত্মা স্বয়ং আত্মাতে প্রবেশ করিয়া আছেন। যাঁহারা এইরূপে সেই পরমাত্মাকে জানিতে পারেন, সেই সকল পরমার্থদর্শী ব্রহ্ম বিজ্ঞানবিৎ সাধকগণ এই সংসার দগ্ধ করিবার নিমিত্ত আত্মাতে প্রবিষ্ট হন। পরন্তু তাঁহাদিগের আর জন্ম পরিগ্রহ হয় না। হে মুনীশ্বর! যে সম্বিৎ-সত্ত্বা পঞ্চভূত কলা হইতে অতীত এবং সর্ব্ব ভাবের অন্তর বহিঃস্থিত হন এবং সকলের সত্ত্বা প্রদাতা দেব, তিনিই সকলের সত্ত্বা ও সংহর্ত্তা হন। হে ব্রাহ্মণ! যে ব্রহ্ম সত্য অসত্যের মধ্য এবং অসত্য সত্যের পর বলিয়া কথিত আছেন, সেই দেব পরমাত্মা। পরম স্বতঃ সত্ত্বা স্বভাব দ্বারা সকলকে প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মহাচিত্ত রূপে কথিত আছেন, সেই পরমাত্মা দেব-সত্ত্বা স্বরূপ হন। তিনি এইরূপে সর্ব্ব পদার্থে অবস্থিতি করেন। যেরূপ সর্ব্ব বৃক্ষের লতার অন্তরে রস জল স্থিত হয়, সেইরূপ সত্ত্বা সমানরূপ দ্বারা পরম চেতন আত্মা সর্ব্ব স্থানে স্থিত হন। অতএব যে চেতন তত্ত্ব অরুন্ধতীর, এবং যে চেতন তত্ত্ব তোমার ন্যায় নিষ্পাপ জীবের, আর যে চেতন তত্ত্ব পার্ব্বতীর, সেই চেতন তত্ত্ব আমার, সেই চেতন তত্ত্ব জগৎ ও ত্রিলোকের। তিনিই একমাত্র দেব, অপর দেব কেহ নাই। পরন্তু যে অপর হস্তপদ সংযুক্ত দেব কল্পনা করিতেছ, তাহাও চিন্মাত্র, অন্য কিছু সার নাই। চিন্মাত্রই সর্ব্ব জগতের সারভূত পদার্থ। তাহাই অর্চ্চনা করিবার যোগ্য, তিনিই সর্ব্ব ফল দাতা। সেই দেব কাহারও হইতে দূরে স্থিত নহেন এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া কোন প্রকারে কাহারও পক্ষে কঠিন নহে; তিনি সকলেরই দেহে অবস্থিতি করেন এবং সকলের আত্মা। সেই এক দেবের আশ্রয়ে মন সহিত ষড় ইন্দ্রিয়ের চেষ্টা হইয়া থাকে। সেই এক দেবের সংজ্ঞা ব্যবহারের নিমিত্ত তত্ত্ববেত্তা পুরুষ কল্পনা করেন যে সেই এক দেব চিন্মাত্র। সূক্ষ্ম সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জন, আত্মা, ব্রহ্ম, ইত্যাদি নাম জ্ঞানী পুরুষ যথাশাস্ত্র উপদেশ ব্যবহারের নিমিত্ত রাখিয়া দেন। পুর্য্যষ্টকাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া তিনিই প্রকাশিত হন। হে বশিষ্ঠ দেব! যাহা কিছু বিস্তার সহিত জগৎ অবভাসিত হইতে দেখা যায়, সেই সকলের প্রকাশক তিনিই, পরন্তু সকল হইতে রহিত। তিনি নিত্য শুদ্ধ অদ্বৈত রূপ। তিনি সর্ব্ব জগতে অনুস্যূত আছেন। এক চিত্ত-সত্ত্বা স্পন্দ দ্বারা অনেক ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে মুনীশ্বর! সম্যক্‌দর্শীর নিকট জগৎ একরূপ আত্ম স্বরূপ; পরন্তু অসম্যক্‌দর্শীর নিকট জগৎ নানা প্রকারে ভাসে। অতএব তুমি সমক্‌দর্শী হইয়া দেখ জগৎও আত্মরূপ। এক্ষণে সম্যক্ দর্শন যেরূপে প্রাপ্ত হওয়া

যায় তাহা শ্রবণ কর। সাধু সঙ্গ করিবে এবং সৎ শাস্ত্রের বিচার করিবে। যখন দৃঢ় ভাবনা করিবে, তখন কত কালে স্বরূপের সাক্ষাৎকার হইবে। কালের অপেক্ষা দৃঢ় ভাবনাকে বা বিচারকে শাস্ত্রে নিমিত্ত কহিয়াছে। যখন দৃঢ় বিচার হয়, তখন সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। যখন স্বরূপের সাক্ষাৎকার হইয়াছে, তখন স্পন্দ, নিস্পন্দ উভয় বিষয়ে এক সমান হইয়া যায়। হে মুনীশ্বর! অজ্ঞানীর চিত্ত থাকে আর জ্ঞানীর সত্ত্বা থাকে, যাহা প্রারব্ধের বেগে স্ফুরিত হয় এবং ব্রহ্মাকার বৃত্তি হয়। আর অজ্ঞানীর চিত্ত স্ফুরণ দ্বারা পুনঃ শরীর প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানী ইষ্ট অনিষ্ট বিষয়ে সমান থাকেন আর অজ্ঞানী এক সমান থাকেন না। ইষ্ট বিষয়ে প্রসন্ন এবং অনিষ্ট প্রাপ্তি বিষয়ে শোকাতুর হন। জ্ঞানী যখন শরীর ত্যাগ করেন, তখন ব্রহ্ম সমুদ্রে স্থিত হন এবং যে পর্য্যন্ত স্বত্ব শেষ না হয়, সেই পর্য্যন্ত স্ফুরণ হইতে থাকে। আর অজ্ঞানীর শরীর ত্যাগ করিবার সময় তাহাতে সূক্ষ্ম সংস্কার বিদ্যমান থাকে। যেরূপ বীজে বৃক্ষ ফুল ফল সূক্ষ্মরূপে স্থিত থাকে, তাহা কালক্রমে পুনঃ বহির্গত হইতে থাকে। অতএব হে মুনীশ্বর! তুমি আপনি আপনাকে দেখ, যাহা অনুভব রূপ এবং নিরন্তর আপনি আপনার বিষয়ে স্থিত হও। যখন তুমি আপনি আপনার দ্বারা অর্থাৎ স্বত্ববৃত্তি দ্বারা আপনাকে দেখিবে, তখন তপাদি ক্রিয়াকে দূর করিয়া শোভায়-মান হইবে। যেরূপ মেঘ দূর হইলে চন্দ্রমা প্রকাশবান্ হইয়া শোভা পায়, সেইরূপ তুমিও ভোগের চপলতা ত্যাগ করিয়া শোভা পাইবে। পরন্ত যখন ইন্দ্রিয়কে জয় করিবে, কোন পদার্থে আসক্তি হইবে না এবং সর্ব্ব বাসনা ত্যাগ করিবে, তখনই জ্ঞানবান্ হইবে। আর যিনি সর্ব্ব বাসনা ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাকে বিষ্ণু জানিবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র। (কাশীধাম)

মোক্ষ]

জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।

একবার দেখা হলেই সব হয়ে গেল। (এ চোখের দেখা নয়) তখন চির-কালকার জন্য নিশ্চিন্ত! তার পর সুখ দুঃখ, ভাব, অভাব, জন্ম, মৃত্যু যা কিছুই আসুক, তাকে আর ভয় হয় না। এ সব গুলিকেই যেন তখন ঘরের লোক বলে মনে হয়; পরিচিত বন্ধুর মত এরা হৃদয়ে আনন্দ বর্ষণই করে; কোন অতৃপ্তি বা ক্লেশ আনয়ন করে না! যতক্ষণ চাই, "দাও দাও" বলে চীৎকার

করি, ততক্ষণই না কষ্ট, তখন চাওয়ার কষ্ট, না পাওয়ার কষ্ট, অভিমানের কষ্ট বিরহের কষ্ট, কত কষ্টই না পেতে হয়। এখন আশাও নাই—আকাঙ্ক্ষাও নাই; সুতরাং না পাওয়ার কষ্টও নাই। হৃদয় আর ধুক্ ধুক্ করে না, মন আর লুক্ পুক্ করে না। তখন এ হৃদয় কিছুতেই আর অবসন্ন হয় না। যত ভারই মাথায় চেপে বসুক, কিছুতেই তাকে আর দমাতে পারে না। তখন তার ক্ষোভ কি।—আনন্দ কি? কেননা সত্যের মুখ দেখেছে; সুতরাং এই মায়া-হাটের ছায়ানাট দেখে সে আর বিচলিত হয় না। অভিনয়-কারীর মুখ চেনা থাক্‌লে সে যম সেজে এলেও আর ভয় হয় না। "সর্ব্বভূতস্থ-মাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" ঠিক এই রকম করে একবার দেখে নেওয়া চাই। এই যে দেখা—এ ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দেখা নয়—এ মনে প্রাণে এক করে দেখা—এরই অপর নাম জ্ঞান! এই জ্ঞানের উদয় হইবামাত্রই তার ইহ পরত্রের বন্ধন খসিয়া যায়। ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্মের সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায়।

[মোক্ষ]

মিলনের সময়।

সেই দিন তব সনে আমার মিলন,
আসিবে দুর্দ্দিন যবে করিয়া গর্জ্জন;
প্রমত্ত ক্ষুধিত হয়ে; দিবে উপাড়িয়া,—
একটি একটি করি ভীম বাহু দিয়া।
আমার হৃদয় হ'তে বৃথা অভিলাষ,
বৃথা গর্ব্ব অভিমান বাসনা পিয়াস;
রিপুদের উত্তেজনা দাসত্ব তাদের,—
সর্ব্ব দুঃখ সর্ব্ব দৈন্য জড়তা প্রাণের॥
মৃত্যু মাঝে কোন ভয় না রবে আমার,
মৃত্যু আসি দিবে খুলে অমৃতের দ্বার;
কোন কষ্ট, কষ্ট বলে না থাকিবে বোধ,—
দুর্ব্বল অক্ষম পেয়ে না থাকিবে ক্রোধ।
উদ্বেগ না রবে হৃদে না কোন অভাব,
হেরিব বিধানে তব শান্ত শিব ভাব;
দুর্ব্বলে করিতে রক্ষা মোর দুটি বাহু—
উদ্যত নিয়ত রবে, না শুনিবে কভু॥
মরণ যদ্যপি আসে বরিবে মরণ,
অকারণে শত্রুরেও না করি পীড়ন;
দুষ্ট অশ্ব ধায় যথা বিপথে নিয়ত,—
দুরাসদ কাম আদি রিপুরা সতত।
ফিরায় চঞ্চল করী এ মোর মানসে,
রাখিতে তাদের হবে দৃঢ়ভাবে বশে;
পিড়ীতেরে কায়মনে করিয়া শুশ্রূষা,—
ক্লান্ত নাহি হবে মন, প্রতিদান আশা॥
না রহিবে চিত্তে মোর, অনন্ত উদ্যম,
স্ত্রী বৃদ্ধ মানীদের রাখিতে সম্ভ্রম;
সাধিয়া চলিতে পথে কর্ত্তব্য আপন,—
না রহিবে কোন মোহ কোন আকিঞ্চন।

প্রয়োজন হলে বিত্ত পুত্র পরিজন,
আপন শরীর আর সমস্ত বন্ধন ;
করিতে হইবে ত্যাগ ক্ষোভ নাহি রাখি,—
মৃত্যুমুখে যেতে হবে নিশ্চিত একাকী ॥
সুখ দুঃখ যাহা ঘটে লাভ কিম্বা ক্ষতি,
সন্তুষ্ট থাকিয়া লব সব শির পাতি ,
তোমার অস্তিত্বে রবে সুদৃঢ় নিশ্চয় —
তব পদে রবে মোর অনন্ত নির্ভয় ।
তোমাতে আমাতে যোগ অনন্ত কালের,
ইহাতে সন্দেহ কভু না হবে মনের
তোমার চরণ পদ্ম করিয়া চুম্বন,—
তব প্রেমে মগ্ন মোর রহিবে এ মন ॥
অনন্ত আশ্রয় পাব তোমার চরণে,
রবে না তিলেক ভয় জীবনে মরণে ,
সেইদিন শুভদিন আসিবে আমার,—
ভাসিবে আমার চিত্ত আনন্দে অপার ।

তব পদ স্পর্শে হবে দুঃখ বিমোচন,
ঘুচিবে সকল জ্বালা সকল বন্ধন ;
সে দিন আসিবে যবে সেই শুভক্ষণ,—
তোমাকে বরিতে পাবি ত্যজি ধন জন ॥
তোমার আহ্বান ভেরী বাজিবে যখন,
না করি সন্দেহ যেন না করি গোপন ;
আসিবে আমার গৃহে তুমি মহারাজ,—
কি দিয়ে ঢাকিব মোর দীনতার সাজ ?
তবু তুমি আন যদি চাও প্রভু মোরে,
ফিরায়ে না দিই তোমা যেন রিক্ত করে ;
সম্বল যা আছে মোর নয়নের জল,—
তা দিয়ে ধুয়াই যেন চরণ কমল ॥
আমার হৃদয় পদ্ম দিই যেন পাতি ।
তোমার আসন তরে ওগো বিশ্বপতি !
তোমার যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপে তুমি
নিও মোরে শূন্য করে হে জীবন স্বামী ।

ধর্ম্ম]

ভক্তি-সুধা লহরী ।

"চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনং ।
সর্ব্বশ্রুতিশিরোরত্নবিরাজিত পদাম্বুজম্ ।
নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং তত্ত্বমালা বিভূষিতং ।
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহম্ ।"

গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণবের ও চরাচর সর্ব্বভূতের চরণ বন্দনা করতঃ আজ মহাপ্রভুর কৃপার্থী হইয়া শাস্ত্রোক্ত "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস" এই গভীর তত্ত্বের গবেষণায় ও বিশ্লেষণে রত হইতেছি। জানিনা সেই অন্তর্য্যামী হৃদয় দেবতা আমার মনের সংশয় অপনোদন করতঃ অপূর্ব্ব জ্ঞান জ্যোতিঃতে আমার মস্তিষ্ক উদ্ভাসিত করিয়া এই দুরতিগম্য তত্ত্বালোচনায় আমাকে সক্ষম করেন কিনা ! তাঁহার কৃপা ব্যতীত কেহই অধ্যাত্মতা লাভের এই প্রকার

সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণা করিতে পারেনা ; তাই সর্ব্ব প্রথমেই তাঁহার কৃপা ভিখারী হইয়া এই সুকঠিন ও পবিত্র কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম।

বিশেষজ্ঞ কয়েকজন বৈষ্ণবের সঙ্গে মিশিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি এবং শাস্ত্রালোচনায় বিচার যুক্তি অবলম্বনে আমার সংকীর্ণ বুদ্ধিতে যাহা ধারণা করিতে পারিয়াছি, শুধু তাহার উপর নির্ভর করতঃ এই দুরূহ তত্ত্বালোচনায় অগ্রসর হইতে সাহসী হইলাম। আশা করি সুধীবৃন্দ আমার সংশয়াপনোদন করতঃ আমাকে কৃতার্থ করিবেন।

যাঁহারা ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন যে ভক্তিমার্গে বৈষ্ণবীয় রস-সাধনায় সান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চভাবের সাধন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। যিনি যেরূপ অধিকারী, তিনি শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হইয়া ঠিক সেইরূপ ভাবের উপদেশ লইয়া থাকেন। কোনটিই মন্দ নহে। চৈতন্য চরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

পঞ্চভাবের পঞ্চবিধ ভক্তির আধার।
সান্ত, দাস্য, সখ্য আর বাৎসল্য মধুর॥
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজভাবে করে কৃষ্ণ সুখ আস্বাদনে॥ চৈঃ চঃ ৩য় ৭ আদিখণ্ড

যে কোন ভাবেই ভগবানের কাছে অগ্রসর হই না কেন, শ্রেয়োলাভ নিশ্চয়ই এবং ইহাও সকলে স্মরণ রাখিবেন যখন আমরা যে প্রকার সাধনের অধিকারী, তাহাই তখন আমাদের নিকট সর্ব্বোত্তম বা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া দৃঢ় ধারণা হওয়া প্রয়োজন। পরম ভক্তিভাজন শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি তারতম্য বহুত আছয়॥
কিন্তু যার যেইরস সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তারতম্য॥ চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড।

—এই "তটস্থ হইয়া বিচার" করিবার অধিকার সাধন ভজন বিহীন, কাম-কামিনীর দাসানুদাস আমাদের একেবারেই নাই। এই অপূর্ব্ব অবস্থা লাভের পূর্ব্বে আমরা যে যেই স্তরে বিচরণ করিতেছি, তাহাই আমাদের পক্ষে সর্ব্বোত্তম বলিয়া ধারণা করা উচিত।

সান্ত, দাস্যাদি সমস্তই ব্রজভাবের সাধনার অন্তর্গত। যে সে ব্যক্তি এই

নিষ্কাম রাজ মার্গের ভক্ত হইতে পারেন না। কোটী কোটী জন্মের সুকৃতি বশতঃ বহু তপস্যা ও পুণ্যের ফলে যদি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সংগুরু মিলাইয়া দেন, তবে কামান্ধহীন এই সর্ব্বোত্তম পবিত্র রূপ-সাধনায় আমাদের অধিকার জন্মে। দ্বাপর যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার নিত্যধামের পরিজনকে লইয়া প্রকৃতির রম্য নিকেতন শ্রীবৃন্দাবনধামে জীবগণকে পূর্ণানন্দ প্রদান করিবার জন্য এবং জগৎকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এত অভিনব মধুর লীলা করিয়া গিয়াছেন। সংকীর্ণ মনুষ্য বুদ্ধিতে আমারা তাঁহার ব্রজলীলা ধারণা করিতে পারিব না। তবে শাস্ত্রালোচনা ও সাধু মহাত্মাদের গভীর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ সমূহ হইতে এই সম্বন্ধে আমরা যাহা জানিয়াছি, তাহাই পাঠকগণের কাছে নিবেদন করিব, অভিপ্রায়ে সম্যক্ অনধিকারী হইলেও এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি।

দাস্যরূপের আলোচনার পূর্ব্বে আমাদের প্রথমে সান্ত রূপ কাহাকে বলে এবং সান্ত ভক্তের লক্ষণ কি তাহা আলোচনা করা উচিত। চৈতন্য চরিতামৃতকার গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ সান্তের দুই গুণ।
এই দুই গুণ ব্যপে সব ভক্তজনে।
আকাশের শব্দগুণ যেন ভূতগণে॥
সান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা গন্ধহীন।
পরংব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ॥
কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় সান্তরসে।" চৈতন্য চরিতামৃত

এই যে "তৃষ্ণাত্যাগ" যাহার জন্য সমস্ত সাধক মণ্ডলী আবহমান কাল হইতে স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী আপন আপন অধিকার হিসাবে সাধনমার্গ অবলম্বন করতঃ ছুটিয়াছেন, তাহা বড় সহজ ব্যাপার নহে। তৃষ্ণা বা বাসনা ত্যাগ হইলে সংসার বন্ধন—কর্ম্ম বন্ধন—ধর্ম্মাধর্ম্ম বন্ধন সর্ব্বপ্রকার সংস্কারের বন্ধনই একেবারে ছিন্ন হইয়া যায়। এই প্রকার তৃষ্ণাত্যাগী মহাপুরুষই "মুক্ত" পদ বাচ্য। কোটি কোটি জন্মের সাধনার ফলে মানুষ যখন আকুল হইয়া তীব্র বৈরাগ্য ও বিবেক আশ্রয় করতঃ সমস্ত বিষয় আশয় ভুলিয়া গিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্য উন্মত্ত হইয়া ছুটে, সেই শুভ মুহূর্ত্তেই সংগুরুর কৃপায় তাহার প্রাণের মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় দিব্য জ্যোতির লহরী খেলিতে থাকে, সেই জ্যোতিঃ দেখিয়া সে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া ভগবানের পূর্ণস্বরূপ উপলব্ধি করতঃ দেব দুর্লভ মনুষ্য জন্ম সার্থক করে। উপাস্যদেবের স্বরূপ জ্ঞান ব্যতীত কেহই ভক্ত হইতে পারে না যাহাকে

জানি না তাঁহার কাছে কিরূপে যাইব? প্রত্যক্ষ দর্শন বা উপলব্ধি ব্যতীত শুধু আনুমানিক পমাণের উপব নির্ভব কবিয়া তাঁহাকে জানি বা বিশ্বাস করি, এবম্বিধ ভাণ কবিলে চলিবে কেন? যদি ভগবান থাকেন তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে হইবে—তাঁহার সম্মুখে বসিয়া তাঁহা হইতেই সমস্ত তত্ত্ব জানিয়া লইতে হইবে—তাঁহাব কাছেই দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা—সমস্ত পূর্ণ নিবেদন করিতে হইবে। অন্যথা শান্তি কোথায়? আনন্দ কোথায়? প্রেমের চরম স্ফূর্ত্তিই বা কিরূপে সম্ভবে।

সৎগুরু' ব্যতীত সেই কেহই "পবমপদ"' আমাদিগকে দেখাইতে পারিবেন না যদি দরকাব হয়, তাঁহাব প্রেমাভিখারী হইয়া সৎগুরু লাভ কবিবার জন্য কোটী কোটী জন্ম অপেক্ষা কবিতে হইবে অবশ্যই সেই পবম দয়াল প্রভু আমাদিগকে কৃপা কবিবেন। তিনি যদি একবাব ফিরিয়া দেখেন, আমাদেরও যদি সেইরূপ সুকৃতি বল থাকে, তবে হয়তঃ এই জন্মেও 'সৎগুরু" লাভ কবিতে পারি। তাঁহাব 'নাম' লইয়া দীনাদপি দীন বেশে নির্জ্জনে বসিয়া অশ্রুপাত ব্যতীত তাঁহার কৃপা আকর্ষণেব দ্বিতীয় পন্থা ত' খুঁজিয়া পাইতেছি না। চৈতন্য ভাগবতকার বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণ বলি কান্দে ভক্ত, তবে কৃষ্ণ মিলে।"

অহো। যাঁহারা ভগবানেব 'নাম' লইয়া কাঁদিতে জানেন—হৃদয়ের অন্তস্থল ভেদ করতঃ ব্যাকুলভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া সৎগুরু কামনা করতঃ তাঁহাব উদ্দেশে অঝোরে অশ্রুপাত করিতে পাবেন, ভগবান অবশ্যই তাঁহাদিগকে দয়া করিয়া থাকেন। সৎগুরু রূপে তিনি অবশ্যই ভক্তের কাছে উপস্থিত হন। এই প্রকার 'সৎগুরুর' আশ্রয় বা তাঁহার 'সাক্ষাৎ কৃপা' ব্যতীত কেহই তাঁহাকে জানিতে পারে না, এবং তাঁহাকে জানিতে না পাবিলে রাজমার্গের ভক্ত হওয়াও অসম্ভব ব্যাপার। শাস্ত্র বলিতেছেন,—

"ক�ৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণাত্যাগ তার কার্য্য মানি।
অতএব শান্ত, কৃষ্ণভক্ত এক জানি॥
স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানে।
সেবা মাগি লয় তারা দাসানুদাস সনে॥" চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড

অহো। কি সুন্দর ভাব! প্রকৃত ভক্ত এইরূপে ভগবানকে পাইয়াই চরিতার্থ হইয়া থাকেন। স্বর্গ বা মোক্ষসুখ বা অন্য কোনও প্রকারের বিষয়-সুখে তাঁহারা সারাৎসার সেই প্রিয়তমকে হারাইতে যাইবেন কেন? ভগবানের

দাসানুদাসের সেবা করিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। তাঁহারা অহৈতুকী শ্রদ্ধা ভক্তির ভিখারী। এই প্রকার ভক্তি হইতেই "প্রেমের" স্ফূর্ত্তি বা বিকাশ হইয়া থাকে। স্বর্গ বা মোক্ষ বাসনায় যাঁহারা ভগবানকে ডাকেন, তাঁহারা এই দেবদুর্লভ প্রেম লাভ করিতে পারেন না। নিষ্কাম হইতে না পারিলে, কেহই প্রেম-ভক্তি বা সাস্ত রসের অধিকারী হইতে সমর্থ নহেন। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব ব্রজরসের সান্তভাব লইয়া আকুলকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে জগৎজননী আ'দ্যাশক্তিকে বলিয়াছিলেন—"মা! আমায় ভক্তি দাও? এই নাও তোমার ধর্ম্ম, এই নাও তোমার অধর্ম্ম. আমায় শ্রদ্ধাভক্তি দাও। এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ. আমায় শ্রদ্ধা-ভক্তি দাও। এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শ্রদ্ধা-ভক্তি দাও। আমি মুক্তি চাহি না, আমায় ভক্তি দে। আমি স্বর্গ চাহি না, আমায় ভক্তি দে। আমি সালোক্য, সাযুজ্য, নির্ব্বাণ, মোক্ষ—এ সব কিছুই চাহিনা, আমায় ভক্তি দে। তোর সু নে, কু নে, আমায় ভক্তি দে। লীলাময়ি! তুমি দেখো—তোমার ঐ অভয় পাদপদ্মই যেন আমার সার হয়। তোমার ঐ বরাভয়-দায়িনী আনন্দময়ী মূর্ত্তি চিরজন্মের মত আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করো। ঐ অপরূপ রূপের ছবি আমার বুকের ভিতর বুক চিরিয়া আঁকিয়া দাও। তোমার কৃপায় যেন মা আমি সর্ব্বভূতেই তোমায় দেখিতে পাই।"

এই প্রকারের প্রাণস্পর্শী ক্রন্দনই ভগবানের কৃপালাভ করিবার একমাত্র উপায়। এতদ্ব্যতীত কে কবে তাঁহাকে ভক্তিযোগে উপাসনা করিতে পারিয়াছে? এই ভাবে বিভোর হইয়াই পাঠক প্রেমজড়িত কণ্ঠে ভগবানের উদ্দেশে বলিতেছেন,—

"ন ধনং ন জনং ন কবিতাং সুন্দরীং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতু ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

"হে জগদীশ! আমি ধন, জন, কবিতা বা সুন্দরী কিছুই প্রার্থনা করিনা; হে ঈশ্বর! তোমার প্রতি জন্মে জন্মে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।"

এই অহৈতুকী নিষ্কাম সহজ ভক্তি না হইলে কেহই প্রকৃত ভক্ত হইতে পারেন না। শাস্ত্র ইঁহাদের সম্বন্ধেই বলিতেছেন,—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তি-লতা বীজ॥

উপজিয়া পড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায় ॥
তবে যায়—তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণ-চরণ-পঙ্কজ বৃক্ষ করে আরোহণ ॥ চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড।

উপরি উদ্ধৃত বাক্য হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে "গুরু কৃষ্ণ প্রসাদ" ব্যতীত কেহই এই অহৈতুকী শ্রদ্ধাভক্তি পাইতে পারেন না। এইস্থলে 'ভক্তি' শব্দের দ্বারা "বিধিভক্তি" বুঝিলে বড়ই গোল হইবে। তাহা হইলে শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য আমরা ধারণা করিতে পারিব না। বিধিভক্ত সকাম। বৈধভাব কামনা মূলক। বিধিভক্তের গতিস্থান বৈকুণ্ঠ। যথা ;—

"বিধিভক্তে পার্ষদ দেহে বৈকুণ্ঠেতে যায়।" চৈ, চ, মধ্যখণ্ড
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে বিধি ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাইয়া।" চৈঃ চঃ আদি খঃ, ২য় পঃ।

রাজমার্গাবলম্বী ভক্তদের গতিস্থল শ্রীকৃষ্ণ চরণ—পরম মাধুর্য্যময় চিন্ময় অপ্রাকৃত বৃন্দাবন, গোলোকধাম। জীবন্মুক্ত নিত্যধামের অধিবাসীগণের এই সহজ রাগভক্তি বা রসাশ্রয় ব্যতীত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পূর্ণতম ভগবান প্রত্যক্ষীভূত হয় না। রাগমার্গ বেদবিধি বহির্ভূত। আমরা সকলেই বিধিভক্ত। এই বৈধীমার্গ আশ্রয় করিয়া যতদিন যাবৎ আমাদের কর্ম্ম বন্ধন ছিন্ন না হয়, ততদিনই ঘুরাফিরা করিতে হইবে এবং তীব্র জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কর্ম্মবীজকে সমূলে দগ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তৎপরে সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তি লাভ করতঃ যুগযুগান্তর ধরিয়া বৈকুণ্ঠাদি ভোগ করিতে করিতে বৈকুণ্ঠের সুখভোগ স্পৃহা পরিপূর্ণ হইলে, তবে অনন্যভাবে কৃষ্ণচরণ বা ভগবচ্চরণ আশ্রয় করিবার জন্য আমাদের তীব্র ব্যাকুলতা উপস্থিত হইবে। এই সময়েই 'সৎগুরু' আসিয়া আমাদিগকে দর্শন দিবেন এবং আমাদের প্রাকৃত দেহকে অচিন্ত্য দিব্যশক্তি সম্পন্ন চিদ্‌ঘন আনন্দঘন অপ্রাকৃত নিরঞ্জন দেহে পরিণত করিবেন। এই অভাবনীয় অবস্থায় আমরা স্বরূপে পৌঁছিয়া সচ্চিদানন্দ তনু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ভজন করিবার অধিকারী হইব। এই অপূর্ব্ব নিষ্কাম মার্গ আশ্রয় করিয়া যাঁহারা ভগবানকে ভক্তি করিয়া থাকেন, তাঁহারাই বৈষ্ণবীয় সাধনের প্রথম স্তরের কৃষ্ণভক্ত। এই প্রথম স্তরের আদর্শ ভক্ত হওয়াও কত কঠিন ব্যাপার, পাঠকগণ একবার বুঝিয়া দেখুন। বহু কোটি জীবের মধ্যে গুরু কৃষ্ণ

প্রসাদে মাত্র দু'একজন আদর্শ সাস্ত ভক্ত হইতে পারেন। শাস্ত্র ইঁহাদিগকে এইরূপ ভাবে পরিচিহ্নিত করিতেছেন। যথা ;—

রূপগোস্বামীকে মহাপ্রভু ভক্তিরস লক্ষণ বিচার প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশি লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ ॥
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ বৌদ্ধ, শবর ॥
বেদনিষ্ঠ মধ্যে বহুৎ কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটী কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ॥
কোটী জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটী মুক্ত মধ্যে হয় এক কৃষ্ণভক্ত ॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব সান্ত।
ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত ॥" চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড

আমাদের মধ্যে অধিকাংশই শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে আস্থাবান এবং বৈদিক যাগ যজ্ঞ ব্রত সন্ধ্যোপাসনায় ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া দেবতাদের কাছে পুত্রকলত্রাদি ক্রমে স্বর্গ কিম্বা মোক্ষ বাঞ্ছা করিয়া থাকি। * সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে কাম কামনা জর্জ্জরিত, জাতি বিদ্যা জ্ঞানাভিমানী ঘোর বিষয়াসক্ত আমরা কিছুতেই কৃষ্ণভক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে পারি না ; অথবা নিজেও ঐরূপ ভক্তাভিমানে গৌরবান্বিত হইতে অসমর্থ। কেননা যাহা আমাদের নাই, তাহা আছে বলিয়া মনে করিলে কিম্বা দশজনের কাছে বলিয়া বেড়াইলে নিশ্চয় প্রত্যবায় ভাগী হইতে হইবে। আমি ত' মুক্তকণ্ঠেই বলিতে পারি শাস্ত্রোক্ত আদর্শ সান্ত স্তরের কৃষ্ণভক্ত আমি এই পর্য্যন্ত একজনও দেখি নাই এবং ইহজীবনে দেখিতে পাইব কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয়। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—গীতোক্ত এই নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ দেওয়া কিম্বা মুখে বলা খুব সহজ ; কিন্তু কার্য্যতঃ ইহা প্রতিপালন করা অত্যন্ত কঠিন। 'আমি' 'আমায়' ভুলিয়া গিয়া সম্পূর্ণ অনাসক্ত হইয়া ফলাফল

(*) প্রবন্ধ লেখক এইখানে ভুল করিয়াছেন, যাঁহারা যাগযজ্ঞ ব্রত, সন্ধ্যা বন্দনা করেন, তাঁহারা অবশ্য ভক্ত, যেহেতু তাঁহারা ভক্তি, শ্রদ্ধা পূর্ব্বকই ভগবৎ উদ্দেশে উক্ত কর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠান করেন। সে সকল কার্য্য ত' ভগবান্‌-শূন্য নয়। উক্ত কার্য্য সমূহ ভগবান্‌ শূন্য বলিলে অথবা ভক্তিহীন বলিলে, সনাতন শাস্ত্রের ক্রম হয় স্তর লঙ্ঘন করা হয় এবং শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বজায় থাকে না। সহ...সং শ্রী...শাস্ত্রী।

ভগবচ্চরণে নিবেদন করতঃ তদেকনিষ্ঠ হইয়া ও তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়া যাঁহারা ভক্তিপথের পাথক হইয়াছেন, তাঁহারা যে সম্প্রদায়ের লোক হউন না কেন, আমাদের আদর্শস্থানীয় এবং বৈষ্ণবীয় সাধনের প্রথম স্তরের কৃষ্ণভক্ত। ইঁহাদের সর্ব্ব কামনার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। পরশমণির সংস্পর্শে আসিয়া ইঁহারা খাঁটি সোণা হইয়াছেন, সর্ব্ব বন্ধনমুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতেছেন এবং তাঁহাকে লইয়া পূর্ণ রসাস্বাদন ও পূর্ণানন্দ সম্ভোগে কাল কাটাইতেছেন।

শুদ্ধ, নিষ্কাম সাত্ত্ব ভক্ত কাহাকে বলে? শাস্ত্র বলিতেছেন,—

"সেই শুদ্ধ ভক্ত, তোমা ভজে তোমা লাগি।
আপনার সুখ দুঃখ হয় ভোজ ভাগী॥
তোমা অনুকম্পা চাহি ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাৎ মিলে তারা তোমার চরণ॥ চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড ৯ম পঃ

ভগবানের জন্যই ভগবানের ভজন এবং তাঁহারই কৃপা ভিখারী হইয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ ব্যতীত কেহই শুদ্ধ ভক্ত হইতে পারেন না। শত দুঃখ আসুক, ভক্ত মস্তক পাতিয়া ভগবানের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ বলিয়া তাহা অম্লান বদনে গ্রহণ করেন। রোগ, শোক, দারিদ্র্য কিম্বা পার্থিব কোনও অভাব পূরণ করিবার জন্য কখনই তাঁহার ভজন করেন না; এবং প্রেমগদগদকণ্ঠে ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া প্রাণ খুলিয়া বলেন;—

"হরি, আমি দুঃখ ভালবাসি, সুখ সাধ নাই হে।
আমি জনমে জনমে যেন দুঃখ পাই হে॥
সুখে যে দুঃখের স্মৃতি চলে যায়,
দুঃখস্মৃতি লোপে মোহ মদিরায়;
বিলাস কামনা লালসা জাগায়,—
শেষে অবসাদে অলসে ঘুমাই হে।
দুঃখেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে,
দুঃখেই আমার চেতনা হয়েছে;
দুঃখেই তোমার চরণে লুটাই হে।
যত তাপে ফোটে বেদনা আমার,
তত তাপে উঠে স্মরণ তোমার;
সাধে কি সাধিয়ে ডেকে দুঃখ চাই হে॥"

ভক্তের কি হৃদয়ভেদী প্রাণস্পর্শী আকুল উচ্ছ্বাস! আমাদের মধ্যে জানি না এরূপ সুকৃতিবান্ কেহ আছেন কিনা; যিনি এরূপ ভাবে দুঃখ পাইবার জন্য ভগবানের কাছে অহর্নিশ প্রার্থনা করেন। যুগে যুগে সাধকগণ মস্তক পাতিয়া সহাস্য বদনে, নির্ব্বিকার চিত্তে তাঁহার করুণার উপর নির্ভর করতঃ লৌকিক সুখ দুঃখকে তৃণবৎ অগ্রাহ্য করিয়া এবং অক্ষয় অনন্ত ভূমানন্দে আত্মহারা হইয়া সাধনের একমাত্র বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবানকে লাভ করতঃ কৃত-কৃতার্থ হইয়াছেন। ইঁহারাই সান্তস্তরের আদর্শ ভক্ত।

উপাসক ত্রিবিধ—নিষ্কাম, মোক্ষকাম ও সকাম। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ!॥

আর্ত্ত ও অর্থার্থী সকাম ভক্ত। জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী মোক্ষকাম। ইঁহারা পরম সুকৃতিশালী হইলেও কেহই শুদ্ধ নিষ্কাম সান্তস্তরের ভক্ত হওয়ার অধিকারী নহেন। কামান্ধ হইতে না পারিলে কেহই রূপমার্গের ভক্ত হইতে পারেন না। এইরূপ আদর্শ ভক্ত হওয়া দূরে থাকুক, মোক্ষকাম ভক্ত হওয়াও বড় সহজ ব্যাপার নহে। ভক্তিসাধন করিতে করিতে নিজের স্বরূপ তত্ত্বে ডুব দিতে না পারিলে—জন্ম মৃত্যুর হাত এড়াইয়া সচ্চিদানন্দ তনু স্পর্শে সচ্চিদানন্দময় হইয়া পূর্ণস্বরূপে অবস্থিত করিতে না পারিলে, কেহই বেদান্তের মুক্তি বা বৌদ্ধের নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারেন না। শাস্ত্র বলিয়াছেন।

ভক্তিবলে প্রাপ্ত রূপ দিব্যদেহ পায়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হইয়া ভজে কৃষ্ণ পায়॥
এই সব সান্ত যবে ভজে ভগবান।
সান্তভক্ত বলি তবে কহি তার নাম। চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড।

সাধন বলে যাঁহারা আত্মার যথার্থ স্বরূপে পৌছিয়া দিব্যদেহে অপ্রাকৃত চিদানন্দময় ভাবদেহে শুদ্ধ-অহৈতুকী ভক্তিমার্গে তদাকারবৃত্তিযোগে তৎগুণাকৃষ্ট হইয়া ভগবানের ভজন করিতে পারেন, তাঁহারাই বৈষ্ণবশাস্ত্রে বর্ণিত যথার্থ সান্তভক্ত।”

রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ আলোচনা করিয়া আমরা শাস্ত্রোক্ত 'দাস্য' রসতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। মহাপ্রভুর সাধন ভক্তি নির্ণয় প্রসঙ্গে তাঁহার পরমভক্ত সনাতনকে বলিতেছেন,—

“ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ লক্ষণ।
ইষ্টে অধিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ কথন॥

রাগময়ী ভক্তি হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥
বাহ্য, অন্তর, ইহার দুই ত' সাধন।
বাহ্যে সাধকদেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিন করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥
দাস, সখা পুত্রাদি প্রেয়সী গণ।
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন॥
এই মত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তার উপজয়ে প্রীতি॥
যাহা হৈতে পায় কৃষ্ণের প্রেম রসধন।
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীভগবান॥" চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড।

ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা। বৎসের জন্য গাভী যেমন ব্যাকুলা হয়; প্রবাসী পুত্রের জন্য মাতা যেরূপ উৎকণ্ঠিতা হন, পতির শ্রীচরণ সেবা করিবার জন্য সতী স্ত্রী যেমন উদ্বিগ্না হন, প্রাণের একান্ত প্রিয়তম বস্তু লাভের জন্য জীব যেমন উতলা ও দিশাহারা হইয়া ছুটে, ভগবানের জন্য ভক্তের প্রাণ যখন ঠিক এইরূপ ব্যাকুল, উৎকণ্ঠিত বা উদ্বিগ্ন হয়, বিষয়, আশয়, স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন সমস্ত ভুলিয়া গিয়া উন্মাদের মত ভক্ত হৃদয় ভগবানকে পাইবার জন্য যখন এইরূপ ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠে, ঠিক সেই শুভ মুহূর্ত্তেই সৎগুরু কৃপায়, তাহার প্রাণের নিভৃততম ক্ষেত্রে ভগবান স্বরূপে প্রকাশিত হন। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন।

ধর্ম্ম]

ভক্ত।

এস' সন্ধ্যার মত মুগ্ধ সতত, উজ্জ্বল মম হৃদয়ে।
পাপ তাপ নাশি, রাগ প্রকাশি, পুলক বিভল প্রণয়ে।
এস, আশা ভাস্বর তরুণ অরুণ, কিরণ মানস গগনে,
চিন্তার সাথী নিশীথের ভাতি,এস গো ! পবন বাহনে।
এস' আমার হৃদয়ে,
বস' মানস আসনে ॥

২

ওহে তোমারে বরিতে চিত্ত ত্বরিতে, ছুটিছে গগণ তীর,
তোমারি লাগিয়া রেখেছি রচিয়া, পাদ্য নয়ন নীর।
হের শক্তি অর্ঘ্য সুকৃত ধূপ, বিবেক দীপ জ্বালি।"
নিবেদি চিত্ত নিখিল বিত্ত, তোমার মহিমাশালী '!
র'য়েছি বসিয়া ধীর
মুছায়ে কলুষ-কালি !!

৩

কবে শরতেরি কম জোছনারি সম, তোমার পাবন হাসি।
মধুর সিক্ত মলয় পৃক্ত, করুণা সলিল রাশি।
আসি ফুটিবে, বলিবে নব মেঘরবে স্ফুটিত রত্ন মত।
আমার হৃদয়ে তোমার উদয়ে, আমি সে হইব নত ॥
এস, মমতা প্রকাশি
পূরায়ে বাসনা শত !!

প্রসাদ, —রাজসাহি।

কাম]

প্রলাপ।

বিশ্ব-বীণার গভীর মন্ত্র, পাঠক ! তোমার হৃদয়-ক্ষেত্রে কখনও বাজিয়াছে কি ? অনাদি সঙ্গীতের মোহন মূর্চ্ছনায় মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার মন মুগ্ধ হইয়াছে কি ? যদি না হইয়া থাকে, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" এই বহু আরাধনা-লব্ধ মানব জন্ম

শুধু বিলাস লালসায় ব্যয়িত করিলে চলিবে না, সংসারে আসিয়া শুধু সং সাজিয়া থাকিলে হইবে না, সার টুকু লাভ করিতে হইবে। মোহ মদিরা পানে মত্ত হইয়া থাকাই এই দুর্ল্লভ মানব জন্মের উদ্দেশ্য নহে, সংসার সাগরোত্থিত তরঙ্গাভিঘাতে বিধ্বস্ত হইবার জন্য, দরিদ্রের দৈন্য, শোকের হা হুতাশ, রোগের যন্ত্রণা, নিরাশার তাড়না ভুগিবার জন্যই আমরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি নাই; পক্ষান্তরে এই সাধনার তপোবনে দীক্ষা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এই শোক দুঃখ রোগ দারিদ্র্যের অভিনয় কেন, ইহাদের উদ্দেশ্য ও ইঙ্গিত অবগত হওয়াই এই জীবনের লক্ষ্য। এই ভীষণ ভয়ের রাজ্যে সেই অভয়ার মাভৈঃ বাণী শুনিবার জন্যই এই জন্ম মৃত্যুর জরা ব্যাধি বিভীষিকার অন্তরালে মায়ের চরণ কমলস্থিত স্নিগ্ধ সুনীল অম্বুরাশি দেখাইবার জন্যই সর্ব্বমঙ্গলার মঙ্গলময় পদ্মহস্ত ওতঃপ্রোত ভাবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত জানাইবার জন্যই জীবের সংসার-ক্ষেত্রে অবতারণা ও ভোগ।

আমরা মেঘের গভীর গর্জ্জনে আড়ষ্ট হই, সুকোমল শিশুর ক্রন্দনে ব্যথিত হই, নায়িকার নূপুর নিক্কনে চকিত হই, প্রিয় সম্ভাষণে পুলকিত হই; কিন্তু ঐ নানা শব্দ যে একই বিশ্বব্যাপী শব্দসিন্ধুর বিভিন্ন স্পন্দন মাত্র এবং ঐ নানা ভাব যে জীব হৃদয়স্থিত ভাবরূপী জনার্দ্দনের অসীম ঘন ভাব রাশির বিভিন্ন ব্যঞ্জনামাত্র, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না; কারণ আমরা,—

"দুষ্পারে ভবসাগরে জনি-মৃতে ব্যাধাদি দুঃখোৎকটে
ঘোরে পুত্র কলত্র মিত্র বহুল গ্রাহাকরেভিকরে,
কর্ম্মোত্তুঙ্গ তরঙ্গ ভঙ্গ নিকরৈরাকৃষ্যমানো মুহুঃ—"।

ঐ বিশ্বব্যাপী অনাদি শব্দই ভগবানের ভাষা, মন্ত্র, নাদ বা সনাতন সঙ্গীত ও ঐ ঘন ভাবই ব্যঞ্জনা, ছন্দ, মাধুর্য্য বা লয়।

আমরা বহু লইয়াই ব্যস্ত, পৃথক ভাবই আমরা জন্মাবধি পোষণ করিয়া আসিতেছি; কিন্তু এই দৃশ্যমান বহুর ভিতরে যে এক সত্ত্বা প্রবাহিত, একেরই যে বহু ভাবে বিকাশ, সমস্ত পৃথক ভাবই যে সেই এক সূত্রে মণিগণাইব গ্রথিত, তাহা আমরা উপলব্ধি করি কৈ। আমরা স্পর্দ্ধা হইতে ছোট বড় সহস্র সহস্র তরঙ্গ দর্শন করিয়া থাকি সত্য, কিন্তু সিন্ধু সলিলে নিমজ্জিত হইলে, দিগন্ত বিস্তৃত অগাধ বারিরাশি ব্যতীত কিছুই দেখা যায় না। মা জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে! কবে আমি তোমার সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ রূপ-সিন্ধু মাঝে ডুবিয়া যাইব মা! কবে সেই নিবিড় কৃষ্ণ জলদ-জাল বক্ষে সৌদামিনীর ক্ষণিক জ্যোতি মহামেঘ

প্রভাং ঘোরাং” শ্যামা মায়ের আমরা চকিত চাহনি বলিয়া বুঝিতে পারিব স্নেহমাখা শিশুর সরল হাসিতে শারদ-পূর্ণিমা শোভা শশধরের সুবিমল রজত কিরণে মন্দানিল চুম্বির বিকচ কুসুম দল সৌরভে তোমার অজস্র স্নেহধারা, তোমার পবিত্র জ্যোতি, তোমার বিমল হাসি দেখিয়া এ জনম সার্থক করিতে দিবি কি মা? আমার প্রাণের লক্ষ বাসনা, হৃদয়ের সহস্র দুর্ব্বলতা, মনের হর্ষ, বিষাদ, বিরহ, প্রেম, বাহিরের আলোক-আঁধার,-শীত উত্তাপ ইত্যাদি সর্ব্বের ভিতরে তোমার প্রসারিত হস্ত দর্শন করিয়া “ত্বমেকা গতির্দ্দেবী নিস্তার দাত্রী” বলিয়া চিনিতে পারিব কি মা! একেশ্বরি মা আমার, আমার এই পুঞ্জীভূত বহুগুলিকে এক তানে তোমার অভিমুখে টানিয়া লও মা। তোমার সর্ব্ব সন্তাপ-হারিণী কোলে এই অধম সন্তানকে একটীবার স্থান দে মা।

ধ্বংস আমাদের মানসিক বৃত্তিকে একাভিমুখী করিতে শিক্ষা দেয়। এই সুবিশাল ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, আপাততঃ ইহা কেবল ধ্বংসের লীলাভূমি ব্যতীত আর কিছু বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে না। জগৎ-ভক্ষক মহাকাল যেন মহাশ্মশান রূপ বিস্তৃত বদন ব্যাদান করিয়া একে একে সকল গ্রাস করিতেছেন। সৃজন, বর্দ্ধন, সৌন্দর্য্য রমণীয়তা সকলই সেই মহাশ্মশানে আহুতি দিবার সম্ভার মাত্র। ইহাদের বিকাশ যত বেশী হইবে, অন্তিমে আহুতিও সেই পরিমাণে পূর্ণতর হইতে থাকিবে। ঐ যে পূর্ব্ব গগন রাক্তিম-রাগে রঞ্জিত করিয়া স্বকীয় কিরণ জালে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিতে করিতে সহস্রাংশু দিবাকর উদিত হইতেছে, ইহারও সন্ধ্যা-সমাগমে অস্তাচল চূড়া অবলম্বন করিয়া তামসী নিশার আগমন বার্ত্তা সূচিত করিতে হইবে। যে নবীন যুবক সে দিন মাত্র উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া প্রমোদোদ্যানে বিচরণ করিতে করিতে মনোমত কুসুম চয়ন করিয়া অর্দ্ধাঙ্গিনীর কম্বু-কণ্ঠ মনোরম মাল্যনিচয়ে শোভিত করিতেছিল, ভবিষ্যৎ জীবন যাহার নিকট পিককুল-মুখরিত, পারিজাত শোভিত-নন্দনে জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর সুখ স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল, যে তাহার বাল-বিধবা জননীর একমাত্র নয়নানন্দকর অঞ্চলের নিধি, ভবিষ্যৎ জীবনের আশা ও ভরসার কেন্দ্রস্থল, সংসারের লক্ষ্য ও অবলম্বন; ঐ দেখ নদীতীরস্থ শ্মশানবহ্নি ভীষণ লোল রসনা প্রসারণ করিতে করিতে তাহারই দুগ্ধফেননিভ সুন্দর বপু মাতা, স্ত্রী, আত্মীয়, বান্ধবের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ও অজস্র অশ্রুসিক্ত দীর্ঘশ্বাস বেষ্টিত হইয়া ভস্মে পরিণত হইতেছে। একদিন যে বারবিলাসিনীর ফুল্ল নিলোৎ-পল সদৃশ বঙ্কিম নয়ন-যুগলের চকিত-চাহনি কত শত মানবকে মন্ত্র মুগ্ধবৎ

তাহার পদপ্রান্তে আকর্ষণ করিত, আজ ঐ দেখ গগণ-বিহারী নির্দ্দয় শ্যেন তাহার তীক্ষ্ণ চঞ্চু দ্বারা উহা উৎপাটিত করিয়া নিজ উদরপূর্ত্তি সাধনে ব্যস্ত। এত শোভা, এত সৌন্দর্য্য, এত প্রেম সকলই কি ধ্বংসের জন্য! যাহাদের দ্বারা আমরা দিবারাত্রি বেষ্টিত হইয়া আছি, এই সুরম্য হর্ম্ম্যমালা শোভিত বিলাস-ভবন, এই স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ইত্যাদি প্রিয় স্বজন বান্ধব, এই হৃদয়-শোণিত সম অর্থরাশি, এই ভোগশীল প্রিয়তম দেহ সকলই কি সেই ধ্বংসরূপ পরিণতির জন্য অগ্রসর হইতেছে?

এই সত্যমুখী বিচার, এই ভস্মাচ্ছাদিত রত্ন লাভের অনুসন্ধিৎসা ও প্রবল আকাঙ্ক্ষাই মুমুক্ষ পাঠক! তোমাকে ধ্বংসের পরপারের সংবাদ আনিয়া দিবে।—এক অভূতপূর্ব্ব মহান্ ভাষা বুঝাইয়া দিবে; এক জগদ্ব্যাপী অনিত্যের খেলা হইতেই তোমার নয়ন একমাত্র নিত্য বস্তুর উপর পতিত হইবে। এই পরিণামশীল তরঙ্গ ভঙ্গ হইতে একমাত্র প্রশান্ত সত্য সাগরের উপলব্ধি হইবে; অপূর্ব্ব জ্যোতিতে তুমি ডুবিয়া যাইবে, ধ্বংসের বিভীষিকা হইতে তোমার প্রাণ একমুখী হইবে, তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে; "ত্বমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" তখন প্রাণের সহিত বলিবে।—

"উদয় গিরিমুপেতং ভাস্করং পদ্মহস্তং।
নিখিল ভুবন নেত্রং রত্ন রত্নোপমেয়ম্॥
তিমির করি মৃগেন্দ্রং বোধকং পদ্মিনানাং।
সুরবরমভিবন্দে সুন্দরং বিশ্ববন্দ্যম্॥"

জগদ্বন্ধু বনমালীর বিশ্ব-বিমোহন মুরলী ঝঙ্কারে পাঠক! তুমি নিজেকে হারাইয়া ফেলিবে। তোমার হৃদি-বৃন্দাবন প্লাবিত করিয়া উল্লাস বিভোরা নীলা যমুনা লহরমালায় নৃত্য করিতে করিতে উজান বহিবে, তোমার প্রাণ-প্রবাহ সীমার গণ্ডি ছাড়াইয়া অসীমের পানে ধাবিত হইবে। পরমানন্দময় মাধবের কোটী শশী বিনিন্দিত মুক্তিপ্রদ চরণ কমলে শরণ পাইয়া তুমি উচ্চকণ্ঠে গাহিবে।

"ত্বমাদি দেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥"

শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্ত।

———

কাম]

উৎসর্গ।

তোমা—পাশরিতে পারি কেমনে!
আমি—দেহমন প্রাণ সকলই সঁপেছি,—
তোমার রাতুল চরণে।
তুমি—লুকায়ে মেঘের আড়ালে ছড়াও—
সুহাস সন্ধ্যা গগণে—
আমি—যে দিকে নেহারি হাসে সেই দিক,
সাজিয়া সোণার বরণে
তব—মধুর সুহাস পেখিয়া,
বুকে—কণক কিরণ মাখিয়া;
ধায়—কুলকুলরবে নাচিয়া গরবে,—
তটিনী সাগর সদনে।
তব—কোমলতারাশি বিকাশে চাঁদিনী,
যামিনী জোছনা কিরণে।
তব—প্রেমে মাতোয়ারা ঢালে সুধা ধার
চকোরী বিমল গগনে।
তব—সুধামাখা নাম জপিয়া,
মম—এ ক্ষুদ্র পরাণ সঁপিয়া;
তব—চরণে; নিরখি তোমার মধুর
মুরতি, শয়নে স্বপনে।
তব—কনক কিরণ জাগায়ে প্রভাতে
প্রকাশি এ দীন ভবনে।
তব—মহিমা অপার. বিকচ কুসুম,
ছড়ায় প্রভাত পবনে
তব—প্রেমেতে আপনা ভুলিয়া,
নব—সুরভি কুসুম তুলিয়া;
মাখি—যতনে ভকতি চন্দনে করি,
নিবেদন তব চরণে॥

তব—গৌরব গীতিকা গায় পাখীকুল,
হরিষে নিবিড় কাননে।
নাচে—ব্রততী নিচয় তব প্রেমে ভোর,
তব গুণ গান শ্রবণে॥
ওই—প্রকৃতির ভাব হেরিয়া,
যায়-তব প্রেমে প্রাণ ভরিয়া,
ধায়—আকুলি বিকুলি চিত মোর,
তব, প্রেম ভরা গীত শ্রবণে।
কত—প্রবাসী পথিক, বসিয়া ছায়ায়,
তোমার করুণা স্মরণে।
সুখে—লভয়ে বিরাম সেবা করে আসি,
তোমার সেবক পবনে॥
আমি—তোমার করুণা চাহিয়া,
যাই জীবনের স্রোত বাহিয়া,
তুমি—যে দিকে চালাও চলি সেই দিকে,
বাসনা তোমার মিলনে।
ওই—ডুবু ডুবু রবি ঝিকিমিকি বেলা,
হাসিয়া জানায় ভুবনে,
যাবে—ভবে ছায়াবাজি ফুরায়ে, ডুবিবে—
আয়ু-দিবাকর যেদিনে।
তব—প্রেমময় রূপ স্মরিয়া,
আছি তোমার চরণে পড়িয়া,
তুমি—কাছে লও আর দূরে রাখ, সাথি
আমার জীবনে মরণে

শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস।

হরিদ্বার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অন্যান্য তীর্থ।

অতঃপর হরিদ্বারের অন্যান্য তীর্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।—

আনন্দ ভৈরব। পোষ্টাপিসের উত্তর দিকে মাঠের মধ্যে জুনা আখড়ায় আনন্দ-ভৈরবের প্রাচীন মূর্ত্তি যাত্রীগণের অবশ্য দর্শনীয়। আখড়ার সন্ন্যাসীরা বলেন, ইনিই ক্ষেত্রপাল ভৈরব। শাস্ত্র বিধানানুসারে ক্ষেত্রপাল ভৈরবের পূজা করিয়া তীর্থ ভ্রমণ করিতে হয়। বদরিকাশ্রম মাহাত্ম্যে আছে, হরিদ্বারে স্নানাদি করিয়া নীল ভৈরবের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক কেদার বদ্রী যাত্রা কর্ত্তব্য। হরিদ্বারে তিনটী ভৈরব, প্রথম আনন্দ ভৈরব, দ্বিতীয় বিল্লকেশ্বর পথে ভৈরব, তৃতীয় চণ্ডীর পাহাড়ের ভৈরব। ইহার মধ্যে কোন্‌টী নীল ভৈরব, তাহা কেহই ঠিক বলিতে পারেন না। আমরা কেদার বদ্রী যাত্রী, সুতরাং তিন স্থানেই শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রানুসারে প্রার্থনা করিলাম,—

নমো নমস্তে ভগবন্নীল ভৈরব ক্ষেত্রপঃ।
অনুজ্ঞাং দেহি যাত্রায়ৈ ধন্যঃ স্যাং ত্রিজগৎসু বৈ॥

আনন্দ ভৈরবের মূর্ত্তি সিন্দুর মণ্ডিত—শিবলিঙ্গের ন্যায়। লিঙ্গের উপরিভাগে দুইটী চক্ষু এবং কপালে অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত।

মায়াদেবী—আনন্দ ভৈরবের অনতিদূরেই মায়াদেবীর প্রাচীন মন্দির। মায়াদেবী ত্রিমুণ্ড ধারিণী ও চতুর্ভুজা; সর্ব্বাঙ্গে সিন্দুর লেপিত। দেবীর হস্ত-ত্রয়ে অসুর মুণ্ড, চক্র ও ত্রিশূল, অপর হস্তে মা অভয় দান করিতেছেন, পার্শ্বেই অষ্টভুজ মহাদেব মূর্ত্তি।

এই মন্দিরের দ্বারে একটি প্রাচীন শিলালিপি পাঠে কানিংহাম সাহেব এই মন্দির দশম কিম্বা একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ পুরাতন মন্দির ভগ্ন হওয়ার পর এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। মন্দিরের সম্মুখে একটী নন্দীকেশ্বর আছেন। বড়ই দুঃখের বিষয়

মায়াপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সেবা পূজা অতি সামান্ত ভাবেই হয়, এবং মন্দিরটিও সংস্কার বিহীন; চতুর্দ্দিকে বড় অপরিষ্কার এবং বন জঙ্গল সমাকীর্ণ। মন্দির প্রায়ই বন্ধ থাকে, সুতরাং দর্শনের বড়ই অসুবিধা। নির্দ্দিষ্ট সময়ে পূজারী মহাশয় পূজান্তে মন্দির অর্গল বন্ধ করিয়া চলিয়া যান।

নারায়ণ-শিলা।—মায়াপুরী মহল্লার আর একটী পুরাতন মন্দিরে নারায়ণ-শিলা অবস্থিত, মায়াপুরী মাহাত্ম্যে আছে ;—

ততঃ পশ্চিম দিগ্‌ভাগে শিলা পরম পাবনী।
নাম্না নারায়ণী খ্যাতা সর্ব্ব পাপ প্রণাশিনী॥
যস্তত্র কুরুতে শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধাভক্তি সমন্বিতঃ।
পিতৃ বংশ্যাঃ শতং মাতৃ বংশ্যাশ্চাপি তথা স্বয়ং॥
তারিতাঃ পিতরস্তেন সত্যং সত্যং ন সংশয়॥

কেদার খণ্ড ১১৫ অধ্যায় ১২। ১৩ শ্লোক

পরম পবিত্র নারায়ণী-শিলা সর্ব্ব পাপ বিনাশ করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধা ভক্তি যুক্ত হইয়া এস্থানে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃ ও মাতৃ বংশ এবং স্বয়ং শ্রাদ্ধ কর্ত্তা উদ্ধার পাইয়া থাকেন। গঙ্গার খালের (canal) সহিত ভূতনা নদীর সঙ্গমের নিকটেই নারায়ণ-শিলার মন্দির। ইহার অনতিদূরেই বেন রাজার কেল্লার ভগ্নাবশেষ দৃষ্টব্য। মায়াপুরী মহল্লা হরিদ্বারের একটী প্রাচীন স্থান; এই মহল্লায় ভৈরব, নারায়ণ-শিলা, মায়াদেবীর মন্দির ও বেন রাজার কেল্লার ভগ্নাবশেষ অবস্থিত। চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাং মায়াপুরী বা "ময়ূলোর" বৌদ্ধযুগে সমৃদ্ধির বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ভূগর্ভ খনন কালে এই স্থানে বহু প্রকারের মুদ্রা ও হিন্দু এবং বৌদ্ধ মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে।

সূর্য্যকুণ্ড—হরিদ্বারের বাজারের অনতিদুরে পর্ব্বতোপরি সূর্য্যকুণ্ড অবস্থিত। প্রবাদ, সূর্য্যদেব এইস্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। পর্ব্বতের গায়ে একটু সমতল ক্ষেত্রে জলপূর্ণ কুণ্ড, পাথরের ভিতর হইতে জল বাহির হইতেছে। এই নির্জ্জন পর্ব্বত বেষ্টিত স্থানটী তপস্যার উপযুক্ত বটে! পাহাড়ের গায়ে একটী সিন্দুর লেপিত সূর্য্যের সুগোল মুখ। এই পর্ব্বতের চূড়ায় মনসাদেবীর ক্ষুদ্র মন্দির আছে। যাঁহারা হরিদ্বারের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে চাহেন, তাঁহারা এই পর্ব্বতশৃঙ্গে অবশ্য আরোহণ করিবেন। দূরে পর্ব্বতের সমুদ্র তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া দিগন্ত বিস্তৃত; নিম্নে নীল কলেবরা ভাগীরথী নানা ধারায় বিভক্ত হইয়া ছুটিতেছেন। নদী তীরে শুভ্র মঠ, মন্দির পরিশোভিত

হরিদ্বার নগর কি সুন্দর দেখাইতেছে। দক্ষিণে কিছু দূরে সুন্দর কণখল দেখা যাইতেছে; আর একটু দূরে নয়ন মেলিয়া দেখ, গঙ্গার canal বা খাল নদীর অধিকাংশ জল লইয়া বহিয়া যাইতেছে।

ভীমেশ্বর মহাদেব ও ভীমকুণ্ড। ব্রহ্মকুণ্ডের এক মাইল উত্তরে হৃষীকেশাভিমুখী পথের পার্শ্বেই ভীমকুণ্ড ও ভীমেশ্বর মহাদেব। ভীমকুণ্ড একটী ক্ষুদ্র সরোবর, তাহার মধ্যে মন্দিরে ভীমেশ্বর লিঙ্গ বিরাজমান। প্রবাদ ভীমেশ্বর, মধ্যম পাণ্ডব ভীম প্রতিষ্ঠিত। ভীমেশ্বরকে স্থানীয় লোকে ভীমগদা বা ভীম ঘোড়া বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন ভীমের অশ্বের ক্ষুরাঘাতে এই কুণ্ডের উৎপত্তি; আবার কেহ বলেন যে স্বর্গারোহণকালে ভীম গদা নিক্ষেপ করিয়া যাওয়ায় "ভীমগদা" নাম হইয়াছে। সম্মুখে পতিত একটী প্রস্তর খণ্ডকে তাঁহারা ভীমের গদা বলিয়া দেখান। উহার উপর আঘাত করিলে এক প্রকার শব্দ হয়। মায়াপুরী মাহাত্ম্যে ভীমেশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ কোন পৌরাণিক প্রবাদের উল্লেখ নাই। পার্শ্বস্থ পর্ব্বত হইতে একটী ক্ষুদ্র উৎস নির্গত হইয়া ভীমকুণ্ডে পতিত হয় এবং সেখান হইতে একটী প্রণালীদ্বারা সেই সলিলরাশি গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। ভীমকুণ্ডের অনতিদূরে পর্ব্বত কন্দরে পঞ্চ পাণ্ডবের, নারায়ণের দশাবতারের এবং কালীমাতার মূর্ত্তি দ্রষ্টব্য। অনতিদূরে নদীর উপকূলে গৌরীশঙ্কর মহাদেবের একটী বৃহৎ মন্দির বিরাজমান।

সর্ব্বনাথ। সর্ব্বনাথ মহাদেবের মন্দির কুশাবর্ত্তঘাটের অনতিদূরে অবস্থিত। ইহা পুরাণ বর্ণিত প্রাচীন তীর্থ নহে। প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে (সম্বৎ ১৮৭৬ সালের মাঘ মাসে শুক্ল পক্ষীয় ৫মী তিথিতে) শ্রবণনাথ নামক জনৈক সাধু এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শিলালেখ্য পাঠে জানা যায়, মন্দির প্রতিষ্ঠায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। সর্ব্বনাথদেবের মন্দিরই হরিদ্বারে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর এবং এখানকার সেবা পূজার বন্দোবস্ত উত্তম। মন্দিরের কতকগুলি ভূ-সম্পত্তি আছে, তাহা হইতেই সেবা পূজা ও সদাব্রতের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। প্রশস্ত প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে প্রধান মন্দিরে দেবাদিদেব মহাদেবের কৃষ্ণপ্রস্তর বিনির্ম্মিত অতি সুন্দর পঞ্চমুখী লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজমান। লিঙ্গের চতুর্দ্দিকে সুন্দর পঞ্চমুখ শোভিতেছে। মূর্ত্তি মনোরম ও ভক্তি উদ্দীপক—জীবন্ত বলিয়া প্রতিয়মান হয়। মূর্ত্তিটীতে সদাশিবের করুণাময় ভাব প্রকটিত। সম্মুখে মন্দিরের জগমোহনের মধ্যে মর্ম্মর বিনির্ম্মিত বৃহৎ সুন্দর নন্দীকেশ্বর (বৃষভ)। ইহা ৮ ফিট লম্বা এবং ৪॥০ ফিট উচ্চ। মন্দির প্রাঙ্গণে প্রোথিত একটী প্রকাণ্ড

ত্রিশূল বহুদূর হইতে দৃষ্ট হইয়া সর্ব্বনাথদেবের মন্দিরের অবস্থান নির্দ্দেশ করে। মূল শিবমন্দিরের চতুর্দ্দিকে ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরে শ্বেতপ্রস্তর বিনির্ম্মিত গঙ্গাযমুনা সরস্বতীর সুন্দর মূর্ত্তি। নেপালী কারিকরের নির্ম্মিত পিত্তল গঠিত বহু সুন্দর সুন্দর দেবমূর্ত্তি এবং বৃষভ-বাহন হরপার্ব্বতী, চতুর্ভুজ নারায়ণ, দ্বিভূজ মুরলীধর শ্রীরাধা-কৃষ্ণ প্রভৃতি মূর্ত্তি, কালভৈরব ও শিবলিঙ্গ প্রভৃতি দর্শন করিলাম। আর একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে সাধু শ্রবণনাথের প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি এবং তাঁহার খড়ম ও কমণ্ডলু রক্ষিত আছে। শ্রবণনাথজী যোগী ও ভক্ত সাধু ছিলেন; তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরে একটা শান্ত সৌম্য ও গাম্ভীর্য্যের ভাব আছে। সর্ব্বনাথ-দেবের সান্ধ্য-আরত্রিক বড় মনোরম; পাঠক ইহা দেখিতে ভুলিবেন না।

শ্রবণনাথের মন্দিরের পূর্ব্বদিকে বিকানীর মহারাজের স্থাপিত উচ্চ চূড়া সমন্বিত একটী সুন্দর মন্দিরে গঙ্গাদেবীর সৌম্য-মূর্ত্তিটীও দর্শনীয়। বিকানীর দরবারের পক্ষ হইতে এখানে সাধু সন্ন্যাসী অনাথ দরিদ্রকে ভোজন-প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইন্দোর মহারাণী ও অন্যান্য রাজা সাধু মহান্ত প্রভৃতির প্রতিষ্ঠিত বহু দেবালয় গঙ্গাতীরেই প্রতিষ্ঠিত আছে। আমরা সময়াভাবে সকলগুলি দেখিবার সুযোগ পাই নাই।

সপ্ত সামুদ্রিক ও সপ্ত শ্রোতা তীর্থ। এই তীর্থ হরিদ্বার হইতে ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। পুরাণে আছে সমুদ্র এইস্থানে মহাদেবের অরাধনা করিয়াছিলেন।

সপ্ত-সামুদ্রিকং নাম তীর্থ পরম পাবনম্।
যত্র স্নাত্বা মহাভাগ শিবলোকে মহীয়তে॥
পুরা তত্র সমুদ্রৈশ্চারাধিতঃ ভগবান শিবঃ।
সমুদ্রেশ্বরো মহাদেবঃ সর্ব্বকাম ফলপ্রদঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—সপ্তশ্রোতা তীর্থে সপ্তঋষি তপস্যা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের প্রীতি সাধনার্থ গঙ্গা সেইস্থানে আপনাকে সপ্তধারায় বিভক্ত করিয়া-ছিলেন, এইজন্য এই পুণ্য তীর্থ সপ্তশ্রোতা নামে খ্যাত।

দক্ষিণে হিমবত ঋষীনাং আশ্রমঃ—
স্রোতোভিঃ সপ্তর্ভিযাবৈ স্বধুর্ণীসপ্তধাব্যধাৎ।
সপ্তানাং প্রীয়তে নানা সপ্তশ্রোতঃ প্রচক্ষতে॥ ভাগবৎ ১।১৩৫১।৫২

কপিলস্থান বা কপিলাবট। কোন ইংরাজী guideএ লেখা আছে হরিদ্বারের এক নাম "কপিলস্থান"; কারণ কপিলঋষি এখানে তপস্যা করিয়া-

ছিলেন। কোন পুরাণে আমরা এ কথার উল্লেখ পাই নাই ; কিন্তু মহাভারতে বনপর্ব্বে কণথলের সহিত কপিলাবট নামক তীর্থের উল্লেখ আছে। "কপিলায়াং বটং গচ্ছেৎ তীর্থসেবী নরাধিপঃ। উষ্যৈকাং রজনীং তত্র গোসহস্র ফলং লভেৎ ॥" (বনপর্ব্ব ৮৪ অধ্যায়)। কপিলস্থান বা কপিলাবটের কোন সংবাদ পাণ্ডাদিগের নিকট পাওয়া যায় না। প্রবাসী পত্রিকায় (১৩১৭ ভাদ্র, ভ্রমণ কাহিনী) জনৈক লেখক লিখিয়াছিলেন, যে তিনি সাধু সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছেন যে হরিদ্বার হইতে তিন মাইল উত্তরে কপিলস্থান অবস্থিত।

পিছোরনাথ মহাদেব, বিষ্ণুতীর্থ, শিবতীর্থ, পুষ্করুৎসেশ্বর, আপদুদ্ধারণ, শালিহোত্রেশ্বর, সর্ব্ব-দারিদ্র্যনাশিনী কৌমুদ্বতী নদী, বজ্রশিলা, রম্ভাকুণ্ড প্রভৃতি অনেক তীর্থের উল্লেখ মায়াপুরী মাহাত্ম্যে আছে। কালপ্রভাবে তন্মধ্যে অনেকগুলি লুপ্ত। পাঠকমহাশয় ইচ্ছা করিলে কেদার খণ্ডান্তর্গত মায়াপুরী মাহাত্ম্য পাঠে এই গুলির বিষয় অবগত হইতে পারিবেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীপান্নালাল সিংহ।

অর্ঘ]

জড় প্রেম

(সনেট)

ভালবাসা, ভালবাসা কাতর ক্রন্দন।
দুর্বোধ্য প্রেমের ভাষা বুঝিবার আশে,
অচেতনে ধ'রে আনি বাঁধি প্রেম পাশে !
—জগতের জড় দেহ সহিল বন্ধন।
বহুদিন হ'ল মোর সে অভিনন্দন।
জড় নাহি কথা কয়, কাছে নাহি আসে,
কত করে সাধি,—তুষি, জড় নাহি হাসে
জড় সে কি কভু হয় হৃদয় নন্দন ?
অবশেষে একদিন শারদ গগনে,
(সুনীল আকাশ পটে মেঘ নাহি ছিল।)
তপন ছাইল ধরা রঞ্জিত কিরণে,
প্রেমের পুলকে মোর দেহ শিহরিল।
নশ্বর সংসার মোর হইল নন্দন।
জড়ে হেরিলাম আমি প্রেমের স্পন্দন ॥

শ্রীশশধর মৈত্র।

সম্মোহন বিদ্যা।

(পূর্ব্ব প্রকশিতের পর ।)

মোহ-নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির স্মরণ-শক্তি একটী বিশেষ আলোচনার বিষয়। নিদ্রার গভীরতা অনুসারে ইহার তারতম্য লক্ষিত হয়। স্বল্প নিদ্রার পর সুপ্ত ব্যক্তি নিদ্রাকালীন সকল ঘটনাই বিবৃত করিতে পারে; কিন্তু গভীর নিদ্রার পর কিছুই পারে না। কাহারও স্বপ্নবৎ কিছু মনে থাকে; কাহাকেও বা কিছু স্মরণ করাইয়া দিলে ঘটনাবলী বলিতে পারে। মোহ-নিদ্রাবস্থায় কোন লোককে একটী সুরম্য ফুলের বাগানে বেড়াইতে বলা হইল; সে বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে কতকগুলি ফুল তুলিয়া আঘ্রাণ লইল; কতকগুলি লইয়া তোড়া বাঁধিল; কতকগুলি মালা গাঁথিয়া গলায় পরিল। নিদ্রাভঙ্গের পর সে যে বাগানে বেড়াইতেছিল, ইহাই মাত্র মনে থাকে; কিন্তু বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে সে কি করিল, তাহা কিছুমাত্র মনে থাকে না; কাহারও বা ইহাও মনে থাকে না। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে কেবলমাত্র বলে যে, সে ঘুমাইতে-ছিল। কিন্তু যগুপি তাহাকে বলা হয়, যে সে বাগানে বেড়াইতেছিল, তাহা হইলে তাহার নিদ্রাকালীন কোন কোন ঘটনা মনে জাগরূক হয়। অত্যন্ত গভীর নিদ্রার পর (স্বপ্নাটন অবস্থার পর) সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির কিছুই মনে থাকে না; কিন্তু নিদ্রাবস্থায় যগুপি তাহাকে বলা হয় যে তাহার সকল ঘটনাই মনে থাকিবে তাহা হইলে সে নিদ্রা ভঙ্গের পর সমস্ত ঘটনাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিতে পারে। সময়ে সময়ে ইহাও দেখা গিয়াছে, যে সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির কেবলমাত্র চক্ষু বন্ধ করিয়া নিদ্রাকালীন ঘটনাবলী বলিতে বলিলে, সে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনাগুলি বলিতে পারে।

মোহ-নিদ্রাবস্থায় জীবনের বিস্মৃত ঘটনাগুলি পুনরায় স্মরণ পথে আনয়ন করা যায় এবং পরিজ্ঞাত ঘটনাবলীর বিস্মৃতি উৎপাদন করা যায়। এমন কি যে সকল ঘটনাবলী কিছুমাত্র মনে নাই, তাহাও স্পষ্টরূপে মনে আইসে; এবং যাহা নিশ্চিতরূপে জানা থাকে, তাহারও ভ্রম হয়। একটী ৪০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিকে মোহ নিদ্রাভিভূত করিয়া বলা হইল, যে তাহার বয়স ৭ বৎসর; সে অমনি তাহার জীবনের ৭ বৎসর বয়সের পর সমস্ত ঘটনাবলী ভুলিয়া গেল। এ

অবস্থায় সে মনে করে যে বাস্তবিকই সে একটী ৭ বৎসরের বালক; তদূর্দ্ধ বয়সের ঘটনা তাহার মনে থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহার ৭ বৎসর বয়সের ঘটনাবলী যাহা অধিকাংশ ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহা স্পষ্টরূপে স্মরণ পথে আইসে এবং জিজ্ঞাসা করিলে সমস্ত ঘটনাই বলিতে পারে। তখন কি পড়ে, কোন শ্রেণীতে পড়ে, জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে "ফাষ্ট´বুক, শিশুশিক্ষা" ইত্যাদি পড়ি ও ৮ম শ্রেণীতে পড়ি। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাকে লিখিতে বলিলে সে বালকের হস্ত লিপির ন্যায় বড় বড় অক্ষরে A. B. C. D. লিখে। বর্ত্তমান কোন ঘটনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছুই বলিতে পারে না। সুপ্ত ব্যক্তিকে তাহার নাম ভুলাইয়া দিয়া অপর একটী নাম বলিলে সে তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। তখন তাহার নিজ নাম ধরিয়া ডাকিলে আর উত্তর দেয় না; তখন সে নূতন নামে পরিচয় দেয়, নূতন নাম ধরিয়া ডাকিলে তবে উত্তর দেয়। একদা নলিনী নামে এক মদ্যপায়ীকে মোহ-নিদ্রাভিভূত করিয়া বলিলাম তাহার নাম নলিনী নহে, সুরেন্দ্র বাবু; তাহাকে নলিনী বলিয়া ডাকাতে কোন উত্তর দিল না, যখন সুরেন্দ্র বাবু বলিয়া ডাকিলাম তখন উত্তর দিল। তাহাকে মদ্য পানের অপকারিতা সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দিতে বলিলাম; সে লোকটী সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা দুই তিন বার শুনিয়াছিল; আমার কথানুযায়ী সে মদ্য-পান সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা দিল। তাহার বক্তৃতার বিশেষত্ব এই যে বক্তৃতা দিবার সময় সে অবিকল সুরেন্দ্র বাবুর হাবভাব অনুকরণ করিয়াছিল। এই অবস্থায় পুরুষকে নারী ভাবাপন্ন করা যায়; তখন সে নিজের পুরুষত্ব ভুলিয়া গিয়া নারীবোধে মাথায় অবগুণ্ঠন দেয় ও পুরুষের সহিত কথা কহিতে সঙ্কুচিত হয়। তখন নারীর ন্যায় গলার স্বরেরও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। এমন কি সুপ্ত ব্যক্তিকে পশু বা পক্ষী বলিলে, সে পশু পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করে ও তাহাদের মত ডাকে। তাহাকে কুকুর বলিলে সে হস্তে ও পদে ভর দিয়া বিচরণ করে ও কুকুরের ন্যায় ডাকিতে থাকে। তাহাকে কুক্কুট বলিলে সে কুক্কুটের ন্যায় ডাকিতে থাকে। সুপ্ত ব্যক্তিকে অচেতন পদার্থেও পরিণত করা যায়। তাহাকে প্রস্তরময় মূর্ত্তি বলিলে সে নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ হইয়া দণ্ডায়মান থাকে; চেয়ার বলিলে অঙ্গ বিকৃত করিয়া একখানি চেয়ারের মত অর্দ্ধ উপবেশন ভাবে থাকে। গালিচা বলিলে শয়ন করিয়া নিস্পন্দ ভাবে পড়িয়া থাকে।

Post Hypnotism আরও আশ্চর্য্যের বিষয়। যে সকল দৃশ্যাবলী পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা মোহ-নিদ্রাবস্থায় দৃষ্ট হয়। কিন্তু মোহ-নিদ্রা অপনয়ন করিবার

পরও সুপ্ত-কালীন প্রেরণা বাক্যানুযায়ী দৃশ্যতঃ জাগ্রত অবস্থায় অতি অদ্ভুত ক্রিয়াবলীর বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। মোহ নিদ্রাভিভূত ব্যক্তিকে সুস্থ অবস্থায় যদ্যপি বলা যায়, যে সে নিদ্রাভঙ্গের পর কোন একটী ক্রিয়া করিবে, তাহা হইলে তাহাকে জাগ্রত করিবার পর সে প্রেরণা বাক্যানুযায়ী সেই ক্রিয়া জাগ্রত অবস্থায় সম্পাদন করে। কেবল মাত্র স্বপ্নাটনকারীর (Somnam bulist) উপর Post hypnotismএর দৃশ্যাবলী দেখিতে পাওয়া যায় ; এবং যে সকল দৃশ্যাবলী মোহ-নিদ্রাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই Post hypnotism অবস্থায় হইয়া থাকে। মোহ-নিদ্রাবস্থায় কোন লোককে যদ্যপি বলা হয় যে নিদ্রাভঙ্গের পর কথা কহিতে পারিবে না, তাহা হইলে সে জাগ্রত হইয়া বোবা হইয়া যায় ; অনেক চেষ্টা করিয়াও কথা কহিতে পারে না। তাহাকে যদ্যপি বলা হয় যে সে নিদ্রাভঙ্গের পর চেয়ার হইতে উঠিতে পারিবে না, তাহা হইলে নিদ্রাভঙ্গের পর তাহাকে উঠিতে বলিলে সে সম্পূর্ণ রূপে অক্ষম হয়। তাহাকে যদ্যপি বলা হয় যে জাগ্রত হইবার পর অৰ্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর মল মূত্র ত্যাগ করিবে, তাহা হইলে নিদ্রাভঙ্গের পর নির্দ্দিষ্ট সময়ে মলমূত্র ত্যাগ করিবার ইচ্ছা বলবতী হয় ও বাধ্য হইয়া মল মূত্র ত্যাগ করে।

এই সকল ঘটনাবলী দৃশ্যতঃ জাগ্রত অবস্থায় হইলেও প্রকৃত জাগ্রত অবস্থায় হয় না। সুপ্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করিয়া দিলে, সে তাহার স্বাভাবিক জাগ্রত অবস্থায় আসে বটে, কিন্তু নিদ্রাকালীন প্রেরণা-বাক্য প্রণোদিত ক্রিয়া সম্পাদনের সময় তাহার অজ্ঞাতসারে এক প্রকার নূতন মোহ-নিদ্রাবস্থা আইসে এবং ক্রিয়া নিষ্পন্নের পর তাহা চলিয়া যায় ও পুনরায় স্বাভাবিক জাগ্রত অবস্থায় আইসে। এই নূতন অবস্থায় সুপ্ত ব্যক্তির কিছুমাত্র জ্ঞান থাকেনা। এতদ্ সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে আশ্চর্য্যান্বিত হয় এবং উল্লিখিত কোন ঘটনাই মনে থাকে না ; জিজ্ঞাসা করিলে স্বীকার করে না। জাগরিত হইবার পর, নিদ্রাকালীন প্রেরণা বাক্যানুযায়ী ক্রিয়া সম্পাদন করিবার জন্য স্বতঃই একটী বলবতী ইচ্ছা হয় এবং তাহাতে তাহার অজ্ঞাতসারে এক প্রকার মোহ-নিদ্রা আইসে ও সেই অবস্থায় প্রেরণা বাক্য নির্দ্দিষ্ট কার্য্যটী সম্পাদন করিয়া পুনরায় জাগ্রত হয়। দৃশ্যতঃ জাগ্রত অবস্থায় ক্রিয়াটী নিষ্পন্ন হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা নব উদ্ভূত মোহ-নিদ্রাবস্থায় হইয়া থাকে। সুতরাং ক্রিয়া সম্পাদনের পর ঘটনাবলী সম্বন্ধে তাহার কিছুমাত্র স্মরণ থাকে না ; জিজ্ঞাসা করিলে সকলই অস্বীকার করে ; কদাচিৎ

কাহারও কাহারও সমাপিত ক্রিয়া মনে থাকে। তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ উল্লিখিত ক্রিয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে অস্বীকার করে না। তাহারা মনে করে যে ক্রিয়াটী স্ব-ইচ্ছায় করিয়াছে। কার্য্যটী অন্যায় হইলেও তাহার একটী সদুত্তর দিতে চেষ্টা করে। একটী গভীর মোহ-নিদ্রাভিভূত ব্যক্তিকে বলিলাম যে নিদ্রাভঙ্গের পর সে টেবিল হইতে পুস্তকগুলি লইয়া সেল্ফের উপর রাখিবে। নিদ্রাভঙ্গের পর সে তাহাই করিল। জিজ্ঞাসা করিলাম পুস্তকগুলি সেল্ফে রাখিলে কেন; সে উত্তর দিল, বইগুলি টেবিলের উপর বড়ই অপরিচ্ছন্ন দেখাইতেছিল।

কেহ কেহ Post-Hypnotic প্রেরণা বাক্যানুযায়ী ক্রিয়া সম্পাদনের সময় কার্য্যটী অন্যায় হইতেছে বুঝিতে পারে এবং কার্য্যটী না করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পায়; কিন্তু ইচ্ছা এত বলবতী হয়, যে কার্য্যটী না করিয়া থাকিতে পারে না। একজন সুপ্ত ব্যক্তিকে বলিলাম যে জাগ্রত হইবার ৫ মিনিট পরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবে এবং ক্ষণেক পরে পুনরায় আসিয়া আমাকে জিহ্বা দেখাইবে ও গালাগালি দিয়া পুনরায় নিজ আসনে উপবেশন করিবে। তাহার মোহ-নিদ্রা অপনয়ন করিয়া দিয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলাম, ঠিক ৫ মিনিট পরে সে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল এবং ক্ষণেক পরে পুনরায় গৃহাভ্যন্তরে আসিয়া কিছুক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিল। তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল যেন সে একটী বলবতী ইচ্ছা দমন করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতেছে ও তজ্জন্য মুখ ক্রমশঃ রক্তিম হইয়াছে। প্রায় ২।৩ মিনিট পরে সে অতি কষ্টে একবার জিহ্বাগ্রভাগ বাহির করিল ও আমাকে অতি অনুচ্চস্বরে একটী গালি দিয়া বসিয়া পড়িল এবং অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

কেহ কেহ এই প্রকার বলবতী ইচ্ছা কথঞ্চিৎ দমন করিতে সমর্থ হয়। তাহারা প্রেরণা বাক্যানুযায়ী কতক কার্য্য করে এবং কতক কার্য্য করে না। একটী লোককে মোহ-নিদ্রাভিভূত করিয়া বলিলাম যে সে জাগ্রত হইবার পর আমার নস্য-দানি হইতে এক টিপ নস্য লইবে। জাগরিত হইবার পর সে নস্য-দানিটী লইয়া ডালা খুলিয়া একবার আঘ্রাণ লইল ও নস্য-দানিটী পুনরায় বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। নস্য না লইবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিল যে সে নস্য লইতে অভ্যস্ত নহে, লইলে অসুস্থ বোধ করে।

Post hypnotismএ সুপ্ত ব্যক্তিকে নির্দ্ধারিত সময়ে কোন ক্রীড়া করিতে

বলিলে ঠিক সময় মত তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকে। সময় নিরূপণের জন্য কোনরূপ সঙ্কেত করিতে হয়। সঙ্কেতটী কোন বাহ্য বস্তু সংশ্লিষ্ট হইলে নিদ্ধারিত সময় নিরূপণের তারতম্য হয় না। একটী লোককে মোহ-নিদ্রাভিভূত করিয়া বলিলাম যে নিদ্রাভঙ্গের পর যখনই আমি হস্তে হস্ত ঘর্ষণ করিব, তখনই সে নৃত্য করিবে। মোহ-নিদ্রাভঙ্গের পর কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে যেমন হস্তে হস্তে ঘর্ষণ করিলাম, অমনি সে উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। যতক্ষণ হস্ত ঘর্ষণ করিলাম, ততক্ষণ সে নৃত্য করিতে লাগিল; ঘর্ষণ বন্ধ করিয়া হস্ত অপসারিত করিলে সেও নিরস্ত হইল। জিজ্ঞাসা করাতে সে সমস্ত অস্বীকার করিল। তাহার ধারণা যে; সে বরাবরই আমার সহিত কথোপকথন করিতেছে। এই লোকটীকে পুনরায় মোহ-নিদ্রাভিভূত করিয়া বলিলাম, কল্য রাত্রি ঠিক ৮টার সময় আমার বাটীতে আসিয়া টেবিল হইতে একখানি পুস্তক লইয়া আমাকে দিবে। পরদিন ঠিক রাত্রি ৮টার সময় সে আসিয়া কথিত মত ক্রিয়া সম্পন্ন করিল। একদিন একটী লোককে মোহ-নিদ্রাভিভূত করিয়া বলিলাম, যে সে ২২ ঘণ্টা পরে আমাদের বাটীতে আসিবে ও তাহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলে সে 'ন' অক্ষরটী ভুলিয়া যাইবে। লোকটীর নাম নগেন্দ্রনাথ। পরদিন সে আসিল বটে, কিন্তু বস্তুগত সঙ্কেত অভাবে ঠিক ২২ ঘণ্টা পরে আসিল না; প্রায় এক ঘণ্টা দেরী করিয়া আসিল। ক্ষণেক কথাবার্ত্তার পর আমি তাহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া একখণ্ড কাগজে নিরোদচন্দ্র লিখিতে বলিলাম; সে 'ন' বাদ দিয়া ি—রোদচন্দ্র লিখিল। তাহার নাম লিখিতে বলাতে, সে লিখিল "অগেন্দ্রআথ"। নাম জিজ্ঞাসা করাতে বলিল "অগেন্দ্রআথ"।

Post hypnotism অবস্থায় সুপ্ত ব্যক্তি যখন প্রেরণা-বাক্যানুবর্ত্তী কোন কার্য্য করিতেছে, তখন অপর কোন নূতন প্রেরণাবাক্য প্রয়োগ করিলে, সুপ্ত ব্যক্তি তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকে। ইহাতে দেখা যায় Post hypnotic অবস্থা মোহ-নিদ্রা হইতে বিভিন্ন নয়। একটী লোককে মোহ-তন্দ্রাভিভূত করিয়া বলিলাম যে নিদ্রাভঙ্গের পর সে টেবিল হইতে পুস্তকগুলি উঠাইয়া আলমারির মধ্যে রাখিবে। নিদ্রাভঙ্গের পর যখন সে প্রেরণা বাক্যানুযায়ী টেবিল হইতে পুস্তকগুলি লইয়া আলমারির মধ্যে রাখিতেছে, তখন বলিলাম যে আলমারির মধ্যে একটী সর্প রহিয়াছে এবং অঙ্গুলি নির্দ্দেশে অলীক সর্পটী দেখাইয়া দিলাম। সে তখন সর্প দেখিয়া সভয়ে নিরস্ত হইল এবং একটী যষ্ঠী লইয়া সেই অলীক-সর্পটীকে মারিয়া বহির্দ্দেশে নিক্ষেপ করিল। তৎপরে আলমারীর মধ্যে পুস্ত-ক

গুলি রাখিয়া উপবেশন করিল। জিজ্ঞাসা করাতে কোন সদুত্তর দিতে পারিল না।

মোহ-নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির উল্লিখিত অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, যতক্ষণ মনুষ্য অজ্ঞান অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ সে বাহ্যিক বা ইন্দ্রিয়গত মনের বশীভূত হইয়া কার্য্য করে, ততক্ষণ সে আত্ম-বোধ ও আত্ম গরিমাতে মত্ত থাকে, ততক্ষণ সে আমি ও আমার লইয়া আত্মহারা হয়। কিন্তু যেই কিছুক্ষণের জন্য ইন্দ্রিয়গত মনের ক্রিয়া স্থগিত হইয়া মনুষ্যের আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয় মনের অভ্যুদয় হয়, তখনই সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তখন অদ্ভুত দৃশ্যাবলী দেখিলে কাহারও মনে হয় না যে সুপ্ত ব্যক্তি কিছুমাত্র প্রকৃতিস্থ আছে বা কিছুমাত্র তাহার আত্মজ্ঞান আছে। তখন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে সুপ্ত ব্যক্তি আত্মহারা হইয়াছে। তখন তাহাকে যাহা বলা হইতেছে, তাহাই সত্য বোধে অম্লান বদনে গ্রহণ করিতেছে। নলিনীকে যেমনি বলা হইল যে, সে নলিনী নহে, সুরেন্দ্র বাবু, অমনি সে নিজ নামটী ভুলিয়া গেল ও নিঃসঙ্কোচে আপনাকে সুরেন্দ্র বাবু বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়া লইল। সামান্য মোহ-নিদ্রায় মানবের চির পোষিত আত্ম-ভাব ক্ষণেকের মধ্যে কোথায় চলিয়া যায়, ইহা দেখিয়াও মানবের চৈতন্য হয় না। মোহা-নিদ্রা আসিলে তাহার এই আত্ম-ভাব কোথায় থাকিবে। মহামায়ার খেলাঘরে দু'দিন খেলাইতে আসিয়া এ খেলনাটা লইয়া আমি খেলিয়াছি, অতএব ইহা আমার, এরূপ মনে করা অপেক্ষা ভ্রান্তি আর কি হইতে পারে। তাহার একবারও মনে হয় না যে নির্দ্দিষ্ট কাল ফুরাইলে তাহাকে যেখানকার খেলনা সেইখানে ফেলিয়া রিক্ত হস্তে চলিয়া যাইতে হইবে। এক কণিকা মাত্রও লইয়া যাইবার ক্ষমতা নাই। খেলনা যাহার তাঁহারই থাকিবে; আপনার বলাই সার হইবে।

মাগো! একি খেলা তোর ভ্রান্ত জীব ল'য়ে।
কেনই বা ক্রীড়া-মত্ত বিশ্ব-মাতা হ'য়ে।
জীব-প্রসবিনী যদি, মাতৃস্নেহ হরে।
বদ্ধ কেন করিলি বা দৃঢ় মায়া ডোরে!
কোথা হতে আসে তারা, কোথা চলে যায়।
কেনই বা আসে আর কেনই বা যায়।
জন্মিতেছে যদি, কেন মরিতেছে তারা।

পুনরায় আসি কেন হইতেছে সারা।
জন্ম মৃত্যু দেখিয়াও অন্ধ কেন তারা।
পুনঃ পুনঃ আসে যায় তবু আত্মহারা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায়।

অর্থ]

সাধনায় বিঘ্ন।

আত্মানুভূতিই সাধনার চরম লক্ষ্য। সাধনা ব্যতিরেকে কোনও বিষয়ে কোন প্রকার সিদ্ধিলাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। মানবের চিত্তে অনাদি কাল হইতে যে সব বিষয় বাসনা ও অবিদ্যা বদ্ধমূল হইয়া আছে, সাধনা ব্যতীত তাহার ক্ষয় সম্ভাবনা নাই। সুতরাং কি অবিদ্যা নাশ, কি মোক্ষ সাধন, ইহ-পরত্র যে কিছু দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখ লাভের উপায়—সাধনা। সাধনা, সর্ব্ব ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল; সাধনা, সর্ব্ব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ বল। এই রোগ, শোক দুঃখ, দুর্দ্দশা, দৈন্য পীড়িত জ্বালা যন্ত্রণাময় সংসারে—এই বাহ্য চাকচিক্যময় নিরাশা-পীড়িত দুঃখময় মানব জীবনে সাধনাই চিরশান্তির পথ দেখাইয়া দেয়। সাধনার পথে গমন করিলে কত অননুভূতপূর্ব্ব শান্তি লাভ হয়। সে শান্তি রাজাধিরাজের রত্ন সিংহাসনে কেন, স্বর্গের অপ্সরা কণ্ঠ-নিনাদিত নিত্য নব আনন্দের চির লীলা নিকেতন রমনীয় নন্দন কাননেও নাই; বুঝিবা বিশ্বের কুত্রাপি সে সুখ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু এ হেন সর্ব্বসুখ শান্তি দাতা সাধনার মার্গ আপাততঃ সুখশান্তি পূর্ণ নহে। এই মার্গ বিবিধ বিচিত্র কুসুমিত তরুলতা মণ্ডিত ও প্রসূন সমাচ্ছন্ন নহে। বরং এই পথ বিবিধ বিঘ্ন বিপদ্‌রাশি সমাকুল। সাধনার পথে পদে পদে বিপদ; সাধনার পথে উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ মরুভূমি—যেন পিশাচের করাল মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে। সেই উত্তপ্ত মরুতে মায়া কত মরিচীকা তুলিয়া শান্তি-পিপাসু সাধককে মার্গ ভ্রষ্ট করিয়া লোভ মোহাদি দস্যুদিগকে যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিবার সুবিধা দিতেছে। মায়া-মুগ্ধ সাধক দস্যুদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া, বিভ্রান্ত হইয়া শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন ও নিরাশ হইয়া পড়েন। তথায় তাঁহাদের শ্রম অপনোদনের কোনও উপায় নাই। সিদ্ধকামী সাধক স্বীয় সহিষ্ণুতা ও উদ্যম বলে সাধন-পথের এই সকল দুঃখ কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া সাধন-মার্গে সোপানের পর সোপান আরোহণ করেন। সাধক মাত্রেরই জীবন এইরূপ

বিঘ্ন-বিপদ্‌রাশি সঙ্কুল; দুঃখ কষ্ট যেন সাধকের অঙ্গাভরণ। সাধনার পথে এবম্প্রকার বিঘ্ন বিপদ্ আছে বলিয়া কোন প্রকৃত সাধক কি এই পথ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন?—কথনই নহে। কারণ এই সব বিপদরাশি উত্তীর্ণ হইয়া যদি সাধনার সমুচ্চ সোপানে আরোহণ করা যায়, তাহা হইলে সেখানে যে "অবাঙ্‌মানসগোচরম্" পদার্থ লাভ হয়। তাহাতে জীবনের সকল দুঃখ ও তাপ-ত্রয় দুর হইয়া এক পরমানন্দ লাভ হয়, সে আনন্দ আর কোথাও নাই।

আর এক কথা। সাধনার পথে বিঘ্ন বিপদ আছে বলিয়া এ পথ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। নশ্বর সংসারের তুচ্ছ সুখও বিনা বাধা বিপত্তিতে মিলে না; আর মানব জীবনের চরম সুখ—সাধনার অত্যুত্তম সুখ বিনা বাধায় মিলিবে কি প্রকারে? সংসারে যাহা যত সুখকর, তাহার সংগ্রহে ততই দুঃখ। যেমন বহুমূল্য প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া রত্নাকরের অতলতলে নিমজ্জন না করিলে মণি-মাণিক্য পাওয়া যায় না;—তদ্রূপ জীবন-মরণ পণ করিয়া সাধন-সিন্ধুর অতল তলে নিমজ্জন না করিলে কখনও সাধনার নিধিকে পাওয়া যায় না। সুখের পথে দুঃখ আছে বলিয়া কে কবে সুখ চেষ্টায় বিরত হয়? ভোগে রোগ ভয়—"ভোগে রোগ ভয়ম্" আছে বলিয়া কে কবে ভোগ বিমুখ হয়? "মদ্যমদেয়মস্পর্শমপেয়ম্" এবং সকল দুঃখের আকর জানিয়া, কবে কোন্ মদ্যপায়ী মদ্য-পান হইতে বিরত হয়েন? তদ্রূপ সাধনায় বিঘ্ন আছে জানিয়া, কবে কোন্ ভক্ত-অলিসাধন সৌধ-তোরণের অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সাধু-ঋষিগণ-আকাঙ্খিত, জন্ম-মৃত্যু-জরানাশনী ত্রিতাপহারিণী, চিরশান্তিদায়িনী, মুক্তি-সুধা লাভে বিরত হয়েন? তল্লাভে বিরত হওয়া দূরে থাকুক বরং 'মন্ত্রং বা সাধয়েৎ শরীরং বা পাতয়েৎ' পণ করিয়া সেই অপার্থিব ব্রহ্মানন্দ-সুধা লাভে অধিকতর যত্নবান হয়েন। সংসারের অস্থায়ী অনিত্য সুখের ন্যায় সাধনার সুখ অনায়াস-লভ্য ও অস্থায়ী নহে। এ সুখ ভূমা নিত্য এবং বহু আয়াস লভ্য। বহু জন্মের সুতীব্র সাধনার ফলে, কত উত্থান পতন ও পতনোত্থানের পর মুক্তির এই চিরবাঞ্ছিত ফল লাভ হয়। কিন্তু মৃদু সাধনায় মুক্তির এই বাঞ্ছিত ফল লাভে বহু বিলম্ব ও বহু আয়াস স্বীকার করিতে হয়। তাই উপনিষদ উপদেশ দিয়াছেন,—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত, ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গমপথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" অর্থাৎ 'উঠ, জাগ, বর গ্রহণ কর, যে পর্য্যন্ত না চরমে পৌঁছিতে পার? কবিরা এই পথকে শাণিত ক্ষুর ধারের ন্যায় দুর্গম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।'

সাধনার যত উচ্চ সোপানে যিনি আরোহণ করেন, তাহার পতন ঘটিলে

তিনি তত নিম্নেই পতিত হয়েন। কিন্তু তাই বলিয়া এই পতন, সংসার-মার্গের দুর্নীতি-পরায়ণ ব্যক্তির পতনের ন্যায় ভবিষ্যত ভীতি ও দুঃখপূর্ণ নহে। পরন্তু পতিত সাধক পূর্ব্ব জন্মের সাধনার ফলে, উদ্ধারের পথ পাইয়া থাকেন। ঈশ্বর-পরায়ণ সাধকের পতন হইলেও তাঁহাদের কখনও বিনাশ নাই। ভগবান এই কথা গীতাতে বলিয়াছেন ;—

"পার্থ! নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নাহ কল্যাণকৃত কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত! গচ্ছতি ॥
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥
অথবা যোগীনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ॥
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥
তত্র তং বুদ্ধি-সংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যত তে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তেহ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতি বর্ত্ততে ॥
প্রযত্নাদ্যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধ-কিল্বিষঃ।
অনেক জন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম ॥

গীতা ৬ষ্ঠ অঃ ৪০-৪৫।

"ভগবান কহিলেন, হে পার্থ! কি ইহলোকে কি পরলোকে, কুত্রাপি যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির বিনাশ নাই; কারণ হে তাত; কল্যাণকারী ব্যক্তি কখন দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি বহু বর্ষ যাবৎ পুণ্যশীলগণের প্রাপ্য লোকে অবস্থিতি করতঃ সদাচার ধনবানদিগের গৃহে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া থাকে; অথবা ধীমান্ যোগীগণের কুলে জন্মগ্রহণ করে। ঈদৃশ যে জন্ম ইহলোকে অতীব দুর্ল্লভ, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সেই জন্মে পূর্ব্বদেহ-লব্ধ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ-প্রাপ্তি বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হইয়া থাকেন। যোগভ্রষ্ট-ব্যক্তি কোন বিঘ্ন-নিবন্ধন অনিচ্ছু হইলেও পূর্ব্ব জন্ম কৃত অভ্যাস তাহাকে ব্রহ্ম-পরায়ণ করে; তখন সেই ব্যক্তি যোগ-জিজ্ঞাসু হইয়া বেদ কথিত কর্ম্মফল অপেক্ষা অধিক ফল প্রাপ্ত হয়। নিষ্কলুষ যোগী অধিকতর প্রযত্ন সহকারে বহু জন্মে সিদ্ধ হইয়া অবশেষে পরমাগতি লাভ করে।"

তাই বলিতেছি, সাধনার মার্গ বিঘ্ন বিপদসঙ্কুল হইলেও, অভীষ্ট সিদ্ধিলাভে

পুনঃ পুনঃ ব্যাঘাত ঘটিলেও, সকলেরই এই পথ আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। সাধনার পথ আপাতঃ দৃষ্টিতে দুঃখময় হইলেও, এ পথ কেবলই সুখের আকর স্বরূপ। সাধনার পথে যে দুঃখ আছে, তাহা প্রকৃত দুঃখ নহে—সুখ। যে সুখ পরিনামে দুঃখের পথে লইয়া যায়, তাহা কদাচ সুখ নহে—তাহাই দুঃখ। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, সংসারের তাবৎ বস্তুই দুঃখানুবিদ্ধ। এই কারণ সাংসারিক অনিত্য বস্তু জীবকে এ যাবৎ সন্তোষ দান করিতে পারে নাই ও কখনও পারিবেনা। নশ্বর অনিত্য বস্তু হইতে কখনও সুখের উদ্ভব হয় নাই, হইবেও না। পরিণামে দুঃখ, বর্ত্তমানে অর্থাৎ ভোগকালে দুঃখ এবং পশ্চাৎ বা স্মরণ কালেও দুঃখ হয় দেখিয়া এবং সত্ত্বাদি গুণ সকল পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করে দেখিয়া, বিবেকীগণ সমস্ত বস্তুকেই দুঃখ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। "পরিণাম তাপ সংস্কার দুঃখৈ গুণবৃত্তি বিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বম্ বিবেকিনঃ" (পাতঞ্জল দর্শন, সাধন পাদ ১৫ সূত্র)। এইরূপে সংসারের তাবৎ বস্তুই দুঃখ সংশ্লিষ্ট দেখিয়া, কালে জীবের বুদ্ধিও শক্তি স্বতঃ প্রেরিত হইয়া নিত্য সনাতন ও চির সুখ-ময় অবলম্বনকে ধরিতে যাইয়া সাধনার পথ দিয়া সেই মূল তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত হয়। কিন্তু অবিবেকী ব্যক্তিগণ মোহে মুগ্ধ হইয়া 'ইহাতে সুখ হয়' 'উহাতে দুঃখ হয়' মনে করিয়া আপনাকে একবার সুখী. একবার দুঃখী মনে করিয়া, সুখ-দুঃখের নিষ্পেষণে নিষ্পেশিত হয়। সংসার-চক্রের এই সুখ-দুঃখের নিষ্পেষণ হইতে উদ্ধার লাভ করিবার পন্থাই—সাধনা। নিত্য সুখ মিলিবার কারণ বলিয়া সাধনার পথের ক্লেশও সুখকর বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, মানবের প্রকৃত সুখ কোথায়? বাস্তবিক সংসারের কোন বস্তুই সুখ বা দুঃখের হেতু নহে। সুখ বা দুঃখ মনেরই বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। কিন্তু প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দ্বারা সংসারে নিরতিশয় সুখ বা দুঃখ অনুভব করা যাইতে পারে। প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদনে যে সুখ হয়, তাহা পরিণামে দুঃখদ বলিয়া দুঃখের এবং নিবৃত্তির দ্বারা যে সুখ ভোগ হয়, তাহা পরিণামে সুখদ বলিয়া প্রকৃত সুখের। নিবৃত্তি দ্বারাই প্রকৃত দুঃখের বিনাশ ও সুখের উদ্ভব হয়। বৃত্তির এই নিবৃত্তির অবস্থাই যোগ বা সাধনা। "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" (পাতঞ্জল দর্শন ২য় সূত্র সমাধিপাদ)। বৃত্তির নিরোধই আত্মানুভূতির প্রকৃষ্ট উপায়। বৃত্তির নিরোধ হইলে আত্মানুভূতি হয় ———"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্" (ঐ তৃতীয় সূত্র সমাধিপাদ) তখন (এই নিরোধের অবস্থায়) দ্রষ্টা (পুরুষ) আপনার (অপরিবর্ত্তনীয়) স্বরূপে অবস্থিত থাকেন।

যে পথে বৃত্তির নিরোধ হয়, তাহাই যোগ বা সাধনার পথ। নানা প্রকার বিঘ্ন বিপদের কিম্বদন্তী আছে। ইহাকে যোগ বা সাধন-বিঘ্ন বলে। এই যোগের পথে বা সাধনার পথে প্রত্যেক সাধকেরই অল্প বিস্তর বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। সেই সকল বিঘ্নের কথা যথাজ্ঞান বর্ণিত হইতেছে।

সাধনার নানা প্রকার বিঘ্ন আছে, তন্মধ্যে ধর্ম্মধ্বজিতা, ভাবদুষ্টতা, বিলাস-লালসা, অহংজ্ঞান, অভিমান ও কপটাচার প্রভৃতি সাধনার প্রচলিত বিঘ্ন। এতব্যতিরিক্ত আরও কয়েক প্রকার সাধন বিঘ্নের কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। এগুলি সাধনার সোপানে স্বতঃই উপস্থিত হয়। আবার সাধকের অহংকার প্রভৃতি দোষ হইতেও বিঘ্ন উপস্থিত হয়। সাধক যখন সাধনার ক্রমোচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার কোন কোন অলৌকিক দৈবী শক্তির আবির্ভাব হয়। সাধক সেই সকল দৈবী শক্তি লাভ করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া আপনার শক্তির অযথা ব্যবহার করিয়া সাধন-সোপান হইতে বিচ্যুত বা যোগভ্রষ্ট হইয়া থাকেন।

মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার যোগ-সূত্রে সমাধিপাদে কয়েকটি সমাধি বা বিঘ্নের উল্লেখ করিয়াছেন। "ব্যাধিস্ত্যানসংশয় প্রমাদালস্যাবিরতি ভ্রান্তিদর্শনালব্ধ ভূমিকত্বানবস্থিতানি চিত্তবিক্ষেপোস্তেহন্তরায়াঃ॥' অর্থাৎ ব্যাধি, স্ত্যান (মনের অক্ষমতা, ইচ্ছা হইলেও কার্য্য করিবার শক্তির অভাব) সংশয় (যোগ করিতে পারিব কিনা অথবা যোগ হয় কিনা ইত্যাকার জ্ঞান) প্রমাদ (চিত্তের ঔদাসীন্য) আলস্য (শরীরের ও মনের গুরুত্ব যদ্দ্বারা যোগে অপ্রবৃত্তি জন্মে) অবিরতি (বিষয়-তৃষ্ণা, অর্থাৎ ইহা হউক, উহা হউক ইত্যাকার আকাঙ্ক্ষা) ভ্রান্তি দর্শন (ভ্রম জ্ঞান অর্থাৎ একে আর জ্ঞান, শুক্তিতে রজত জ্ঞান) অলব্ধভূমিকত্ব (কোন কারণে বা প্রতিবন্ধক বশতঃ যোগাবস্থা প্রাপ্ত না হওয়া, যোগ বা সাধনা আরম্ভ করিয়া কোন সিদ্ধি লক্ষণ না দেখিলে চিত্তে অমনি বিক্ষেপ উপস্থিত হয়. মনে হয় বৃথা পণ্ডশ্রম হইতেছে; ইহাও বিঘ্ন মধ্যে গণ্য) অনবস্থিত চিত্ত (চিত্তের অস্থিরতা; কোন এক যোগ অবস্থা পাইলে তাহাতে চিত্ত স্থির বা সন্তুষ্ট না থাকা);—এই গুলিন সকলই একাগ্রতা লাভের বিঘ্ন বা বিপক্ষ, সুতরাং সাধনার ঘোর অন্তরায়। চঞ্চলতা সাধনার প্রবল বিঘ্ন। চিত্তস্থির না হইলে সাধনার সোপানে কখন আরোহণ করা যায় না। *

চিত্তস্থির না হওয়ায় কতকগুলি কারণ আছে, সেই গুলি এই—"দুঃখ দৌর্ম্ম-

* ৺পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের ব্যাখ্যা।

নস্তাঙ্গমজেয়ত্ব শ্বাসাবিক্ষেপসহভুবঃ (সমাধিপাদ—৩১ সূত্র) দুঃখ, দৌর্ম্মনস্ত (ইচ্ছার ব্যাঘাত হইলে যেমন ক্ষোভ জন্মে তাহার নাম দৌমনস্ত) অঙ্গকম্পন, শ্বাস, প্রশ্বাস—এগুলি বিক্ষেপের অর্থাৎ অস্থিরতায় সহচর। সুতরাং মনঃস্থৈর্য্যের প্রতিবন্ধক। আর কতগুলি বিঘ্ন, এগুলি সাধারণ সর্ব্বোচ্চ সোপানে উপস্থিত হয়। সাধক যখন সাধনার সোপানের পর সোপানে আরোহণ করিতে থাকেন, যখন তাঁহার অনিমা, লঘিমা প্রভৃতি যোগৈশ্বর্য্য গুলি আয়ত্বে আইসে; তখন তিনি বঞ্চনাপরায়ণ দেবযোনি সমূহ অর্থাৎ পিশাচ গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া থাকেন।

বায়স্কোপের চিত্রের ন্যায় নানাবিধ আলৌকিক দিব্য মূর্ত্তি সাধকের মানসপটে উদিত হইয়া প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হয়। সাধন-রসানভিজ্ঞ সাধক সেই মূর্ত্তির ইঙ্গিত মত চালিত হইয়া সাধন সোপান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন।

বৈরাগ্যাবতার জ্ঞানসিন্ধু ভগবান বুদ্ধ দেবের আলৌকিক জীবনেও আমরা এই সকল সাধন বিঘ্নের পরিচয় পাই। ভগবান বুদ্ধ দেবকে সাধনমার্গ ভ্রষ্ট করিবার জন্য 'মার' নামক দৈত্য নানা প্রকার পলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে বিপথগামী করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কবিবর নবীনচন্দ্র সেই সকল বিঘ্নের ভিন্ন ভিন্ন চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; তন্মধ্য হইতে দুই একটি উদ্ধৃত হইল।

"পঞ্চমা আবেশময়ী কুন্তল আলুলায়িতা, কুসুম শয্যায় অর্দ্ধ শায়িতা সুন্দরী অর্দ্ধ অনাবৃত বক্ষ, অর্দ্ধ নিমীলিত আঁখি, কি মধুর হাসিসিক্তবিম্বাধরে মরি! কুসুমে খচিত বাসা একবারে চারু বীণা তুলিছে; মূর্চ্ছনা মৃদু কি আবেশময়। সুরাপাত্র অন্য করে, অবেশ কটাক্ষে কহে, আইস বিলাস সুখে পূরিব হৃদয়। দাঁড়াইয়া কামদেব, দাঁড়াইয়া রতি দেবী রতির কুসুম কায়, কুসুমেরি পাশ। কহে কাম, শাক্যসিংহ চেয়ে দেখ, এতাধিক আছে মানবের আর কিবা অভিলাষ। কি চাহ সকলি তাহা, দিবে প্রাণ পত্নী মম বাঁধিয়া কুসুমদাম করেতে তোমার। এই নির্ব্বাণের পথ দেখেছো কি দুঃখরেখা যাও ঘরে ফিরে যোগ কর পরিহার (অমিতাভ)।"

সাধনার পথে এইরূপ নানাবিধ বিঘ্ন নানা মূর্ত্তিতে উপস্থিত হয়। সিদ্ধিকামী সাধক এই গুলিকে বিঘ্নমাত্র জানিয়া অগ্রাহ্য পূর্ব্বক চরম লক্ষ্যে উপস্থিত হয়েন। যদি তিনি এই সকল বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী। আমরা আগামী বারে অস্মদ্দেশের কোনও

বিখ্যাত সিদ্ধ তান্ত্রিক যোগীর অপূর্ব্ব লোক বিস্ময়কর সাধন বিঘ্নের অথ্যায়িকা পাঠকবর্গের গোচর করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীহৃদয়নাথ মিশ্র।

অর্ঘ]

মৃত্যুপথ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ব্যক্তি ভেদঃ কর্ম্ম বিশেষাৎ।

পরে অন্যান্য জীবের কর্ম্মে বা অদৃষ্টের বলে তাহা অংশে অংশে ভিন্ন হইয়া অনেক অর্থাৎ অসংখ্য হইয়াছে; যেমন এক পিতৃলিঙ্গ শরীর হইতে অনেক পুত্র কন্যাদির লিঙ্গ শরীর উৎপন্ন হয় সেইরূপ।

তদনিষ্ঠানাশ্রয়ে দেহেতদ্বাদত্তদ্বাদঃ॥

লিঙ্গ শরীরের অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয় সূক্ষ্মভূত এবং তাহার আশ্রয় এই ষাট্‌কৌষিক স্থূল। প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে সূক্ষ্ম দেহই দেহ; পরন্তু তাহা ষাট্‌-কৌষিক স্থূলে অবস্থিত থাকে বলিয়া ষাট্‌-কৌষিক স্থূলও দেহ আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

নস্বাতন্ত্র্যাত্তদৃতেচ্ছায়াবচ্চিত্র বচ্চ॥

ছায়া অথবা চিত্র যেমন আধার পরিশূন্য হয় না বা থাকে না, তেমনি লিঙ্গ-দেহও নিরাধার বা নিরাশ্রয় নহে। তাহারও অধিষ্ঠান বা আশ্রয় আছে। তাহা সূক্ষ্ম ভূতের অবস্থাবিশেষ।

মূর্ত্তত্বেপিন সঙ্ঘাত যোগাৎ তরণীবৎ॥

লিঙ্গ শরীর শরীর বলিয়া মূর্ত্ত বটে; পরন্তু তাহা অসঙ্গ ও স্বতন্ত্র অবস্থান করে না। তাহা সূর্য্য কিরণের ন্যায় সঙ্ঘাত অবলম্বনে অবস্থান করে। সূর্য্য কিরণ কেন? তেজ পদার্থ মত্রেই পার্থিব দ্রব্যাদিতে সম্বদ্ধ হইয়া অবস্থান করে। লিঙ্গ-শরীর সত্ত্ব প্রকাশময় বলিয়া ভূতসঙ্গী অর্থাৎ সূক্ষ্ম ভূতাশ্রয়ী।

অণু পরিমাণং তৎকৃতিশ্রুতেঃ॥

লিঙ্গ.দেহ মূর্ত্ত ও পরিমিত পরিমাণ বিশিষ্ট। হেতু এই যে, তাহার ক্রিয়া শ্রবণ আছে। ক্রিয়া=কর্ম্মকরণ ও গত্যাগতি প্রভৃতি। মূর্ত্ত ব্যতীত পূর্ণ বা বিভু পদার্থে ক্রিয়া হয় না।

তদন্নময়ত্ব শ্রুতেশ্চ ॥

শ্রুতি বলিয়াছেন, লিঙ্গ শরীরের একাবয়ব মন; তাহা অন্নময় অর্থাৎ ভক্ষ্য দ্রব্যের পরিণামে উৎপন্ন। তাহাতেও বুঝা গেল, লিঙ্গ শরীর অনিত্য ও পরিমিত পরিমাণ বিশিষ্ট। যাহা অপরিমিত বা বিভু তাহা অনিত্য নহে; প্রত্যুত নিত্য।

পুরুষার্থং সংস্থিতালিঙ্গানাং সূর্পকারবদ্রাজ্ঞঃ ॥

জীব পুরুষের অবয়ব অঙ্গুষ্ঠ প্রমান। যাঁহার তেজ সূর্য্যের ন্যায়, যিনি সঙ্কল্প ও অহংকার প্রভৃতির আশ্রয়, সেই জীব পুরুষ স্বীয় বুদ্ধি প্রভাবে অতি সূক্ষ্ম পরমাত্মাতে পরিজ্ঞাত হইতে পারে।

সূক্ষ্ম দেহের বিস্তৃতি। আকৃতি থাকিলেই বিস্তৃতি থাকিবে। স্থুল শরীর যেমন কতক স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, সূক্ষ্ম শরীরও কতক স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করে, যথা।—

অঙ্গুষ্ঠ মাত্রঃ পুরুষোহঙ্গুষ্ঠঞ্চ সমাশ্রিতঃ।
ঈশঃ সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভুঃ প্রীণাতিবিশ্বভুক্ ॥ ১৩৮ ॥ নারায়ণোপনিষৎ ॥

অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ অঙ্গুষ্ঠ মাত্র স্থানকে আশ্রয় করিয়াছে; সমস্ত জগতের ঈশ্বর ও বিশ্বভুক্ প্রভু সমস্তকে প্রীত করেন।

সূক্ষ্ম শরীরের প্রকৃতি। জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর পঞ্চ কোষাত্মক। তন্মধ্যে স্থূল শরীর অন্নময়, সূক্ষ্ম শরীর প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়, এবং কারণ শরীর আনন্দময়। প্রাণী মাত্রেই এই নিয়ম।

(ক) অন্নময় কোষ বা স্থুল শরীর। ভৌতিক শক্তির আধার ভূতকোষ বা অন্নময় কোষ। অন্নের বিকারাত্মক যাট্‌কৌষিক অর্থাৎ অস্থি, মজ্জা, মেদ, ত্বক, মাংস ও রক্ত দ্বারা গঠিত শরীরই অন্নময় কোষ। পিতৃ মাতৃ ভুক্ত অন্ন হইতে ইহা উৎপন্ন। যে শরীর অর্থাৎ স্থূলদেহ, পিতৃমাতৃ ভুক্ত অন্নের পরিণাম বিশেষরূপ শুক্র শোণিত হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্নরস দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হয়, তাহাই অন্নময় কোষ বা স্থূল সমষ্টি। পিতৃমাতৃ ভুক্ত অন্নরস বনস্পতি প্রভৃতি বৃক্ষাদি হইতেই গৃহীত হয়, এইজন্য ইহাকে 'উদ্ভিদ্ কোষও' বলা যায়; কেননা ইহা উদ্ভিদের সহিত সম্পূর্ণই সাদৃশ আছে, যথা শ্রুতি—"তান্ হৈতৈঃ

শ্লোকৈঃ প্রপঞ্চ। যথা বৃক্ষোবনস্পতি স্তথৈব পুরুষোঽমৃষা, তস্যলোমানি পর্ণানিত্বগস্যোৎপটিকাবহিঃ। ত্বচ এবাস্য রুধিরং প্রস্যন্দি ত্বচ উৎপটঃ তস্মাত্তদা বৃক্ষোৎপ্রৈতিরসো বৃক্ষাদি বাহতাৎ। মাংসাণ্যস্য শকরাণি কিনাটং স্নাবতৎ স্থিরং, অস্থীন্যস্তরতোদারুণি মজ্জামজ্জোপমকৃতা। ২৮॥ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

এই জগতে পুরুষ এবং বনস্পতি বা বৃক্ষ উভয়ই ঠিক একরূপ। পুরুষের লোম আছে, বনস্পতিরও পত্র আছে, পুরুষের যেমন ত্বক আছে, বৃক্ষেরও তেমন বল্কল আছে। পুরুষেরও কর্ত্তিত ত্বক্ হইতে রুধির নিঃসৃত হয়, বৃক্ষেরও কর্ত্তিত বল্কল হইতে রস নিঃসৃত হয়। পুরুষেরও মাংস আছে, বৃক্ষেরও মাংস স্থানীয় শকল আছে। পুরুষেরও স্নায়ু অর্থাৎ শিরা আছে, বৃক্ষেরও কিনাট অর্থাৎ বল্কলের ভিতরে এক প্রকার সূত্র আছে। পুরুষেরও স্নায়ুর পরে অস্থি সমস্ত আছে, বৃক্ষেরও কিনাটের নীচে দারু অর্থাৎ কাষ্ঠ আছে। পুরুষেরও মজ্জা আছে, বৃক্ষেরও সার আছে। এবম্প্রকারে স্থূল শরীর উদ্ভিদাত্মক অন্নময় কোষ।

সন্নিধানাদ্ যথাকাশ কালাদ্যাঃ কারণং দ্রুমোঃ।
তথৈব পরিণামেন বিশ্বস্য ভগবান্ হরিঃ।
ব্রীহিবীজে যথা মূলং নালং পত্রাঙ্কুরৌ তথা।
কাণ্ডং কোষস্তথা পুষ্পং ক্ষীরং তদ্বচ্চ তণ্ডুলাঃ॥
তুষাকণাশ্চ সন্তোবৈষাভ্যাবির্ভাবমাত্মনঃ।
প্ররোহহেতু সামগ্রম্ আসাদ্য মুনিসত্তম॥
তথা কর্ম্মস্বনেকেষু দেবাদ্যাঃ সমবস্থিতাঃ॥
বিষ্ণুশক্তিং সমাসাদ্য প্ররোহমুপযান্তিবৈ॥ বি পু ২ অং-৭ অঃ॥

আকাশ ও কাল প্রভৃতি যেমন সন্নিধান হেতু বৃক্ষোৎপত্তির কারণ হয়, সেইরূপ ভগবান্ হরিও জগতের পরিণামের কারণ। হে মুনিসত্তম! ধান্যের মধ্যে যেমন মূল, নাল, পত্র, অঙ্কুর, কোষ, পুষ্প, ক্ষীর, তণ্ডুল, তুষ ও কণা সকল আছে এবং অঙ্কুরোৎপত্তির হেতু ভূমি জলাদি সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া আভির্ভূত হয়; সেইরূপ প্রাক্তন কর্ম্ম সকলে অবস্থিত দেবাদি সমুদয়, বিষ্ণু-শক্তি প্রাপ্ত হইয়া অবির্ভূত হয়।

(খ) প্রাণময় কোষ বা সূক্ষ্ম শরীর। ভৌতিক শক্তি ও জীবনী শক্তি দুইয়ের একাধার উদ্ভিদ কোষ, প্রাণময় কোষ অর্থাৎ উদ্ভিদ্‌দিগের অন্নময় ও প্রাণের অস্তিত্ব আছে; কিন্তু মন, বুদ্ধি ও আনন্দের বিকাশ অন্যান্য জীবাদি

হইতে অতি অল্পতর মলিন। অন্নময় কোষের অভ্যন্তরে অন্নময় শরীরে বলাধান করতঃ ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তিকারী পরিপূর্ণ স্বভাব যে পঞ্চ বায়ু, তাহাকে প্রাণময় কোষ কহে। দৈহিক ক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া প্রাণময় কোষের কার্য্য। প্রাণময় কোষ সূক্ষ্ম শরীরের প্রথম আবরণ। এই প্রাণময় কোষে প্রাণাদি বায়ু বিকার প্রাপ্ত হইলে, বক্তৃতাদি রহিত আত্মাকে বক্তার ন্যায়, দাতৃত্বাদি রহিত আত্মাকে দাতার ন্যায়, গমনাদি রহিত আত্মাকে গন্তার ন্যায় এবং ক্ষুৎ-পিপাসাদি রহিত আত্মাকে ক্ষুৎ-পিপাসাদি যুক্তের ন্যায় আবরণ করে।

(গ) মনোময় কোষ বা সূক্ষ্ম শরীর। ভৌতিক শক্তি, জীবনী শক্তি ও চেতন শক্তি এই তিনের একাধার পশ্বাদি কোষ বা মনোময় কোষ অর্থাৎ পশ্বাদিতে অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষের অভিব্যক্তি আছে; কিন্তু বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষের অভিব্যক্তি অতি মলিন ও কম। প্রাণময় কোষের অভ্যন্তরে সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া মনোময় কোষ নামে অভিহিত হয়। ইহাই সূক্ষ্ম শরীরের দ্বিতীয় আবরণ। ইচ্ছা, অনুভূতি, চিন্তা, কল্পনা, ধারণা, ধৃতি, স্মৃতি, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, মমতা, গ্রহণ, ধারণ, উহ, অপোহ, তত্ত্বজ্ঞান ও অভিনিবেশ ইত্যাদি সমস্তই মনোময় কোষের ধর্ম্ম। এই মনোময় কোষ হইতে 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি সংকল্প বিকল্প উত্থিত হয় এবং নামরূপাদি ভেদ কল্পনা দ্বারা প্রবল প্রাণময় কোষকে অভিপূর্ণ করিয়া স্বয়ং প্রকাশমান হয়।

অহঙ্কারোঽভিমানশ্চকর্ত্তা মন্তা চ সংস্মৃতঃ।
আত্মাচ প্রাকৃতোজীবো যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥ কূর্ম্ম॥

অর্থাৎ অহঙ্কার, অভিমান, কর্ত্তা, অনুমন্তা, সংস্মৃত আত্মা, প্রাকৃত ও জীব এই সকল অহংকারের নাম। এক অন্তঃকরণই যেমন বীজ, অঙ্কুর ও মহাবৃক্ষাদিরূপে ত্রয়াবস্থা ভাবাপন্ন হয় অর্থাৎ এক বীজেরও বীজ, অঙ্কুর ও মহা বৃক্ষাদি অবস্থাত্রয় উপস্থিত করে, তদ্রূপ মহত্তত্ত্বেরও সাত্ত্বিক বিকাশে বুদ্ধি, রাজসিক বিকাশে চিত্ত বা মন এবং তামসিক বিকাশে অহংকার উৎপন্ন হয়। সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, অনুভূতি প্রকাশক সংশয়াত্মক মনের স্থান ললাটদেশ অর্থাৎ মস্তকাভ্যন্তরে ললাটদেশে মনোময় কোষ অবস্থিতি করে, এবং সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্থান মস্তিষ্ক সুতরাং মনের সহিত একীভাবাপন্ন। ঐ মনোময় আকুঞ্চণ শক্তিবলে যত ইচ্ছা তত সূক্ষ্ম হইতে পারে, এবং প্রসারণ শক্তিবলে

যত ইচ্ছা ততদূর প্রসারিত হইতে পারে; এক মুহূর্ত্তে ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে পারে। ঐ মনের একটি সংরক্ষণী শক্তি আছে। মনোময় কোষের দুইটী কার্য্য। একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বিষয় সংগ্রহ করণ, দ্বিতীয় অন্তরে তাহার চিন্তা দ্বারা পরিবর্দ্ধন ও বিস্তার করিয়া ভাবের আকার নির্ম্মাণ করণ। জ্ঞানেন্দ্রিয়েতে বাহ্য বিষয় জ্ঞান পতিত হয়, স্নায়ু দ্বারা তাহা মনোময় কোষে অর্পিত হয়, মন তাহার 'আয়তন পরিবর্দ্ধন শক্তি' বলে বা প্রসারণ শক্তিবলে তাহা গ্রহণ করিয়া 'সংরক্ষণী' শক্তিবলে তাহাকে ধারণ পোষণ করিয়া তাহাতে ভাবের আকার নির্ম্মাণ করে; ঐ ধারণ পোষণের নামই ধৃতি ইত্যাদি। ঐ নির্ম্মিত ভাবে মনের যখন অভিনিবেশ বা আসক্তি জন্মে, তখনই ইচ্ছা রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি কামজ বৃত্তিরও বিকাশ হয় এবং উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট বৃত্তি এবং বিশেষাবিশেষ ভাবের উদয় হয়।

ঐ মনোময় কোষের বিকার হইলে, সংশয় রহিত আত্মাকে সংশয়াপন্নের ন্যায়, শোকমোহাদিশূন্য আত্মাকে শোকমোহাদি যুক্তের ন্যায়, শ্রবণ দর্শনাদি গুণ বর্জ্জিত আত্মাকে শ্রবণ দর্শনাদি গুণ যুক্তের ন্যায় আবরণ করে, এবং কাম ক্রোধাধি বিহীন আত্মাকে কামুক ও ক্রোধীরূপে প্রতীয়মান করে।

(ঘ) বিজ্ঞানময় কোষ বা সূক্ষ্ম শরীর। ভৌতিক শক্তি, জীবনী শক্তি, চেতন শক্তি ও ধীশক্তি এই চারের একাধার বিজ্ঞানময় কোষ। মনোময় কোষের অভ্যন্তরে মস্তিষ্কস্থ ব্রহ্মরন্ধ্রে, বিচার জনিত জ্ঞান-বুদ্ধি-বিকাশক, নিশ্চয়াত্মক বিজ্ঞানাময় কোষ রহিয়াছে; উহাই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি প্রকাশক বিজ্ঞানাত্মা। সুষুপ্তি কালে অজ্ঞানে লীন হয় এবং জাগ্রতাবস্থায় আনখাগ্র পর্য্যন্ত সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে। যে চৈতন্য ছায়া বিশিষ্ট বুদ্ধি, তাহাকেই বিজ্ঞানময় কোষ বলে। ইহাই সূক্ষ্ম শরীরের তৃতীয় আবরণ। কর্ত্তৃত্বাভিমান এই বিজ্ঞানময় কোষের ধর্ম্ম। মন এবং বুদ্ধি ইহারা উভয়ে অন্তঃকরণ রূপে সামান্যতঃ অভিন্ন হইলেও অন্তরেতে কর্ত্তৃরূপে পরিণত হইয়া বুদ্ধি বিজ্ঞানময় শব্দের বাচ্য হয়, এবং মন বাহ্যেতে করণরূপে বিকৃত হইয়া মনোময় শব্দে উক্ত হয়। ইচ্ছা, নির্ব্বাচন, যুক্তি, বিচার, বিবেচনা, বিবেক প্রভৃতি এই বিজ্ঞানময় কোষের কার্য্য। বিজ্ঞানময় কোষ, জ্ঞান ও স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির কেন্দ্র। মনোময় কোষ যে বিষয় ও অভিজ্ঞতা বাহ্য জগৎ হইতে সংগ্রহ করিয়া উপলব্ধি, ধারণা, চিন্তা, কল্পনা প্রভৃতি দ্বারা অন্তরে পরিবর্দ্ধন ও বিস্তার করে। বিজ্ঞানময় কোষ তাহা নির্ব্বাচন, বিচার ও যুক্তি দ্বারা উপযুক্তরূপে নিয়োগ ও সুব্যবস্থিত করে।

মনোময় কোষস্থ ইচ্ছা বাহ্য বিষয়ের আকর্ষণের অধীন ; উহা ইন্দ্রিয়-লব্ধ বাহ্য বিষয় কর্তৃক আকর্ষিত হইয়া তদাকারে অন্তরে গঠিত হয় এবং সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ বাহ্য বিষয়ের অধীন হইয়া পড়ে। বাহ্য জগতের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির প্রলোভনে পড়িয়া ইচ্ছা উহাদের অনুগত ভৃত্যের ন্যায় দাসত্বে নিযুক্ত হয়। ইচ্ছা রূপবতী কামিনীরূপে, উৎকৃষ্ট খাদ্যে, গন্ধে, মোহিত হইয়া পড়ে ও নানা প্রকার বিষয় ঐশ্বর্য্যে প্রলোভিত হয়। এইজন্য ঐ ইচ্ছা স্বাধীন ইচ্ছা নহে। কিন্তু বিজ্ঞানময় ইচ্ছা স্বাধীন ; উহা বাহ্য বিষয়ের অধীন নহে, উহা অন্তর হইতে উৎপন্ন হইয়া যুক্তি ও বিবেকের সহিত স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু সচরাচর মনোময় কোষস্থ ইচ্ছা প্রবল স্রোতে পড়িয়া স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞান-ময় কোষস্থ স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তি মনোময় কোষস্থ ইচ্ছা-শক্তিকে দমন করিতে পারিলে, সমস্ত জগৎকে স্বীয় অধীনে আনিয়া ইচ্ছামত চালাইতে পারে। *ঐ ইচ্ছার নাম "ধীশক্তি।" ইহা দ্বারা মানবের স্বাধীন ইচ্ছা* সেই মহৎ ইচ্ছার অংশ সাব্যস্ত হইতেছে। যোগীগণ স্বাধীন ইচ্ছা বলে স্থূল দেহে, সূক্ষ্ম দেহে বিবর্ত্তন, ও সূক্ষ্ম উপাদানে স্থূল বিশ্বের নির্ম্মাণ ও অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়কর ব্যাপার সকল সম্পাদন করিতে পারেন। বিজ্ঞানময় কোষই 'ব্যবহারিক জীব' বলিয়া কথিত হয়। বুদ্ধিতে চৈতন্যের ছায়া পড়াতে অত্যন্ত স্বচ্ছতা-প্রযুক্ত বুদ্ধিকে চৈতন্যের ন্যায় দেখায়। ইহাকেই আত্মার অভিভক্ত চৈতন্য বলে। স্ফটিকে জবা পুষ্পের ন্যায়, এই বুদ্ধিই আত্মার উপাধি। বুদ্ধি ভিন্ন ও অজ্ঞান বা অবিদ্যা নামক আত্মার সূক্ষ্মতর একটি উপাধি আছে, ইহাই বুদ্ধি-সম্পর্কের কারণ ও মূল উপাধি। "উপ সমীপে অধীয়তে" ইতি উপাধি অর্থাৎ যাহা আত্মার অতি নিকটে থাকে। নিদ্রাবস্থায় বুদ্ধি ঐ অজ্ঞানেই লীন হয়। বুদ্ধিরূপ উপাধিতে উপহিত চৈতন্যের নাম বুদ্ধিরবচ্ছিন্ন চৈতন্য বা চৈতন্যাভাস। এই চৈতন্যাভাস যখন বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করেন, তখন তিনি স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হন এবং যখন অজ্ঞানোপাধিতে উপহিত চৈতন্যাভাস অজ্ঞানোপাধি বিজ্ঞান দ্বারা বুদ্ধিকে উপরত করেন, তখন তাহার সুষুপ্তি প্রাপ্তি হয়। বস্তুতঃ আত্মা সর্ব্বাবস্থায় একরূপেই বিদ্যমান থাকেন ; কেবল বুদ্ধিই দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয় আকারে পরিণত হয়। সেই পরিমাণ অভ্যস্ত হইলে জাগরণাদি অবস্থাত্রয়ের কার্য্য সকল সম্পন্ন হয়। ঐ সুষুপ্তি কালের বুদ্ধি বিষয়-বাসনা ত্যাগ করে বটে, কিন্তু উক্ত অজ্ঞানরূপ উপাধি

কর্ত্তৃক সমাচ্ছাদিত হইয়া স্বরূপে শূন্যের ন্যায় অতি সামান্য ভাবে অর্থাৎ বীজাকারে অবস্থান করে; সুতরাং বুদ্ধির বীজাভাবে অবস্থানই সুষুপ্তি; ইহাই তাহার দৈনন্দিন নিত্য প্রলয়। মূর্চ্ছা, মরণ ও নৈমিত্তিক প্রলয় কালেও বুদ্ধি এই প্রকারে অবস্থান করিয়া থাকে। তজ্জন্যই মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর জ্ঞানোদয় হয় ও মরণাদির পর নিদ্রাভঙ্গের ন্যায় জীবের পুণর্জন্ম লাভ হয়। ভোগ-জনক কর্ম্ম-সূত্রই বুদ্ধিকে এইরূপে রক্ষা করে। আত্মা নিত্য-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব হইয়াও সন্নিহিত বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব হেতু সুখিত্ব ও দুঃখিত্ব সম্পর্কে 'আমি কর্ত্তা, আমি সুখী, আমি দুঃখী' ইত্যাদি রূপ অভিমান প্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞানময় কোষ বিকৃত হইলেই অর্থাৎ বুদ্ধির বিকার উপস্থিত হইলেই অকর্ত্তা স্বরূপ আত্মাকে কর্ত্তারূপে, অবিজ্ঞাত স্বরূপ আত্মাকে বিজ্ঞানরূপে এবং মন্দত্ব জড়তাদি রহিত আত্মাকে মন্দতা ও জড়তাদি যুক্তের ন্যায় আবরণ করে।

(৬) আনন্দময় কোষ বা কারণ শরীর।

ভৌতিক শক্তি, জীবনী-শক্তি, চেতনা-শক্তি, ধীশক্তি ও আনন্দ শক্তি এই পাঁচের একাধার মানবিক আনন্দময় বা হিরণ্ময় কোষ। কর্ত্তৃ পদ-বাচ্য বিজ্ঞানময় কোষের অভ্যন্তরে ভোক্তৃ পদবাচ্য আনন্দময়কোষ রহিয়াছে। পুণ্য কর্ম্ম ফলভোগ কালে প্রীতি, আনন্দ ও উল্লাসরূপ চিদানন্দ প্রতিবিম্ব বিশিষ্ট এবং ভোগ সমাপ্তিতে প্রকৃতিতে যে আন্তরিক বুদ্ধি লীন হয়, বৃত্তি তাহাকে আনন্দময় কোষ বলে। ইহাই আত্মার কারণ শরীর। এই আনন্দময় কোষ বিকার প্রাপ্ত হইলে, অভোক্তা স্বরূপ আত্মাকে ভোক্তার ন্যায় ও অপরিমিত সুখস্বরূপ আত্মাকে পরিমিত সুখ যুক্তের ন্যায় আবরণ করে।

সূক্ষ্ম শরীরের গুণ। স্থূল শরীর যেমন ছেদ্য, ভেদ্য, দাহ্য, ক্লেদ্য গুণ বিশিষ্ট, সূক্ষ্ম শরীরটী সেরূপ নহে, যথা—নোপমর্দ্দেনাতঃ ॥১০॥

বেদান্ত—৪ অঃ—২ পা ॥

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণঞ্চ যো জীবঃ পুরুষঃ কৃতঃ।
বিভর্ত্তি সূক্ষ্ম দেহস্ত তদ্রূপং ভোগহেতবে ॥
সদেহো নভবেত্তস্ম জ্বলদগ্নৌ যমালয়ে।
জলেন নষ্টোদেহী বা প্রহারে সুচিরে কৃতে ॥

যেমন পাচকগণ রাজার নিমিত্ত পাক গৃহে সঞ্চরণ করে, তেমনি লিঙ্গ-

শরীর পুরুষের আত্মার নিমিত্ত ইহ-পরলোক ভ্রমণ করে। এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহে যায়।

সূক্ষ্মা মাতা পিতৃজাঃ সহ পভূতৈস্ত্রিধাবিশেষাঃ স্যুঃ সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা মাতা পিতৃজানিবর্ত্তন্তে॥ ৩৯ সাংখ্যকারিকা॥

বিশেষ তত্ত্ব তিন প্রকার, যথা—সূক্ষ্ম শরীর, শুক্র শোণিত প্রভব স্থূল শরীর-ও মহাভূত। সূক্ষ্ম শরীরও মাতৃ পিতৃজাত যাট্ কৌষিক শরীর, এই দু'য়ের মধ্যে সূক্ষ্ম শরীর নিয়ত অর্থাৎ দীর্ঘকাল স্থায়ী। মাতৃপিতৃজাত শরীর নশ্বর। সূক্ষ্ম শরীর নষ্ট হয় না, স্থূল শরীরটাই নষ্ট হয়, মাটী হয়, ভস্ম হয় অথবা জীবের ভক্ষ্য হইয়া বিষ্ঠায় পরিণত হয়।

পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং মহদাদিসূক্ষ্মপর্য্যন্তম্ সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্॥ ঐ

সৃষ্টিকালে প্রধান হইতে প্রত্যেক আত্মার এক এক সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই শরীর অব্যাহত, কুত্রাপি তাহার প্রতিরোধ হয় না; এমন কি তাহা শিলা মধ্যেও প্রবিষ্ট হইতে পারে। তাহা নিয়ত অর্থাৎ আদি সৃষ্টিকালে উৎপন্ন হইয়া মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত থাকে, বিধ্বস্ত হয় না। তাহার স্বরূপ সংযুক্ত মহৎ অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রা পঞ্চক। এই শরীরই সংসরণ করে অর্থাৎ এক শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়া অন্য স্থূল শরীর গ্রহণ করে। সূক্ষ্ম শরীর নিরুপভোগ অর্থাৎ স্থূল শরীর ব্যতীত সে শরীর স্বতন্ত্ররূপে সুখ দুঃখাদি ভোগ জন্মায় না। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অনৈশ্বর্য্য, ও ভাব পদ বাচ্য এই সকলের সংস্কার এই শরীরের বিদ্যমানতায় সেই শরীরে সংলগ্ন হয়। প্রলয়কালে থাকে না, লয় হইয়া যায়; সেই কারণে তাহা লিঙ্গ শরীর।

চিত্রং যথাশ্রয় মৃতেস্থা্ণাদিভ্যোবিনা যথাচ্ছায়া তদ্বদ্বিনা বিশেষৈর্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্॥ ৪১ ॥ ঐ ॥

চিত্র যেমন আশ্রয় ব্যতীত থাকে না, ছায়া যেমন বৃক্ষাদি ব্যতীত অবস্থান করে না, তেমনি বুদ্ধ্যাদিও সূক্ষ্ম শরীর ব্যতীত নিরাশ্রয়ে থাকে না।

পুরুষার্থ হেতুকমিদং নিমিত্তনৈমিত্তিক প্রসঙ্গেণ।

প্রকৃতের্বিভুত্ব যোগাৎ নটবৎ ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গম্॥ ৪২ ॥ ঐ ॥

এই লিঙ্গ শরীর (বুদ্ধ্যাদিময় সূক্ষ্ম দেহ) পুরুষের অর্থের অর্থাৎ ভোগাপবর্গের উদ্দেশে প্রকৃতি কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়। অধিকন্তু ইহা প্রকৃতিরই

আশ্রিত এবং অন্তর্ব্বাহ্যভেদে দ্বিবিধ করণাশ্রিত, ভাব অর্থাৎ ধর্ম্মাদি নিমিত্ত নৈমিত্তিক প্রসঙ্গে নটের ন্যায় অবস্থিত। নিমিত্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম; নৈমিত্তিক স্থূল শরীর গ্রহণ। নটী যেমন নানা সাজে সাজে, তেমনি এই সূক্ষ্ম শরীরও ধর্ম্মাধর্ম্মাদির প্রেরণায় দেব মনুষ্যাদি শরীর ধারণ করে অর্থাৎ সেই সেই যোনিতে গিয়া জন্মে। 'প্রধান' বিশ্বরূপ, তাহার পরিণামও অদ্ভুত; সেই কারণে সেই সেই শরীর হওয়া অসম্ভব হয় না।

এবং পঞ্চবিধং লিঙ্গং ত্রিবৃৎ ষোড়শ বিস্তৃত।
এষ চেতনয়া যুক্তো জীব ইত্যভিধীয়তে॥
অনেন পুরুষো দেহানুপাদত্তে বিমুঞ্চতি। ভাগ-৪-২৯অঃ॥

পঞ্চ তন্মাত্রের পঞ্চধাগত পঞ্চ প্রকারে অভিব্যক্ত পঞ্চ প্রকারে স্পন্দিত প্রাণাদি পঞ্চ পদার্থের সমষ্টিকে সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ দেহ বলে। ত্রিগুণ বিশিষ্ট এবং ষোড়শ বিকারে বিস্তৃত এই লিঙ্গ দেহ চেতনার সহিত সংযুক্ত হইয়া জীব নামে কথিত হইয়া থাকে। পুরুষ এই লিঙ্গ দেহ দ্বারা দেব-তির্য্যকাদি নানা দেহ ধারণ ও পরিত্যাগ করে।

শয়ানমিদমুৎসৃজ্যাশ্বসন্তং পুরুষো যথা।
কর্ম্মাত্মনাহিতং ভুঙ্‌ক্তে তাদৃশেনেতরেণ বা॥ ভাগ-৪স্ক-২৯অঃ॥

যেমন মনুষ্য জীবদ্দশায় নিদ্রাগত এই দেহকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বপ্নাবস্থায় মনোধর্ম্মে কর্ম্মের সেবা করে, সেইরূপ ঐ সূক্ষ্ম শরীর পরলোকে গিয়াও ঐহিক কর্ম্ম জন্য দেহ অথবা পশ্বাদির দেহদ্বারা কর্ম্মভোগ করে।

সূক্ষ্ম দেহের আকৃতি। সূক্ষ্ম শরীরের পরিমাণ কত? স্থূল শরীরের ন্যায় কি?—না। স্থূল শরীর যেমন প্রত্যেকের হস্তের সার্দ্ধ তিন হস্ত প্রমাণ; সূক্ষ্ম শরীরও তেমনি আঙ্গুলের অঙ্গুষ্ঠ প্রমান।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রমান সূক্ষ্ম দেহের উপরি জীবের ভোগ দেহ উৎপন্ন হয়।

অঙ্গুষ্ঠমাত্র রবিতুল্যরূপঃ সঙ্কল্পাহঙ্কার সমন্বিতোষঃ।
বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব আরাগ্রমাত্রোহ্যপ্যবরোহপিদৃষ্টঃ॥

নশস্ত্রেচ ন চাস্ত্রেচ ন তীক্ষ্ণ কণ্টকে তথা।
তপ্ত দ্রব্যে তপ্ত লোহে তপ্ত পাষাণ এবচ॥
প্রতপ্ত প্রতিমা শ্লেষেহপ্যতূর্দ্ধ পতনেহপিচ।
নচ দগ্ধোনভগ্নশ্চ ভুঙ্‌ক্তে সন্তাপমেবচ॥ ব্রহ্মবৈ॥

যমরাজ সাবিত্রীকে বলিতেছেন,—এই স্থূল দেহ অগ্নি দগ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ যে সূক্ষ্ম দেহ, যাহাকে অবলম্বন করিয়া ভোগ দেহ জন্মে, তাহা অগ্নি দ্বারা ভস্ম হয় না, জলে ক্লিষ্ট হয় না, প্রহারে, অস্ত্রে, শস্ত্রে, তীক্ষ্ণ কণ্টকাদিতেও ভেদ হয় না; তপ্ত দ্রব্যে, তপ্ত লৌহে, তপ্ত পাষাণে, যমালয়ে প্রতপ্ত মূর্ত্তি আলিঙ্গনে, উর্দ্ধ হইতে পতনে নষ্ট বা ভগ্ন হয় না; কিন্তু সন্তাপ ভোগ করে।

সূক্ষ্ম শরীরের ধর্ম্ম।

তদেতৎ ষোড়শকলং লিঙ্গং শক্তিত্রয়ং মহৎ।
ধত্তেঽনুসংস্থতিং পুংসিহর্ষশোকভয়ার্ত্তিদা॥ ভাগ-৬স্ক-১ অঃ।

ষোড়শ কলা বিশিষ্ট লিঙ্গ শরীর এবং সত্বাদি গুণত্রয়ের কার্য্য তিন শক্তি। ইহারা ঐ জীবের কেবল সেই মতি জন্মাইয়া দেয়, যাহাতে হর্ষ, শোক, ভয় এবং পীড়া এতাবন্মাত্র উপস্থিত করিয়া থাকে। ইহারা উহার ধর্ম্ম।

অনেন পুরুষো দেহানুপাদত্তে বিমুঞ্চতি।
হর্ষং শোকং ভয়ং দুঃখং সুখঞ্চানেন বিন্দতি॥ গারুড়ে।

হর্ষ, শোক, ভয়, মোহ, সুখ, দুঃখ ইহা সূক্ষ্ম শরীরের ধর্ম্ম। জীব এই সূক্ষ্ম শরীরাবচ্ছিন্ন হইয়া ঐ সব ধর্ম্ম ভোগ করে এবং দেহ হইতে দেহান্তরে গমনাগমন করে।

সূক্ষ্ম শরীরের সহিত যে যে পদার্থ গমন করে।

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ মনশ্চৈব পঞ্চভূতানি যানিচ।
ইন্দ্রিয়াণি চ পঞ্চৈব যাশ্চান্যাঃ পঞ্চ দেবতা॥
তাশ্চৈব মনসঃ সর্ব্বে নিত্যমেবাভিমানতঃ।
জীবেন সহগচ্ছন্তি যাবত্তত্ত্বং নবিন্দতি॥　　উত্তর গীতা॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, মন, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়াভিমানী দিগ্‌বাতাদি পঞ্চ দেবতা অর্থাৎ দিক, বায়ু, অর্ক, বরুণ, অশ্বিনীকুমার ইহা অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা নিত্যাভিমান বশতঃ যাবৎ কাল পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ অর্থাৎ অপরোক্ষানুভব লাভ না করে, তাবৎ কাল ইহারা জীবোপাধি লিঙ্গ শরীরের সহিত গমন করে।

সূক্ষ্ম শরীর দৃষ্ট কি অদৃষ্ট। সূক্ষ্ম শরীর দৃশ্য কি অদৃশ্য? দৃশ্যও বটে, অদৃশ্যও বটে। স্থূল দর্শীর অদৃশ্য, সূক্ষ্ম দর্শীর দৃশ্য। যথা :—

চ্যবন্তংজায়মানং বা প্রবিশন্তঞ্চ যোনিষু।

প্রপশ্যন্তি চতং সিদ্ধা-দেবা দিব্যেন চক্ষুষা॥ অগ্নি পুঃ—৩৭২ অঃ॥

দেহ হইতে প্রচ্যুত অথবা যোনি প্রবেশনশীল বা জায়মান জীবাত্মাকে সিদ্ধগণ দিব্য চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তন্মাত্র অর্থাৎ পরমাণু দর্শন শক্তি বিশিষ্ট যে চক্ষু, সেই চক্ষুই উহা দেখিতে পায়।

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপিভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।

বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষঃ॥ গীতা॥

সূক্ষ্ম শরীর কখন দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে, কখন দেহে অবস্থান করিয়াই সুখ দুঃখাদি গুণ উপভোগ করে; কিন্তু অজ্ঞগণ ইহাকে দেখিতে পায় না, জ্ঞান চক্ষু সম্পন্ন ব্যক্তিগণই দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

সূক্ষ্ম দেহই ক্ষেত্র। যাহাতে বীজ বপন করিয়া শস্য উৎপন্ন করা হয়, তাহার নাম ক্ষেত্র। সূক্ষ্ম শরীর একটী ক্ষেত্র। ইহাতে ইচ্ছা দ্বেষাদি কামনারূপ বীজ রোপণ করিয়া সুখ দুঃখ শস্য উৎপন্ন করা হয়। যথা গীতায়—

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেবচ।

ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চচেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং সংঘাতশ্চেতনাধৃতিঃ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের সহিত অষ্টধা প্রকৃতি দশ ইন্দ্রিয়, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ; কার্য্য স্বরূপ ইত্যাদি ভোগ স্বরূপ সুখ দুঃখাদি উৎপন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত চিত্তের সহিত সম্মিলন হইলেই সূক্ষ্ম ক্ষেত্র গঠিত হয়। ইহাই সূক্ষ্ম শরীর। তদুপরি স্থূল ক্ষেত্র গঠিত হয়।

ক্ষেত্রজ্ঞ। ইদং শরীরং কৌন্তেয়! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।

এতদ্ যোবেত্তিতং প্রাহুঃক্ষেত্রজ্ঞমিতিতদ্বিদঃ॥ গীতা॥

অপিচ স্মৃতি—ক্ষেত্রাণিহিশরীরাণি বীজমচাপি শুভাশুভে।

তানি বেত্তি সযোগাত্মাততঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে॥

ভোগায়তন ত্রিবিধ শরীরই ক্ষেত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং যিনি এতন্মধ্যস্থ হইয়া ইহাকে 'আমার আমি' ইত্যাদিরূপে অনুভব করেন এবং তৎ সমস্তের তত্ত্ব অবগত আছেন,—তত্ত্ববিদ্গণ তাঁহাকে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলিয়া থাকেন। ক্ষেত্র যেমন বীজ বপনের স্থান, এই শরীরও কামাদি বীজ বপনের স্থান। এইজন্য

ইহার নাম ক্ষেত্র। প্রকৃতি ত্রিগুণা এবং সর্ব্ব কার্য্য সম্পাদন সমর্থরূপে পরিণতা। পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ উভয় সাধনই কর্ত্তব্য ; এই উদ্দেশ্য সংসাধনের নিমিত্ত প্রকৃতি দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদির সম্মিলন হয়। এই ভোগায়তন শরীর সংসাররূপ উৎপত্তি স্থান স্বরূপ। কৃষিজীবিগণ যেরূপ স্ব স্ব ভূমির ফলভোগ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ক্ষেত্রজ্ঞ জীবও এই শরীর রূপ ক্ষেত্রজাত ফল ভোগ করিয়া থাকেন। এই ইন্দ্রিয় প্রাণ সহকৃত শরীর ভোগ কর্ত্তা জীবের ভোগ্য সুখ দুঃখের অঙ্কুরোৎপাদক ভূমি স্বরূপ। এইজন্য ইহার নাম ক্ষেত্র ; অবিদ্যাদ্বারা আত্মার ক্ষয় সাধন করে এবং বিদ্যাদ্বারা ত্রাণ সাধন করে, এই জন্য এই শরীরের নাম ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্র কর্ম্মবীজের অঙ্কুরোৎপত্তির ভূমি। যিনি ভাসকরূপে ইহার যথার্থ ভাব প্রকটিত করিয়া ইহাকে উদ্ভাসিত করে, সেই চিদাত্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। এই শরীর অহঙ্কারাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্বাত্মিকা প্রকৃতিরই পরিণাম। ইহা জড়রূপ এবং পরিচ্ছিন্ন স্বভাব, অর্থাৎ এই ক্ষেত্রের উপদান সমূহের আলোচনা করিলে, স্পষ্টতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহা জড় দ্বারা গঠিত এবং জড় পদার্থের সম্মিলন মাত্র, আর দেশ কাল পাত্র প্রভৃতি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। ইহার শক্তি ও যোগ্যতা সীমাবদ্ধ এবং ইহা নিত্য বিকারশীল ও পরিণামী। এই জন্য ইহাকে সবিকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এই ক্ষেত্ররূপ দেহকে প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষিজীবিগণের ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করা আবশ্যক। কারণ ইহা শুভাশুভ ফলপ্রসূ এবং পরিণামের মঙ্গলা-মঙ্গল বিধায়ক। ক্ষেত্রে যেরূপ কালে সতেজ সার প্রয়োগ করিলে ও নিয়মিত সময়ে অক্লান্তভাবে কর্ষণাদি রীতিমত কার্য্যানুষ্ঠান করিলে, যথাকালে তাহাতে উপ্ত বীজ সমূহ অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে। এই শরীর ক্ষেত্রে অবস্থান কালে রীতিমত সংসঙ্গ, সদুপদেশ ও সাধনাদি অনুষ্ঠিত হইলে, যথাকালে নিঃশ্রেয়স-রূপ পরম ফলের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যেমন ক্ষেত্রের সহিত কৃষকের বারংবার ফলপ্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ ব্যতীত আর কোন সম্বন্ধ নাই, শরীরের সহিতও শরীরস্থ আত্মার তদ্রূপ ফল প্রাপ্তিমাত্র সম্বন্ধ। এই ক্ষেত্রতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে হৃদ্‌গত হইলে আত্মস্বরূপ ক্ষেত্রজ্ঞের অবরোধ অবশ্যম্ভাবী। সেই ক্ষেত্রজ্ঞ অনায়াসেই উপলব্ধি করেন যে, ক্ষেত্রের সহিত তাহার কোন স্থায়ী সম্বন্ধ নাই ; তিনি ক্ষেত্র মধ্য হইলেও ক্ষেত্রাতীত, ক্ষেত্র বদ্ধ হইলেও ক্ষেত্র নির্ম্মুক্ত এবং ক্ষেত্ররূপ হইলেও ক্ষেত্র-ধর্ম্ম-বিরহিত। সে আরও দেখিতে পায় যে, একই সম্রাটের অধীন বহু প্রজা, বহু ক্ষেত্র লইয়া চাস করে, তদ্রূপ

জীবের ভোগ-মোক্ষ-সাধনের ভূমি স্বরূপ স্ব স্ব ক্ষেত্রের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া প্রজার ন্যায় বিদ্যমান রহিয়াছে। আর সেই একই সর্ব্বেশ্বর তত্তাবৎ ক্ষেত্রজ্ঞ জীব সকলের নিয়ামক ও ভর্ত্তারূপে রাজার ন্যায় বিদ্যমান রহিয়াছেন। এইরূপ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব সামান্য ভাবেও হৃদয়ে উপজাত হইলে, স্বতঃই পরমার্থ ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ বলবতী বাসনা জন্মে। তখন সেই নিত্য স্বরূপ অদ্বিতীয় স্বরূপ, পূর্ণানন্দস্বরূপ পরম ক্ষেত্রজ্ঞের পরমতত্ত্ব হৃদয়ান্ধকার বিনষ্ট করিয়া সাধককে পরম কল্যাণের পথে লইয়া যায়। (ক্রমশঃ)

শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায়।

অর্থ]

দুর্গারাণী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কোজাগর লক্ষ্মীপূজার পর শ্যামা পূজা হইল। শ্যামাপূজার পর জগদ্ধাত্রী পূজা। জগদ্ধাত্রী পূজা হইতে আর সাত আট দিন বাকী আছে, এমন সময় কৃষ্ণপুর হইতে সংবাদ আসিল যে হরনাথের ভয়ানক জ্বর হইয়াছে। কৈলাস-পুরে কালীপূজা করাইয়া বাড়ী গিয়াই তিনি জ্বরাক্রান্ত হইয়াছেন। এই জ্বরটি বড় সহজ নহে; তাহা সহসা বিকারে দাঁড়াইয়াছে। সংবাদ শুনিয়া ঘোষালদের বাটীর সকলেই অতশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। বৃদ্ধ ঘোষাল মহাশয়ের পুত্র কালী প্রসাদ তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণপুরে গমন করিলেন।

হরনাথের কঠিন পীড়ার সংবাদ শুনিয়া অবধি দুর্গারাণী জীবন্মৃতা হইল। সে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। সে এখন আর শৈলজার সহিত একত্র মন্দাকিনী-ধারায় স্নান করিতে যায় না। যখন সকলের স্নান হইয়া যায়, তখন সে একাকিনী মন্দাকিনীতে স্নান করিতে যায় এবং সেখানে এক বিল্ববৃক্ষ মূলে বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করে; পরে স্নান করিয়া শিব পূজায় নিযুক্ত হয়। এরূপ প্রগাঢ় ভক্তির সহিত সে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও শিব পূজা করে নাই। দুর্গারাণী একদিন স্নান করিতে আসিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা বিলম্ব করিল। ভবানী তাহার খোঁজ করিতে আরম্ভ করিলে, শৈলজা বলিল "তুম ব'স;

আমি তাকে খুঁজে আন্‌ছি।" শৈল দুর্গারাণীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছিল, যে দিন হইতে হরনাথের পীড়ার সংবাদ আসিয়াছিল, সেইদিন হইতে সে তাহার এবং অন্য সকলের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া যেন একাকিনী থাকিতেছিল। শৈল মন্দিরে মন্দিরে দুর্গারাণীকে খুঁজিল; কোথাও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া মন্দাকিনী তটে উপস্থিত হইল। সেখানে সে সবিস্ময়ে দেখিল, বিল্ব-বৃক্ষের মূলে শিবলিঙ্গের সম্মুখে দুর্গারাণী কৃতাঞ্জলি ও গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া ধ্যানে নিমগ্না রহিয়াছে! তাহার সেই ধ্যানমগ্না পবিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া শৈলজার দেহ রোমাঞ্চিত এবং চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইল, তাহার কপালের উপর নিপতিত চূর্ণ কুন্তলগুলি লইয়া মধ্যাহ্ন সমীর ক্রীড়া করিতেছিল; বৃক্ষের ছায়া অপসারিত হওয়ায় তাহার মুখমণ্ডলে সূর্য্য কিরণ পড়িতেছিল; কিন্তু তথাপি তাহার ধ্যান ভঙ্গ হয় নাই। দুর্গারাণীর ধ্যানভঙ্গ করিতে শৈলজাও ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটী প্রবল বাতাস উঠিয়া বিল্ববনের শাখা সমূহ আন্দোলিত করিতে লাগিল এবং কতক গুলি পত্র বৃন্তচ্যুত করিল। সহসা একটী বিল্বপত্র জোরে দুর্গারাণীর মুখমণ্ডলের উপর নিপতিত হওয়ায় তাহার ধ্যান ভঙ্গ হইল এবং সে চকিতার ন্যায় শিবকে প্রণাম করিয়া সেই বিল্বপত্রটি সযত্নে তাহার অঞ্চলে বাঁধিল। গাত্রোত্থান করিয়া সে শৈলকে দেখিতে পাইয়া লজ্জায় কিছু সঙ্কুচিত হইল। শৈল বলিল "রাণি, অনেক বেলা হইয়াছে; চল বাড়ী যাই।" দুর্গারাণী মন্দাকিনীর জলে অর্দ্ধ পূর্ণ ঘটীটি লইয়া তাহার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "বৌদিদি, কৃষ্ণপুরের কোনও সংবাদ পেয়েছ?" শৈল দুঃখিতকণ্ঠে বলিল "অল্পক্ষণ আগে একজন লোক এসে বলে গেল, ব্যায়ারাম শক্ত হ'য়েছে। সেই শুনে মা আর বাবা সেখানে গেছেন।" দুর্গারাণীর মুখ মণ্ডল ঈষৎ অন্ধকারময় হইল; কিয়ৎক্ষণ পরে সে বলিল "বৌদিদি, উনি ভাল হইবেন। কিন্তু তোমাকে একটী কথা চুপি চুপি বল্‌ছি; তুমি এখনই একটী বিশ্বাসী লোক সেখানে পাঠাতে পার?" শৈল কিছু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন বল দেখি? দুর্গারাণী বলিল, "বৌদিদি, আমি তোমায় বল্‌ছি; কিন্তু তুমি যেন আর কারেও ব'লো না। আমি শিবের ধ্যান কর্‌ছি, এমন সময় এক মহাপুরুষ তাঁর মাথায় জটা, হাতে ত্রিশূল—পরণে বাঘছাল, আর তাঁর গা থেকে যেন আগুণ বেরুচ্ছে; তিনি আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন,—দুর্গারাণী, ওঠ; এই বেল পাতাটি নাও; এইটি হরনাথের মাথায় ও মুখের উপর বুলিয়ে দিলে সে ভাল হবে; আর তোমার এই ঘটীর জল

তাকে একটু খাওয়াবে। এই বোলে তিনি পাতাটি আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। বৌদি দেখ সেটী আমার আঁচলের খুঁটে আমি বেঁধেছি।" বলিতে বলিতে দুর্গারাণীর নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। রাণীর বাক্য শুনিতে শুনিতে শৈলজারও নয়নে অশ্রু দেখা দিল ও দেহ রোমাঞ্চিত হইল। সে অমনি গলায় কাপড় দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে করিতে বলিল,—"বাবা কৈলাসনাথ, তুমি এ যাত্রা আমার ঠাকুরপোকে রক্ষা কর! আমার পিসি মা বড় দুঃখিনী; বাবা, দুঃখিনীর মুখপানে চেয়ো!" শৈলজা ও দুর্গারাণী উভয়েই বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আবৃত করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিল। রাণী একটু প্রকৃতিস্থা হইয়া বলিল ' বৌদিদি, এগুলি কৃষ্ণপুরে এখনই পাঠাবার কি উপায় হ'বে?" শৈলজা একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "চল দেখি, আমরা একবার পুরুত ঠাকুরের কাছে যাই?" এই বলিয়া উভয়ে কাত্যায়নীর মন্দিরাভিমুখে দ্রুতপদে গমন করিল।

মন্দিরে উপনীত হইয়া তাহারা দেখিল, পুরোহিত মহাশয় মন্দির হইতে বাহির হইয়া কোথায় যাইবার উপক্রম করিতেছেন। শৈল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, তিনি হরনাথকে দেখিবার জন্য কৃষ্ণপুরে যাইতেছেন। দুর্গারাণীকে দেখিয়া তিনি সজল নয়নে বলিলেন "মা, তোর কোনও চিন্তা নাই। হরনাথ নিশ্চয় আরোগ্য লাভ কর্‌বেন। তা না হ'লে আমার ব্রাহ্মণত্ব মিথ্যা।" অতর্কিতে দুর্গারাণীর চক্ষে জল আসিল। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, সে যেন তখনই ভূমিষ্ঠ হইয়া ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে ও তাঁহার পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করে। কিন্তু লজ্জানুরোধে সে তাহা করিতে না পারিলেও, মনে মনে ভক্তিভরে ব্রাহ্মণকে অবনত মস্তকে প্রণাম করিল। শৈলজা প্রণাম করিল। শৈলজা বলিল, "ঠাকুর মশাই, আপনি কৃষ্ণপুরে যাচ্ছেন; ভালই হয়েছে। রাণী এই একটী বেলপাতা দিচ্ছে; এইটী আপনি আপনার চাদরের খুঁটে বেঁধে নিন্, আর এই জলের ঘটীটিও নিয়ে যান। আপনি এই বেলপাতাটি ঠাকুরপোর মাথায় ও মুখে বুলিয়ে দেবেন।" ব্রাহ্মণ দুর্গারাণীর দিকে একবার স্থির নয়নে চাহিয়া সজল নয়নে বলিলেন,—"বুঝলাম এতক্ষণে বেটীর লীলাখেলা! আমিও এখনই তন্দ্রাবেশে দেখ্‌লাম, কে যেন হরনাথকে দেখ্‌তে যাবার জন্য আমায় আদেশ কর্‌লেন। তারা, তারা—জগদম্বা—মা! তোর লীলাখেলা বুঝা ভার; তুই মা সত্য!" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ দুর্গারাণীর হস্ত হইতে বিল্বপত্র ও জলের ঘটীটি লইয়া তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ব্রাহ্মণ যাইতে যাইতে মধ্যে মধ্যে উচ্চৈস্বরে বলিতে লাগিলেন "তারা—তারা—জগদম্বা! তুই মা সত্য!"

নবম পরিচ্ছেদ।

শৈল ও দুর্গারাণী সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই পুরোহিত ঠাকুরের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় কাত্যায়নার মন্দিরে বসিয়াছিল। পরিচারিকা আরতির যোগাড় করিয়া দিল। পুরোহিতের মুখে কৃষ্ণপুরের সংবাদ শুনিবার জন্য উভয়েই অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়াছিল, এমন সময়ে তাহারা তাঁহার কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইল। "তারা তারা—জগদম্বা! তুই মা সত্য!" পুরোহিতকে আসিতে দেখিয়াই তাহারা তাঁহার নিকট ছুটিয়া গেল। বৃদ্ধ সজল নয়নে সহাস্য বদনে বলিল "মা, তোদের আর কোনও চিন্তা নাই; জগদম্বা হরনাথকে এ যাত্রা রক্ষা করেছেন। জর ত্যাগ হয়ে তার চৈতন্য হয়েছে। মা দুর্গারাণি! তুই কে মা, তোকে যে আমি চিন্‌তে পার্‌লাম না? চারিদিকেই তো আমি আমার মাকে দেখ্‌তে পাই। কিন্তু মা, তোর মতন মা যে আমি এর আগে কোথাও দেখি নাই! বৌমা তোমায় কি আর বল্‌ব, আমি কৃষ্ণপুরে গিয়ে দেখি হরনাথের অবস্থা বড় খারাপ; কবিরাজ তার নাড়ী ধরে বসে আছে। আমি গিয়ে বাবার মাথায় আর মুখের উপর সেই বেলপাতাটি বুলিয়ে দিলাম, আর মুখে মন্দাকিনীর একটু জল দিলাম। বাবার তখন কোনও হুঁস ছিল না; কিন্তু একটু পরে বল্‌লে 'দুর্গারাণি আর একটু জল দাও।' আমি মুখে আর একটু জল দিয়ে বল্‌লাম 'হরনাথ, দেখ দেখি আমি কে?' হরনাথ চক্ষু মেলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল, 'মুখুয্যে মশাই, আপনি কখন এলেন? দুর্গারাণী কোথায়? সে আমার মুখে এখনই জল দিলে না?' আমি বলিলাম 'দুর্গারাণীই তোমার জন্য এই জল পাঠিয়ে দিয়েছে; আর একটু খাবে?' হরনাথ বলিল 'না, আমার চোখ ও কপালের উপর একটু জল বুলিয়ে দিন।' পাঁচ ছয় দিন হরনাথ সংজ্ঞাহীন ছিল। আজই তার চেতনা হ'ল। সে এখন কালীপ্রসন্নকে, ঘোষাল মশাইকে, মাকে, মাসীকে—সকলকেই বেশ চিন্‌তে পেরেছে। কবিরাজ বল্‌লেন যে, সঙ্কট উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে, নাড়ী বেশ স্বাভাবিক হ'য়েছে, এখন আর কোনও ভয় নাই। পরশ্ব জগদ্ধাত্রী পূজা। দুর্গারাণীর বাবা যাদব বাঁড়ুয্যে জগদ্ধাত্রী পূজা দেখ্‌তে ও মেয়েদিকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য এখানে আস্‌ছিলেন। ঘোষাল মশাই কৃষ্ণপুরে র'য়েছেন, আর হরনাথ অত্যন্ত পীড়িত হ'য়েছেন, এই কথা শুনে তিনিও সেইখানে আছেন। তিনি আমার সঙ্গেই আস্‌ছিলেন; কিন্তু ঘোষাল মশাই তাঁকে আটক কর্‌লেন। কাল সকালে তাঁর সঙ্গে এখানে আস্‌বেন।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ "তারা তারা—জগদম্বা! তুই মা সত্য"; এই কথা বলিতে বলিতে মন্দিরের

দিকে অগ্রসর হইলেন। শৈলজা দেখিল, দুর্গারাণী তাহার কাছে নাই ; সে কখন যে সেখান হইতে অন্তর্হিতা হইয়াছে, তাহা সে জানিতে পারে নাই। কাত্যায়নীর মন্দির হইতে নামিতে নামিতে শৈলজা দেখিল, দুর্গারাণী একটী নিভৃত স্থানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রোদন করিতেছে ও অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছে।

শৈলজা ব্যথিতা হইয়া বলিল "রাণি, কাঁদ্‌ছ কেন ? পুরুত ঠাকুরের মুখে শুন্‌লে তো তিনি ভাল হয়েছেন, আর কোনও ভাবনা নাই ; চল এখন বাড়ী যাই। বাবা কৈলাসনাথই আজ ঠাকুরপোকে বাঁচিয়েছেন। তোমার প্রাণ যেমন হরময় হয়েছে, তাঁরও তেমনই দুর্গাময় হয়েছে। এত ব্যারামের ঘোরেও তিনি তোমাকে ভুলেন নাই। শুন্‌লে তো মন্দাকিনীর একটু জল খেয়েই তিনি বলেছিলেন দুর্গারাণী, আর একটু জল দাও ?" "বলিতে বলিতে শৈলজার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইল।

দুর্গারাণী অনেকক্ষণ নীরবে অশ্রু মোচন করিল, পরে বলিল "বৌদিদি, তুমি আমার মনের ভাব জান ; তোমার কাছে আমি আর কি লুকোব ! আমি তাঁকে যে কি চোখে দেখিছি, তা তোমায় বল্‌তে পারি না। তাঁর অসুখের কথা শুনে অবধি আমার মন তাঁর কাছেই পড়ে আছে। আজ আমি কয়দিন কোথায় যে গেছি, কি যে করেছি, কি যে খেয়েছি, আর কি যে বলেছি তা আমার মনে নাই। দেখ তাঁর সঙ্গে আমার এখনও বিয়ে হয় নাই, কখনও যে হবে তা আমি বল্‌তে পারি না। নাই হোক্ কিন্তু আমি চিরকাল তাঁরই। এই কয় দিন কেবলই আমার মনে হয়েছিল, আমি ছুটে তাঁর কাছে চলে যাই, আর তাঁর সেবা শুশ্রূষা করি। ওগো এখানে আমার কিছুই ভাল লাগে নাই। কিন্তু লজ্জায় আমি কিছু করতে পারি নাই। কারুর কাছে আমি মনের কথাও ফুটে বল্‌তে পারি নাই। বৌদিদি, তোমাকেও বলি নাই, পাছে তুমি কিছু মনে কর ; তাই আমি একলা একলাই থাক্‌তুম আর কেবল বাবা কৈলাসনাথের কাছে কাঁদ্‌তুম। আজ্‌কাল কৈলাসনাথ আমার কান্না শুনছেন। বৌদিদি, তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা। দুই দিন পরেই বাবার সঙ্গে বাড়ী যেতে হবে। এ জীবনে তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। তোমার স্নেহ ভালবাসা আমি জীবনে কখনও ভুল্‌তে পার্‌ব না।" এই কথা বলিতে বলিতে দুর্গারাণী আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

শৈলজা বিস্মিত হইয়া বলিল, "তুমি ও কি কথা বল্‌ছ দুর্গারাণি !"

দুর্গারাণী একটু বিকৃত হাসি হাসিয়া বলিল "বৌদিদি, আমি তোমাকে ঠিক্

কথাই বল্‌ছি। তুমি আমার বাবাকে তো জান? আমাকে বেচে যেখানে বেশী টাকা পাবেন, সেইখানেই আমার বিয়ে দেবেন। কিন্তু তোমায় আমি বলে রাখ্‌ছি, আমার বিয়ে তাঁকে আর দিতে হবে না। বিয়ের আগেই দুর্গারাণী ভবলীলা সাঙ্গ কর্‌বে।

শৈলজার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইল। সে বলিল, "অমন কথা বল্‌তে নাই রাণি! ঠাকুরপোর সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে। মামা বাবু কি এত অবুঝ? তিনি সব কথা শুন্‌লে বা জান্‌তে পারলে, কখনও অন্য জায়গায় তোমার বিয়ে দেবেন না।

রাণী বলিল, 'তা দেখ্‌তে পাবে।

শৈলজা বলিল "আচ্ছা, অন্য জায়গায় তিনি কেমন তোমার বিয়ে দেন, তা দেখ্‌বো।"

দশম পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে সমারোহের সহিত শ্রীশ্রী৺জগদ্ধাত্রী পূজা সমাপ্ত হইয়া গেল। হরনাথ অসুস্থ থাকায় অন্য একজন তন্ত্রধারক আসিয়া দেবীর পূজা করাইলেন। পূজার পর দুর্গারাণীর পিতা তাহাকে ও ভবানীকে বাড়ী লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, কার্ত্তিক মাসের কয়টা দিন থাকিয়া অগ্রহায়ণ মাসে তাহারা বাড়ী যাইবে; কিন্তু যাদব তাহাতে আপত্তি করিতে লাগিলেন। অপত্তির কারণ বারম্বার জিজ্ঞাসা করায়, যাদব বলিলেন যে, অগ্রহায়ণ মাসে রাণীর বিবাহ হইবে; আগামী ত্রয়োদশী তিথিতে পাত্রপক্ষ কন্যা নিরীক্ষণ করিতে আসিবে। সুতরাং তিনি তাহাকে কিছুতেই কৈলাসপুরে রাখিয়া যাইতে পারিবেন না।

ঘোষাল মহাশয় কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাত্র কোথাকার?"

যাদব বলিলেন, "পাত্র পুরুলিয়ার একজন উকীল।"

"পুরুলিয়ার কোন্ উকীল হে? নাম বল না, আমি ত' সকলকেই চিনি?"

"ত্রৈলোক্য মুখুয্যে।"

ঘোষাল মহাশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ওঃ সেই সত্তর বছরের আফিংখোর খেঁথুরে উকীলটা। বেশ পাত্রটী জুটেছো তো?—যাদব সে কতগুলি টাকা তোমায় দেবে?"

যাদব একটু রুষ্ট হইয়া বলিল, "আপনার তো কেবল ঐ কথা! আমি কি মেয়ে বেচ্‌ছি, যে টাকা নেবো?

"তবে মেয়ে বেচাটা দোষের, তা তুমি স্বীকার কর?"

"তা করি বই কি?"

"কেন বল দেখি?"

"লোকে বলে মেয়ে বেচ্‌তে নাই, এইজন্য।"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "লোকে যে বলে তার তো একটা কারণ আছে? কারণ হচ্ছে শাস্ত্র আর যুক্তি। শাস্ত্রে বলে মেয়ে বেচ্‌লে মহাপাপ হয়; সেই মেয়ের গর্ভে যে সন্তান হয়, তার দ্বারা পিতৃপুরুষগণের পিণ্ডোদক ক্রিয়া হয় না; আর তাঁদের নরকে বাস হয়। এই কারণে শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন, সালঙ্কারা ও সবস্ত্রা কন্যাকে সৎ ও যোগ্যপাত্রে দান কর্‌বে। যুক্তিতেও বলে তুমি যেমন আপনাকে বেচে পরের গোলাম হ'তে ইচ্ছা কর না, মেয়েকেও বেচে পরের ক্রীতদাসী কর্‌তে পার না। তোমার মেয়ে পরের ক্রীতদাসী হবে, এটা কি তুমি ইচ্ছা কর? বিক্রীত কন্যা কখনও ধর্ম্মপত্নী হতে পারে না; সে তো একটী ক্রীতদাসী বাদী মাত্র, আর সেই কন্যার বিবাহটা বিবাহ নামের যোগ্যই নয়। তারপর যোগ্যপাত্রের কথা জিজ্ঞাসা করি; সত্তর বছরের বুড়ো মিন্‌সেকে কি তোমার কন্যার যোগ্য পাত্র মনে কর? এমন পাত্রকে কন্যা বেচ্‌বার আগে, কন্যাকে একটু আফিং খাইয়ে মেরে ফেলা ভাল। যে লোক আজ বাদে কাল মর্‌বে, তুমি বাপ হ'য়ে কোন প্রাণে তাকে কন্যা বেচ্‌বে?"

যাদব মস্তক হেঁট করিয়া নিরুত্তর রহিল।

ঘোষাল মহাশয় আবার বলিতে লাগিলেন, "দেখ, যাদব আমি তোমাকে গুটীকতক স্পষ্ট কথা বল্‌ছি—রাগ কর্‌তে হয় ক'রো। তুমি তোমাদের বংশের নাম ডুবিয়েছ। তোমাদের বংশে কখনও শুক্র বিক্রয় দোষ ছিল না। তোমার পিতৃপুরুষেরা বরাবরই কন্যা দান ক'রে গেছেন। কিন্তু তুমি তাঁদের বংশধর হ'য়ে দুইটি কন্যাকে বিক্রয় ক'রেছ, আর এইটীকেও বিক্রয় কর্‌তে উদ্যত হ'য়েছ। শুক্র বিক্রয় দোষের জন্য তোমার পরিচয় দিতে আমি লজ্জাবোধ করি এবং তোমার বাড়ীতে খাওয়া পর্য্যন্ত ত্যাগ ক'রেছি। এখনও বল্‌ছি সাবধান হও। তুমি যে পাপ করিয়াছ্‌ সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। তার ফল তোমাকে ইহলোকে এবং পরলোকেও ভোগ কর্‌তে হবে। তুমি দুর্গারাণীকে বেচ্‌তে পাবে না। সে যেমন তোমার মেয়ে, তেমনই আমারও মেয়ে। আমি বেঁচে

থাক্‌তে তুমি তাকে বেচ্‌তে পাবে না। তাকে আমি যোগ্য পাত্রে দান কর্‌ব।

যাদব বলিলেন "মেয়ের বাপ মা বেচে থাকৃতে কি আপনি তাকে সম্প্রদান কর্‌তে পারেন ?"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "নিশ্চয়ই পারি। তোমরা যদি সম্প্রদান ক'র্‌তে চাও, তা হ'লে তোমরা থাকৃতে অবশ্য আমি সম্প্রদান করিতে পারি না; আমার তায় অধিকার নাই। কিন্তু তোমরা যখন মেয়ে বিক্রয় কর্‌বে, তখন তাকে তো আর সম্প্রদান কর্‌ছো না। এরূপ স্থলে আমি তোমার মেয়েকে যোগ্য পাত্রে নিশ্চয়ই সম্প্রদান ক'র্‌তে পারি। আর তোমার মেয়ে যখন বয়ঃস্থা হ'য়েছে, তখন সে বাপ মা কিম্বা কারুর অপেক্ষা না ক'রে আপনাকে আপনিই সদম্প্রান ক'র্‌তে পারে। যে কন্যা সাবালিকা হয়েছে, তার উপর কারুরই অধিকার নাই। সে আপনার মালিক আপনিই। তোমার সৌভাগ্য এই যে, তুমি এমন গুণবতী মেয়ে পেয়েছ। নতুবা তুমি পয়সার লোভে তাকে এত বড় করে রেখেছ—সে যে তোমার বংশে বা তোমার মুখে চূণ কালী দেয় নাই, এই যথেষ্ট। শোন, আমি তোমায় স্পষ্ট বল্‌ছি—কারুর সম্প্রদানের অপেক্ষা না করে, সে আপনিই আপনাকে যোগ্য পাত্রে সম্প্রদান করেছে। পণ্ডিত হরনাথ তর্কবাচস্পতি তোমার জামাতা হবে। এই বিবাহে তোমার কিছু খরচ পত্র নাই। কন্যা ও জামতাকে যা দিতে হয় তা আমি দেব। আগামী অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ই তারিখে আমি বিবাহের দিন স্থির করিয়াছি। তার পূর্ব্বেই তুমি সপরিবারে এখানে আস্‌বে, তোমাকে আমি নিমন্ত্রণ কর্‌লাম; এসে বিবাহ উৎসবে যোগ দান কর্‌বে। মেয়ে তার পূর্ব্বে তোমার বাড়ী যাবে না। ভবানীকে নিয়ে যেতে ইচ্চা কর, এখন নিয়ে যেতে পার; কিন্তু সেই সময়ে আবার নিয়ে আস্‌বে,—বুঝ্‌লে ?"

যাদবচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের কথা শুনিয়া ক্রোধে ও বিস্ময়ে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। পরে ক্রোধে বলিলেন, "বিবাহে মেয়ের স্বাধীন মত কি; আমি তার বাপ; আমি যার সঙ্গে তার বিয়ে দেব, সেই তার স্বামী হবে।

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "মেয়ে যদি সেখানে বিয়ে ক'রতে না চায়; তুমি কেমন ক'রে তার বিয়ে দেবে ?"

যাদবচন্দ্র একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "আপনি তো চমৎকার কথা বল্‌ছেন, দেখ্‌ছি ? মেয়ে যদি একটা শূদ্রকে বিবাহ ক'রতে চায়, আমি সেই বিয়ের অনুমোদন কর্‌'ব না কি ?"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "দেখ যাদব, তুমি শান্ত হও, অত উত্তেজিত হ'য়ো না, হিন্দু সমাজে শূদ্রের সহিত ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহ হয় না; তাহা অশুদ্ধ এবং বিবাহ বলেই গণ্য হয় না। কলিকালে হিন্দুসমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত নাই। কিন্তু তোমরা যখন এত ডাগর আইবুড়ো ঘরে রাখ্‌তে পার, তখন শুধু অসবর্ণ বিবাহ কেন, আরও গুরুতর ব্যাপারের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত। হিন্দুসমাজ তোমাদের এত অত্যাচারের যে এখনও ছারখার হয় নাই, সে কেবল তোমাদের ধর্ম্মশীলা কন্যাদেরই জন্য। কন্যাদের যখন জ্ঞান থাকে না, তখন তোমরা সত্তর বছরের মিন্‌সে কেন—একটা গঙ্গাযাত্রার মড়ার সঙ্গেও অনায়াসে তাদের বিয়ে দিতে পার—আর অর্থের লোভে তা দিয়েও থাক। কিন্তু তাদের যখন জ্ঞান হয়, তখন তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিরূপে কাজ ক'র্‌বে?"

যাদব কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "যে মেয়ে বাপ মায়ের বশীভূত নয় – অবাধ্য, সে মেয়ে বেঁচে থাকাও যা, আর মরে যাওয়াও তা। আমি আপনার কথা শুনে বুঝ্‌তে পার্‌ছি, মেয়ে হরনাথকে পছন্দ করেছে। আমি এটা আগে থেকেই সন্দেহ করেছিলাম; সেইজন্য তাকে কখনও আপনাদের এখানে আস্‌তে দিই নাই। মেয়ে যদি আপনার ইচ্ছানুসারেই কাজ কর্‌বে, তবে সে আপনার ইচ্ছা নিয়েই থাকুক্‌, আমার সঙ্গে তার আর সম্পর্ক কি? আমি মনে কর্‌ব, আমার মেয়ে মরে গেছে। আমি ইহ জীবনে তার আর মুখ দেখ্‌তে চাই না। কিন্তু আপনি কিরূপে তার বিয়েটা দেন, তাও আমি একবার দেখ্‌ব।" এই বলিয়া ক্রুদ্ধ যাদবচন্দ্র সেখান হইতে সহসা উঠিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

একাদশপরিচ্ছেদ।

ঘোষাল মহাশয়ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, পাপিষ্ঠটা এখান থেকে সরে গেল, ভালই হল। তার মুখ দর্শন কর্‌লেও পাপ হয়। হরনাথের সঙ্গে দুর্গারাণীর বিবাহ আমি নিশ্চয়ই দেব। এই বিয়ে সে কেমন করে ঠেকায় তা দেখি।"

অন্তঃপুরে গিয়া তিনি দেখিলেন দুর্গারাণী ও ভবানী উভয়েই কাঁদিতেছে এবং তাঁহার পত্নী তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিতেছেন। ঘোষাল মহাশয় একটী মোড়ার উপর বসিয়া উভয়কেই তাঁহার সমীপে আহ্বান করিলেন। তিনি ভবানীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভবানি, শুন্‌লে তোমার বাবার কথা? তিনি

একটা সত্তর বছরের থুরথুরে ঘেঁকুরে বুড়োর সঙ্গে দুর্গারাণীর বিয়ে দেওয়া স্থির করেছেন! মেয়ের সুখ দুঃখের দিকে তাঁর কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই। তাঁর কতকগুলো টাকা হলেই হ'ল। কাল যে মেয়ে বিধবা হবে কিংবা পথের ভিখারিণী হবে, সে কথা তিনি একটী বারও ভেবে দেখ্ছেন না। বল্লে তোমাদের মনে কষ্ট হবে, কিন্তু না বলেও থাক্তে পার্ছি না—তিনি তোমাদের জন্মদাতা পিতামাত্র, তা নইলে তিনি তোমাদের ঘোর শত্রু। তারিণীর কি দশা হয়েছে? তোমার কি দশা হয়েছে? আবার তিনি দুর্গারাণীকেও জলে ভাসিয়ে দিতে প্রস্তুত। এমন ভয়ঙ্কর লোক আমি কোথাও দেখি নাই। তিনি ব'লে গেলেন যে দুর্গরাণীর আর মুখ দেখ্বেন না। দুর্গারাণীর মুখ দেখে তিনি যদি তাকে অকূল পাথারে ভাসিয়ে দেন, তার চেয়ে যদি দুর্গারাণী চিরকাল সুখে থাকে আর তিনি তার মুখ দেখ্তে না চান, সে তো সহস্রগুণে ভাল। শোন ভবানি, আমি কি স্থির করেছি শোন। হরনাথের সঙ্গে দুর্গারণীর বিয়ে আগামী ১৫ই অগ্রহায়ণ তারিখে আমার এই বাড়ীতেই হবে। তুমি এখন পলাশডাঙ্গায় যেও না, বিয়ের পর যাবে।"

ঘোষাল-গৃহিণী বলিলেন, যাদব রাগ ক'রে চলে গেল; তাকে একটু বুঝিয়ে বল্‌লে না?

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, ওগো তা কি আমি না বুঝিয়েছি। কিন্তু যে অবুঝ—যে মেয়ে বেচে বড় লোক হবার স্বপ্ন দেখ্ছে—তাকে বোঝাব কি করে?"

ঘোষাল-গৃহিণী বলিলেন, "আমি যে রকম দেখ্ছি—তাতে সে তো রাণীর বিয়ের সময় আস্‌বে না। সে না আসে নাই আসুক, কিন্তু রাণীর মাকে সেই সময় নিয়ে আস্‌বে না? বৌ বলে পাঠিয়েছে হরনাথের সঙ্গেই যাতে রাণীর বিয়ে হয়, তাই যেন করা হয়।"

ঘোষাল মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা তার জন্য চিন্তা নাই। আমি তাঁকে নিয়ে আস্‌ব।"

বিবাহের সময় মা আসিবেন, ইহা শুনিয়া ভবানী ও দুর্গারাণী উভয়েই প্রফুল্ল হইল।

যাদবচন্দ্র পলাশডাঙ্গায় উপস্থিত হইয়া গৃহিণীর সহিত ভয়ানক কলহ আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "তুমিই ষড়যন্ত্র করে ভবানীকে আর রাণীকে কৈলাসপুরে পাঠিয়েছ। রাণীকে আমি সেখানে কিছুতেই পাঠাতে চাই নাই; কিন্তু তোমার জিদে পড়ে আমি তাকে সেখানে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলাম। কথায়

বলে, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। মেয়ে মানুষের কথা শুনে চল্লে শেষ পর্য্যন্ত এই রকম বিপদই উপস্থিত হয়। শুনেছ কি, এখন তোমার রাণী সাবিত্রীর মত স্বয়ম্বরা হচ্ছেন ? তিনি হর থেকে পছন্দ করেছেন, আর হরনাথ ভিন্ন আর কারেও বিয়ে করবেন না! এমন নির্লজ্জ মেয়ে ভূ-ভারতে আর জন্মে নাই। আর তুমি স্বয়ং রত্নগর্ভা, তা নইলে এমন মেয়ে গর্ভে ধারণ করবে কেন ? মেয়ে শেষকালে এমন হয়ে দাঁড়াবে জান্তে পাল্লে সেই আঁতুড় ঘরেই তাকে গলা টিপে মেরে ফেল্তাম। ঘোষাল মশাই তো আমাকে দশ জনের সাক্ষাতে যা তা বলে অপমান কর্লেন। তিনিই অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ই তারিখে রাণীর বিয়ে দেবেন। দেখি কেমন করে তিনি তার বিয়ে দেন! আমি মেয়ের বাপ, মেয়ের উপর আমার কোনও অধিকার নাই, আর তিনিই হলেন সর্ব্বেসর্ব্বা! 'যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই।' আমি কিন্তু তোমায় আগে থেকেই বলে রাখ্ছি, যদিই কোনও রকমে হরনাথের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যায়, তা হলে মেয়ে জামাইকে কখনও যেন আমার এ বাড়ীতে এনো না। আমি তাদের মুখ দেখ্তে চাই না।

রাণীর মা স্বামীর ভর্ৎসনা শুনিয়া অনেক কাঁদিলেন। কিন্তু হরনাথের সহিত রাণীর বিবাহ হইতেছে শুনিয়া মনে মনে আহ্লাদিত হইলেন।

সেই দিবস বৈকালেই যাদবচন্দ্র পুরুলিয়া যাত্রা করিলেন, পরদিন পুরুলিয়াতে উপস্থিত হইয়া ঘোষাল মহাশয়ের নামে ফৌজদারীতে নালিশ করিয়া কোন ওয়ারেণ্ট বাহির করা যায় কি না, তৎ সম্বন্ধে উকীল মোক্তারদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সকলেই ঘোষাল মহাশয়কে এবং যাদবচন্দ্রকেও চিনিতেন, তাঁহারা প্রস্তাবিত নালিশের কারণ অবগত হইয়া এক বাক্যে ছি ছি করিতে লাগিলেন। হরনাথের আভিজাত্য এবং পাণ্ডিত্যও সকলেই বিদিত ছিলেন। এই কারণে সকলেই যাদবচন্দ্রকে এরূপ কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য সদুপদেশ দিলেন, কিন্তু কিছুতেই যাদবচন্দ্র নিরস্ত হইবার নহেন। তিনি প্রসার প্রতিপত্তি হীন এক নব্য মোক্তারকে ধরিয়া একটী দরখাস্ত লেখাইলেন এবং পর দিন প্রথম কাছারীতে ডেপুটী কমিশনার সাহেবের এজলাসে তাহা দাখিল করাইলেন।

যাদব সাক্ষীর কাঠ্রায় দাঁড়াইয়া হলপ লইয়া এজাহার দিলেন। সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"ঘোষাল তোমার কে হয় ?"

"হুজুর আমার ভগ্নীপতি।"

"তোমার কন্যার বয়স কত ?"

হুজুর সতের আঠারো বছর।"

"হরনাথকে বিয়ে কর্‌তে তার মত আছে ?"

'হুজুর তা আমি ঠিক্ বল্‌তে পারি না, তবে শুনেছি মেয়ের না কি মত আছে; আর হরনাথই মেয়ের মন ভুলিয়েছে। হুজুর আমি হরনাথকেও আসামী কর্‌তে চাই।"

"হরনাথ ব্রাহ্মণ ও তোমাদের স্বজাতি বটে কিনা ?"

হুজুর হাঁ।"

"তাহার বয়স কত ও অবস্থা কি রকম ?

হুজুর তাহার বয়স সাতাশ আঠাশ বৎসর হবে। আর তাব অবস্থা খুব ভাল। তার অনেক ব্রহ্মোত্তর জমী আছে, বছরে দু'তিন হাজার টাকা আয় হবে।

তাহার সহিত তোমার কন্যার বিবাহে কোনও বাধা নাই তো ?

হুজুর আছে বই কি! আমি সেখানে মেয়ের বিয়ে দিতে চাই না। আমি মেয়ের বাপ, আমি যেখানে বিয়ে দেব, সেইখানেই তাকে বিয়ে কর্‌তে হবে। মেয়ের এতে মতামত কি ?

সাহেব ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "মেয়ের মতামত অবশ্যই আছে ও লইতে হইবে। তুমি জোর করিয়া তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার বিবাহ দিতে পার না। সে যদি হরনাথকে ভালবাসিয়া থাকে ও পছন্দ করিয়া থাকে, সে তাহাকেই বিবাহ করিবে। তুমি কোনও বাধা দিতে পার না। খবরদার! তুমি তাহাদের বিবাহে কোনও গোলযোগ করিও না, করিলে আমি তোমাকে নিশ্চয় ফাটক্ দিব। যাও—দরখাস্ত না মঞ্জুর।"

যাবদচন্দ্র যেন সহসা আকাশ হইতে পাতালে পড়িলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল ঘর্ম্মাক্ত এবং কণ্ঠ ও তালু বিশুষ্ক হইল। তাঁহার মোক্তার দরখাস্তের অনুকূলে দুই চারি কথা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সাহেব তাঁহাকে ধমক্ দিবামাত্র তিনি নিরস্ত হইলেন। যাদবচন্দ্র তখন অনন্যোপায় হইয়া সাহেবকে করজোড়ে ও উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"দোহাই হুজুর! দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমার সুবিচার করুন! শিবনাথ ঘোষাল আমার মেয়েকে জোর ক'রে তাঁর ঘরে আটক্ করে রেখেছেন। দোহাই ধর্ম্মাবতার, সুবিচার করুন!"

সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া কনেষ্টবলের প্রতি আদেশ করিলেন,—"ইস্‌কো কাঠ্‌রাসে উতার দেও, আউর এজলাস সে নিকাল দেও।"

সাহেবের মুখ হইতে হুকুম বাহির হইবামাত্র যমদূতের ন্যায় দুইজন কনেষ্টবল যাদবচন্দ্রের হাত ধরিয়া হিঁচ্‌ড়াইয়া তাহাকে কাঠ্‌রা হইতে নামাইল এবং বলপূর্ব্বক দ্বার পর্য্যন্ত তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া গেল। পরে গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া সজোরে এক ধাক্কা দিয়া দ্বারের বাহির করিয়া দিল। সেই সময়ে প্রথম কাছারীতে দরখাস্তাদি পেশ করিবার জন্য উকীল মোক্তার ও তাঁহাদের মক্কেলগণ এজ্‌লাসের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন। যাদবের নির্ব্বাচিত ভাবী জামাতা বৃদ্ধ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ও কাছারীর কোনও লোকমুখে তাঁহার ভাবী পত্নীর সম্বন্ধে কি একটা গোলযোগ ও মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, ইহা অবগত হইয়া ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের সাহায্যার্থ ডেপুটি কমিশনারের এজলাসে ব্যস্ত সমস্ত হয়া প্রবেশ করিতেছিলেন; এমন সময়ে যাদবচন্দ্র কনেষ্টবলদ্বয়ের সজোর ধাক্কা খাইয়া দৈবদুর্ব্বিপাকে তাঁহারই উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেলেন। বৃদ্ধ ত্রৈলোক্যনাথের অপটু পদদ্বয় সেই ধাক্কা সাম্‌লাইতে অসমর্থ হওয়ায়, তিনিও চিৎ হইয়া পড়িয়া গেলেন এবং যাদবচন্দ্রও বেগে তাঁহার উপর নিপতিত হইলেন। পতনের বেগে মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগায় এবং বক্ষের উপর যাদবচন্দ্রের দেহের চাপ পড়ায় বৃদ্ধ ত্রৈলোক্যনাথ সহসা তাঁহার দন্তহীন মুখটি ব্যাদান করিলেন ও চক্ষু দুটী কপালে তুলিয়া নিশ্চেষ্ট হইলেন! সকলে তাহা দেখিয়া "হাঁ হাঁ" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং কনেষ্টবলেরা গোলমাল থামাইবার জন্য দ্বারের দিকে ছুটিল। যাদবচন্দ্র কনেষ্টবল্‌দিগকে পুনর্ব্বার আসিতে দেখিয়া নিমেষমধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও ত্রৈলোক্য নাথের বিকৃত মুখভঙ্গী দর্শনে ভয়ে বিহ্বল হইয়া সহসা সেই জনতার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধ ত্রৈলোক্যনাথ যেরূপ বেগে পড়িয়াছিলেন এবং পড়িয়াই যে ভাবে মুখ চক্ষু বিকৃত করিয়াছিলেন, তাহাতে যাদব মনে করিলেন, বুঝি বা সেই পতনেই তাঁহার ভবলীলার অবসান হইল। খুনের দায়ে ধরা পড়িবার ভয়ে তিনি বাহিরে আসিয়াই তৎক্ষণাৎ কাছারীর সীমা পরিত্যাগ করিলেন। তিনি যেরূপ বেগে ও ভয়চকিত ভাবে গমন করিলেন, তাহাতে তিনি কাছারী যাত্রী অনেক ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি সম্মুখের দিকে দৃষ্টিপাত না

করিয়া কেবল পশ্চাদ্ভাগেই চাহিতে চাহিতে দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে গমন করিতে করিতে তিনি সহসা একটী কনেষ্টবলের সম্মুখে পড়িলেন। এই কনেষ্টবলটি কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া কাছারী অভিমুখে আসিতেছিল। সে যাদবচন্দ্রকে ভীত ও চকিত বদনে এবং দ্রুতপদে গমন করিতে দেখিয়া কিছু সান্দিগান্ হইল; এবং তারস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া "এও, তুম্ কাহে ইস্‌তর্ সে ভাগা যাতা হ্যায়।" কনেষ্টবলকে দেখিয়াই যাদবচন্দ্রের মুখ শুকাইয়া গেল। সে কোনওরূপে শব্দ যোজনা করিয়া বলিল, "না বাবা, আমি তো ভাগা যাতা নাই, আমার চলনই এই রকম।" এই বলিয়া আরও দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। কনেষ্টবল কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনা-আপনি বলিয়া উঠিল, "যহ জরুর পাগ্‌লা হ্যায়।" এই বলিয়া সে গন্তব্য পথে চলিল। কনেষ্টবলকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া যাদবের যেন প্রাণ আসিল। কিন্তু তাহার অবাধ্য পদদ্বয় কিছুতেই সংযত হইতে চাহিল না। দ্রুতগতি অল্পক্ষণ মধ্যেই ধাবনে পরিণত হইল এবং তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে সহরের মধ্যে উপস্থিত হইলেন।

বাজারের মধ্যে তিনি গতি কিঞ্চিৎ মন্দীভূত করিলেও, সদর রাস্তায় চলা তিনি নিরাপদ মনে করিলেন না; এই কারণে একটা গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সহরের বহির্ভাগে উপনীত হইলেন। এইস্থান হইতে ষ্টেশন প্রায় এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী হইবে। কিন্তু তিনি ষ্টেশনে যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইতে লাগিল, হয়ত কনেষ্টবলেরা তাঁহাকে ধরিবার জন্য অগ্রেই ষ্টেশনে গিয়াছে। এই কারণে অগ্রবর্ত্তী ষ্টেশনে গিয়া গাড়ীতে আরোহণ করা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। কিন্তু গাড়ীতে চাপিয়া তিনি কোথায় যাইতেছেন? বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, সেখানেও কনেষ্ট-বলেরা তাঁহাকে ধরিবে! তিনি কমিশনার সাহেবের কাছে যে দরখাস্ত করিয়াছেন, তাহাতে যে তিনি নিজের নাম ধাম দিয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছেন! নানারূপ চিন্তা করিয়া তিনি গভীর রাত্রিতে বাড়ীতে উপস্থিত হওয়াই স্থির করিলেন।

চারিক্রোশ পথ হাঁটিয়া তিনি পরবর্ত্তী ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যার পর যে গাড়ী আসে, সেই গাড়ীতে চাপিয়া তিনি গন্তব্য ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন, এবং সেখান হইতে হাঁটিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। রাত্রি দুইটার সময় বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তিনি গৃহিণীকে বলিলেন,—"আমি এখনই ক'লকাতা যাব।

গোটা পনর টাকা বার করে দাও; বিশেষ কাজ আছে। ফিরে আস্‌তে কতদিন বিলম্ব হ'বে, তা বল্‌তে পারি না।"

গৃহিণী তাঁহার ভীত ও বিশুষ্ক মুখমণ্ডল দেখিয়া বলিলেন, "কি এমন জরুরী কাজ পড়েছে যে এখনই ক'ল্‌কাতা যাবে?"

যাদবচন্দ্র রুক্ষ স্বরে বলিলেন,—"তোমায় এত কৈফিয়ৎ দিতে পারি না। জরুরী কাজ না পড়্‌লে ক'লকাতায় যাচ্ছি কেন? তুমি কিন্তু কারেও বলো না যে, আমি রাত্রিতে বাড়ী এসে আবার ক'লকাতায় গেছি। কেউ জিজ্ঞাসা কর্‌লে ব'লো তিনি কোথায় গেছেন তা জানি না।"

স্বামীর কথা শুনিয়া গৃহিণীর মনে ভয় হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "তুমি বাড়ী ছেড়ে যাচ্ছ, কখন যে আস্‌বে তাও ব'ল্‌ছ না। আর কাল ত্রয়োদশীতে পুরুলিয়া থেকে কারা রাণীকে দেখ্‌তে আস্‌বে, ব'লেছিলে না?"

যাদব বলিলেন, "আস্‌বার তো কথা ছিল। কিন্তু রাণী কি এখানে আছে যে তারা দেখ্‌তে আস্‌বে? আমি পুরুলিয়ায় গিয়ে তাদের আস্‌তে মানা করেছি। তারা কেউ এখানে আস্‌বে না। কিন্তু অপর কেউ আস্‌তে পারে, যেমন—যেমন—এই আর কি—দারোগা, কনেষ্টবল—এই সব লোক। বুঝ্‌লে? তারা এলে ব'লো, আমি কোথায় গেছি তা' তোমরা জান না।"

রাণীর মাতার ভয় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন তুমি কি ক'রেছ গো, যে দারোগা কনেষ্টবল আস্‌বে? আমায় সব কথা খুলে বল না? তোমার কথা শুনে যে আমার বড় ভয় হ'চ্ছে।'

যাদবচন্দ্র বলিলেন, "আমি কি করবো? আমি তো কিছুই করি নাই।"

রাণীর মাতা বলিলেন,—"রাণীর পিশেমশাইকে ওয়ারীন্ দিয়ে ধরাবার জন্যে তুমি তো আজ সকালে সাহেবের কাছে দরখাস্ত ক'রেছিলে। তারপর সাহেব তো এজলাস থেকে তোমাকে বার করে দেন। তারপর তুমি তোমার সেই হবু বুড়ো জামাইয়ের ঘাড়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে যাও। তারপর তুমি সেখান থেকে পালিয়ে যাও। এই সব তো শুনেছি। এর পর তুমি আরও কিছু করেছ নাকি?

যাদবচন্দ্র ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিলেন, "তুমি এসব কথা শুন্‌লে কোথায়? তা হ'লে পুলিশে ধরবার জন্য এখানে এসেছিল নাকি? সেই বুড়া ত্রৈলোক্য মুখুয্যেটা তা হ'লে মারা পড়েছে নাকি?'"

রাণীর মাতা স্বামীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন,—"না গো না, সে মারা

পড়্‌বে কেন? ভিরমি হয়ে তার মূর্চ্ছা হয়েছিল। তার মুখে মাথায় জল দিলে পর তার চেতনা হয়। তুমি মেয়ের জন্যে বেশ জামাইটি পছন্দ ক'রেছিলে যাহোক। তুমি পুরুলিয়া গেলে পর কৈলাসপুর থেকে কালীপ্রসাদ এসেছিল, সেও তোমার পিছু পিছু পুরুলিয়া গে'ছল। আজ বিকেল বেলায় ফিরে যাবার সময় আমায় সব কথা বলে গেল।"

গৃহিণীর কথা শুনিয়া যাদবচন্দ্রের দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল। তিনি বলিলেন আঃ বাঁচলাম বাবা! মুখুয্যেটা তাহলে মরে নাই! আমি মনে ক'রে ছিলাম, বুঝি মরেছে! সে যে রকম করে হা কর্‌লে, আর চোখ কপালে তুল্‌লে,—দেখেই তো আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গে'ছল।

রাণীর মাতা বলিলেন, "তোমার কথা শুনে হাসিও পায় কান্নাও আসে। বলি, তোমার মেয়ের জন্যে কি এমনই বর ঠিক কর্‌তে হয়? তোমার কেবল টাকা আর টাকা। টাকা নিয়ে তুমি কি কর্‌বে? তোমার ছেলে না পিলে? কে তোমার টাকা ভোগ ক'র্‌বে! তোমার যা কিছু থাক্‌বে তা সবই তো তোমার মেয়েরা পাবে—তবে বাছাদের এত কষ্ট দেবার কারণ কি!" এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাণীর মা কাঁদিয়া ফে'ললেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঈষৎ সংযত হইয়া বলিলেন,—আর শুনেছ তো, তুমি যে মাড়োয়ারীকে টাকা ধার দিয়েছিলে, সে দোকান পাট তুলে দিয়ে দেশে পালিয়ে গেছে!"

এই সংবাদ শুনিয়াই যাদবচন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "অ্যাঁ কি ব'ল্‌ছ তুমি! মাড়োয়ারী দোকান তুলে দিয়ে দেশে পালিয়ে গেছে! কে তোমায় এ খবর দিলে!"

রাণীর মাতা বলিলেন, "ঐ যে, কে তোমায় পত্র লিখেছে, পড়ে দেখ।"

যাদবচন্দ্র পত্র পাঠ করিয়া বজ্রাহতের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ নিশ্চেষ্ট রহিলেন পরে কপালে ঘা মারিয়া বলিলেন, ভগবান এমন কঠোর সাজাও আমায় দিলে! দুটো মেয়ে বেচে আর তাদের সর্ব্বনাশ করে যে আমি টাকা নিয়েছিলাম গো! সেই টাকা আমার গেল! ও বাপ্‌রে—এ যে আমার ভয়ানক প্রায়শ্চিত্ত সুরু হ'ল! এ যে তুষানলের চেয়েও বেশী হ'ল। এ যে যত দিন বাঁচব, কেবল দগ্ধে দগ্ধে মর্‌বো! উঃ কি যন্ত্রণা—কি যন্ত্রণা! মলেও কি এই যন্ত্রণা যাবে! ঘোষাল মশাই—ঘোষাল মশাই, তুমি সত্যই বলেছিলে আমার ইহকাল পরকাল দুই গেছে। নরকেও আর আমার স্থান হবে না! উঃ আমি কি করেছি গো! আমি যে আমার বংশে কলঙ্ক দিয়েছি—আমার বাপ পিতামহকে নরকে

ডুবিয়েছি! না আমি আর এ প্রাণ রাখ্‌ব না—এ মুখ আর কারেও দেখাব না।" এই বলিয়া তিনি ভূতলে আছাড় খাইয়া পড়িলেন এবং উন্মত্তের ন্যায় ভূমিতে মাথা ঠুকিতে লাগিলেন। রাণীর মাতা স্বামীর দুর্দ্দশা দেখিয়া চক্ষের জলে ভাসিতে তাহাকে তুলিয়া ধরিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

হরনাথ ও দুর্গারাণীর শুভ বিবাহের পাঁচদিন পূর্ব্বে কালীপ্রসাদ তাঁহার মাতুল ও মাতুলাণীকে কৈলাসপুরে লইয়া যাইবার জন্য পলাশডাঙ্গায় আসিলেন। যাদবচন্দ্র কালীপ্রসাদকে দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন কালীপ্রসাদ কৈলাসপুরে আমি আর এ মুখ দেখাতে যাইব না। তোমার বাবা আমাকে হিত কথাই বলেছিলেন; কিন্তু আমি তাঁকে যা তা বলেছিলাম। তারপরেও, তাঁর বিরুদ্ধে ডেপুটী কমিশনার সাহেবের কাছে আমি দরখাস্ত করেছিলাম। সুতরাং তুমি আমাকে কৈলাসপুরে যেতে বলে আর লজ্জা দিও না। আমি জীবনে যে কুকর্ম্ম করেছি, তার ফল এখন ভোগ কর্‌ছি এবং কতকাল যে কর্‌বো, তা ভগবানই জানেন। অর্থের লোভে আমি দুটো মেয়ের সর্ব্বনাশ করেছি—আবার আর একটী মেয়েরও সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হয়েছিলাম। দুর্গারাণীই আমাকে সেই গুরুতর পাপের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। হরনাথ ও দুর্গারাণীর মঙ্গল হোক; তারা সুখে থাক; আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, ধনে পুত্রে তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি হোক্। বাবা কালীপ্রসাদ আমি যে কাজ কর্‌তে উদ্যত হয়েছিলাম, সে কি পিতার উপযুক্ত কাজ? আমি রাগের মাথায় সেদিন বলেছিলাম যে আমি রাণীর মুখ আর কখনও দেখ্‌বো না। কিন্তু এখন তাকেই আমার মুখ দেখাতে লজ্জা বোধ হচ্চে। কুটুম্বদের সঙ্গে আমি আর কোন মুখে আলাপ কর্‌বো! আমাদের বংশে যা কেউ কখনও করেন নাই, আমি তাই করেছি। আমার ব্যবহারে ও কার্য্যে তোমাদের মাথা হেট হয়েছে। প্রাণ দিলেও যদি এই কলঙ্কের ক্ষালন হয়, তাও দিতে আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু হায়, এ কলঙ্ক কি আর ঘুচবে! কালীপ্রসাদ আমি কুলাঙ্গার হয়ে জন্মেছিলাম। আমি পিতৃ-পিতামহের নাম লোপ করেছি ও তাঁদিকে নরকস্থ ক'রেছি; আমি এ মুখ আর কারেও দেখাবো না। তুমি তোমার মামীকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও, সেই কন্যা দান কর্‌বে। আমি তাকে যেতে ও কন্যা দান কর্‌তে অনুমতি দিয়েছি। আমার মত পাপী লোক কন্যা দান কর্‌লে কন্যার অমঙ্গল

হবে যে! এই পর্য্যন্ত বলিয়া যাদবচন্দ্র ভেউ ভেউ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কালীপ্রসাদ অনেক বুঝাইলেও যাদবচন্দ্র কৈলাসপুরে যাইতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা তিনি মামী ঠাকুরাণীকেই সঙ্গে লইয়া বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। ঘোষাল মহাশয় পুত্রের মুখে যাদবচন্দ্রের অনুতাপের বিবরণ অবগত হইয়া দুঃখিত হইলেন না, বরং মনে মনে আনন্দিতই হইলেন।

ধার্য্য দিবসে যথা সময়ে দুর্গা মন্দিরের প্রাঙ্গনে হরনাথের সহিত দুর্গারাণীর শুভ বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত হইয়া গেলে, বৃদ্ধ পুরোহিত ভক্তি গদ্গদ কণ্ঠে "তারা—তারা জগদম্বা, তুই মা সত্য!" এই কথা বারম্বার বলিতে লাগিলেন। হরগৌরীর মিলনে যেরূপ দেবতারা আনন্দিত হইয়াছিলেন, আজ এই হর-দুর্গার মিলনেও কৈলাসপুরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সেইরূপ আনন্দিত হইলেন। হরনাথের জননীও কৈলাসপুরে আসায় নব দম্পতী কিছুদিন কৈলাসপুরেই থাকিলেন; সুতরাং উভয়কে বৌদিদি ও ভবানীর সুমধুর হাস্য পরিহাসের মধ্যে উক্ত দিবসগুলি কৈলাসপুরে কাটাইতে হইল।

অষ্টমঙ্গলার পর যখন হরনাথ বধূ সহ কৃষ্ণপুরে যাইতে উদ্যত হইলেন, সেই সময়ে একদিন দুর্গারাণী হরনাথকে বলিল, আমি কৈলাস-গিরির সমস্ত মন্দির দেখেছি, কেবল বিষ্ণু-গিরিতে বিষ্ণুমন্দির আর ব্রহ্ম-গিরিটী দেখি নাই। বিষ্ণু-গিরিতে উঠা বড় শক্ত বলে বৌদিদি সেখানে আমায় নিয়ে যায় নাই। একদিন আমাকে ঐ দুটী গিরি দেখাবে না!

হরনাথ বলিলেন, 'বেশ তো' কাল বিষ্ণুমন্দিরে নবান্ন হবে; কাল বৌদিদিকে ও ভবানী দিদিকে সঙ্গে নিয়ে চল। আমি তোমাদের বিষ্ণুমন্দির দেখিয়ে আন্‌বো। ব্রহ্ম-গিরিতে উঠ্‌তে পার্‌বে না। আর সেখানে কোনও দেবতার পূজাও হয় না।"

প্রাতঃস্নান করিয়া শৈলজা ও দুর্গারাণী বিষ্ণুর মন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। ভবানী যাইতে চাহিল না, সে বলিল, "আমি সেখানে দুই একবার গেছি, নাম্‌বার সময় পা বড় থর্ থর্ ক'রে কাঁপে; আমি যাব না।" কালীপ্রসাদ শৈলজাকে যাইতে দেখিয়া বলিলেন, "কি গো, তুমি এক্‌লাই বৈকুণ্ঠে যাবে না কি? আর আমি এখানে প'ড়ে থাক্‌ব? তা হ'বে না, আমরা দু'জনেই বৈকুণ্ঠে যাব।"

হরনাথ, কালীপ্রসাদ, শৈলজা ও দুর্গারাণী বিষ্ণু-গিরিতে আরোহণ করিতে

লাগিলেন। পর্ব্বতটি দুরারোহ হইলেও প্রস্তরময় সোপান পরম্পরা যোগে তাঁহাদের উঠিতে বিশেষ কোনও কষ্ট হইল না। বিষ্ণুমন্দিরে উপনীত হইয়া শৈলজা ও দুর্গারাণী অতীব বিস্মিত ও আনন্দিত হইল। সেই স্থানের বায়ু স্নিগ্ধ ও পবিত্র এবং প্রাকৃতিক শোভাও চমৎকারিণী। মন্দিরের সম্মুখে প্রকাণ্ড পুষ্পোদ্যান। তাহার চারিদিকে কত মনোহর বৃক্ষ। এইস্থানে উপস্থিত হইলে সত্য সত্যই সংসার ভুলিয়া যাইতে হয়। পৃথিবীর পাপ-কোলাহল এই উচ্চ শিখর পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারে না।

মন্দিরের অভ্যন্তরে ভগবান্ নারায়ণের ও ভগবতী লক্ষ্মীর মনোহারিণী মূর্ত্তি। সিংহাসনের নিম্নভাগে গরুড় করজোড়ে বসিয়া আছেন। পার্শ্বে নারদ বীণাযন্ত্র লইয়া ভগবানের গুণগান করিতেছেন। নর-নারায়ণ বাম পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানের স্তব করিতেছেন। দেবতাদিগকে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রণাম করিয়া সকলে মন্দিরের দালানে উপবিষ্ট হইলেন।

সেই মন্দিরের পূর্ব্বভাগে কিয়দ্দূরে একটী পর্ব্বতের চূড়া আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। সেই পর্ব্বতটি নিবিড় বনে সমাচ্ছন্ন এবং সেখানে যাইতে হইলে, একটী গভীর উপত্যকা উত্তীর্ণ হওয়া যাইতে হয়। পর্ব্বতের চূড়ায় একটী ক্ষুদ্র প্রস্তরময় মন্দির আছে। পূর্ব্বদিকে তাহার দ্বার থাকায়, তাহা নয়নগোচর হইতেছিল না।

কালীপ্রসাদ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া হরনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হর, এই মন্দিরগুলি মহারাজ বিক্রমাদিত্য নির্ম্মাণ ক'রেছিলেন ব'লে প্রবাদ আছে, তা শুনে থাক্‌বে। তিনি বৎসরের মধ্যে কিছুদিন এখানে এসে বাস কর্‌তেন। তিনি এরূপ সিদ্ধ পুরুষ ও ভক্ত ছিলেন যে, তিনি এই গঙ্গাহীন দেশে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান কর্‌তে না পেয়ে দুঃখিত হওয়ায়, ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবান্ এই গিরি-শিখরে মন্দাকিনী, গঙ্গা ও ভোগবতীর সৃষ্টি করেন। এই মন্দিরের পিছনে কোথা হ'তে মন্দাকিনীর জল পর্ব্বতের গায়ে অনবরত ঝরে পড়্‌ছে! ঐ জল পতনের শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছ না? বিষ্ণুর সিংহাসনের নিম্নেই না কি একটি গভীর গর্ত্ত আছে; সেই গর্ত্ত হ'তে অনবরত জল বেরুচ্ছে।"

হরনাথ হাসিয়া বলিলেন,—"এই পর্ব্বতমালার অবস্থান, এই মন্দিরগুলি কল্পনা ও রচনা সমস্তই অদ্ভুত। আমি মাঝে মাঝে এখানে আসি, এইগুলি যতবার দেখি, ততবারই নূতন বলে মনে হয় আর হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়। এই মন্দিরগুলির রচনা ও বিন্যাসে একটী চমৎকার তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন আছে, তা বোধ

করি আপনি কখন ভেবেও দেখেন নাই। পূর্ব্বদিকে ঐ দেখুন ব্রহ্ম-গিরি; মধ্যে এই দেখুন বিষ্ণু-গিরি, আর পশ্চিমে ঐ দেখুন কৈলাস-গিরি। ভগবান্ সূর্য্য ত্রিগুণাত্মক এবং সগুণ ব্রহ্মের প্রকাশক ও নিদর্শন। একই সূর্য্য গুণভেদে ত্রিধা বিভক্ত হ'য়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপে প্রতিভাত হ'য়ে থাকেন। প্রভাতে ইনি রজোরূপী ব্রহ্মা, অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা। নিশারূপ প্রলয়ে জীবজগৎ মৃতবৎ নিদ্রিত থাকে। প্রভাতে-সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সকলে চেতনা লাভ ক'রে সঞ্জীবিত হয়। সুতরাং প্রভাত-সূর্য্য সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার নিদর্শন। এই কারণে পর্ব্বতমালার পূর্ব্বদিকে ঐ দেখুন ব্রহ্ম-গিরি ও ব্রহ্মার মন্দির। মধ্যাহ্নে সূর্য্যদেব সত্ত্বরূপী বিষ্ণু। অর্থাৎ সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ ব্যতিরেকে বৃক্ষ, লতা ও ঔষধি কিছুই বর্দ্ধিত, পুষ্পিত ও ফলবান্ হয় না; জল বাষ্পে পরিণত হইয়া মেঘের সঞ্চার করে না; এবং বায়ু প্রবল হইয়া মেঘ সমূহকে নানাস্থানে পরিচালিত করে না। সুতরাং মধ্যাহ্নের সূর্য্য পালনকর্ত্তা ভগবান্ বিষ্ণুর নিদর্শন। এই কারণে, পর্ব্বতমালার ঠিক্ মধ্যস্থলে এই বিষ্ণুগিরি ও বিষ্ণুর মন্দির। সায়াহ্নে সূর্য্যদেব তমোরূপী মহেশ্বর। অন্ধকার যেরূপ সৃষ্টির সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত করে, সূর্য্যদেব অস্তগত হইলেও সেইরূপ সৃষ্টি চিহ্ন বিলুপ্তপ্রায় হয়। জীব সকল নিদ্রারূপ মৃত্যুর ক্রোড়ে লীন হ'য়ে প্রলয়ান্তকালের অপেক্ষা করে। এই কারণে সায়াহ্ন সূর্য্য ভগবান্ মহেশ্বরের নিদর্শন এবং এই পর্ব্বতমালার পশ্চিমদিকে ঐ দেখুন কৈলাস-গিরি। একই বস্তু গুণভেদে ত্রিধা বিভক্ত হইলেও, তিনই এক এবং একই তিন। এই সূর্য্যদেব আবার প্রণবেরও নিদর্শন। ইনিই ওঙ্কার স্বরূপ এবং ইহা হইতেই গায়ত্রী বা সাবিত্রী মন্ত্রের উদ্ভব। অ, উ, ম এই তিন বর্ণের সংযোগে ওঙ্কারের উৎপত্তি। ওঙ্কার উচ্চারণ কর্‌লেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়। প্রণবের একটি অব্যক্তাংশ অর্থাৎ যা অব্যক্ত নাদে মিশে যায়, সেটি ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মের ধাম। তাহা অব্যক্ত, কাজেই তাহা স্থূল চক্ষুর অগোচর। কিন্তু এই স্থানে নিস্তব্ধ হ'য়ে বসে থাক্‌লে, সেই অনাহত নাদও অনুভূত হয় এবং চিত্ত স্বতঃই যোগারূঢ় হয়। মন্দিরগুলির এই অপূর্ব্ব কল্পনা কোনও মহাপুরুষের দ্বারা যে হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

এই বলিয়া হরনাথ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিলেন। কাহারও মুখ হইতে একটিও বাক্য নিঃসৃত হইল না। সকলেরই হৃদয়ে যেন একটী দিব্য ভাবের খেলা হইতে লাগিল। সহসা হরনাথ আবার বলিতে লাগিলেন, "আমার মনে হয়, এই পর্ব্বতটি গিরিরাজ হিমাচলেরই যেন একটী ক্ষীণ অনুবৃত্তি। পবিত্র

হিমাচল দেবভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। হিমাচলের পূর্ব্বভাগের যে অংশ ব্রহ্মপুত্র নদ ও ব্রহ্মদেশের সন্নিহিত, তাহা যেন ব্রহ্মার স্থান। নেপালের নীচে গণ্ডকীর উৎপত্তি স্থল হইতে বদ্‌রিনারায়ণের ধাম পর্য্যন্ত হিমাচলের যে অংশ, তাহা যেন বিষ্ণুর ধাম। এই বদ্‌রিনারায়ণের নিকটে গঙ্গারও উৎপত্তি বটে। আর বদরিনারায়ণ হ'তে কৈলাসপর্ব্বত পর্য্যন্ত হিমাচলের যে অংশ, তাহা মহাদেবের ধাম। দেখুন, এই পর্ব্বতের উপরে বিভিন্ন দেবতাদের মন্দিরগুলিও যেন উক্ত প্রণালী অনুসারেই নির্ম্মিত হ'য়েছে!"

হরনাথের মুখে এই সমস্ত কথা শুনিয়া কালীপ্রসাদ, শৈলজা ও দুর্গারাণীর মনে বিচিত্র ভাবের উদয় হইল। বিষ্ণুর পূজা শেষ হইলে, সকলে ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হইলেন। পর্ব্বতের পাদমূলে উপনীত হইলে, তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল, তাঁহারা যেন স্বর্গধাম পরিত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সুখময় কৈলাসপুর ও বৌদিদিকে ত্যাগ করিয়া যাইতে কষ্ট হইলেও, পতিগৃহে যাইতে দুর্গারাণীর মনে অতিশয় আনন্দ হইল। কৃষ্ণপুরের বাটীতে উপনীত হইয়া দুর্গারাণী শ্বাশুড়ী মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া গৃহকর্ম্মের সুব্যবস্থা করিত। সে গৃহ, গৃহদ্বার, রোয়াক, উঠান প্রভৃতি পরিস্কৃত করিত; শয্যা আসন প্রভৃতি পরিচ্ছন্ন রাখিত, তৈজসপাত্র প্রভৃতি মাজিয়া ঘসিয়া ঝরঝরে করিত। সে শ্বাশুড়ীমাতাকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া রন্ধনশালায় নানাবিধ উপাদেয় ব্যঞ্জন এবং সকলের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিত। হরনাথের পুস্তক ও পুঁথিগুলি সে সুবিন্যস্ত করিয়া রাখিত। অপরাহ্নে সে কিছু অবসর পাইলে শ্বাশুড়ীমাতাকে রামায়ণ, মহাভারত, কিম্বা কোনও পুরাণের বাঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া শুনাইত, অথবা প্রতিবাসিনী সমবয়স্ক মহিলাদের সহিত গল্প করিত। সে একটী কাকাতুয়া ও একটী পাহাড়ে ময়না পুষিয়া তাহাদিগকে নিত্য স্বহস্তে আহার্য্য প্রদান করিত এবং তাহাদিগকে মানুষের মত কথা কহিতে শিখাইত।

এইরূপে সুখে তাহাদের দিন অতিবাহিত হইতেছিল, এমন সময়ে ক্ষেতু মাহাতো একদিন কৃষ্ণপুরে আসিয়া সংবাদ দিল যে, দুর্গারাণীর পিতার অসুখ হইয়াছে এবং তিনি তাহাকে ও জামাতাকে দেখিতে চাহিয়াছেন। পীড়া কঠিন

নহে, ইহা ক্ষেতুর মুখে শুনিলেও দুর্গারাণীর মন অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। হরনাথ দুর্গারাণীকে লইয়া যাইবার জন্য একটী গো-যান ভাড়া করিলেন; কিন্তু গো-যানে যাইতে হইলে, পলাশডাঙ্গায় পঁহুছিতে বহু বিলম্ব হইবে, ইহা ভাবিয়া দুর্গারাণী স্বামীর সহিত পদব্রজেই পার্ব্বত্য সরল পথ দিয়া যাইবার প্রস্তাব করিল। হরনাথ তাহাতে অসম্মত হইলেন না। পিতার পথ্যের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্ষেতুর হস্তে দিয়া দুর্গারাণী পরদিন প্রত্যুষেই পতির সহিত পিত্রালয় অভিমুখে যাত্রা করিল। ক্ষেতু অগ্রে অগ্রে যাইতে গাগিল; দুর্গারাণী গ্রামের বহির্ভাগে হরনাথের সহিত গল্প সল্প করিতে পথ আলোকিত করিয়া গমন করিতে লাগিল। পথিমধ্যে হরনাথের পরিচিত দুই একজন কৃষকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাহারা মস্তক নোয়াইয়া করজোড়ে তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং তাঁহার পশ্চাতে বধূঠাকুরাণীকে দেখিয়া তাঁহাকেও প্রণাম করিল। পর্ব্বতের পাদমূলে যেস্থলে হরনাথ ও শ্রীনাথবাবুর সহিত দুর্গারাণীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেই স্থলে আসিবা-মাত্র দুর্গারাণীর মনে বিচিত্র ভাবের উদয় হইতে লাগিল। দুর্গারাণী সলজ্জ বদনে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "এইখানেই আমাদের প্রথম দেখা।" হরনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "হঁা।" দুর্গারাণী মনে মনে ভাবিল, সেই একদিন,, আর আজ একদিন! পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া তাঁহারা শস্যক্ষেত্রের মধ্যে উপনীত হইল। এখন ক্ষেত্রে আর একটীও শস্য ছিল না। সমস্ত মাঠ ধূ ধূ করিতেছিল। গল্প করিতে করিতে তাহারা কখন যে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া ফেলিল, তাহা বুঝিতে পারিল না। পলাশডাঙ্গার প্রান্তরে উপনীত হইবামাত্র দুর্গারাণীর মনে কেমন একটী লজ্জা ও সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে হরনাথকে বলিল, "তুমি একটু এগিয়ে চল; আমি তোমার পেছু পেছু যাচ্ছি।" হরনাথ তাহাই করিলেন। গ্রামের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একটী পরিচিতা স্ত্রীলোককে দেখিয়া দুর্গারাণী তাহার পিতার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, "তিনি ভাল আছেন।—পথ্য করেছেন।" শুনিয়া দুর্গারাণীর মন প্রফুল্ল হইল। গ্রামের ছোট ছোট বালক বালিকারা দুর্গারাণীকে দেখিয়া রাণী দিদি এসেছে, রাণী দিদি এসেছে বলিতে বলিতে আহ্লাদে তাহার কাছে ছুটিয়া আসিল। রাণী তাহা-দিগকে মিষ্ট সম্ভাষণে তুষ্ট করিতে লাগিল। বালক বালিকাদের আনন্দের কোলাহল শুনিয়া মহিলারা গৃহ কর্ম্ম ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি গৃহের বাহির হইতে লাগিলেন। কিন্তু দেবতার ন্যায় রূপবান হরনাথকে দেখিয়া ঘোম্‌টা টানিয়া দিয়া ঘোম্‌টার আড়াল হইতে হাস্যমুখে রাণীকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। কেহ

কেহ বলিলেন "আহা জামাই তো নয়, যেন সাক্ষাৎ শিব!" কেহ কেহ বলিলেন আহা কৈলাস থেকে যেন শিবদুর্গাই আস্‌ছেন! এইরূপ কথা শুনিতে শুনিতে দুর্গারাণী গৃহের সন্নিহিত হইয়া খিড়কীর দ্বার দিয়া একেবারে অন্তঃপুরে উপস্থিত হইল। দুই একটী বালক বালিকা অগ্রেই ছুটিয়া গিয়া রাণীর মাতাকে তাহাদের আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিল। রাণীর জননী কন্যাকে দেখিয়াই আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাহার পিতা একটী লাঠির উপর ভর দিয়া উঠানে বাহির হইলেন। রাণী পিতার চিন্তাক্লিষ্ট মলিন ও শীর্ণ মুখখানি দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল এবং তাহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইল। যাদবচন্দ্র মনের আবেগ সামলাইতে না পারিয়া রাণীর চিবুক ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন মা দুর্গারাণি! দেখি মা তোর মুখ খান। তুই যে আমার সাক্ষাৎ দুর্গা রে! আমি কি তোর বাপ হবার যোগ্য। আমার মত হতভগা লোক কি আর আছে। এই বলিয়া তিনি বস্ত্র দ্বারা মুখ আবৃত করিলেন। দুর্গারাণীও বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আবৃত করিল। ইত্যবসরে ক্ষেতু মাহাতো আসিয়া উপস্থিত হইলে, যাদবচন্দ্র ঈষৎ সংযত হইয়া ক্ষেতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ক্ষেতু জামাই বাবু এসেছেন! ক্ষেতুর মুখে জামাতার আগমন বার্ত্তা অবগত হইয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে লাঠির উপর ভর দিয়া তিনি তাঁহার সাদর অভ্যর্থনার জন্য বহির্ব্বাটিতে গেলেন।

খোকা বহুদিন পরে মাসীমাকে দেখিয়া আহ্লাদে তাহার ক্রোড়ে উঠিল। সে অভিমান ভরে বলিল, "মাসীমা তুমি ভারি দুষ্টু; তুমি সেখান থেকে পাল্কী চ'ড়ে চলে গেলে। কই আমাকে তো নিয়ে গেলে না? আমি তোমার জন্য কত কাঁদ্‌লুম।"

মাসী-মা হাসিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিতে করিতে বলিলেন,—"সোণা ছেলে, লক্ষ্মী ছেলে, এবার তোমাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাব? তুমি আমার কাছে থাক্‌তে পারবে তো?"

খোকা বলিল পারবো।"

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

৩য় ভাগ। ১৩২১। মাঘ ও ফাল্গুন

যমুনা-বিহার।

(১)

গোলোকে যাঁহার নিত্য বিহার বিরজা নদীর পার
পরম করুণ অবতীর্ণ হৈয়া প্রচারিলা সুধাসার॥
ঐশ্বর্য্য-বিহীন মধুর সে রস জানাতে জগত জনে।
দুই দেহ ধরি রাধা-শ্যামরূপে প্রকট এ ব্রজ ভূমে॥
বাজাও শঙ্খ, দাও জয়ধ্বনি, উড়াও নামের পতাকারাজি।
আপনি শ্রীহরি লয়ে রাধাপ্যারী যমুনা উপরে বিহরে আজি॥

(২)

সখীগণ করে চামর ব্যজন পবন মন্দে বয়।
নিরূপম রূপ হেরিলে নয়নে জনম সফল হয়॥
বিনোদ বিলাসে বিনোদ দোলনে প্রেমে ঢল ঢল সাজ।
দুই দেহ ধরি রাধা-শ্যামরূপে প্রকট ব্রজেতে আজ॥
বাজাও শঙ্খ, দাও জয় ধ্বনি, উড়াও নামের পতাকারাজি।
আপনি শ্রীহরি লয়ে রাধা-প্যারী যমুনা উপরে বিহরে আজি॥

(৩)

যে প্রেম-কণিকায় মাধবেন্দ্রপুরী বিল্বমঙ্গল আর,
গোস্বামী মহান্ত পেলে কলিযুগে ব্রজ-সেবা অধিকার॥
যে প্রেমমূরতি হৃদয়ে উদিলে মনেতে বসে না গৃহের কাজ।
সেই প্রেমরাজ দুই দেহ ধরি যমুনা-বক্ষে বিহরে আজি॥

বাজাও শঙ্খ, দাও জয়ধ্বনি, উড়াও নামের পতাকারাজি।
আপনি শ্রীহরি লয়ে রাধাপ্যারী যমুনা উপরে বিহরে আজি॥

(৪)

একদিন যাঁর বাঁশরীর গান মৃগ পশুপক্ষী যত,
উৎকর্ণ হইয়া নীরবে শুনিত যেন বা মন্ত্রপূত।
যাঁর বেণুরবে ব্রজ-গোপীগণ যুবতী-ধরম ভুলিয়া যায়,
সে প্রেমমূরতি নাবিকের বেশে ঘাটে ঘাটে প্রেম মাগি বেড়ায়।
বাজাও শঙ্খ, দাও জয় ধ্বনি, উড়াও নামের পতাকারাজি।
আপনি শ্রীহরি লয়ে রাধাপ্যারী যমুনা উপরে বিরহে আজি॥

(৫)

প্রকৃতির পারে কোথায় সে ধাম, যেথা নাই মায়া লেশ,
এথানে ত্রিগুণ, সেথানে নির্গুণ, অতুলনীয় সে দেশ।
লঙ্ঘিয়া সে নদী অকুল-পাথার, বৈতরণী যার নাম,
আপনা ইচ্ছায় আপনা প্রকাশ অপরূপ-রূপ শ্যাম।
বাজাও শঙ্খ, দাও জয়ধ্বনি, উড়াও নামের পতাকারাজি,
আপনি শ্রীহরি লয়ে রাধাপ্যারী যমুনা উপরে বিহরে আজি॥

(৬)

গীতায় নিষ্কাম কর্ম্ম উপদেশ স্থাপন করিয়া যাঁর,
শান্তি নাহি পেয়ে ব্যাসদেব পুন ভাগবত লিখে সার।
সেই আদর্শের প্রকট মূরতি নবীন নীরদ শ্যাম,
বামে লয়ে আজ প্রেমের প্রতিমা, কেতকী চম্পকদাম।
বাজাও শঙ্খ, দাও জয়ধ্বনি, উড়াও নামের পতাকারাজি,
আপনি শ্রীহরি লয়ে রাধাপ্যারী যমুনা উপরে বিহরে আজি॥

(৭)

মোহান্ধ জীবের তমঃ ঘুচাইতে, বহির্গৌর অন্ত শ্যাম
রূপেতে আবার নদীয়া উদ্যানে ফুটিল সে আপ্তকাম।
দিবস নিশায় সমান উদয় যাঁহার রূপের ভাতি,
সেই এক আত্মা লীলার কারণ দুইরূপে মাতামাতি।
বাজাও শঙ্খ, দাও জয়ধ্বনি, উড়াও নামের পতাকারাজি।
আপনি শ্রীহরি লয়ে রাধাপ্যারী যমুনা উপরে বিহরে আজি॥

ভক্তিতত্ত্ব।

বিরাট্ পুরুষ জীব-শরীরে তিন রূপে বৃত্তির দ্বারা অনুভূত হন। প্রথম প্রকাশ প্রাণরূপে, দ্বিতীয় প্রকাশ আমাদের অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপে, এবং তাঁহার তৃতীয় প্রকাশ হৃদয়বৃত্তিরূপে। হৃদয়বৃত্তিই শেষ ও পরিণত বিকাশ। সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই বৃক্ষাদি ও কোন কীটাদির মধ্যে কেবল প্রাণই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। তার পর সৃষ্টির মধ্যস্তরে পশু পক্ষীদের মধ্যে প্রাণের বিকাশ তো আছে, তার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়বৃত্তির বিকাশ সাধন হইয়াছে। পরে সৃষ্টির তৃতীয় স্তরে মনুষ্যের মধ্যে হৃদয়বৃত্তি ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্রমে যুগের পর যুগ বহিয়া যাইতেছে—সঙ্গে সঙ্গে এই হৃদয়বৃত্তি মনুষ্যের মধ্যে এক অপরূপ পরিণতি লাভ করিতেছে। যুগে যুগে যুগাবতারগণ এই ক্রম পরিণতির যুগোপযোগী আদর্শ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, এবং মানবসমাজের মধ্যে সেই আদর্শ শিক্ষা দীক্ষা দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া যান।

মানুষের মধ্যে হৃদয়বৃত্তির বর্ত্তমান পরিণতির সূচনা কোন্ যুগ হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না,—তবে মানব-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই যে হৃদয়বৃত্তি বিকশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং ক্রমশঃই তাহা বিকাশ ও উৎকর্ষ লাভ করিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

কোন্ প্রথম প্রভাতে প্রাচীন মানবগণ আপনাদের পরস্পরের সম্বন্ধের মধ্যে একটি সত্য নিত্য জ্ঞানকে উপলব্ধি করিয়া পরস্পরের অধিকার স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, এবং আপনাদের হৃদয়মধ্যে পরমাত্মার সেই প্রথম আবির্ভাবকে বুঝিতে পারিয়া তাঁহার চরণ-প্রান্তে আপনাদের ভক্তি-অর্ঘ্যকে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন—যদিও তাহা নির্ণয় করা কঠিন—তথাপি সেই দিন অতীত ইতিহাসের মধ্যে যে একটী উজ্জ্বল পৃষ্ঠা, সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥

কোন্ সুদূর অতীত কালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা, "কাহার ইঙ্গিতে এই মন বিষয়ে নিপতিত হইতেছে, কাহার প্রেরণায় এই প্রাণ নিযুক্ত হইয়া কার্য্য

করিতেছে, কে এই জনসমূহকে বাক্য বলিতে নিয়ন্ত্রিত করিল এবং কেই বা এই চক্ষু কর্ণকে স্ব স্ব ব্যাপারে পরিচালিত করিতেছে ?"—প্রভৃতি বলিয়া সেই অনাদি কর্ত্তা পরমাত্মাকে জানিবার জন্য যে এক অনির্ব্বচনীয় ব্যথা প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে জানিবার জন্য আকুল আগ্রহে আপনাদের সমস্ত বিরহ বেদনাকে স্পষ্ট করিয়া সরল অন্তঃকরণে ব্যক্ত করিয়া এই ভারতের আকাশ বায়ু ও সলিলকে আন্দোলিত ও ক্ষুভিত করিয়াছিলেন—আজিও তাঁহাদের সেই করুণ-গাথা আমাদের মর্ম্মে মর্ম্মে হৃদয়ে হৃদয়ে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে।

"ন চেদিহাবেদীন্মহতি বিনষ্টিঃ"—তাঁহাকে এখানে না জানিতে পারিলে মহাবিনাশ অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া, ভয়-ব্যাকুল অন্তরে যাঁহারা পর্ব্বতে পর্ব্বতে অরণ্যে গিরিগুহায় নদী-তটে, সেই পরম সত্যকে জানিবার জন্য চিত্ত স্থির করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, এবং এই বিশ্ব প্রভৃতির মধ্যে অবশেষে তাঁহার সাড়া পাইয়া এক দিন আনন্দে বলিয়া উঠিয়াছিলেন "ওঁ যো দেব অগ্নৌ যো অপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ যো ওষধীষু বনস্পতিষু অস্মৈ দেবায় নমঃ," তাঁহাদের প্রণত চিত্তের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের মর্ম্মকথা যেন স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

বিশ্ব-প্রকৃতির বিরাট্ ইঙ্গিতে বিস্মিত হইয়া শিশু-মানব প্রথম প্রথম মুগ্ধ হইতেন, ভীত হইতেন, কখন কখন আনন্দিত হইতেন; কিন্তু তখনও সেই বিরাট্-ব্রহ্মের মধ্যে তাঁহারা স্থির আশ্রয় লাভ করিতে পারেন নাই; সুতরাং তাঁহারা ইহাতে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। ব্রহ্মের সহিত আমাদের যে কত নিবিড়তর ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা তখন তাঁহারা বুঝিতে না পারিয়া ভয়ে মোহে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে চাহিতেন,—তাঁহার তুষ্টির জন্য বলি সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিতে চাহিতেন, এবং দৃশ্যমান সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি ও জলে সেই পরম দেবতাকে দেখিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে স্তোত্র রচনা করিতেন। অবশেষে এক শুভ্র-প্রভাতে কোন কোন ভাগ্যবান্ পুরুষ বহু তপস্যার ফলে তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া বলিয়া ফেলিলেন "তোমরা কাহাকে পূজা করিতেছ? তিনি যে আমারি মধ্যে"———

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যৎ বাচো হি বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ চক্ষুষঃ চক্ষুঃ"—এইরূপে তাঁহাকে জানিতে হইবে—আপনার অন্তরের গভীরতম প্রদেশের মধ্যে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে; তবেই সেই অমৃত পুরুষের জ্ঞান আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ হইবে।

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যং ।
অন্তঃ শরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥—মুণ্ডক

এইরূপে ক্ষীণপাপ হইয়া, ব্রহ্মচর্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, তাঁহারা আপনার অন্তঃকরণে পরমাত্মার বরণীয়রূপ দেখিয়া আশ্বস্ত হইতেন, তখন তাঁহাদের নিকট পরমাত্মা আনন্দরূপে অমৃতরূপে অনুভূত হইতেন।

"তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥"

প্রবন্ধের এই অংশ পাঠ করিয়া কেহ যেন অনুমান না করেন আমি বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়দিগের মন্তব্য হইতে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি, বা ইহা ঠিক প্রাচীন মতগুলির অনুকূল চিন্তা-প্রসূত নহে। আমাদের শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে আমি আমার এই ক্ষুদ্র বুদ্ধির সাহায্যে যাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। শাস্ত্রানুকূল যে মত নহে আমি তাহা স্বয়ং গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি।

সৃষ্টির আদি কেহ অনুমান করিতে পারেন না—এই জন্য সৃষ্টিকে অনাদি বলিয়া মান্য করা হয়। তবে বুঝিবার সুবিধার জন্য এক একটি মহাপ্রলয়ের পর যে সৃষ্টি-ক্রিয়া চলিতে থাকে, তাহাকেই সাধারণতঃ আদি সৃষ্টি বলিয়া ধরা হয়। আমাদের শাস্ত্রেও ক্রমোন্নতি আছে;—কিন্তু ঠিক পাশ্চাত্য ক্রমোন্নতিবাদ যে ধরণের, সেরূপ ক্রমোন্নতি আমাদের মধ্যে স্বীকৃত হয় না। সেই জন্য আদি সৃষ্টিতে প্রথমে স্থাবর—তৎপরে কীটাদি, পরে পক্ষী, পশু এবং তৎপশ্চাৎ মানবের যে সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ঠিক মানিতে পারি না। ব্রহ্মা যখন প্রথম মনোময় জগৎ সৃষ্টি করেন এবং স্বায়ম্ভুবাদি মনু, এবং প্রচেতাদি পিতৃগণকে কল্পনা করেন—তখন এই ত্রিলোকস্থ যাবতীয় পদার্থ ও জীবাদির এক সঙ্গেই সৃষ্টি হয়—তার পর এক একটি আদি পিতৃদেবকে শক্তিসমন্বিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্তরের সৃষ্টিকার্য্যের ভার তাঁহাদিগকে অর্পণ করেন। তাঁহাদের কাজ অনেকটা বাগানের মালীর কাজের মতন। আদিস্রষ্টা বীজ সংগ্রহ করিয়াছিলেন—তৎপরে এই পিতৃলোকদিগের হস্তে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিদর্শনের ভার দিয়াছিলেন; তাঁহারা ইহার ক্রমশঃ উন্নতিসাধনে সদা তৎপর ছিলেন। এই সময় দৈবশক্তি-সম্পন্ন কতকগুলি ঋষি সমুৎপন্ন হ'ন। তাঁহাদের হস্তেই

ত্রিলোকের যাবতীয় বিদ্যা ও জ্ঞানের ভার অর্পিত হয়। তাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানী, এবং আপ্ত; তাঁহারাই বেদকে প্রকাশ করেন। পরবর্ত্তী ঋষিরাও আপ্ত ছিলেন; কিন্তু ইঁহাদিগের মত অনাদিসিদ্ধ জ্ঞানী নহেন, পরবর্ত্তী তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া আপ্ত হইয়াছিলেন, এবং মনুষ্যের ভাষায় এই পরমার্থ ও লৌকিক জ্ঞানকে জগৎ মধ্যে প্রচারিত করেন। ইঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা ও স্থূল শরীর সম্পন্ন। অগ্রবর্ত্তী ঋষিদের এ স্থূল দেহ নাই;—তাঁহাদের দেহ সূক্ষ্ম, তেজোময়; ইঁহারা দেবতাদিগেরও পূজনীয়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে যেমন বানর, তৎপরে অসভ্য আদিম মনুষ্য, এবং সেই অসভ্য মানবমণ্ডলী ক্রমশঃ জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে এই বর্ত্তমান উন্নতির সীমায় দাঁড়াইয়াছে। আমরা এ কথা বিশ্বাস করি না। আমাদের বিশ্বাস আদি মানবেরা পূর্ণ-বিজ্ঞানবান্ ও ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন। তৎপরে পৃথিবীর বয়স যত বাড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মানবেরা স্থূলের প্রতি অধিকতর আসক্ত হওয়ায়—তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে। এইরূপে স্থূল বাসনা যত বাড়িতে চলিয়াছে—ততই তাহাদের প্রকৃতির মধ্যে অধ্যাত্ম ভাব মুদিত হইয়া গিয়াছে,—শেষে এমন দাঁড়াইয়াছে যে স্থূলকে ভেদ করিয়া তাহার বুদ্ধি সূক্ষ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না। এখন সূক্ষ্মকে স্পর্শ করিতে গেলে বহু সাধ্যসাধনার প্রয়োজন,—নচেৎ তাহা কোন মতেই আয়ত্ত করা যায় না। এই সকল মানবমণ্ডলীর দুর্দ্দশা দেখিয়াই ঋষিরা জ্ঞানসমূহকে সঙ্কলন করিয়াছিলেন; নচেৎ প্রথম প্রথম এরূপ লিপিবদ্ধ গ্রন্থাদির কোন আবশ্যকতাই ছিল না। বাধা-হীন স্বতঃপরিস্ফুট জ্ঞান—জ্ঞানী ঋষিদিগের সকলেরই আয়ত্ত ছিল। তার পর কল্প-কল্পান্ত চলিয়া গিয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে মানবের জ্ঞান সহস্র দিক্ হইতে প্রতিহত হইয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই ভ্রম নষ্ট করিবার জন্য প্রতি যুগের শেষে শেষে যুগান্তরে, সিদ্ধ ঋষিরা যুগোপযোগী ভাবে পুরাণ সত্যের প্রকাশ করেন।

ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্ম মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, বিষয়ের সহিত চিত্তের অনাবশ্যক অতিরিক্ত আসক্তি হওয়ায়—অন্য বৃত্তিগুলি ফুটি ফুটি করিয়াও ফুটিতে পারে না। এ সব গুলি ধার করা জিনিষ নহে।

প্রথমে ঋষিরা পরমাত্মাকে পিতা, বন্ধু, জনিতা, বিধাতা বলিয়া জানিতেন; তখন আর ভয়ে বিস্ময়ে নহে প্রীতি দ্বারা প্রেমের দ্বারা সেই অব্যক্ত বিরাট্‌কে তাঁহারা উপাসনা করিতেন। সুতরাং ভক্তির মূল ব্যাপারগুলি উপনিষদের

ঋষিরা এইরূপে উপলব্ধি করিয়া জনসমাজে জিজ্ঞাসু শিষ্যদিগের নিকট এইরূপে প্রচার করিতে লাগিলেন ;—

"শ্রেয়ো পুত্রাৎ শ্রেয়ো বিত্তাৎ" পুত্র হইতে ও বিত্ত হইতে শ্রেয়—এ কথাও শিষ্যদিগকে তাঁহারা বুঝাইলেন। ক্রমে তাঁহারা আরও বুঝিলেন যে পরমাত্মা কেবল প্রিয়তর নহেন—তিনি প্রেমময় প্রেমস্বরূপ, প্রেমের দ্বারাই তিনি লভ্য।' তাই ভক্তি-জগতের আদিগুরু ভক্তির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিলেন—

সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা ॥ নারদ-সূত্র

যদিও ভগবান্‌কে সম্পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় না, যদিও তাঁহাকে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা অসম্ভব। তথাপি সেই নিকটতর অথচ অজ্ঞাত পুরুষের প্রীতিসাধন এবং তাঁহাকে একান্ত ভালবাসাই মনুষ্যজীবনের একতম লক্ষ্য। শুধু তাহাই নহে, রৌদ্রদগ্ধ সংসার-মরুভূমিতে, তিনিই একমাত্র জুড়াইবার স্থান।

ভয়ে হ'ক শ্রদ্ধায় হ'ক যখনি আমরা আপনাকে ভুলিয়া তাঁহার দিকে কাতর দৃষ্টিপাত করিয়াছি, তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছি,—তখনি সেই ব্যাকুলতা ভক্তিরূপে আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছে।

এই ভক্তি হইতে কেহই বঞ্চিত হয় নাই। সকলের হৃদয়েই এই ভক্তি কিছু না কিছু পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। স্নেহ ভালবাসা ও ভক্তি এ তিনটী একই পদার্থ, স্থানভেদে উপাধিভেদ মাত্র; নচেৎ স্বরূপতঃ ইহারা পৃথক্ বৃত্তি নহে। স্নেহ ও ভালবাসা তখনি ভক্তিরূপে পরিণত হয়, যখন তাহা সংসারকে অতিক্রম করিয়া ভগবৎ-চরণচুম্বনে আপনাকে সার্থক করিয়া তুলে। আমাদের যতগুলি বৃত্তি আছে, সকলই ভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হয়। আমাদের মধ্যে এমন একজনও নাই যিনি কাহাকেও ভালবাসেন নাই। যে শিশু সেদিন মাত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেও তাহার জননীর পানে আকুলনয়নে চাহিয়া থাকে; শিশু এই আগ্রহ দৃষ্টি কোথা হইতে পাইল? তাহার এ প্রাণের ব্যাকুলতা, নিবিড় নিঃসংশয়তা কোথা হইতে আসিল? তাই বলিতেছিলাম, এই ভালবাসা সকলেরই সহজাত সংস্কার। শিশু জননীকে ভালবাসিতে পারে বলিয়াই, সে যেমন নিবিড় ভাবে জননীতে আশ্রয় পায়, তদ্রূপ আমরাও ভগবানেতে নিবিড়ভাবে আশ্রয় পাইব যখন আমরা তাঁহাকে সরল শিশুর মত ভালবাসিতে পারিব। শিশু অল্প দিন সংসারে আসিয়াছে; সে সংসারের সমস্ত ব্যাপার হইতে ভীত হয়—কুণ্ঠিত

হয় ; কিন্তু সে জননীকে আঁকড়িয়া থাকে কেন ? এই যে অজ্ঞাত প্রীতির ভাব, এই যে বিশ্বাস, ইহাই বিকশিত হইতে হইতে ভক্তি ও প্রেমে পরিণত হয়। ভালবাসা কোথাও কিনিতে হয় না, ভালবাসা আমাদের জীবনের সহচর ; এই ভালবাসাই আমাদের সংসার-পথের একমাত্র সম্বল। ভগবান্ নিঃসম্বলে, নিতান্ত অসহায় অবস্থায় আমাদের এজগতে পাঠান নাই।

তিনি আমাদের সঙ্গেই এই মূল্যবান্ বৃত্তিটীকে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই মূলধন লইয়া' যিনি জগতের মাঝে কারবার চালাইয়া ধনী হন, তাঁহার গৌরবে পৃথিবী পরিপূর্ণ ও পবিত্র হয় এবং কবিগণ তাঁহার যশোগাথা গাহিয়া কৃতার্থ হন। ইহাই Bible এর Talent এর কাহিনী।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনেক কৃত্রিমতা শিক্ষা করি ; ইহাতেই আমাদের 'সহজ ভক্তি' ভাবটী বাড়িয়া উঠিতে পারে না। সংসারের মধ্যে আমাদের আচার ব্যবহার সংস্কার, আমাদের সহজ প্রকৃতিটীকে ক্রমশঃই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তখন জীবন-পথের সেই একমাত্র সম্বলটীর স্বরূপ আর আমরা ঠাহরাইয়া উঠিতে পারি না। সংসারের বিবিধ আড়ম্বর আয়োজনের মধ্যে আমাদের চিরসঙ্গিনীর কথা যখন বিস্মৃত হইয়া পড়ি, 'ইহা যে অন্ন জলের মত নিত্য প্রয়োজন' বিস্মৃতির বশে যখন আমরা এই সহজ সত্যটীকে ভুলিয়া গিয়া, কতকগুলি শুষ্ক অনুষ্ঠান ও কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলি, তখনি আমাদের চতুষ্পার্শ্বে বিবিধ বিরোধগুলি ক্রমশঃই বড় হইতে থাকে। সংসারই তখন আমাদের কাছে বড় হইয়া উঠে, এবং যাহার করুণার অমৃতধারা আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই অমৃতময় পুরুষই উহ্য হইয়া যান। এইরূপে যখন মানব-সমাজের মধ্যে স্বার্থের বিপুল অবয়ব ক্রমশঃ স্ফীত হইতে থাকে, তখনি সংসার তামসিক অন্ধকারে Spiritual darkness আচ্ছন্ন হইয়া যায়। আমাদের জীবনের লক্ষ্য, —গন্তব্য পথ কিছুই ঠিক থাকে না ;—জীবাত্মা ভিতর হইতে হাহাকার করিয়া উঠেন ; আমরা নিজেরাই বুঝিতে পারি না যে আমাদের প্রাণ কি চাহিতেছে।

ধন সম্পদ্ বিলাস ভোগ তাহার সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হয়। সে অব্যক্ত আবেগে সেই সকল গিয়া আঁকড়িয়া ধরে ; এবং তাহার ভিতর তাহার ক্ষুধার অন্ন পিপাসার জল আছে কিনা দেখিয়া লয়। একে একে সেই সকলকে পরীক্ষা করিয়া দেখে, এবং পরিশেষে তাহা ফেলিয়া দিয়া কাঁদিয়া উঠে ;—তাহার মধ্যে সে তাহার বাঞ্ছিতকে পায় না।

কিছু পাওয়ার জন্য এই যে আগ্রহ ব্যাকুলতা ইহাই সমস্ত জীবনকে সবেগে আবার পরমেশ্বরের পানে টানিয়া আনে। এই আকর্ষণকে যখন আমরা জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করি, তখনি আমাদের ভাব প্রগাঢ় হইয়া উঠে, শ্রদ্ধা প্রীতিতে প্রাণ ভরিয়া যায়; তখনি আত্মার মধ্যে পরমাত্মার আলোক ফুটিয়া উঠে,—বেদনার ঝটিকা ও অবিশ্বাসের মেঘ বিদূরিত হইয়া যায়; আবার হৃদয়াকাশে আত্মার সুবিমল কিরণজ্যোতি ফুটিয়া উঠে।

যখন তামসিক অন্ধকার দেশ বিশেষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তখন তদ্দেশবাসীদের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। সকল প্রকার দীনতা, নিশ্চেষ্টতা ও কৃপণতা বিকট মুখ ব্যাদান করিয়া সত্য ধর্ম্ম ও বিশ্বাস,—বলকে গ্রাস করিয়া ফেলে। কপটাচার ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার পৈশাচিক তাণ্ডবে তখন দেশ টলমল করিতে থাকে। অধর্ম্মে ধর্ম্মবোধ, পীড়া দুর্ভিক্ষ, অনাচার, অত্যাচার মানব-সমাজের গন্তব্যপথকে অবরুদ্ধ করিয়া তুলে, পরম লক্ষ্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। মানবের অন্তঃকরণ তখন পরিত্রাণের জন্য লালায়িত হইয়া উঠে—এই সময় করুণা-নিধান ভগবানন্ "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ হন। এই পৃথিবী যুগে যুগে কতবার সেই পাপিত্রাণ পরায়ণ, দীন-বৎসল ভক্ত-অবতার ও যুগাবতারগণের পদধূলিতে পবিত্র হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে শরীর মন পুলকিত হইয়া উঠে। পৃথিবীতে কত ধর্ম্ম কত সম্প্রদায়ই আছে,—তাহাদের প্রত্যেকের অনুষ্ঠানের মধ্যে কত প্রভেদ। তবু, সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে, সর্ব্ব আত্মায় সেই বিশ্বাত্মা প্রেমময়ের সদাভিলাষ সমস্ত বিশ্বের অন্তঃকরণকে আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছে। ভগবান্ কাহাকেও যে ত্যাগ করেন নাই, কোন দেশকেই বর্জ্জন করেন নাই,—তাহা বিভিন্ন দেশের মধ্যে একই ভাবাপন্ন ভক্তগণের আবির্ভাবেই প্রমাণিত।

বৈদিক যুগে ভক্তির বিকাশ

বেদে যে ভক্তির কথা আছে, তাহা আমি আগেই বলিয়া আসিয়াছি। বেদ বিবিধ গাথায় ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন করিয়াছেন। অটল বিশ্বাসে পিতামহগণ পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভে কৃতার্থ হইয়া "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্" বলিয়া গাহিয়া উঠিতেন; সরল শিশুর মত তাঁহাদের বিশ্বাস। পরমাত্মার প্রতি সে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও ভালবাসা পৃথিবীর সমগ্র সুধী-সমাজকে আজও বিস্ময়াভিভূত করিতেছে। তবে আধুনিক বৈষ্ণব-সমাজের মত তখন কোন ভক্ত-সম্প্রদায় গঠিত হয় নাই। ভক্তিশাস্ত্র

বলিয়া তখন কোন পৃথক্ শাস্ত্রও ছিল না। প্রাচীনদিগের মধ্যে শাণ্ডিল্য ঋষিই প্রথম ভক্তি-সূত্র প্রণয়ন করেন; ইহাতেও কিন্তু 'প্রাণ মাতানো' গোচের ভক্তির যেন অভাব আছে। শাণ্ডিল্য সূত্রে ভক্তিটি কেবল দার্শনিক তত্ত্বে মাত্র দাঁড় করানো হইয়াছে। কিন্তু ভক্তিকে শুধু তত্ত্বের হিসাবে দেখিলে তো চলিবে না। ভক্তির ক্রম-বিকাশ পুরাণের মধ্যেই সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। প্রথমে মহাভারতে গীতায়, পরে বিষ্ণুপুরাণে ও ভাগবতে এই ভক্তিতত্ত্ব সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর মূর্ত্তিতে সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। দর্শনে ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও অরূপ অব্যক্ত সত্ত্বার বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে তাঁহার চিন্ময় মূর্ত্তির ও মাধুর্য্যের কোন স্থান নাই। দর্শনে ব্রহ্মের অরূপ সত্ত্বায় মন প্রাণকে নিঃশেষে নিমজ্জিত করিতে পারিলেই, এই সৃষ্টি কি কি উপাদানে গঠিত তাহা জানিতে পারিলেই এবং ইহার মায়া-নাট্য-যবনিকা উন্মোচন করিয়া দিতে পারিলেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হইল। অবশ্য ইহাতে ব্রহ্মের অস্তিত্ব অপূর্ব্ব তর্কে মীমাংসিত হইয়াছে বটে; কিন্তু সেখানেও ভগবানকে আমাদের হইতে বহু দূরে রাখা হইয়াছে। ভগবান্ যে কি নিবিড় অন্তরতর হৃদয়রাজ্যের সমাদৃত অধীশ্বর, অন্তরের অন্তরতম, সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম 'নিজ জন', তাহা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে তেমন করিয়া আলোচিত হয় নাই। বোধ হয় দর্শনে সেরূপ আলোচনা করার সুবিধাও নাই। পুরাণ ভগবানকে নির্ব্বিকার নিরঞ্জন সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড পরমাত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়াও, তিনি কেবলই যে তাহাই, —শুদ্ধ জ্যোতির্ম্মাত্র নির্ব্বিকল্প সমাধিলভ্য ধন, একথা বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই। পুরাণকর্ত্তারা বলিয়াছেন এই যে বিরাট্ পরমাত্মা প্রয়োজন হইলে এই পৃথিবীতে আমাদের মত বেশে, আমাদের মত হইয়া, আমাদের কাজে উপস্থিত হন। তিনি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করেন; তিনি যুগে যুগে ভূভার হরণের জন্য অবতীর্ণ হইয়া জগতের জীবগণকে কৃতার্থ করেন। পুরাণের মধ্যে ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে এবং মহাভারতেও ভক্তির মূর্ত্তি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখানে ভগবান্ কেবল সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার কার্য্য করিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন। তিনি এখানে পুত্ররূপে, পিতারূপে, গুরুরূপে, পতিরূপে, প্রণয়িরূপে ভক্তের নিকট আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। পৌরাণিক ভক্তদিগের মধ্যে ভগবান্ 'ঘরের মানুষের' মত হইয়াগিয়াছেন,—অন্ন জলের মত নিত্য ব্যবহার্য্য হইয়া উঠিয়াছেন। এখানে তাঁহারা ভগবানকে নিজ জন জানিয়া নিশ্চিন্ত। বেদের সে "রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং" ইত্যাদি সব প্রার্থনা আর নাই। এখানে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের খুব মাখামাখি

ভাব,—যেন ভগবান্ ও ভক্ত দুই-ই মানুষ। তাই বিরহ-বেদনাতে কাতর ভক্তের মুখে এখানে শুনিতে পাই "হে দয়িত ! তুমি পুরুষ, তোমার শক্তি অধিক ; তাই বাহু ছাড়াইয়া চলিয়া গেলে। কিন্তু তুমি আমার মনোমন্দির হইতে চলিয়া যাও দেখি ; 'পৌরুষং গণয়ামি তে', তবে তোমার পৌরুষ বুঝিব।" ভগবানকে লইয়া এত মাখামাখি, এত অভিমান, এত স্পর্দ্ধা, একি সাধারণ প্রেমের কথা ! পুরাণে ভগবানকেও বলিতে শুনি,—

'ন চ তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।'

এখানে মানুষের মতন ভক্তের উপর ভগবান্ অভিমান করিয়া থাকেন ; ও ভক্তের প্রদত্ত ফল পুষ্প সমাদরে গ্রহণ করেন। স্নেহময়ী জননীর মতন তিনি ভক্তদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন-বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করেন ; এবং তাঁহার কোমল করুণার্দ্র হৃদয় ভক্তের বিরুদ্ধে কোন রূঢ় কথা শুনিলে কাঁদিয়া উঠে। তখন মা যেমন শিশুর অপরাধ আপনার স্কন্ধে চাপাইয়া ল'ন, তিনিও ভক্তের কোন ত্রুটী এবং তজ্জনিত দণ্ড আসন্ন দেখিয়া ভয় স্নেহ বিজড়িত স্বরে বলিয়া উঠেন,—

'কার প্রাণ নাশ করবি রে ভাই ?
শোন মিতার আমার কোন অপরাধ নাই।
সে যে প্রেমে 'ওরে হ্যাঁরে', সে করে আমারে,
আমি তারে বড় ভালবাসি ভাই।'

অবশ্য আমি জানি না ইহা ধর্ম্মানুষ্ঠানের বা ভগবদ্ভক্তির উচ্চাঙ্গ বলিয়া গণ্য হইতে পারে কিনা ; তবে ইহা নিশ্চয় জানি ভগবানকে 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্' বলিয়া যখন ভাবি এবং তিনি 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং' হইয়া যখন ভক্তের প্রাণ বিকম্পিত করিয়া তুলেন, তাহাপেক্ষা তাঁহার কমনীয়তা আরও শত গুণে বাড়িয়া উঠে। যখন তিনি ভক্তকে বলেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

সেই জন্যই পৌরাণিক ভক্তি, দার্শনিক জ্ঞানতত্ত্ব অপেক্ষা, ভারতের সর্ব্বত্র সুবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ এখানে কেবল জ্ঞানে বা যুক্তির মধ্যে ভগবান্ স্থাপিত ন'ন ; তিনি আমাদের চিরকালের সখা দয়িত রূপে নিত্য বিরাজিত। আমরা যত বড়ই দার্শনিক বা জ্ঞানী হই না কেন, পিতার পুত্রের

প্রতি অগাধ স্নেহ, জননীর সন্তানের জন্য বুকফাটা ভালবাসা ভ্রাতা ভগ্নীর পরস্পরের প্রতি সে স্বর্গীয় অনুরাগ, ভৃত্যের প্রভুর প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা, এবং স্বামী স্ত্রীর মধুর সম্মিলন, আমাদিগকে স্বতঃই বিমুগ্ধ করে। এক অনির্ব্বচনীয় সুখস্পর্শে প্রাণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। এই ভাবগুলি কোথাও ধার করিতে হয় না; ইহারা মনুষ্য-হৃদয়ে স্বতঃই প্রস্ফুটিত হইয়া উক্ত কোন যুক্তি তর্কের অপেক্ষা রাখে না। কারণ যুক্তি তর্ককে ছাড়াইয়া উঠিতে না পারিলেও এই সহজ ভাবগুলি বিকশিত হইতে পারে না। কুতর্ক কুযুক্তির প্রলয়-বহ্নি-ধূমে এই কুসুম-সুকোমল মিলনমাধুরীর অপূর্ব্ব সুষমা বিনষ্ট হইয়া যায়। ভক্তেরা যখন ভগবানের সহিত এই সকল প্রেম প্রীতির সম্বন্ধগুলি গভীর ও সত্য ভাবে পাতাইয়া তোলেন, তখন তাহার শোভা আর ধরে না; মাধুর্য্য-রসে জীবন প্রাণ মধুময় হইয়া উঠে। তখনি ভক্তের নিকট এই নীলাকাশ, এই ধরণীধূলি, এই তরু-লতা-পুষ্প-শোভিত কানন, নদনদী, গিরিশ্রেণী, বিহগ কাকলী, কলকলতান সমস্তই অপরূপ সুষমায় ভরিয়া উঠে। তখন বাস্তবিকই "মধু বাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সৈন্ধবঃ",—সর্ব্বত্রই মধু, সর্ব্বত্রই প্রেমানন্দ। এই জন্যই পৌরাণিক ভক্তদিগের স্থান, ভক্তি শাস্ত্রে খুব উচ্চে।

প্রথমে মানব-প্রকৃতি স্বার্থ-সম্বন্ধে জড়িত হইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়;—যখন দেখে রোগ শোক দুঃখ মৃত্যু ব্যসন হইতে পরিত্রাণের কোন উপায় নাই, দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ ব্যাধির কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের সমস্ত উপায় ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। তখন মানব-শক্তির অতীত কোন অতীন্দ্রিয় সর্ব্বশক্তিমানের কৃপার উপর নির্ভর করিতে প্রাণ আপনা হইতে আকুল হইয়া উঠে। তখন সে বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় অথবা কোন সাংসারিক লাভের আশায়, তাঁহার শরণ গ্রহণ করে। সেই জন্য ভক্তি প্রথম অবস্থায় সকাম, তার পর ভক্তি পরিপক্ক হইলে, তাহা নির্ম্মল নিষ্কাম ভক্তিতে পরিণত হয়। কিন্তু সকাম ভক্তও ভক্তিহীন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ সে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছে। ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

ভক্তির স্তর

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

এখানে অর্থার্থী এবং আর্ত্ত ভক্তও সুকৃতিশালী বলিয়া গণ্য হয়। ভক্তির প্রথম যুগে সকাম ভক্তিই প্রবল ছিল। সকাম ভক্তদিগের মধ্যে ধ্রুবের নামই পুরাণে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে। তিনি সকাম ভাবে ভগবানের উপাসনা

করিয়াও সিদ্ধি লাভ করিয়া নিষ্কাম ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। পিতার নিকট অবমানিত ও বিমাতা কর্তৃক গঞ্জিত হইয়া, ধ্রুব অভিমানে জর্জ্জরিত হইয়া মনে মনে সেই দিন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"ইচ্ছামি তদহং স্থানং যন্ন প্রাপ পিতা মম।" অভিমান-কাতর রোরুদ্যমান ধ্রুবকে তাঁহার মাতা সুনীতি তাঁহার অপমানের কথা শুনিয়া বলিলেন,"বৎস পরের অপরাধ মনে লইবে না। যে অন্যকে দুঃখ দেয় সে সেই দুঃখ নিজে ভোগ করে 'মামঙ্গলং তাত পরেষু মংস্থা, ভুঙ্‌ক্তে জনো যৎ পরং দুঃখদস্তৎ'। তবে তুমি যদি নিতান্তই বিমাতার বাক্যে কষ্ট পাইয়া থাক, তবে তুমি পুরুষার্থ অবলম্বন করিয়া নারায়ণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হও—

"নান্যং ততঃ পদ্ম পলাশ লোচনা-
দ্দুঃখ চ্ছিদস্তে মৃগয়ামি কঞ্চন।
যো মৃগ্যতে হস্ত গৃহীত পদ্ময়া
প্রিয়েতরে রঙ্গ বিমৃগ্যমানয়া"।

'সেই পদ্মপলাশলোচন ভিন্ন তোমার দুঃখ হরণ করিবার আর কাহাকেও দেখিনা; পদ্মরূপ দীপ হস্তে লইয়া লক্ষ্মী এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহার অন্বেষণ করেন'। শুভক্ষণে জননীর এই উপদেশ বাক্য শুনিয়া ধ্রুব গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। ধ্রুব তখন নিতান্ত শিশু, কিছুই বোঝে না, ভজন সাধনের ধার ধারে না। তথাপি যাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে এই অপমানের প্রতিশোধ হইতে পারে তাঁহার নিকট না গিয়া ধ্রুব থাকিতে পারিল না। বাসনার তীব্র জ্বালাময় আবেগ তাহাকে কিছুতেই থাকিতে দিল না। 'কোথায় ভগবান্' 'কিরূপে তাঁহাকে পাওয়া যায়' এসব বৃত্তান্ত জানিয়া লইবার অপেক্ষা না করিয়াও 'পদ্মপলাশলোচন কোথা তুমি' বলিয়া ধ্রুব ঘরের বাহির হইয়া পড়িলেন। ধ্রুব সকাম আর্ত্ত এবং অর্থার্থী; কিন্তু তথাপি তিনি অনন্যমনা। খ্রীষ্ট বলিয়াছেন, 'ask it shall be given;' ধ্রুব সরল অন্তঃকরণে তীব্র আবেগে যেমনি তাঁহাকে প্রার্থনা করিলেন, অমনি তাহাকে জ্ঞান উপদেশ দান করিবার জন্য জগদ্‌গুরু করুণাময় নারদ উপস্থিত হইয়া দীক্ষা দান করিলেন। ভক্তিশাস্ত্রে গুরু-বাদের খুব প্রভাব। গুরু ভিন্ন কিছু হইবার নহে। অবশ্য পরোক্ষ-ভাবে এ কথা সকল দেশেই স্বীকৃত হইয়াছে। গুরু আসিয়া ধ্রুবের হৃদয়-গ্রন্থি ছেদ করিবার উপদেশ দিলেন। ধ্রুবও তখন সাহসে বুক বাঁধিয়া 'নমো ভগবতে বাসুদেবায়' এই মন্ত্র দ্বারা ভগবানকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। কঠোর তপস্যায় তাঁহার শরীর ক্ষীণ হইয়া

গেল, কণ্ঠাগত প্রাণ; তথাপি ধ্রুব তপস্যা হইতে বিরত হইবার পাত্র নহেন। কত মায়া, কত ভয় বিভীষিকা আসিয়া তাঁহার তপোভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তপস্যায় ধ্রুব অটল অচল। "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন" ধ্রুবের এই মূলমন্ত্র। তিনি একে একে বহির্জগৎ হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া একাগ্রমনে হৃদয়মধ্যে ভগবান্ বাসুদেবকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপস্যার প্রভাবে দেবতারা পর্য্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। তখন ভগবান্ আর থাকিতে পারিলেন না। প্রথমে অন্তরে সমুদিত হইলেন; ধ্রুব বিভোর হইল, তাহার আর বাহ্যজ্ঞান রহিল না। তখন ভগবান্ ধ্রুবের বহির্দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আপনার রূপ সংহৃত করিলেন। ভয়-ব্যাকুল অন্তরে ধ্রুব বাহিরের দিকে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, অন্তরে যে রূপে তাঁহার মন ডুবিয়া গিয়াছিল, বাহিরেও সেইরূপ; দেখিয়া ধ্রুব আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। ভগবান্ স্বয়ং পূর্ণ; তাঁহাকে দেখিলে সমস্ত আশা মিটিয়া যায়; তাঁহাকে দেখিলে কি আর বাসনার কল্মষ মনকে কলঙ্কিত করিতে পারে না, তখন আর কিছুরই অভাব থাকে ?— 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ' সুতরাং পূর্ণস্বরূপ ভগবানকে পাইয়া, তিনি যাহা মনে করিয়া তপস্যারম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা বিস্মৃত হইয়া গেলেন; অথবা তাহা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইল। বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ কিন্তু তাহা ভুলিলেন না। তিনি ধ্রুবকে অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া শেষে বলিলেন "তুমি বর লও। তুমি যে বলিয়াছিলে" ইচ্ছামি তদহং স্থানং যন্ন প্রাপ পিতা মম। 'আমি তোমার সেই বাসনা আজ পূর্ণ করিব।' পূর্ণ ধ্রুব তখন সাক্ষাৎ ভগবানকে দেখিতেছেন, তাঁহার কি আর সোনা রূপায় বা রাজ্য ভোগাদিতে মন আছে; তিনি কাঁদিয়া বলিলেন—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং, ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব মুনীন্দ্রগুহ্যং।
কাচান্ বিচন্বনাপদিব্যরত্নং, নাথ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

ভগবানকে পাইয়া ধ্রুবের বিষয়-ভোগ-বাসনাকে তুচ্ছ বোধ হইল। এই গেল ভক্তির প্রথম স্তর; এবং ধ্রুবতেই তাহার পূর্ণ বিকাশ। ভগবানকে সকাম ভাবে ভজনা করিলেও, ভগবান্ই ভক্তকে নিষ্কাম করিয়া দেন।

ভক্তির দ্বিতীয়স্তর নিষ্কাম ভক্তি; ইহা শান্তরসাশ্রিত। শনক, সনন্দ, সনাতন, ভৃগু অম্বরীষ (অধিকাংশ ঋষি) ও ভীষ্মাদি রাজন্যবর্গ এইরূপ ভক্তির ভজনা করিয়াছিলেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ কবির সাহেব তাঁহার দোঁহায় ভক্তির লক্ষণও বর্ণন করিয়াছেন,—

"সহ কামী সুমিরণ করে পাওয়ে উচাধাম
নিরকামী সুমিরণ করে পাওয়ে অবিচল রাম"

নিষ্কাম ভক্ত পরমাত্মার অপূর্ব্ব শান্ত ভাবকে আশ্রয় করিয়া ভগবানেই সর্ব্ব কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া, নিশ্চল-মানস হইয়া, ধ্যান-যোগের দ্বারা ও একান্ত ভক্তির দ্বারা তাঁহাকে আরাধনা করেন। ভক্ত 'নিশ্চয়াত্মা, দৃঢ়-বুদ্ধি, ভগবানে অর্পিত-চিত্ত, সর্ব্ব প্রকার ক্ষোভ হইতে মুক্ত, শীতোষ্ণ মানাপমান স্তুতি নিন্দার অতীত হইয়া শুভাশুভ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, এবং প্রিয় বস্তু পাইয়া হৃষ্ট বা অপ্রিয় ব্যাপারে দ্বেষ করেন না।' প্হ্লাদ এই দ্বিতীয় স্তরের চরম বিকাশ। দৈত্য-বালকগণ যখন ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাই প্রহ্লাদ আমরা তো ভগবানের উপাসনার কিছুই জানি না' কিরূপে তাঁহার উপাসনা করিতে হয়?" দৈত্য প্রহ্লাদ বলিলেন "সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত সমত্বমারাধন-মচ্যুতস্য" ; সকলকে সমান ভাবে প্রীতি কর, সকলের মধ্যে সমান ভাবে বিষ্ণু বিরাজিত, ইহা বুঝিতে পারিলেই তাঁহার উপাসনা হইবে।' ভক্ত প্রহ্লাদের আখ্যায়িকা কে না অবগত আছেন?

তিনি সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ করিয়া, ঐশ্বর্য্যভোগে বিমুখ হইয়া, পিতৃরোষে কিছু মাত্র ভীত না হইয়া, সেই পরাৎপর ভগবানকেই বরণ করিয়া লইলেন। ইহাতে তিনি যে নিজের জীবনকে কি সঙ্কটের মধ্যে নিপাতিত করিলেন, তাহা মনে হইলেও হৃৎকম্প হয়। কিন্তু দৃঢ়-নিশ্চয় দৈত্য-বা ক এক ভগবান্ ছাড়া আর কিছুই চাহিলেন না। পৃথিবীর সমস্ত প্রলোভনের সামগ্রী লাঞ্ছিত হইয়া চলিয়া গেল। সেই প্রহ্লাদকে যখন ভগবান্ বর দিতে চাহিলেন, তখন রাজ্য ধন সমৃদ্ধি চাওয়া দূরে থাক, তিনি বর লইতেই ইচ্ছা করিলেন না। বিঘ্নসঙ্কুল ভবসাগর পার হইবার জন্য তখন তিনি ব্যাকুল নহেন। তিনি বলিলেন, "হে ভগবান্ দুরত্যয় ভব-বৈতরণী পার হইবার জন্য আমি কিছু মাত্র উদ্বিগ্ন নই। তোমার বীর্য্যসঙ্গীত রসে আমার চিত্তমগ্ন। অতএব আমার জন্য কোন চিন্তা নাই। কিন্তু যাহারা ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া, মায়া সুখের জন্য বৃথা ভার বহন করে, সেই সকল ভগবদ্-বিমুখ লোকের জন্যই আমার চিন্তা।

প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষো একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে॥

"হে দেব ! মুনিরা প্রায় নিজেরই মুক্তি কামনা করিয়া থাকেন,সেই জন্য মৌন হইয়া তাঁহারা বিজনে ভ্রমণ করেন। তাঁহারা পরের জন্য জীবন সঙ্কল্প করেন না। কিন্তু এই কাতর অসুর-বালকগণকে ত্যাগ করিয়া, আমি একা মুক্তি লাভের ইচ্ছা করি না। তোমা বিনা ভ্রান্ত জীবের অন্য গতি নাই।" ইহা অপেক্ষা আর চিত্ত শুদ্ধি কি হইতে পারে? পরের জন্য আত্ম ত্যাগ, পরের জন্য সমস্ত দুঃখকে সমাদর করিয়া প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করার মত উচ্চ বিষয় আর কি থাকিতে পারে? ইহাই নিষ্কাম ভক্তির পরাকাষ্ঠা।

অম্বরীষ নামে এক জন রাজা ছিলেন তিনিও পরম ভাগবত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া, তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা বিষ্ণু সেবায় রত হইয়াছিলেন। ভাগবতে অতি সুন্দর সুমধুর শ্লোক দ্বারা তাঁহার চরিত্র আখ্যাত হইয়াছে। পুরাণ ও ইতিহাসে আর একজন মহাপুরুষের নাম আছে। তিনি একজন ভক্তি শাস্ত্রের আচার্য্য বলিয়া পরিগণিত; তাঁহার নাম হনুমান্। ইনি অনার্য্য হইতে পারেন, অসভ্য কুলে ইঁহার জন্ম হইতে পারে; কিন্তু ইঁহার ভক্তি, নিষ্ঠা, প্রেম অনার্য্যকুলে যে গৌরব প্রদান করিয়াছে, তাহা কোন যুগে মলিন হইবার উপায় নাই। দাস্য ভক্তির চরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত সাধক, কি অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গ-প্রভাব আপনার উপাস্য দেবতার চরণ-কমলে, আপনার হৃদয় মনকে চিরদিনের মত বিকাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সকরুণ অথচ সুদৃঢ় বাণীর মধ্যে তাঁহার কি জ্বলন্ত বিশ্বাস ও নিষ্কাম ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়! তিনি বলিতেছেন—

"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদপরমাত্মনি
তথাপি মম সর্ব্বস্ব রামঃ কমললোচনঃ।"

'জানি,জানকীনাথে ও পরমাত্মায় কোন ভেদ নাই, তথাপি রামই আমার সর্ব্বস্ব!'

আমার মনে হয় মোটামুটি পুরাণ-বর্ণিত ভক্তি এক প্রকার বলিতে পারিয়াছি যে টুকু বলিতে বাকি আছে, তাহা চৈতন্যের জীবন প্রসঙ্গে বলিতে পারিব বলিয়া ভরসা করি।

ভক্তদের কি সাধুত্ব !! ভাগবতে আছে দেখিতে পাই দেবতারা বলিতেছেন—

"স্বয়ং সমুত্তীর্য্য সুদুস্তরং দ্যুমন্
ভবার্ণবং ভীম মদভ্র সৌহৃদঃ।
ভবৎ পদাম্ভোরুহনাবমত্র তে,
নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্॥"

'হে স্বপ্রকাশ স্বয়ং এই সুদুস্তর ভীমভবার্ণব উত্তীর্ণ হইয়াও, সকল জীবের অত্যন্ত সুহৃদ্ সেই করুণহৃদয় ভক্তগণ তোমার চরণকমল রূপ তরি অন্যের জন্য পশ্চাৎ রা'খয়া গমন করেন। তুমি ভক্তের অনুগ্রাহক, তাই তোমার চরণতরীর এত মহিমা। ভরত ও রহুগণকে বলিয়াছিলেন,—

"রহুগণৈ স্তত্তপসা ন যাতি ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্যৈঃ
নচেজ্যয়া নৈরূপানন্দ গৃহাদ্বা বিনা মহৎপাদোবজোভিষেকং।

একজন ভক্ত কবি বলিয়াছেন,—

"সাধু ভজ সাধুভজ সাধুপার নাই
জগত জীবন রাম বাঁধা তাঁর ঠাঁই।"

গীতাতে ভগবান্ বলিতেছেন,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

ক্রমশঃ

মোক্ষ] **জ্ঞানেই প্রেম বা প্রেমেই জ্ঞান।**

১ম। আচ্ছা তুমি নরহরি গোঁসাইকে চেন? তা'কে ভালবাস?

২য়। লোকটা কে বলত হে? আমি কি তা'কে চিনি?

১ম। তা'কে তুমি ভালবাস কিনা আগে তাই বল? তার পর তোমার কথার উত্তর দিব।

২য়। বাঃ, আচ্ছা লোক তো তুমি, আমি তা'কে কখন দেখ্‌লাম না, জান্‌লাম না, কখনও নামও শুনি নাই! অমনি শূন্যে শূন্যে ভালবাসা হয় কিনা?

১ম। কিন্তু সে বড় সুন্দর লোক ভাই; তা'কে তোমার ভালবাস্‌তে ইচ্ছা করে না?

২য়। আচ্ছা মজার লোক তো তুমি? আমি যার সম্বন্ধে কিছুই জানি না, সে সুন্দর কি অসুন্দর তা কি করে ঠিক করব? আগে শুনি লোকটা কেমন, একবার চোখে দেখি, তার সঙ্গে পরিচয় হ'ক্, তার পর না ভালবাসা হবে?

১ম। কেন শূন্যে শূন্যে কি ভালবাসা জন্মায় না? না দেখে না শুনে কাঁহাকেও ভালবাসা কি যায় না?

২য়। ভালবাস্‌তে পারা যায় হয়ত, কিন্তু সে ভালবাসা যে কাকে ভালবাসা

তা' কিন্তু কোন দিনই ঠিক হয় না! এ সব কবি-কল্পনা মন্দ নহে! পাগলামী আর কা'কে বলে?

১ম। তবে এখন পথে এস। কাল যে অত জ্যাঠামী কর্‌ছিলে? প্রেমই বড়,জ্ঞান বড় নয়; জ্ঞান না থাক্‌লেও প্রেম হ'তে পারে,—অথচ প্রেমিকের সঙ্গে কোন খোঁজ খবর নেই! "জ্ঞানে প্রেম বাধা পায়—ভাল গজাইতে পারে না" বলে যে আস্ফালন কর্‌ছিলে; এখন যে বড় আমাকে পাগল বলা হচ্ছে? হাঁ করে রইলে যে? আমার কথার উত্তর দাও? আসল কথা প্রেম বা জ্ঞান যে কি—তা আমরা মোটেই বুঝি না—কেবল কথা ল'য়ে মারামারি করি! তা'তে ঝগড়া বেড়ে উঠে বটে, কিন্তু জ্ঞান বা প্রেম একটুও ফুটে উঠে না। আমরা যেরূপ বিষয়াসক্ত এবং দুশ্চিন্তা-বিষে আমাদের চিত্ত যেরূপ জর্জ্জরিত, তা'তে ওদুটি বিষয়কে বুঝিতে পারা এক প্রকার অসম্ভব বলিলেই হয়।

বহুদিন ধরিয়া শ্রদ্ধালুচিত্তে সাধুসঙ্গ ও ভগবদ্ভজনা করিলে, তবে ভাব বিশুদ্ধ হয়। ভাব বিশুদ্ধ হ'লে, তবে না প্রকৃত নিষ্ঠা আস্‌বে। তার পর রুচি—অর্থাৎ তাঁকে ভাল লাগা; তার পর আসক্তি, এবং তারও ঢের পরে প্রেম। এখন জ্ঞানই বল আর প্রেমের কথাই বল ওসব শুকপক্ষীর কথা বলার মত—একবারে বস্তুতন্ত্রতা শূন্য। কিন্তু এই ভাল-লাগাটা যে কত বড় সাধনার ফল, তা' অপ্রেমিক আমরা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিব না! প্রচণ্ড জ্বরাসুর যখন প্রবল বেগে ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়া বসে, তখন তাহার দাপটে আর সবই ভুলিয়া যাইতে হয়; কেবল জ্বর তাহার নিজের অস্তিত্বটা ঘনঘন নাড়া দিয়া হাড় পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া বেশ করিয়া আমাদিগকে জানাইয়া দেয়। তদ্রূপ শুভমুহূর্ত্তে সৌভাগ্যের উদয়ে যখন ভগবানে লোকের রুচি এবং আসক্তি জন্মে, তখন সে এত প্রবল বেগে দেখা দেয় যে তখন আর কিছুই মনে থাকে না, কেবল প্রেমময়ই সমস্ত চিত্ত তাহার অধিকার করিয়া বসেন। ভক্ত তখন আত্ম ভুলে, জগৎ ভুলে; শুধু তাঁ'কেই চেয়ে বসে;—আর কিছুতে তার প্রয়োজনও হয় না, এবং সে জন্য কিছু সে আর চাইতেও পারে না। তখন ধন জন মান প্রতিষ্ঠা পায়ের তলে গড়াগড়ি যায়—সে ফিরেও তাকায় না! এই যে সকল ভুলে তাঁ'কে ভালবাসা—এরই নাম অনুরাগ। এখন দেখ কাহাকেও ভালবাস্‌তে হ'লে, ভালবাসা আকাশ থেকে লাফিয়ে পড়ে না—যা'কে ভালবাস্‌বে তা'কে আগে জান্‌তে হয়। তার পর যদি সে ভালবাসার উপযুক্ত পাত্র হয়, তবেই তার উপর আমাদের ভালবাসা প্রগাঢ় হ'তে পারে! ভালবাসা অন্ধ এ কথা অনেককে বল্‌তে শুনি। পাত্রা-

পাত্র বিচার না করিয়া ভালবাসা নাকি আপনাকে অজানিত লোকের হাতে বিকাইয়া দেয়! কিন্তু এ কথা সত্য নহে; প্রেম অন্ধ নহে, কাম অন্ধ বটে! প্রেমকে কামের সহিত এক করিয়া দেখিলে চলিবে না। অপাত্রে ভালবাসা হয় না, হ'লেও টেঁকে না। একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, ভালবাসামাত্রই প্রেম নহে। প্রেম অপার্থিব জিনিষ, তাহার সহিত দেহ বা ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ নাই বলিলেই হয়।

যাহা মোহকর, যাহা 'নিজেন্দ্রিয় তৃপ্তি ইচ্ছা', যাহা মানসিক বিকৃতির ফল—তাহা কখনই প্রেম নহে। সুন্দর হইলেও যাহা ইন্দ্রিয়-মোহকর নহে, বরং যাহা দিব্যভাবের উদ্দীপক, যাহার ত্রিসীমানায় অসত্য কামভাব আসিতেই পারে না—যাহা হিমাদ্রি-বক্ষ-বিদারী বেগবতী ভাগীরথীর সাগরাভিমুখে অবিশ্রান্ত গতির ন্যায়—ভগবদভিমুখী নিত্য চঞ্চল ও আবেগময়ী তাহাই 'প্রেম' শব্দবাচ্য। কিন্তু তথাপি প্রেম বিচারবিমূঢ় অজ্ঞানন্ধতা নহে;—কারণ প্রেম মিথ্যাকে আঁকাড়িয়া চিরদিন অন্ধভাবে দিন কাটাইতে পারে না। তাহা সত্যের আলোকে পরীক্ষিত এবং সত্যের সুদৃঢ় বর্ম্মে আচ্ছাদিত;—তাই প্রেম অন্তরে সুরতরঙ্গিণীর মত বিগলিত হইলেও বাহিরে নিয়মের কঠোর দুর্ভেদ্য প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেই জন্যই তো প্রেমের রাজ্যেও এত চুলচেরা বিচারের প্রয়োজন। প্রয়োজন এই জন্যই যে পাছে ভুল হইয়া যায়; প্রেমের নামে কাম বিকাইয়া যায়। অসুন্দর হইতে সুন্দরকে, অসত্য হইতে সত্যকে, নিরানন্দ হইতে আনন্দকে বাছিয়া না লইলে "প্রেমকে" পাওয়াই ভার হইবে। কিন্তু এই বাছিয়া লওয়াই, এই চিনিয়া লওয়াই জ্ঞানের কার্য্য; জ্ঞানই আলোক কি না। জ্ঞানের সাহায্যে বাঞ্ছিতকে চিনিতে পারিলেই বাঞ্ছিতের প্রতি অত্যন্তাসক্তি একান্তই স্বাভাবিক। সুতরাং প্রেমের জন্য যে জ্ঞানের খুবই প্রয়োজন এ কথা আমরা অস্বীকার করিব কিরূপে? ভগবানে নির্গুন ভক্তিই প্রেম। সেই প্রেমকে লাভ করিতে পারিলেই মুক্তি লাভ হয়। সারূপ্য সামীপ্যকেই ঠিক মুক্তি বলা যায় না! মুক্তি তাহাই যাহা সত্যের স্বরূপকে অবধারণ। আত্মজ্ঞান—দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র সত্ত্বা। "তমেব বিদিত্বাতি-মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারা যায়, মুক্তি লাভের অন্য উপায় নাই! শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন "ভগবদ্ভক্তিরেব মোক্ষহেতুঃ।" ভগবদ্ভক্তিই মুক্তির সোপান। "ভগবদ্ভক্তি-যুক্তস্য তৎপ্রসাদাৎ আত্মবোধতঃ স্বয়ং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যাৎ" ভগবদ্ভক্তের

ঈশ্বরপ্রসাদে আত্মজ্ঞান হেতু, সুখে বন্ধন মোচন হয়। গীতাতেও ভগবান্ বলিলেন—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥"

"যাহারা একনিষ্ঠ হইয়া আমাকে ভালবাসিয়া ভজনা করে, তাহাদিগকে আমি বুদ্ধি-যোগ দিই অর্থাৎ জ্ঞান দিই যদ্দ্বারা তাহারা আমাকে পায়।" এই জ্ঞান আর প্রেম অভিন্ন; উভয়ই নিঃশ্রেয়সের হেতু। নদী যেখানে সমুদ্রেতে আপনাকে হারাইয়া ফেলে তাহাই মহাতীর্থে পরিণত হয়। তাহাই নদীর চিরবাঞ্ছিতকে পাওয়া, তাহাই নদী-জীবনের চরমলক্ষ্য, তাহাই নদী-জীবনের আত্মজ্ঞান বা মুক্তি!

ইহাই ভালবাসার চরম—সেই জন্যই ইহা প্রেমশব্দবাচ্য। আত্মাই সকল আনন্দের উৎস, এই আত্মাকে না জানিতে পারিলে অমৃত লাভ হয় না। তাই সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম, জ্ঞান ভক্তির একমাত্র চেষ্টা সেই প্রেম পারাবার পরমাত্মাকে জানিতে পারা তাঁহার সহিত একাত্মতা লাভ করা। একের সহিত অন্যের যে আত্যন্তিক মিলন-বাঞ্ছা তাহাই আসক্তি। তা'র পর মিলন বা ভাব; ইহাতেই আত্ম-বিস্মৃতি হয়। এই সময় ঠিক অর্পণের সময়। তার পর ব্রজগোপীকাদের সর্ব্বেন্দ্রিয় সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে যখন অর্পিত হইল, যখন সব 'চাওয়া' সব 'পাওয়া' তাহাদের মিটিয়া গিয়া, তাহারা যে কে তাহা ভুল হইয়া গেল, ও তাহাদের এক প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ বা ভগবান্ ছাড়া আর কিছুই রহিল না—তখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহারা একাত্মতা লাভ করিলেন, ইহারই নাম প্রেম। এই প্রেমে নামরূপ সব মিটিয়া লয় হইয়া যায়, আত্মজ্ঞানীর ঠিক ঠিক তাহাই ঘটিয়া থাকে। ভাগবতে আছে,—

"তাঃ নাবিদন্ ময্যি অনুষঙ্গবদ্ধ ধীরঃ স্বমাত্মানমদঃ তথেদম্।
যথা সমাধৌ মুনয়ঃ অব্ধিতোয়ে নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে॥"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আগে জানা, তার পর ভাব! এখন কথা হচ্চে যে কাহাকেও হঠাৎ তোমার জানবার ইচ্ছা হবে কেন? আগে কারও কাছে তার গুণাগুণ শুন, তবে না তাকে পেতে ইচ্ছা হবে। তবেই দেখ, প্রথমেই হ'ল "শ্রবণ"। তারপর নিজের মনের সঙ্গে বোঝা পড়া করা চাই, অর্থাৎ যাকে ধরচি, যাকে চাচ্চি সে যে সেই, সেটা বেশ করে বুঝে দেখা চাই; এরই নাম হল "মনন"; অর্থাৎ আত্মপ্রত্যয় না হলে শুধু শাস্ত্রবাক্যে কিছু হয় না। তারপর নিদিধ্যাসন, তারও পরে ধ্যান,—তার পর ধ্যেয় বস্তুর ধারণা হয়। ধারণা মানেই তাঁর

সঙ্গে পরিচয় মন বোঝা-বুঝি। এই ধারণা থেকেই তাঁরসঙ্গে গদগদ ভাব; ভক্তিশাস্ত্রে ইহাকেই আসক্তি বা নবানুরাগ বলে। কিন্তু ইহাও "পরানুরাগ বা প্রেম" নহে! ধ্যানীরা যাহাকে সবিকল্প সমাধি বলেন, সে আরও এক ধাপ উচ্চে; তাহাই ভক্তি শাস্ত্রে 'ভাব' নামে আখ্যাত। কিন্তু ইহার উপরেও আর এক ধাপ আছে। প্রিয়তম প্রণয়-পাত্রকে ভাল বাসিতে বাসিতে এমনি তাহার প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মিয়া যায়, যে তাকে দেখ্‌তে, তার কথা শুন্‌তে,তার সম্বন্ধে চিন্তা কর্‌তে, তার সঙ্গে বেড়াতে, তাহাকে খাওয়াতে, শুশ্রূষা করতে, তার কথা বলতে, এমন কি তাকে মনে করতেও ভক্তের প্রাণের মধ্যে এক নিবিড় অনাবিল আনন্দ রসের সঞ্চার হয়। সে আনন্দের সঙ্গে জগতের আর কোন আনন্দকে সে সমান ভাবতেই পারে না। সেই দয়িত, চিরবাঞ্ছিত প্রেমিক যদি তা'র গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন তা'র 'নাওয়া খাওয়া' কাজ কর্ম্ম কর্ত্তব্য সবই মাথায় উঠে! তখন ভক্ত যে আনন্দে বিভোর, তার কাছে পৃথিবীর যশঃ মান ঐশর্য্য আত্মীয় স্বজন সমস্তই বিরস ও অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হয়! তখন তাহার হাবভাব চাল চলন পরণ পরিচ্ছদ সমস্তই এক অদ্ভুত গোছের হইয়া উঠে। তখন সে বলে—

"কাজ কি গো কুল, কাজ কি গোকুল, ব্রজকুল সব হ'ক প্রতিকূল, আমি যে সঁপেছি গো কুল অকুল-কাণ্ডারীর করে। কাজ কি বাসে, কাজ কি বাসে, কাজ নাই মোর গৃহবাসে, সে যার হৃদয় বাসে; সেকি বাসে বাস করে লো॥" তখন সে জ্ঞানশূন্য মোহমুগ্ধ ক্ষিপ্তের ন্যায় কেবল তাহার প্রেমময়ের সঙ্গই বাঞ্ছা করে, মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাকে নয়নের অন্তরাল করিতে চাহে না। তখন "শয়নে স্বপনে দেখে কাল রূপখানি।" সময়ে সময়ে এমন হয় যে ভক্তের—

> "আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে।
> "পরাণ হরিল রাঙ্গা নয়ন নাচনে।"

এমনই আত্ম-ভোলা, জগৎ-ভোলা ভাব ভক্তের হইয়া থাকে। ইহাই রাগানুগা বা আসল ভক্তি। কৃত্রিম ভক্তি বা বৈধী ভক্তি ইহার দিক্ দিয়াও যায় না; সুতরাং প্রাকৃত ভক্তেরা ইহার মর্ম্ম বুঝিবে কিরূপে? অথচ আমাদের অধিকাংশেরই ভক্তি অনেক স্থলেই কৃত্রিম, বড় জোর বৈধী। সুতরাং আমাদের সে প্রেমভক্তির কথা বুঝিবার সম্ভাবনা কোথায়?

অন্য দিকে প্রগাঢ় ধ্যানীদের এমনই অবস্থা হয়, যে বিবিধ বিক্ষেপের মধ্যেও রোগ, শোক, দুঃখের হৃদয় বিদারী কোলাহলের মধ্যেও, তাঁহারা "কূর্ম্মাঙ্গানীব"

সর্ব্বত্র হইতে মনকে ফিরাইয়া আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত করেন। নির্ব্বাত স্থানে প্রদীপ-শিখার মত তাঁহাদের মন ব্রহ্মে অটল-প্রতিষ্ঠ। শীত উষ্ণ, লাভ অলাভ, হর্ষ বিষাদ, জন্ম মৃত্যু, কিছুই চিত্তকে চঞ্চল করিতে পারে না। তখন সেই পরমাত্মৈকনিষ্ঠ জ্ঞানী দেখেন "যদি চৈক নিরন্তর সর্ব্ব শিবং, যজনঞ্চ কথং তপনঞ্চ কথং"। তখন জ্ঞানীর জ্ঞাননেত্রের নিকট এই আত্মবোধ প্রতিভাসিত হয়—

'নাহং মনুষ্যো ন চ দেবযক্ষৌ, ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ।
ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো ভিক্ষুর্ন চাহং নিজবোধরূপঃ।"

অর্থাৎ এখানেও নাম রূপের সব অবসান হইয়া গেল। পূর্ব্ব কথিত ভক্তদের অবস্থার সঙ্গে জ্ঞানীদের অবস্থার কেমন মিল রহিয়াছে! বাপু দুদিকেরই ঐ একই কথা। নাম রূপ না মিটাতে পার্‌লে, প্রকৃত ভক্তও হতে পার না, যথার্থ যোগীও হতে পার না। জ্ঞানপথ ও ভক্তিপথ দুটা যে ঠিক একই পথ, তাহা অবশ্য বলা যায় না; তবে উভয়ই একই লক্ষ্যস্থলে পৌছাইয়া দেয়। বিভিন্নমুখী নদীর মত, গতি কিন্তু উভয়েরই সমুদ্রাভিমুখী। তবে ইহা সত্য যে জ্ঞানের পথ অপেক্ষাকৃত দুর্গম, ভক্তি ও কর্ম্মের পথ আপক্ষাকৃত সরল ও সুগম। তবে ইহাও সত্য যে জ্ঞানের পথ বা ভক্তির পথ বা যোগের পথ, একই অধিকারীর পক্ষে অবলম্বনীয় নহে। তিনটি পথেরই তিন প্রকার অধিকারী আছে! যে যে পথের অধিকারী তাহার পক্ষে সে পথ অবশ্যই সহজ। জ্ঞানপথ, ভক্তিপথ, যোগপথ পৃথক্ বটে, কিন্তু জ্ঞান, যোগ, ও প্রেম তিনটী পৃথক্ লক্ষ্যস্থল নহে। প্রত্যেক পথাবলম্বীকেই যোগ, প্রেম ও জ্ঞানকেই লাভ করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান, প্রেম, যোগ তিনটির একই সাধ্যবস্তু—ইহাদের সাধনা তিন প্রকারের। জ্ঞানপথ অপেক্ষাকৃত দুর্গম; এইজন্য যে সাধারণতঃ আমাদের চিত্ত দুর্ব্বল ও রজস্তমোভিভূত। বাসনা ও তমান্বিত বিক্ষেপের লীলা নিকেতন! সুতরাং এই সকল চিত্তে জ্ঞান-পথ কোন ফলদায়ী হয় না। জ্ঞানপথকে অতিক্রম করা ইহাদের পক্ষে অসাধ্য। কর্ম্ম বা যোগ দ্বারা চিত্ত কতকটা নির্ম্মল হইলে,তবে ভক্তির সঞ্চার হয়। ভক্তির আবেশে চিত্ত বিশুদ্ধ ও আর্দ্র হইলে, তবে বিবেক বৈরাগ্যের উদয় হয়; তৎপরে জ্ঞানোদয়ের সম্ভাবনা।

সেই জন্য জ্ঞান ও প্রেম আলাদা বস্তু নহে। যে মার্গই অবলম্বন কর, লক্ষ্যস্থলে আসিলেই বুঝিবে—যাহাকে বলে অপরোক্ষজ্ঞান বা আত্মদর্শন,

তাঁহা সত্য সত্যই 'প্রেম' শব্দ বাচ্য। ভক্তি আর জ্ঞান শুধু কথার মারপেঁচ মাত্র,—উভয় সাধনাই কঠিন; যাহার তাহার পক্ষে অধিগম্য নহে। এ পথ সহজ, ও পথ কঠিন এ কথা বলা বিড়ম্বনা মাত্র। কোন পথই সহজ নহে. অথচ কোনটাই একেবারে যে অনভিগম্য তাহাও নহে। প্রেমে আর জ্ঞানে বস্তুতঃ ভেদ না থাকিলেও,ভাবের একটু তফাৎ আছে;—সেইটা কি একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাই। ভগবান্ যে অনন্ত অসীম অথচ শাশ্বত সুন্দর ও প্রাণারাম, এটা আমরা দুটি জিনিষের ভিতর দিয়া লোককে বুঝাইয়া থাকি,—এক অনন্ত মহা সমুদ্র, অপরটী সীমাহীন মহাকাশ। দুইটিই অনন্তের জ্ঞাপক; কিন্তু দুটিতে বিভাব দুই প্রকারের। দুইটিই সীমাহীন, ইন্দ্রিয় জ্ঞানে অলব্ধ; কিন্তু একটি অসীমের আনন্দে উৎফুল্ল, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাহার সেই হর্ষ কূল ছাপাইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, কি এক অব্যক্ত প্রেম তাহাকে অনুক্ষণ আকুল করিয়া রাখিয়াছে। আর একটী স্তব্ধ গম্ভীর,—সেই কি যেন পাইয়া আপনাতে আপনি মগ্ন, কি গভীর বিস্ময়ে তাহার চিত্ত অসীমের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া মৌন হইয়া রহিয়াছে। এই মূক মৌন গম্ভীর শান্ত মহিমা; আর ওই আনন্দের কুলভাঙ্গা অসীম চাঞ্চল্য!! ইহা একই বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

আসল কথাটা শেষ হইতে বাকী আছে 'জ্ঞানই প্রেম" বলেছি কি না; এখন বুঝ জ্ঞানেই কি করিয়া প্রেম দাঁড়ায়। মনে কর, তুমি সত্য কথা ও সত্যবাদীকে খুব পছন্দ কর; এখন তুমি যদি লোকের মুখে শুনে এবং কতকটা বা নিজে পরীক্ষা করে জান্‌তে পার যে অমুক লোকটা বড় সত্যবাদী, তখন স্বতঃই তুমি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হও। তারপর মনে কর যদু পরোপকার ও দয়াকেই মানুষের সর্ব্বপ্রধান গুণ বলে মনে করেন। এখন যদু যদি শুনেন অমুক ব্যক্তি বড় করুণাময়, বড় দয়ালু, পরের জন্য তিনি সহস্র ক্ষতি স্বীকার করেন; লোক সেবাতে তাঁর যত আনন্দ, এত আনন্দ তাঁর ধনসম্পত্তি সুখ বিলাসে কিছুতেই হয় না—পরের উপকারের জন্য এমন কি সর্ব্বস্বান্ত হতেও তিনি প্রস্তুত। তা হ'লে এই সদাশয় মহাত্মার প্রতি যদুর ভক্তি না হইয়াই থাকিতে পারে না। আবার ধর, রাম বড় বিজ্ঞান ও তত্ত্বালোচনায় পক্ষপাতী; সুতরাং শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিগের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধালু হওয়াই স্বাভাবিক নয় কি? কিন্তু ভাবিয়া দেখ তুমি যদি সেই সত্যবাদী পুরুষটীর কথা মাত্র শুনে থাক, কিন্তু তাঁকে কখন প্রত্যক্ষ কর নাই, এরূপ অবস্থায় যদি তিনি তোমার সামনে দিয়ে চলে যান—তবে "তিনিই এই বলে" কি বুঝতে পার,—না, তাঁরপ্রতি কোন

আকর্ষণ আসে? কেন না লোক যদিও সেই—তথাপি পরিচয় নাই কিনা; এইজন্য আকর্ষণ হইবে না। এইরূপ সত্ত্ব এই পরিচয় না হলে, জানা না হলে, ভালবাসা হয় না। না দেখেও কেবল মাত্র গুণ শুনে যখন আমরা কোন ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করি, তখন আমরা স্বরূপতঃ কি করি, না তাঁর গুণের আদর করি? এই গুণের পরিচয় প্রত্যক্ষভাবে আমার না থাকিলেও অন্যের দৃষ্ট অর্থাৎ পরোক্ষানুভূতি আছে। সুতরাং বুঝাগেল কাহাকেও ভালবাসিতে হইলে তাহার সহিত পরিচয় থাকা চাই। কিন্তু এই যে "তদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ" তাঁহার দিকে আকর্ষণ হইবার কারণ কি? না; তাঁর গুণ আছে বলিয়াই। নির্গুণকে কেহ আদর করে না; পাথরের সহিত কাহারও প্রেম হয় না। ভগবানকে সর্ব্ব-গুণাধার সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যের নিত্য নব প্রস্রবণ "সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং" বলে জানা গিয়াছে বা শুনা গিয়াছে বলিয়াই না আমরা তাঁহাকে চাই। সুতরাং জ্ঞানের কাজ জানা; তাহা হইয়া গিয়াছে। তারপর প্রেম আসিয়াছে। কতলোক সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে তাঁর জন্য পাগল হয়ে উঠে কেন? না তাঁ'তে এমনই কিছু মন, প্রাণ ইন্দ্রিয়ের মোহকর জিনিষ আছে; যা দেখে বা শুনে তাঁ'কে পাবার জন্য লোকের এত আকর্ষণ হয়। জগতের সমস্ত রূপ রস গন্ধ তাঁ'রই মাধুর্য্য সংস্পর্শে মধুময় হয়ে উঠে। তাই না তাঁকে পাবার এত চেষ্টা!! ঈশ্বর জ্ঞান স্বরূপ, আলোক স্বরূপ,—সেখানে কোন ধাঁধা নাই, সবই সেখানে স্পষ্ট; তিনি বল বিধাতা, শান্তিদাতা—তাই না তাঁর কাছে যে'তে লোকের এত ব্যাকুলতা!! সুতরাং ভগবানের প্রতি যে প্রেম, তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞানের অপেক্ষা রাখিতেছে। তিনি যদি আলোক না হয়ে ঘুরঘুটি অন্ধকারের মধ্যে, কালিমায় মুখ ঢেকে একটি 'জুজু বুড়ি' হয়ে বসে থাকতেন, তবে তাঁকে সমস্ত জীবন ধরে অন্বেষণ করবার কষ্টভোগকে বরণ করিয়া লইত কে? এবং কেইবা তাঁহার সঙ্গলাভের আকুল তৃষ্ণায় ছটফট করিয়া যুগযুগান্তর জনম-মরণের চড়কীতে 'চড়িয়া ঘুরপাক' খাইয়া বেড়াইত। তিনি আলোক বলেই না, লোকে অন্ধকারের ভয়ে তাঁ'র কাছে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করচে! আর অন্ধকারকে এত ভয় করি কেন? ইহার মূলেও জ্ঞান আছে। কারণ অন্ধকার শুধু আঁখির দৃষ্টিকেই হরণ করে না, অন্ধকারে ধমাধম মাথা ঠুকিয়া যায়, ইহা জানা আছে; তাই আমরা আলোক এত ভালবাসি, এবং আলোককে এতটা চাহিয়া থাকি। অন্ধকারে হাঁচড় পাঁচড় করতে কেহই আমরা ভালবাসি না। আলোকই আমাদের পরমবন্ধু, আলোকই আমাদের জীবন-পথের সম্বল; তাই সকলেই আমরা জ্ঞানের পক্ষপাতী এবং

অজ্ঞানের বিরোধী। কিন্তু জ্ঞান ভক্তির বিরোধী নহে; যাঁহারা জ্ঞানকে ভক্তির বিরোধী মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। ভগবদ্‌-প্রেম যত অহৈতুকী-ই হ'ক, ভগবান্ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট জ্ঞান ভক্তের হৃদয়ে উজ্জ্বলরূপে আছে বলেই ভক্ত ভগবানকে তার সর্ব্বস্বধন বলে বুঝতে পারে। তিনিই তাহার পরমাশ্রয় এ কথা তা'র মনে মনে তা'কে কে যেন বলে দেয়। প্রেমের মূলে এই স্পষ্ট অথচ সহজ জ্ঞানটি আছে বলেই না, ভক্ত ভগবানের জন্য বিগতসন্দেহ। বৃকভানুনন্দিনী শুধু-শুধুই যে শূন্যের পানে চেয়ে কাল্পনিক শ্যামসুন্দরের জন্য কেঁদে কেঁদে ব্যাকুলা হয়ে বেড়াতেন, তা'তো নয়। সখীদের মুখে গুণ শুন্‌লেন, নিজে বাঁশী শুন্‌লেন; তাঁ'র জগৎ-মনোমোহন রূপ খানি আড়ালে আড়ালে দেখলেন; তবে না তাঁকে কৃষ্ণোন্মাদিনী করিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে জ্ঞান না হইলে প্রেম আসে না—এবং প্রেম না হইলেও প্রকৃত জ্ঞান আসে না। একটা লোককে, উপরে উপরে ভাসাভাসা, জানিতে পারি; কিন্তু যতক্ষণ তাঁহার সহিত ভালবাসা না জন্মিবে—তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত প্রীতির সহিত যতক্ষণ দেখিতে না শিখিব' ততক্ষণ তাঁহার সম্যক্ পরিচয় পাইব না। একজন লোক একজনের সম্বন্ধে বলে বসে "ও লোকটা ভল নয়?" কিন্তু সে কেন ভাল নয়? তা'কে অপর একজন তো বেশ ভ.ল বল্‌চে। এর কারণ একজন আব একজনের চেয়ে তাকে বেশী ভালবাসে বলেই তাঁর গুণের অধিক পরিচয় পায়; অপরে পায় না। জ্ঞান ভক্তি পাশাপাশিই খেলা করিয়া বেড়ায়। ভক্ত কবি নবীনচন্দ্র বলিয়াছেন;—

"জ্ঞান বিহঙ্গম যেথানে যাইতে চায়
ভক্তি-বিহঙ্গিনী উধাও হইয়া উল্লাসে উড়িয়া যায়।"

তবে চৈতন্যদেব যে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির চেয়ে জ্ঞানবর্জ্জিত শ্রদ্ধা ভক্তিকে অধিক প্রশংসা করেছেন? তা'ত করিবেনই। তিনি জ্ঞানবর্জ্জিত শুদ্ধাভক্তির প্রশংসা করেছেন; কিন্তু অজ্ঞান জড়িত ভক্তির তাই বলে উপাসনা করতে বলেছেন এ কথা বোলতে পারবে না। তবেই তার মানে হচ্চে যে যতক্ষণ জ্ঞেয়বস্তুকে জানা না যায় ততক্ষণ জ্ঞানের প্রয়োজন আছে; কিন্তু জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয়কে লাভ করিলে আর জ্ঞানের আবশ্যক হয় না। তাই যে প্রেমময় পরমাত্মাকে জেনে তাঁর প্রেমিক হতে পেরেছে, তার আর জ্ঞানের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাহার বিবেক বৈরাগ্যের উদয় হয় নাই, সুতরাং প্রেম পরিস্ফুট হইতে পারে নাই, তাহার পক্ষেও যে জ্ঞান অনালোচনীয়, একথা আদৌ শ্রদ্ধেয় নহে। আমরা যে নামের দোহাই দিই তাহাতেও বলে "হরেনাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং"—ইহা ছাড়া আর

গতি নাই। কিন্তু এই নাম-মহিমাতো কাহারও গড়া কথা নহে, আন্দাজি কথা নহে। এ সত্যটিও কাহারও জ্ঞানে প্রতিভাসিত হইয়াছে, তবেই না তিনি এই সত্যতত্ত্বটি প্রচার করিতে পারিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি দার্শনিকেরা জ্ঞানকে জ্ঞেয়ের সহিত অভিন্ন বলিয়াছেন। সুতরাং জ্ঞানলাভ হইলেই তাঁহাদের মতে যাহা পাইবার তাহা পাওয়া গেল। গীতায় আছে—

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীতে উভে সুকৃত দুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।
কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্।

শ্রুতিতে আছে সেই আত্মাকে "বিদিত্বা অতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা অয়নায়" শ্রুতিতে আছে "অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ। ভূমৈব তেষাং সুখং।" অবশ্য এ জ্ঞান শুধু শাস্ত্রজ্ঞান নহে, ইহা অপরোক্ষ অনুভূতি। ইহাই সত্য জ্ঞান। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানকেই চরম লক্ষ্য বা সাধ্য বলেন না, তাঁহাদের পক্ষেও যে জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়াছি। অন্ধকারে বস্তুকে খুঁজিয়া পাইবার জন্যও প্রদীপের আবশ্যকতা আছে, বস্তু খুঁজিয়া পাইলে প্রদীপ নিভাইয়া দিলেও চলে। কিন্তু এই জ্ঞানদীপ একবার জ্বলিলে আর নিভিতে চায় না। সুতরাং প্রথমেই যখন জ্ঞানের প্রয়োজন তখন সকল চেষ্টাই প্রথমে এই জ্ঞানানুসন্ধানে লাগালেই হইল, বুদ্ধিমানের কার্য্য। একবার জ্ঞানের সাহায্যে তাঁহাকে পাইলে, তখন জ্ঞানকে ছাড়িয়া দিলেও চলে; কিন্তু তৎপূর্ব্বে নহে। বস্তুকে পাইয়া জ্ঞানকে ছাড়িয়া দিলে চলে এইজন্য বলিতেছি যে বস্তুটি স্বয়ংই দীপ্তিময় অর্থাৎ কি না জ্ঞানময়! সুতরাং জ্ঞানকে তখন চাহি না বলিলেও কোন দোষের হয় না; কারণ জ্ঞান তাঁহাকে ছাড়িয়া নাই। না চাহিলেও সে থাকিবে। জ্ঞেয়ের সহিত এ জ্ঞান অচ্ছেদ্য-বন্ধনে জড়িত; এমন কি অভিন্ন। ইহাকেই ভাগবতে ঈশ্বরস্বরূপ বলা হইয়াছে "মুক্তাত্মভিঃ স্বহৃদয়ে পরিভাবিতায় জ্ঞানাত্মনে ভগবতে নম ঈশ্বরায়।" অবশ্য শাস্ত্রে আছে "জ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোক্য জ্ঞানং পশ্চাৎ পরিত্যজেৎ"—এজ্ঞান ঠিক সত্য জ্ঞান নহে;—ইহা পরোক্ষজ্ঞান বা সাধনাঙ্গ জ্ঞান, ইহা জ্ঞানের আভাস মাত্র। লৌকিক বিদ্যা, চিন্তা, কল্পনাশক্তি, যুক্তি, হেতুবাদ প্রভৃতিই ইহার অন্তর্গত। এগুলি জ্ঞেয় বস্তুলাভের পর বাস্তবিকই আর কোন প্রয়োজনে লাগে না। সূর্য্যকে যতক্ষণ দেখা না যায় ততক্ষণই না প্রদীপ জেলে কাজ সারতে হয়; সূর্য্য প্রকাশিত

হলে আর প্রদীপের আলোর কি দরকার? লৌকিকজ্ঞান যুক্তি এমন কি সাধন-জ্ঞানের উপাসনারও এই পর্য্যন্তই শেষ। সেইজন্য পূর্ব্বাপর আমাদের দেশে একটি প্রবাদ চলে আসচে যে 'গুরু দর্শন হলে, আর সে দিন সাধন ভজন জপের কোন প্রয়োজন নাই।' কারণ যাঁর জন্য সাধনা তিনি স্বয়ং তখন সম্মুখে উপস্থিত।

সূর্য্য আর প্রদীপে যেমন খানিকটা মিলও আছে আবার বিরাট্ প্রভেদও আছে, লৌকিক আর সত্যজ্ঞানে ঠিক সেই রকম মিল ও প্রভেদ বর্ত্তমান। সূর্য্য স্বয়ংই প্রকাশস্বরূপ, প্রদীপ জ্বালিয়া সূর্য্যকে দেখিতে হয় না। সূর্য্যের প্রকাশ যতক্ষণ না থাকে ততক্ষণই প্রদীপের সার্থকতা, "তদ্রূপ যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি" অর্থাৎ যতক্ষণ তত্ত্ব বস্তুকে পাওয়া না যায় ততক্ষণই শাস্ত্রজ্ঞান, বিচার, বিবেক, বৈরাগ্য সাধনার আবশ্যক হয়; একবার তাঁহাকে পাইলে ইহাদের কার্য্য ফুরাইয়া আসে। সূর্য্য যেমন সমস্ত লোককে প্রকাশিত করেন এবং আপনাকেও প্রকাশ করেন, তদ্রূপ ভগবান্ স্বকীয় জ্ঞানালোকে সরহস্য জাগতিক সমস্ত ব্যাপার এবং তাঁহার নিজের প্রকৃত স্বরূপকেও বুদ্ধির গোচর করিয়া দেন। সূর্য্যের যেখানে প্রকাশ সেখানে প্রদীপের যেমন একান্তভাবে প্রয়োজনাভাব, যেখানে স্বয়ং তিনি সম্মুখে সেখানে তত্ত্বালোচনা বা ব্রহ্মনিরূপণ প্রভৃতিও নিতান্তই অনাবশ্যক বলিয়া মনে হয়। যাহারা তাঁহাকে চক্ষের সামনে দেখিতেছে, হৃদয়গুহায় প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছে—আর তাহারা তর্কবিতর্কের কুটকচালির মধ্যে যাইতে চাহিবে কেন? তাঁহারা তখন ভগবানের স্বরূপ সত্তার বিভোব-মগ্ন; "ব্রহ্ম কি" এ প্রশ্ন করিবার আর তাঁহাদের অবসর কোথায়? বস্তুকে পাইয়া তাঁহারা তো বিগত-মোহ—"পরং দৃষ্টা" তাঁহারা বিগত কাম! আর তাঁহারা কি চাহিবেন? সুতরাং দেখা যাইতেছে যাহাতে ভগবানের স্বরূপ সত্ত্বার বোধ হয়, দেহের অভিমান বিগত হইয়া পরমাত্মাতে যখন অচল প্রতিষ্ঠা লাভ হয়, যাহাতে তাঁহার সহিত নিরন্তর মিলন যোগে ত্বংএর সহিত অহংএর অখণ্ড অভেদ সপ্রমাণিত হয়, যাহাতে তিনি আপনার নিজ জন পরম সুহৃদ্ পরমাত্মা রূপে উপলব্ধ হ'ন—যে ভাবে 'তাঁহাকে" ছাড়িয়া "আমি" কিছু নয় বুঝিতে পারা যায়, যে ভাবে তন্ময় হইয়া এই বিশ্ব বাসুদেবাত্মক বলিয়া প্রতীতি হয়—তাহাই প্রকৃত জ্ঞান এবং ইহা প্রেমেরই নামান্তর! ভগবানের সহিত অখণ্ড মিলন ভাবকেই ভক্তেরা প্রেম নামে অবিহিত করিয়া থাকেন এবং এই প্রেমের সাধনার নামই ভক্তি। ভাগবত বলিতেছেন—এই ভক্তি যোগ বাসুদেবে প্রযোজিত হইলেই, আশু অহৈতুকী জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হয়।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥"

এখন দেখিলে জ্ঞান কিসে হয়! ভক্তিরই ফল জ্ঞান। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি ভক্তিতে প্রেম উপস্থিত হয়। সুতরাং এই "জ্ঞান" ও "প্রেম" একই জিনিষ। অবশ্য পূর্ব্বোক্ত বৈরাগ্যও পরা বৈরাগ্য! পতঞ্জলি যাহাকে "গুণ বৈতৃষ্ণম্ বৈরাগ্যম্" বলিয়াছেন! ভক্তজনবরেণ্য মহামতি নারদের আত্ম-কাহিনীতেও এই কথারই ইঙ্গিত আছে

"তস্মিংস্তদা লব্ধরুচে র্মহামতে, প্রিয় শ্রবণ স্খলিতা মতির্মম।
যয়াহমেতৎ সদসৎ স্বমায়য়া পশ্যে ময়ি ব্রহ্মণি কল্পিতং পরে।১।৫।২৭ভাগ

"সেইমতি উৎপন্ন হইলে পর প্রপাঞ্চাতীত ব্রহ্মরূপে আমাকে চিনিতে পারিলাম।" নদী যেমন স্বভাবতঃই সমুদ্র পানে ধাবিত হয়, সেই রূপ ভাবে আত্মহারা হইয়া যাহার চিত্ত স্রোতের মত আপনাপনি যে ভগবৎসমুদ্র পানে ধাবিত হয় কাহারও প্ররোচনায় নহে, কোন ইষ্ট লাভের জন্য নহে, না যাইয়া থাকিতে পারে না তাই যায়, কোন কামাভিসন্ধি ইহাতে নাই—ইহাই ত' নিশ্চল ভক্তিযোগ।

"মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোম্বুধৌ॥

ইহাই মানুষের পরম ধর্ম্ম "ইহার প্রভাবে ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিষয়-রসকে পরিহার করে।" "সবৈ পুংসাং পরোধর্ম্ম যতোভক্তিরধোক্ষজে"

আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনলে ত?

২য়। নিশ্চয়ই শুনেছি! কিন্তু--

১ম। কিন্তু কি?

২য়! প্রেম আর জ্ঞান একই বস্তু বটে; কিন্তু ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম এই তিনটি পথ অতি প্রসিদ্ধ।

১ম। পথ তো তিনটাই বটে; কিন্তু তিনেরই গম্য স্থান এক কি না? নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষই এই তিনটি পথের লক্ষ্য,—তাই এই তিনটিই যোগ শব্দে অভিহিত।

"যোগাঃ ত্রয়ঃ ময়া প্রোক্তাঃ নৃণাম্ শ্রেয়ো বিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায় অন্যমস্তি কুত্রচিৎ।"

কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনটি মোক্ষের পথ, এ ছাড়া অন্য পথ নাই! ইহা

ভাগবতে ভগবানের উক্তি। তবে যদি বল এক বস্তুকে পে'তে এ তিনটি পথ কেন! তার কারণ আছে। জগতে সকলেই আমরা সমান অধিকারী নহি! অধিকারী সমান না হইলেও মোক্ষের ইচ্ছা তো সকলেরই হয়। তাই যার পক্ষে যেটা সুবিধা হয়, এইরূপভাবে আর্য্য ঋষিরা এ তিনটি মোক্ষের সনাতন পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন! অধিকার সম্বন্ধে ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন তাহা তোমাকে শুনাইতেছি।

নির্ব্বিণ্ণানাম্ জ্ঞানযোগঃ ন্যাসিনাম্ ইহ কর্ম্মসু।"

স্বভাবতঃই দুঃখবুদ্ধিতে কর্ম্ম ফলে বিরক্ত, সুতরাং জ্ঞানযোগ ত্যাগী বা সন্ন্যাসীর পক্ষে অবলম্বনীয়। আবার "তেষু নির্ব্বিণ্ণচিত্তানাম্ কর্ম্মযোগঃ তু কামীনাম্।" যাহারা স্বভাবতঃই কামী, ফল-লাভেচ্ছু, সংসারবাসনা যাহাদের প্রবল এবং ভোগবিলাসে যাহারা অত্যন্ত আসক্ত, সেই সকল দুঃখবুদ্ধিশূন্য, কর্ম্মফলে অবিরক্ত পুরুষদের পক্ষে কর্ম্মযোগ নিঃশ্রেয়সের হেতু। সেই জন্য রাজ্য সুখাভিলাষী অর্জ্জুনকে ভগবান্ বলিলেন "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" কর্ম্মে তোমার অধিকার, জ্ঞানে তোমার অধিকার নাই। কিন্তু পাছে কর্ম্মীরা মনে করেন, তবে কোন কালেই বুঝি মুক্তি তাঁহাদের নাই,—তাই ভগবান্ তাঁহাদিগকে বলিলেন "মাভৈঃ" ভয়নাই—এই কর্ম্মই তোমাদিগকে মুক্তিদান করিবে। "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।" যোগস্থ হইয়া অর্থাৎ ঈশ্বরার্পিতচিত্ত হইয়া কর্ম্ম কর। "মা কর্ম্মফল হেতুঃ" ফল লাভই যেন কর্ম্মের কারণ না হয়—এবং "মা সঙ্গোস্ত্বেহকর্ম্মণি" এবং সন্ন্যাসীদের মত কর্ম্ম অকরণেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়. তবে কি ভাবে কর্ম্ম করিবে।

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ"।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

কর্ম্ম পরমেশ্বরে সমর্পণ করিয়া এবং কর্ম্মফলে আসক্তিত্যাগ করিয়া যে কর্ম্ম করে সে পাপে লিপ্ত হয় না। কেমন? না যেমন পদ্মপত্র জলে থাকিলেও জলে লিপ্ত হয় না সেইরূপ, কর্ম্মযোগী কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মফলে বদ্ধ হয় না।

এই জন্যই তো ভগবান্ বলিলেন "যোগঃ কর্ম্মসুকৌশলম্" সুকৌশল কর্ম্মই যোগ। অবশ্য এই রকম কর্ম্মে কুশলী কি প্রকারে হইতে হয়, তাহা ভগবান্ গীতায় অনেক রকম করে উপদেশ দিয়াছেন, এখানে সে সব কথার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। গীতা শ্রদ্ধা করে পড়ে দেখ, সবই বুঝতে পারবে।

২য়। ভক্তি যোগ তবে কাহাদের জন্য?

১ম। ভক্তি যোগ "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধঃ তু যঃ পুমান্।

ন নির্ব্বিণ্নঃ নাতিসক্তঃ ভক্তিযোগোহস্য সিদ্ধিদঃ॥ ভাগ

'কোনরূপে মৎকথাতে জাতশ্রদ্ধ, যে পুরুষ বিরক্তও নহে আর অত্যন্ত আসক্ত ও নহে, সেই পুরুষের জন্যই ভক্তিমার্গ প্রশস্ত।' ভগবান্ বলিয়াছেন যত দিন বৈরাগ্য বা মৎকথা শ্রবণে শ্রদ্ধা না জন্মায়, ততদিন অবধি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।

মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে॥

২য়। তাহলে দেখছি আমাদের পক্ষে কর্ম্মযোগই শ্রেয়ঃ

১ম। সে বিষয়ে সন্দেহ নাই! জ্ঞান বা ভক্তি একবারে হয় না, ন কর্ম্ম-ণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোহশ্নুতে। কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহই নৈষ্কর্ম্য বা জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। কর্ম্মের দ্বারা ঈশ্বরার্পিত-চিত্ত অভ্যাস করিতে করিতে অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়; বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ভক্তি লাভ হয় অর্থাৎ ভগবানে আসক্তি হয়; বিষয়ে দোষদৃষ্টি হেতু বৈরাগ্য হয়; তার পর জ্ঞান।

কাম]

দোল।

সখিরে

টুটল পিয়াসা মিটল গোল।
পরাণ আমার দোল দোল॥
বঁধুর উজল দিঠির সাথে।
ফাগুন পূর্ণ নিশিটি ভাতে॥
"বিচ্ছেদ ব্যথা বেদনা-সাথী।
গহন কাননে গহীন রাতি॥
বক্ষের দ্বারে চক্ষের জল।
মিলনের পথে কণ্টক দল॥
মিলায়ে গিয়াছে সখি! সে সকল।
মঙ্গল মহ, মঙ্গল বল্॥

সখিরে

বঁধুর পিরীতি প্রাণে প্রাণে।
শান্তি, কান্তি কি যেন আনে॥
নব বসন্ত অন্তরে মম।
দীপিল ভাব কোমল কম॥
ভুবন বেড়ে কান্ত মোরে।
জড়ায়ে আদরে রয়েছে ক্রোড়ে॥
বঞ্চন মান অপমান-ভার।
তরাসে তাড়িত পরশে তার॥
কান্তিময় এ সখি! থল, জল।
মঙ্গল মহ মঙ্গল বল্॥

সখিরে,

ধন্য জীবন, ধন্য তা।
"পুলকে পূরিত সকল গা"॥
শ্যাম বঁধু মম বাসর দুলাল।
কুল, লাজ, আজি কি সে জঞ্জাল॥
নাগর ঢাচ পরাণ কান।
ছুটায়ে দিয়াছে সুখের বাণ॥
আমি যে কান্ত, কান্ত সে আমি।
রহুক এমন দিবস যামি"॥
টুটুক পিয়াসা, মিটুক গোল।
পরাণ আমার দোল দোল॥

'প্রসাদ'

মোক্ষ |

আত্মতত্ত্ব।

(কার্ত্তিক, ১৩২১ সংখ্যার পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হে শিষ্য! যাজ্ঞবল্ক্য আপনার মনোমধ্যে এই প্রকার বিচার করিয়া মৈত্রেয়ী স্ত্রীকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন,—"হে মৈত্রেয়ি, আমি এক্ষণে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া চতুর্থ সংন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিতেছি। এই বার্ত্তা তুমি অঙ্গীকার কর। হে মৈত্রেয়ি! আমার গৃহে যত সুবর্ণ গাভী প্রভৃতি ধন আছে, সেই ধন দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ আমি তোমাকে দিতেছি; আর দ্বিতীয় ভাগ আমি কাত্যায়নীকে দিতেছি। আমি গৃহ ত্যাগ করিয়া গেলে এই ধন দ্বারা তোমাদের উভয় স্ত্রীর সুখ লাভ হইবে।" হে শিষ্য! এই প্রকার বচন যখন যাজ্ঞবল্ক্য মুনি মৈত্রেয়ী স্ত্রীকে বলিলেন, তখন সংসারভারাক্রান্তা এবং সংসার-দুঃখে কাতরা সেই মৈত্রেয়ী এই অবসর পাইয়া যাজ্ঞবল্ক্য মুনিকে বলিল;—"হে ভগবন্, যে ধন প্রাপ্তি দ্বারা আমি মৃত্যুরহিত হইব, এরূপ ধন পাইতে আমি ইচ্ছা করিতেছি; আর যেধন প্রাপ্তি দ্বারা ইহলোকে মরণ প্রাপ্তি হয়, সেই ধন প্রাপ্তির ইচ্ছা আমি করিতেছি না। হে ভগবন্, সুবর্ণাদি ধন দ্বারা পূর্ণ এই সসাগরা পৃথিবী যদি কখন আপনি আমাকে দেন, তাহা হইলে সেই ধন প্রাপ্তি দ্বারা আমি অমৃতভাব প্রাপ্ত হইব, অথবা সেই ধন দ্বারা আমি অমৃত ভাব প্রাপ্ত হইব না; এই দুই পক্ষের মধ্যে এক পক্ষ আপনি নিশ্চয় করিয়া আমাকে বলুন। তদনন্তর বিচার করিয়া আমি আপনার ধন লইব।" ইহা যখন মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য মুনিকে বলিল, তখন যাজ্ঞবল্ক্য মুনি সুবর্ণাদি ধন দ্বারা এই জীবের অমৃত

ভাব প্রাপ্তি হয় না এই দ্বিতীয় পক্ষ অঙ্গীকার করিয়া মৈত্রেয়ীকে এই প্রকার বাক্য বলিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "হে মৈত্রেয়ি, এই সুবর্ণাদি রূপ নাশবান ধন দ্বারা কোন দেহধারী জীব মোক্ষরূপ অমৃত ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। তদ্বিপরীতে সেই সুবর্ণাদি ধন দ্বারা এই জীব মরণকেই প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে সুবর্ণাদি ধন বিষয়ে মৃত্যুর কারণতা অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা নিরূপণ করা যাইতেছে। ইহলোকে যত ধনবান্ পুরুষ আছে তাহারা রাজা হইতে, চোর হইতে এবং অন্য দুষ্ট পুরুষ হইতে, অনেক প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হে মৈত্রেয়ি, ইহলোকে এরূপ কোন ধনবান্ পুরুষ নাই যিনি চিন্তারহিত হইয়া কালযাপন করেন; পরন্তু এই ধনবান্ পুরুষের স্বপ্নাবস্থায়ও রাজা, চোর, অগ্নি আদির ভয় নিরন্তর থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, যখন স্বপ্নাবস্থায়ও ধনবান্ পুরুষ রাজাদির ভয় বিনির্ম্মুক্ত হন না, তখন জাগ্রত অবস্থায় রাজাদির ভয়রহিত কি প্রকার হইবেন? আর হে মৈত্রেয়ি, ইহলোকে ধনহীন যে নির্ধন পুরুষ তাহাদের ত রাজাদির ভয় নাই এবং বিশেষ রূপে রোগাদিও হয় না, সুতরাং সেই নির্ধন পুরুষের শরীরেও অনেক বল আছে এবং সেই নির্ধন পুরুষের জঠরাগ্নিও প্রজ্বলিত থাকে। অতএব এই জানা যাইতেছে যে, সেই নির্ধন পুরুষের উপর দৈবও প্রসন্ন এবং অনুকূল। এক্ষণে ধনী পুরুষের উপর দৈবের প্রতিকূলতা দেখান যাইতেছে। হে মৈত্রেয়ি, ইহলোকে যে ধনবান্ পুরুষ তাঁহার উপর বিশেষ রূপেত দৈব প্রতিকূল থাকেন। কারণ ইহলোকে প্রধানতঃ ধনী পুরুষই রোগীই থাকেন এবং সেই ধনবান পুরুষের ক্ষুধা হয় না এবং তাঁহার অসুখও অল্প হয়। এবং বহুধন প্রাপ্ত হইলেও সেই ধনীর তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয় না। আরও ধনী ব্যক্তি আপনার জ্ঞাতি বন্ধুবর্গের প্রতিও মনে মনে বিদ্বেষ রাখেন, সুতরাং সর্ব্বদা অসুখী থাকেন। এবং কোন কোন ধনীও কুকুরের ন্যায় প্রসিদ্ধই আছেন। তাঁহারা পুত্রাদি বন্ধু-বর্গের সহিত বিদ্বেষ করেন। আর এই কার্য্য আমি করিব এবং এই কার্য্য আমি করিব না—এই প্রকার চিন্তা করিয়া নিরন্তর ব্যাকুলই থাকেন। এইরূপ চিন্তা-যুক্ত সেই ধনবান্ পুরুষগণ কিঞ্চিন্মাত্রও সুখ প্রাপ্ত হন না। আর ইহলোকে মহাত্মা দয়ালু পুরুষ নির্ধন ব্যক্তির প্রতি কৃপা করিয়া যেরূপ স্নেহ করেন, সেরূপ স্নেহ তিনি ধনবান্দিগের উপর করেন না। আর ইহলোকে ধনমদে গর্ব্বিত হইয়া এই ধনী ব্যক্তি যে প্রকার পাপ কর্ম্ম করেন, সেইরূপ পাপ কর্ম্ম এই নির্ধন ব্যক্তি রাজা প্রভৃতির ভয়ে করিতে সাহস করে না। আর ইহলোকে ধনবান্ পুরুষ

ধনমদে মত্ত হইয়া দেবতাদিগকেও অবজ্ঞা করে; গুরুকেও অবজ্ঞা করে, অতিথিদিগকে অবজ্ঞা করে এবং দেবতা ব্রাহ্মণদিগকেও অবজ্ঞা করে, বেদবেত্তা জ্ঞানী পুরুষকেও অবজ্ঞা করে। এই ধনবান্ পুরুষ স্বপক্ষে স্থিত জীবের এবং শত্রুপক্ষে স্থিত জীবের উপর উপদ্রব করে। এই সকল কারণে সেই ধনবান্ পুরুষ ইহলোকে এবং পরলোকে নানা প্রকার দুঃখ পাইয়া থাকে। কিন্তু ইহলোকে যে সকল নির্ধন দরিদ্র পুরুষ আছে, তাহারা অন্য জীবকে পীড়ন করিতে সমর্থ নহে; সুতরাং তাহারা সেইরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হয় না। অতএব ধনবান্ পুরুষ অপেক্ষা নির্ধন পুরুষ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। হে মৈত্রেয়ি, যদি তুমি সুবর্ণাদিরূপ ধন লইতে স্বীকার কর, তবে ইহলোকে যেরূপ প্রসিদ্ধ ধনী লোকের জীবন হইয়া থাকে, সেই ধন দ্বারা তোমারও জীবন সেইরূপ হইবে। আর যেরূপ ইহলোকে ধনের আসক্তি প্রযুক্ত চলচিত্ত ধনবান্ পুরুষের মোক্ষরূপ অমৃত ভাব প্রাপ্তির আশা নাই, সেইরূপ ধনের আসক্তি দ্বারা তোমারও মোক্ষরূপ অমৃতের আশা থাকিবে না। হে মৈত্রেয়ি, ধনবান্ পুরুষের অমৃত ভাব প্রাপ্তি হইবে না, এ বিষয়ে কারণ এই যে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিরূপ যে মোক্ষ তাহার নাম অমৃত। সেই মোক্ষরূপ অমৃত লাভ দেহাদিতে 'অহং মম' অভিমান নিবৃত্তি বিনা হইবে না। সুতরাং দেহাদিতে 'অহং মম' অভিমান নিবৃত্তি সেই মোক্ষরূপ অমৃতের কারণ। আর সেই 'অহং মম' অভিমান নিবৃত্তি অজ্ঞান নিবৃত্তি বিনা হইবে না, সুতরাং সেই অজ্ঞান-নিবৃত্তি 'অহং মম' অভিমান নিবৃত্তির কারণ। কিন্তু সেই অজ্ঞান নিবৃত্তি আনন্দস্বরূপ আত্মার জ্ঞান বিনা হইবে না। সুতরাং এই আত্মজ্ঞান অজ্ঞান নিবৃত্তির কারণ। কিন্তু ধনের আসক্তি দ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত ধনবান্ পুরুষের চিত্তে সেই আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। আর সেই আত্মজ্ঞানের অভাব হওয়াতে ধনী পুরুষের অজ্ঞানও নিবৃত্তি হয় না। আর অজ্ঞান বিদ্যমান থাকিতে অজ্ঞানের কার্য্যরূপ সূক্ষ্ম শরীরও নিবৃত্তি হইবে না। সূক্ষ্ম শরীর বিদ্যমানে সূক্ষ্ম শরীরের আশ্রিত পুণ্য পাপ কর্ম্মও নাশ হইবে না। পুণ্য পাপ কর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলে, পুনঃ স্থূল শরীর প্রাপ্তি অবশ্যই হইবে। এই স্থূল শরীর প্রাপ্ত হইলে, জীব পূর্ব্বজন্মের পুণ্য পাপ কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ অবশ্যই ভোগ করিবে; এবং পূর্ব্বের সংস্কারবশে এই জীব পুনর্ব্বার পুণ্য পাপ কর্ম্ম করে এবং প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করিয়া পুনরায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর মরণানন্তর সেই অজ্ঞানী জীব পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ আত্মজ্ঞানহীন সেই ধনবান্ পুরুষ ঘটীযন্ত্রের ন্যায় নিরন্তর সংসারে ভ্রমণ করে। এরূপ ধনী ব্যক্তির মোক্ষরূপ অমৃত

প্রাপ্তির কোন আশা নাই। সুতরাং সুবর্ণাদি রূপ ধন দ্বারা মোক্ষরূপ অমৃত প্রাপ্তি হয় না ; এই অর্থ সিদ্ধ হইল। হে শিষ্য ! যাজ্ঞবল্ক্য মুনি যখন মৈত্রেয়ীকে এইরূপ বলিলেন, তখন মৈত্রেয়ী বলিল, "হে ভগবন্, সুবর্ণাদিরূপ ধনপ্রাপ্তি দ্বারা যখন মোক্ষরূপ অমৃত প্রাপ্তির আশা নাই, তদ্বিপরীতে মৃত্যুই প্রাপ্ত হয়,—তখন মোক্ষ পাইতে অভিলাষিণী আমি মৈত্রেয়ী এই সুবর্ণাদি ধন লইয়া কি করিব ? পরন্তু এই ধন দ্বারা আমার কিছুমাত্রও প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। অতএব আপনার সমস্ত ধন কাত্যায়নীকে দিন। আমার এই ধনপ্রাপ্তির ইচ্ছা নাই।" শঙ্কা। হে মৈত্রেয়ি ! এই সুবর্ণাদি ধন যদি তুমি অঙ্গীকার না কর, তাহা হইলে তোমার শরীরের ভোগ ও তাহার রক্ষার জন্য আহারাদি ব্যবহার কিরূপে চলিবে ? সমাধান। হে ভগবন্ ! ভোগ প্রারব্ধাধীন, তজ্জন্য জীবের চিন্তার কি কারণ আছে ? ভোগ বিষয়ে প্রারব্ধ বা দৈব মুখ্য, এবং পুরুষকার গৌণ অর্থাৎ উপলক্ষ মাত্র ; পরন্তু অপবর্গ বা মোক্ষ সম্বন্ধে দৈব গৌণ এবং পুরুষকার মুখ্য। যোগবাশিষ্টে ইহা স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত হইয়াছে। আহারাদি ব্যবহার সম্বন্ধে যেরূপ সন্ন্যাস আশ্রম ধারণ করিয়া আপনি শরীরের নাশ পর্য্যন্ত ভিক্ষা অন্ন দ্বারা আপনার শরীর নির্ব্বাহ করিবেন সেইরূপ আমিও এই শরীর নাশ পর্য্যন্ত ভিক্ষা অন্ন দ্বারা আপনার শরীর নির্ব্বাহ করিব। সুতরাং আমার জীবন রক্ষার জন্য আপনি কিঞ্চিন্মাত্রও চিন্তা করিবেন না। হে ভগবন্, পূর্ব্বে মাতার উদরে দশ মাস দশ দিন পর্য্যন্ত যে বিশ্বম্ভরদেব আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই বিশ্বম্ভরদেব এখনও আমাকে রক্ষা করিবেন। আর যে বিশ্বম্ভরদেব আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত নিখিল জীবের অন্তরে বিদ্যমান থাকিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে নিরন্তর চালাইতেছেন, বিশেষতঃ ভক্তজনের ভার নিজেই বহন করিয়া থাকেন, সেই বিশ্বম্ভরদেবের প্রেমে যদি আমি অনন্যমনে নিরন্তর অনুরক্ত থাকি, তাহা হইলে তিনিই আমার শরীরের যোগক্ষেম বহন করিবেন। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবংগীতায় শ্রীকৃষ্ণদেব স্বয়ং বলিয়াছেন :—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥" গীতা।

সুতরাং এরূপ বিশ্বম্ভর পরমাত্মা দেব বিদ্যমান থাকিতে আপনার শরীরের চিন্তা করা উচিত নহে। হে ভগবন্, যদি কখন ভিক্ষা অন্ন না পাইয়া আমার শরীর নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলেও আমার ভয় নাই। তদ্বিপরীতে এই শরীর নাশ হইলে, আমি পরমেশ্বরের কৃপা বলিয়া মানিব। কারণ এই শরীর,

বিষ্ঠা মূত্রাদি মল দ্বারা পূর্ণ; সুতরাং এই শরীর অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত; এবং এই শরীর অনেক ব্যাধি দ্বারা গ্রাসিত; সুতরাং নানাপ্রকার দুঃখের কারণ এবং এই শরীর অশুভ প্রবৃত্তি দ্বারা বহু পাপের কারণ। এরূপ নিন্দিত শরীরে আমার কিছুমাত্রও আসক্তি নাই। শঙ্কা হে মৈত্রেয়ি! তোমার শরীরে যদি তোমার আসক্তি না থাকে, তাহা হইলে এই শরীর রক্ষার জন্য তুমি অন্নাদি ভক্ষণ কি নিমিত্ত কর? সমাধান। হে ভগবন্! যেরূপ ইহলোক রাজার ভৃত্য কোন লোককে বলপূর্ব্বক কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত করে, সেইরূপ আমি মৈত্রেয়ী পরাধীনতা প্রযুক্ত ভোজনাদি ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। শরীরের প্রতি অনুরূপ প্রযুক্ত আমি ভোজনাদি বিষয়ে প্রবৃত্ত হই না। চণ্ডীতে উক্ত আছে—

"জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥"

পুনশ্চ জানা যায়—

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ, জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

এক্ষণে অন্ন-ভোজন-বিষয়ে দোষ নিরূপণ করা যাইতেছে। "হে ভগবন্, অন্ন ভোজন করিলে জীবের চিত্তে কাম ক্রোধ লোভ মোহ উৎপন্ন হয় এবং অন্নের ভোজন হইতে এই জীবে নিদ্রা তন্দ্রাদি দোষ জন্মে, এবং বিষ্ঠা মূত্রাদি মল বৃদ্ধিও অন্নের ভোজন দ্বারা হইয়া থাকে, এবং অন্নের ভোজন দ্বারাই এই জীবের নেত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন শরীর আপন আপন ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়। সেই নেত্রাদির প্রবৃত্তি হইতে এই জীবে অনেক প্রকার পাপ উৎপন্ন হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি আহার-রহিত ক্ষুধাজয়ী, সেই ব্যক্তির নেত্রাদি ইন্দ্রিয় কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। হে ভগবন্! অন্ন ভোজন না করিলে এই জীবের এক ক্ষুধা-পীড়া উৎপাদন করে, কিন্তু অন্ন ভোজন করিলে এই জীবের কাম ক্রোধাদি অনেক শত্রু পীড়া প্রদান করে। হে ভগবন্! পূর্ব্বে কামরূপ দোষ আমাকে যে যে দীন অবস্থা প্রাপ্ত করিয়াছিল, আমার সেই সেই দীন অবস্থা আপনি জানেন। এই জন্য আপনার নিকট আমি সেই নিজের দীন অবস্থার বিষয় বলিতেছি না। হে ভগবন্, সেই কামরূপ বৃক্ষের গর্ভরূপ ফল আমার ন্যায় স্ত্রীলোকের শীঘ্রই হয়। সেই গর্ভ-ধারণ সময়ে এবং সেই গর্ভ পরিত্যাগ কালে স্ত্রীলোকের যে দুঃখ হয়, তাহা নরকদুঃখ হইতে এবং মরণদুঃখ হইতে কোটী গুণ অধিক। হে ভগবন্, যেরূপ ইহলোকে

কুচ্‌লের বৃক্ষে জীবকে বিষরূপ ফল প্রদান করে, সেইরূপ এই কামরূপ বৃক্ষে আমার ন্যায় সকল স্ত্রীলোককে নানাপ্রকার দুঃখরূপ ফল প্রদান করে। সেই দুঃখের অনুভব যেরূপ আমার ন্যায় স্ত্রীলোকের আছে, সেরূপ পুরুষের নাই। হে ভগবন্, এরূপ দারুণ দুঃখ সহ্য করিয়াও আমার এই শরীর নাশ প্রাপ্ত হয় নাই, ইহাই অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। সুতরাং ইহা জানা যাইতেছে যে, ব্রহ্মা স্ত্রীলোকের শরীরে কোন বজ্ররূপ উপাদান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। হে ভগবন্, এই কামদ্বারা যে প্রকার দুঃখ আমি পাইয়াছি, সেই প্রকার দুঃখ ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি দ্বারাও আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সমস্ত দুঃখ আমি আপনার চিত্তে অনুভব করিতেছি। আপনি তো সর্ব্বজ্ঞ; এই কারণে আপনার সমীপে সেই দুঃখ বর্ণন করিতেছি না। আর হে ভগবন্, অন্ন ভোজন করিলে যে কাম ক্রোধাদি অনেক প্রকার বিকার উৎপাদন হয়, সেই কাম ক্রোধাদি বিকার দ্বারা যদি কদাচিৎ আমার মৃত্যু হয়, সেই মৃত্যু অপেক্ষা ক্ষুধা-জন্য মৃত্যুকে আমি অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ মনে করি। কারণ, যেরূপ ইহলোকে এক বীরপুরুষ একই বীরপুরুষের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ, এক বীরপুরুষ অনেক বীরপুরুষের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহে। যদি কখন এক বীরপুরুষ অনেক বীরপুরুষের সহিত যুদ্ধ করে, তাহা হইলে সে সেই যুদ্ধ দ্বারা ক্লেশই প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ কাম ক্রোধাদি অনেক বিকারের মধ্যে প্রবল যে এই ক্ষুধারূপ বিকার, সেই এক ক্ষুধার সহিত যুদ্ধ করিতে যদ্যপি আমি সমর্থ আছি, তথাপি অনেক কাম ক্রোধাদি বিকারের সহিত যুদ্ধ করিতে আমি সমর্থ নহি। সুতরাং হে ভগবন্, ধন গ্রহণ না করিলে যদি আমার এই শরীর নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে আমার উপর হইতে দুর্গন্ধ শরীর রূপ ভার উঠিয়া যাইবে। এই শরীর রক্ষা করিবার জন্য আমার কিঞ্চিন্মাত্রও অনুরাগ নাই। পরন্তু এই ভারত-খণ্ডে, একমাত্র মোক্ষ স্থানে, অধিকারী মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হইয়া আত্মজ্ঞান-হীন হইয়া, আমি মৈত্রেয়ী এই শরীর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু যেরূপ আপনি আত্মজ্ঞান দ্বারা সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেইরূপ আমিও আত্মজ্ঞান সম্পাদন করিয়া পশ্চাৎ যদি শরীর পরিত্যাগ করি তো ভাল হয়। সুতরাং হে ভগবন্, যদি আপনার আমার উপর দয়া হয় এবং আপনি মোক্ষরূপ অমৃত প্রাপ্তির উপায় জানেন, তাহা হইলে তাহা কৃপা করিয়া আমাকে উপদেশ করুন, যদ্দ্বারা আমিও মোক্ষরূপ অমৃত প্রাপ্ত হইব।

হে শিষ্য, এই প্রকার যখন মৈত্রেয়ী ধনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য প্রদর্শন

করিলেন, তখন যাজ্ঞবল্ক্য মুনি আপনার মনে এই প্রকার বিচার করিয়া মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা অঙ্গীকার করিলেন। এক্ষণে সেই বিচার নিরূপণ করা যাইতেছে। ইহলোকে যদ্যপি এই জীব ধন দ্বারা কামরূপ পুরুষার্থ এবং ধর্ম্মরূপ পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইতে পারে বটে, তথাপি সেই ধনদ্বারা জীব মোক্ষরূপ অমৃত কখনও প্রাপ্ত হইতে পারে না। আর ধনদ্বারা জীবের যে স্ত্রী প্রভৃতি বিষয়ের সম্বন্ধরূপ কাম লাভ হয়, সেই কাম বাস্তবিক বিচার করিয়া দেখিলে তো জীবের দুঃখেরই সাধন। পরন্তু যেরূপ পথশ্রান্ত পুরুষের সমীপে দুঃখের কারণ যে পদ-প্রহার তাহাও সুখের কারণ বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ বিষয়াসক্ত ভ্রান্ত পুরুষের নিকট, কাম নিজে দুঃখের কারণ হইলেও সুখের কারণ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। কিংবা বাস্তবিক বিচার করিয়া দেখিতে গেলে বিষয়-জন্য সুখের সুখরূপতা সম্ভব নহে। কিন্তু সেই বিষয় জন্য সুখে দুঃখরূপতাই সম্ভব। পরন্তু বিষয়াসক্ত লোকের দৃষ্টিতে যদি কখন সেই বিষয়-জন্য সুখে সুখরূপতা অঙ্গীকারও করা যায়, তাহা হইলেও বিষয়ে কিংবা ধনে সেই সুখের কারণতা সম্ভব নহে। পরন্তু ব্রহ্মানন্দই আভাসরূপে প্রতিফলিত হয় মাত্র। প্রথমতঃ বিষয়ে সেই সুখের কারণতা সম্ভব নহে; কারণ বিষয় জড়। বিষয়ের লালসায় চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকিলে, তাহা নিরন্তর চঞ্চল থাকে। যখন সেই বিষয় লাভ হয়, তখন চিত্ত স্থির হইয়া যায় সুতরাং তৎকালে সত্ত্বগুণের কার্য্য যে স্বচ্ছ মন তাহাতে ব্রহ্মানন্দ প্রতিফলিত হয়। এজন্য সেই আনন্দাভাসকে আমরা প্রকৃত আনন্দ বোধে ভ্রান্ত হই, বাস্তবিক তাহা আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের আনন্দাভাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিষয় জড়, সুতরাং তাহাতে কোন কালেই আনন্দ থাকিতে পারে না। যে বিষয় আজ আনন্দদায়ক, তাহা কাল পরম দুঃখের আস্পদ হয়। বিষয়ে আনন্দ থাকিলে এরূপ হইত না; উহা সকল কালেই এক রকম থাকিত। সুতরাং বিষয়ে সুখের কারণতা নাই স্থিরীকৃত হইল। দ্বিতীয়তঃ ধনেও সুখের কারণতা সম্ভব নহে; কারণ ধনহীন যে শ্বানাদি পশু তাহারাও আপনার স্ত্রীর সহিত সম্ভোগ করিয়া বিষয়সুখ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং স্ত্রীরূপ বিষয়-জন্য সুখে ধনের কারণতা সম্ভব নহে। আর ধনহীন যে ভ্রমর তাহারাও নানাপ্রকার পুষ্পের সুগন্ধ গ্রহণ করিয়া সুখ লাভ করে। সুতরাং গন্ধরূপ বিষয়-জন্য সুখে ধনের কারণতা সম্ভব নহে। আর ধনহীন যে শুক কোকিলাদি পক্ষী তাহারাও আম্রাদি ফলের রস গ্রহণ করিয়া সুখ প্রাপ্ত হয়; সুতরাং রসরূপ বিষয়-জন্য সুখেও ধনের কারণতা সম্ভব নহে। আর বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদিগের মন্দিরে

যে গাভী প্রভৃতি পশু থাকে এবং অন্য নির্ধন পুরুষ থাকে, তাহারাও নানাপ্রকার গীতবাদ্য শব্দ শ্রবণ করিয়া সুখ লাভ করে ; সুতরাং শব্দরূপ বিষয় জন্য সুখের ধনের কারণতা সম্ভব নহে। আর ইহলোকে ধনহীন যে দরিদ্র পুরুষ তাহারাও বারাঙ্গনাদি সুন্দরী স্ত্রীর রূপ দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করে ; সুতরাং রূপ-বিষয়জন্য সুখেও ধনের করণতা সম্ভব নহে। আর ধনহীন যে মক্ষিকাদি জীব, তাহারাও দুর্লভ রাজার স্ত্রীর স্পর্শ লাভ করিয়া সুখ প্রাপ্ত হয় ; সুতরাং স্পর্শ-রূপ বিষয়জন্য সুখেও ধনের কারণতা সম্ভব নহে। যদ্যপি ইহলোকে কোন কোন লোক ধনদ্বারা বিষয়সুখ প্রাপ্ত হয় বটে, সুতরাং ধন বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ বিষয়সুখের কারণতা সম্ভব ; তথাপি যে বস্তু সম্পূর্ণ কার্য্য-অভিব্যক্তির নিয়ম-পূর্ব্বক জনক হয় তাহাকে শাস্ত্রে কারণ কহিয়াছে ; কিন্তু যে বস্তু কোন কোন কার্য্য-অভিব্যক্তির জনক হইবে তাহাকে শাস্ত্রে কারণ কহে নাই। আর যে বস্তু কোন কোন কার্য্যে ব্যক্তির জনক হইবে আর কোন কোন কার্য্যে ব্যক্তির জনক না হইবে, সেই বস্তুকে শাস্ত্রে 'কারণ' কহে নাই। যেরূপ মৃত্তিকা দণ্ড চক্র কুলাল এই চারি নিয়মপূর্ব্বক সম্পূর্ণ ঘটের জনক, সুতরাং এই চারি, ঘটের কারণ। আর এই কুলালের গৃহে স্থিত যে রাসভ (গর্দ্দভ) যে যৎকিঞ্চিৎ ঘটের জনক, তথাপি সেই রাসভ সম্পূর্ণ ঘটের জনক নহে। এজন্য সেই রাসভ ঘটের কারণ নহে। কিন্তু অন্যথা সিদ্ধ হইতেছে। সেইরূপ এই ধন যদ্যপি পুরুষের বিষয় সুখের যৎকিঞ্চিৎ জনক, তথাপি এই ধন পশু আদি, সর্ব্বজীবের বিষয়-সুখের জনক নহে। সুতরাং এই ধন বিষয়সুখের কারণ নহে। কিন্তু রাসভের ন্যায় অন্যথা সিদ্ধ হইতেছে। কিংবা ইহলোকে ধনি-পুরুষ ধন দ্বারা সম্পূর্ণ বিষয়সুখ প্রাপ্ত হইতে পারে না ; কিন্তু সেই ধনবান্ পুরুষ যৎকিঞ্চিৎ বিষয়সুখ প্রাপ্ত হন। সেই যৎকিঞ্চিৎ বিষয়সুখ নির্ধন পুরুষও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং বিষয়জন্য সুখে ধনের কারণতা সম্ভব নহে। কিংবা যেরূপ বিষয়-জন্য সুখে ধনের কারণতা সম্ভব নহে, সেইরূপ স্বর্গাদিসুখের হেতু যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম বিষয়েও ধনের কারণতা সম্ভব নহে। কারণ মুদ্গল ব্রাহ্মণ প্রভৃতি যে নির্ধন পুরুষ, তাহারাও অতিথি সেবা প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন. ইহা শাস্ত্রে শুনা যায়। সুতরাং ধন দ্বারাই এই পুরুষের ধর্ম্ম প্রাপ্তি হয়, এই প্রকার নিয়ম সম্ভব নহে। তদ্বিপরীতে কত ধনবান্ পুরুষ তো ধনমদে মত্ত হইয়া নরকই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শঙ্কা। স্বর্গপ্রাপ্তির সাধন যে অশ্বমেধ যজ্ঞ, সেই যজ্ঞ ধন বিনা হয় না ; সুতরাং ধনই স্বর্গপ্রাপ্তির সাধন। সমাধান। অশ্বমেধ

যজ্ঞ বিনা অন্য কোন উপায় দ্বারা যদি কখন এই জীবের স্বর্গপ্রাপ্তি না হইত, তাহা হইলে ধন বিষয়েই স্বর্গের কারণতা সম্ভব হইত। পরন্তু স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য শাস্ত্রে তপ জপ ব্রত প্রভৃতি অনেক প্রকার সাধন কথিত হইয়াছে। সেই জপাদি সাধন দ্বারাও এই জীবের স্বর্গপ্রাপ্তি হইতে পারে।

অতএব ধনই স্বর্গ প্রাপ্তির সাধন এই প্রকার নিয়ম সম্ভব নহে। কিংবা যে বাদী ধনকে মোক্ষের কারণ স্বীকার করেন, সেই বাদীও ধনকে মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ স্বীকার করেন না; কিন্তু যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা এই ধনকে মোক্ষের কারণ বলেন। সমুচ্চয় বাদীদিগের এই মত অদ্বৈত বাদীদিগের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত বা খণ্ডিত হইয়াছে। স্বারাজ্যসিদ্ধি নামক গ্রন্থে বহু শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণে কথিত হইয়াছে—

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপানাপহানির্নান্যঃ পন্থাশ্চেতি ভূয়ো বচোভিঃ।
জ্ঞপ্তে সাক্ষান্মুক্তিহেতুত্বসিদ্ধাবধ্যাসত্বং বন্ধনস্যার্থসিদ্ধম্॥

অর্থঃ। শ্বেতাশ্বতর বচন যথা,—দেবের জ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববন্ধন নিবৃত্তি হইয়া যায়। সংসার অসার না হইলে শ্রুতি বাক্যের এরূপ কথন সম্ভব হইত না। "নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে হি অয়নায়" যজুর্ব্বেদের এরূপ বহু বচন দ্বারা বেদ সাক্ষাৎ জ্ঞান দ্বারা মুক্তি কহিতেছেন; তাহাও সংসার মিথ্যা না হইলে হইতে পারে না। সুতরাং সংসার মিথ্যা ইহা অর্থ হইতেই সিদ্ধ হইতেছে। "জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ে মিলিত হইয়া মুক্তি প্রদান করে" এই সমুচ্চয় বাদীদিগের মত নিম্নলিখিত ফুট নোট দ্বারা নিরস্ত হইয়াছে।* সেই যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হয় মাত্র। যজ্ঞাদি কর্ম্মে

---

* স্বারাজ্যসিদ্ধি নামক প্রমেয় গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় দ্বারা সমুচ্চয়-বাদ সংক্ষেপে সম্পূর্ণ রূপে নিরস্ত হইয়াছে। অতএব বিদ্বান্ মুমুক্ষু পাঠকমণ্ডলী ইহার অর্থ সবিশেষ অবগত হইয়া শ্রুতি-অনুকূল তর্ক বা মনন দ্বারা বেদান্ততাৎপর্য্য যে অদ্বৈত ভাব তাহা সম্যক্‌রূপে নিঃসংশয়িত ভাবে উপলব্ধি করিতে যত্নবান্ হইবেন। তাঁহাদের বোধ-সৌকর্য্যার্থে আমি এই শ্লোকদ্বয়ের সংক্ষেপ টীকা দিলাম।

"সত্যং ভাবং ন চিত্তির্ব্যপনুদতি যতঃ কর্ম্মনাশ্যো ঘটাদি-
র্মিথ্যাভূতং চ কর্ম্ম ক্ষপয়তি ন তথা চিত্তিঘাত্যং যতস্তৎ।
ইত্থং সিদ্ধে বিভাগে শ্রুতিশিখরগিরা চিত্তিঘাত্যঃ প্রতীতো
বন্ধো মিথ্যেতি সিদ্ধে ন তদপহতয়ে কর্ম্মজাতং সমর্থম্॥

টীকা।—লোকে ঘটাদি ভাব পদার্থঃ কর্ম্মনাশ্যঃ প্রহারাদি ক্রিয়াবিনাশ্যঃ প্রসিদ্ধঃ যতঃ অতঃ চিত্তিঃ জ্ঞানম্ সত্যং অনারোপিতং ভাবং ভাবপদার্থম্ ন ব্যাপনুদতি ন নাশয়তি তথা কর্ম্ম ক্রিয়া মিথ্যাভূতম্ আরোপিতং শুক্তিরজতাদি ন ক্ষপয়তি ন নাশয়তি যতঃ লোকে তৎ মিথ্যাভূতং বস্তু চিত্তিঘাত্যম্ অধিষ্ঠানজ্ঞাননাশ্যম্ প্রসিদ্ধম্। ইত্থম্ অমুনা প্রকারেণ বিভাগে বস্তুস্বভাবজ্ঞানে সিদ্ধে সতি শ্রুতিশিখরগিরা বেদান্তবাক্যেন চিত্তিঘাত্যঃ জ্ঞানবিনাশ্যঃ সন প্রতীতঃ নিশ্চিতঃ

মোক্ষের কারণতা সম্ভব নহে। জ্ঞান ও কর্ম্ম সম্পূর্ণ বিরোধী। জ্ঞান দ্বারা মনোনাশ হয়, সুতরাং মোক্ষের দিকে তাহার গতি। কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, সুতরাং জগতের দিকে তাহার গতি। যখন যজ্ঞাদি কর্ম্মেই মোক্ষের কারণতা সম্ভব নহে, তখন ধন বিষয়ে মোক্ষের কারণতা কিরূপ সম্ভব হইতে পারে? আর স্বর্গাদিপ্রাপ্তি সম্বন্ধে যেরূপ যজ্ঞাদি কর্ম্মের কারণতা রহিয়াছে, সেইরূপ জপ তপ ব্রতাদি কর্ম্মেও স্বর্গপ্রাপ্তির কারণতা আছে। সুতরাং এই অর্থ সিদ্ধ হইল যে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ যদ্যপি একমাত্র ধনদ্বারা অনুষ্ঠান করা যায় বটে, তথাপি ধন দ্বারা মোক্ষরূপ অমৃত প্রাপ্তি হইবে না। হে শিষ্য! মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যমুনি মৈত্রেয়ীকে বলিলেন, "হে প্রিয়ে মৈত্রেয়ি, ধনে বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়া মোক্ষরূপ অমৃতপ্রাপ্তির সাধন যে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা শুনিয়া আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি। হে মৈত্রেয়ি, ইহলোকে এই পুরুষ পুত্ররূপে প্রীতিযুক্ত হইয়া যে স্ত্রীর গর্ভ হইতে উৎপন্ন হয় (আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ)। সেই স্ত্রীর নাম জায়া, এই প্রকার আত্মার জায়া এক তুমিই। কারণ এই তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিভাবাপন্ন আমি যাজ্ঞবল্ক্য তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি। সুতরাং তোমার ন্যায় যে বিচারবতী স্ত্রী তিনিই জায়া নামে কথন করিবার যোগ্য। আর তোমার ন্যায় বিচারবতী স্ত্রী ভিন্ন যত লৌকিক স্ত্রী আছে, তাহারা সকলেই অন্নবস্ত্র ভূষণাদি যাচ্ঞা করিয়া আপনার পতিকে নানা প্রকার ক্লেশ প্রদান করে, সুতরাং সেই সকল স্ত্রী জায়া নামে কথন করিবার

বন্ধঃ মিথ্যা ইতি সিদ্ধে তদপহতয়ে বন্ধবিনাশায় কর্ম্মজাতং অগ্নিহোত্রাদি পুণ্যকর্ম্মসমূহং ন সমর্থম্ নিজস্বভাবাদিতি ভাবঃ॥

নম্বেবমপি অজ্ঞানবিরোধি জ্ঞানস্য অবিরোধি জগদ্বন্ধনিবর্ত্তকত্বং কথমিত্যাশঙ্কাম্ পসুদন্ জ্ঞানোপায়ে প্রবর্ত্তয়তি, আবিদ্য ইতি—

"আবিদ্যো হ্যেষ বন্ধো বিরমতি ন বিনা:বেদনং কর্ম্মজালৈ-
র্মালোদ্ভূতোঽহিরন্তং ব্রজতি কিমু নমস্কারমন্ত্রৌষধাদ্যৈঃ।
এবং নিশ্চিত্য নাগত্বচমিব বিধিনা কর্ম্মবন্ধং বিধূয়
জ্ঞানোপায়ে শ্রীগুরুচরণমভিগতঃ সেবমানো যতেত॥"

টীকা।—গুরোঃ তত্ত্বনিষ্ঠস্য গুরোঃ শ্রীচরণম্ অভিগতঃ সম্মুখং গতঃ সন্ সেবমানঃ জ্ঞানোপায়ে শ্রবণাদৌ যতেত যত্নং কুর্য্যাৎ। কিং কৃত্বা এবং উক্তপ্রকারেণ নিশ্চিত্য নিশ্চয়ং কৃত্বা বিধিনা শাস্ত্রোক্তপ্রকারেণ কর্ম্মবন্ধং কর্ম্মবন্ধনম্ বিধূয় সম্যক্ ত্যক্ত্বা কঃ কিমিব নাগঃ সর্পঃ ত্বচম্ জীর্ণকঞ্চুকম্ ইব এবম্ কথম্ মালোদ্ভূতঃ মালায়াং কল্পিতঃ অহিঃ সর্পঃ নমস্কারমন্ত্রৌষধাদ্যৈঃ উপায়ৈঃ অন্তম্ নাশম্ কিমু ব্রজতি কিন্তু ন ব্রজতি, তদ্বৎ এব বন্ধঃ বেদনম্ অধিষ্ঠানজ্ঞানম্ বিনা কর্ম্মজালৈঃ কর্ম্মসমূহৈঃ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসমূহৈঃ ন বিরমতি ন নশ্যতি. কুতঃ হি যতঃ আবিদ্যঃ অবিদ্যোদ্ভূতঃ অজ্ঞানমূলক ইতিযাবৎ শ্রুত্যাদ্যুক্ত জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বোক্তাজ্ঞানগুণত্বাজ্ঞানাকার্য্য-বন্ধোঽজ্ঞানমেবেতি ভাবঃ।

যোগ্যা নহে; কিন্তু তাহারা ললনা, ভার্য্যা ইত্যাদি নামের যোগ্য। হে মৈত্রেয়ি! ইহলোকে আমার ন্যায় তুমিও ধনাদি পদার্থের কামনা পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট আত্মার স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছ।

তোমার সেই নিষ্কাম বচন শ্রবণ করিয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। সুতরাং স্ত্রীলোকের যে স্বাভাবিক লজ্জা ধর্ম্ম তাহা পরিত্যাগ করিয়া তুমি আমার সম্মুখবর্ত্তিনী হও। হে মৈত্রেয়ি! আমি তোমাকে মোক্ষরূপ অমৃতপ্রাপ্তির সাধন বলিতেছি; তুমি আপনার মন, নেত্র এবং অন্যান্য করণ সাবধান করিয়া শ্রবণ কর। এক্ষণে অন্বয়ব্যতিরেক দ্বারা আত্মার পরমানন্দরূপতা নিরূপণ করা যাইতেছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে মৈত্রেয়ি! তোমার আমি পতি প্রিয় আর আমার তুমি জায়া প্রিয়া, এই বার্ত্তা তোমার ও আমার অনুভবসিদ্ধ। পরন্তু এ বিষয় এই বিশেষতা আছে। আমার তোমার শরীরের প্রতি যে প্রীতি আছে সেই প্রীতি তোমার সুখের জন্য নহে; কিন্তু আমার নিজের আত্মার সুখের জন্য, তোমার শরীরের উপর আমার প্রীতি আছে। আর হে মৈত্রেয়ি, তোমার যে আমার শরীরের উপর প্রীতি আছে, তাহাও আমার সুখের জন্য নহে; কিন্তু তোমার আপনার আত্মার সুখের জন্য তোমার, আমার শরীরের উপর প্রীতি আছে। এক্ষণে এই অর্থ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য নিরূপণ করা যাইতেছে। হে মৈত্রেয়ি! এই জায়া যে আপনার পতির প্রতি প্রীতি করে তাহা পতির সুখের নিমিত্ত করে না, কামরূপ অগ্নি দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া সেই জায়া কামরূপ অগ্নির শান্তি দ্বারা আপনার বিষয়সুখের নিমিত্ত এবং বস্ত্র ভূষণাদি প্রাপ্তি জন্য সুখের নিমিত্ত আপনার পতির প্রতি প্রীতি করিয়া থাকে। শঙ্কা। হে ভগবন্! এই জায়া আপনার সুখের জন্য পতির প্রতি প্রীতি করে, এই কথা কিরূপে জানা যাইবে? সমাধান। হে মৈত্রেয়ি! যদি কখন পতির সুখের নিমিত্ত এই জায়া পতির প্রতি প্রীতি করিত, তবে যে সময়ে সেই পতি কোন পরস্ত্রীতে আসক্তি করিয়া সেই জায়ার প্রতিকূল হয়, সেই সময়েও সেই জায়ার আপনার পতির উপর প্রীতি থাকা উচিত। কিন্তু আপনার প্রতিকূল পতির উপর কোনও জায়া প্রীতি করে না; কিন্তু অনুকূল পতির উপর সকল জায়া প্রীতি করিয়া থাকে। সুতরাং ইহা জানা যাইতেছে যে, সেই জায়া আপনার সুখের জন্যই পতির উপর প্রীতি করিয়া থাকে। পতির সুখের জন্য নহে। আর হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ এই জায়া পতির সুখের জন্য পতির প্রতি স্নেহ করে না, সেইরূপ এই পতিও সেই জায়ার সুখের জন্য জায়ার প্রতি

স্নেহ করে না। কিন্তু কামরূপ অগ্নির শান্তি দ্বারা আপনার বিষয়সুখের জন্ম এবং অন্নপাকাদি গৃহের ব্যবহার নিমিত্ত সুখের জন্য সেই পতি আপনার জায়ার প্রতি প্রীতি করে। যদি কখন জায়ার সুখের জন্য পতি জায়ার প্রতি প্রীতি করিত, তাহা হইলে যে সময়ে জায়া ঋতুধর্ম্মবশতঃ অথবা কোন ব্যভিচারাদি কর্ম্ম-বশতঃ সেই পতির প্রতিকূল হয়, সেই সময়েও পতির জায়ার উপর প্রীতি হওয়া উচিত। কিন্তু আপনার প্রতিকূল জায়ার উপর কোনও পতির প্রীতি হয় না, কিন্তু অনুকূল জায়ার উপরই সকল পতির প্রীতি হইয়া থাকে। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, জায়ার সুখের জন্য পতির জায়ার উপর প্রীতি হয় না, কিন্তু আপনার সুখের জন্যই জায়ার উপর প্রীতি হইয়া থাকে। সুতরাং হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ ইহলোকে শর্করা স্বভাবতঃ মধুর এবং আপনার সম্বন্ধ দ্বারা সেই শর্করা অমধুর পদার্থকেও মধুর করে, সুতরাং সেই শর্করা মধুরতম; সেইরূপ এই স্ত্রীর এবং পুরুষের যে স্বয়ং-জ্যোতি আনন্দস্বরূপ আত্মা, সেই আত্মাই স্বভাবতঃ প্রিয়রূপ। আর সেই আনন্দস্বরূপ আত্মা আপনার তাদাত্ম্য সম্বন্ধ দ্বারা শরীরাদি অপ্রিয় পদার্থকেও প্রিয়রূপ করে। এই কারণে সেই আত্মাদেব প্রিয়তম। আর হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ জায়ার আপনার সুখের জন্য পতি প্রিয় এবং পতির আপনার সুখের জন্য জায়া প্রিয়া, সেইরূপ পুত্র সুবর্ণাদি ধন, গবাদি পশু, ব্রাহ্মণত্ব জাতি, ক্ষত্রিয়ত্ব জাতি, ভূরাদি সপ্ত লোক, ইন্দ্রাদি দেবতা, ঋগাদি বেদ, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী, ইত্যাদি জগতে যত পদার্থ আছে, সেই পুত্রাদি পদার্থে যে জীবের প্রীতি হয়, তাহা সেই পুত্রাদি পদার্থের জন্য নহে; কিন্তু আপনার সুখের জন্যই এই জীবের পুত্রাদি পদার্থে প্রীতি হইয়া থাকে। যদি কখন পুত্রাদি পদার্থের সুখের জন্য সেই জীবের পুত্রার্থে প্রীতি হইত, তাহা হইলে যে সময়ে সেই পুত্রাদি পদার্থ এই জীবের প্রতিকূল হয়, সেই সময়েও সেই জীবের সেই পুত্রাদি পদার্থে প্রীতি হওয়া উচিত। কিন্তু আপনার প্রতিকূল পুত্রাদি পদার্থে কোনও জীব প্রীতি করে না, পরন্তু অনুকূল পুত্রাদি পদার্থেই সর্ব্ব লোক প্রীতি করিয়া থাকে। সুতরাং এই জানা যাইতেছে, এই জীব আপনার সুখের জন্যই সেই পুত্রাদি পদার্থে প্রীতি করিয়া থাকে। সেই পুত্রাদি পদার্থের সুখের জন্য কোনও জীব পুত্রাদিতে প্রীতি করে না। অতএব সর্ব্বজীবের আপন আত্মাই স্বভাবতঃ প্রিয় "ন বারে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বারে জায়ায়াঃ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বারে সর্ব্বস্য কামায়

সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।" শঙ্কা। হে ভগবন্, পতি, জায়া, পুত্র ইত্যাদি যত কিছু পদার্থ জগতে আছে, তাহা যদ্যপি প্রতিকূল হইলে জীবের সুখের হেতু হয় না বটে, তথাপি অনুকূল হইলে এই জগৎ জীবের সুখের হেতু হইয়া থাকে। সুতরাং আনন্দস্বরূপ আত্মার সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া এই জগৎ প্রিয়রূপ হয় না; কিন্তু স্বভাবতঃই এই জগৎ প্রিয়রূপ। সমাধান। হে মৈত্রেয়ি! এক আনন্দস্বরূপ আত্মা ব্যতিরেকে পতি জায়া পুত্র প্রভৃতি যে কিছু অনাত্ম পদার্থ আছে, সেই সমস্ত পদার্থ স্বভাবতঃ প্রিয় রূপ নহে এবং অপ্রিয় রূপ নহে; কিন্তু এই পদার্থ আমার সুখের সাধন, এই প্রকার অনুকূল জ্ঞান যে জীবের যে পদার্থে হয়, সেই জীবের সেই পদার্থ প্রিয়! আর এই পদার্থ আমার দুঃখের সাধন, এই প্রকার প্রতিকূল জ্ঞান যে জীবের যে পদার্থে হয় সেই জীবের সেই পদার্থ অপ্রিয়। এই কারণেই ইহলোকে যে পুরুষের ভ্রান্তি বশতঃ আপনার প্রিয় মিত্র বিষয়ে পতিকূল জ্ঞান হয় আর আপনার শত্রু বিষয়ে অনুকূল জ্ঞান হয়, সেই ভ্রান্ত পুরুষ আপনার মিত্রকে তো অপ্রিয় জ্ঞান করে এবং আপনার শত্রুকে প্রিয় জ্ঞান করে। সুতরাং ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে অনাত্ম পদার্থের প্রিয়তা বিষয় অনুকূল জ্ঞানই কারণ এবং অনাত্ম পদার্থের অপ্রিয়তা বিষয়ে প্রতিকূল জ্ঞানই কারণ। স্বভাবতঃ কোনও অনাত্ম পদার্থ প্রিয়, অপ্রিয় নহে। এ বিষয় দৃষ্টান্ত। যেরূপ বায়ু স্বভাবতঃ উত্তপ্ত নহে শীতলও নহে, পরন্তু সেই বায়ু অগ্নির সম্বন্ধ দ্বারা উষ্ণ প্রতীত হয় এবং জলের সম্বন্ধ দ্বারা শীতল প্রতীত হয়। সেইরূপ এই অনাত্ম পদার্থ স্বভাবতঃ প্রিয়রূপ নহে; অপ্রিয় রূপও নহে; পরন্তু অনুকূল জ্ঞান দ্বারা সেই অনাত্ম পদার্থ জীবের প্রিয়রূপে প্রতীত হয় মাত্র এবং প্রতিকূল জ্ঞান দ্বারা সেই অনাত্ম পদার্থ জীবের অপ্রিয়রূপে প্রতীত হইয়া থাকে। কিংবা ইহলোকে যে বস্তুর যে স্বভাব, সেই বস্তুর সেই স্বভাব কোন কালেও নিবৃত্ত হয় না। যেরূপ অগ্নির যে উষ্ণতা স্বভাব, সেই অগ্নি হইতে কোন কালেও নিবৃত্ত হয় না। সেইরূপ পতি জায়াদি অনাত্ম পদার্থ যদি স্বভাবতঃই প্রিয়রূপ হয়, তাহা হইলে সর্ব্বদা সেই পদার্থ প্রিয়ই প্রতীতি হওয়া উচিত। কিন্তু সর্ব্বদা সেই অনাত্ম পদার্থে প্রিয়তা প্রতীতি হয় না। কিন্তু আপনার স্থিতি কালে যে পতি জায়াদি অনাত্ম পদার্থ এই জীবকে সুখ প্রদান করিয়াছিল, সেই পতি জায়াদি অনাত্ম পদার্থ আপনার বিয়োগকালে এবং প্রতিকূল জ্ঞানকালে এই জীবকে পরম দুঃখ প্রদান করে। সুতরাং এই আনন্দস্বরূপ আত্মা ভিন্ন পতি জায়াদি

যাহা কিছু অনাত্ম পদার্থ আছে, তাহারা স্বভাবতঃ প্রিয়রূপ নহে। কিন্তু যে সময়ে জীবের সেই পতি জায়াদি পদার্থে অনুকূল জ্ঞান হইবে, সেই সময়ে সেই পতিজায়াদি পদার্থ প্রিয় বোধ হইবে। অতএব এই সিদ্ধ হইল যে, যে আনন্দ-স্বরূপ আত্মা আপনার সম্বন্ধ দ্বারা অপ্রিয় পদার্থকেও প্রিয় করিয়াছিল, সেই আনন্দস্বরূপ আত্মাই সর্ব্ব জীবের প্রিয়তম। এক্ষণে আনন্দস্বরূপ আত্মা বিষয়ে প্রিয়তমতা স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য প্রথমে অপ্রিয়, প্রিয়, প্রিয়তম এই তিনের নিরূপণ করা যাইতেছে। হে মৈত্রেয়ি! এই পদার্থ আমি কখনই প্রাপ্ত হইব না, এই প্রকার জীবের দ্বেষের বিষয় যে দুঃখ এবং সেই দুঃখের সাধন যে সিংহ সর্পাদি সেই দুই এর নাম অপ্রিয়। আর এই পদার্থ আমার সুখের সাধন এই প্রকার জীবের জ্ঞানের বিষয় যে পতি জায়াদি পদার্থ তাহার নাম প্রিয়। আর সেই পতি জায়াদি প্রিয় পদার্থ প্রাপ্তি দ্বারা যে সাত্ত্বিক অন্তঃকরণের পরিণামরূপ সুখ, সেই সুখের নাম প্রিয়তর। আর যেরূপ পতি জায়াদি প্রিয় পদার্থে যে জীবের প্রীতি হয়, তাহা সেই পতি জায়াদি পদার্থের সমুদায়ের জন্য হয় না, কিন্তু আপনার সুখের জন্যই এই জীবের, সেই পতি জায়াদি পদার্থে প্রীতি হয়, সেইরূপ সেই প্রিয়তর সুখে যে জীবের প্রীতি হয়, তাহা সেই সুখের জন্য হয় না, কিন্তু আপনার আত্মার জন্যই সেই জীবের সেই সুখে প্রীতি হয়। যদি কখন সেই সুখের জন্য জীবের সেই সুখে প্রীতি হইত, তাহা হইলে শত্রুর সুখেও এই জীবের প্রীতি হওয়া উচিত; কিন্তু শত্রুর সুখে কোন জীবের প্রীতি হয় না। সুতরাং এই জানা যাইতেছে যে আপনার আত্মার জন্যই এই জীবের সেই সুখ প্রিয়তম হইতেছে। এই কারণে এই আনন্দ-স্বরূপ আত্মাই এই জীবের প্রিয়তম। এখানে প্রিয় হইতে যাহা অধিক তাহার নাম প্রিয়তর। আর প্রিয়তর হইতেও যাহা অধিক তাহার নাম প্রিয়তম। হে মৈত্রেয়ি! এরূপ প্রিয়তম আত্মার লেশমাত্র (১) আনন্দ আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাদি লোকও আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই কারণে সেই আত্মাস্বরূপ আনন্দ ব্রহ্মার আনন্দ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট।

---

(১) অত্র আনন্দবল্লী সপ্তমোহনুবাক্ প্রমাণ "সৈষাহআনন্দস্য মীমাংসা ভবতি" ইত্যাদি। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য মনীষাপঞ্চকে লিখিয়াছেন।—

"যৎ সৌখ্যাম্বুধিলেশলেশতঃ ইমে শক্রাদয়ো নির্বৃতা।
যচ্চিত্তে নিতরাং প্রশান্তকলনে লব্ধ্বা মুনির্নিবৃতঃ
যস্মিন নিত্য সুখাম্বুধৌ গলিতধী ব্রহ্মৈব ন ব্রহ্মবিৎ।
যঃ কশ্চিৎ স সুরেন্দ্রবন্দিতপদো নূনং মনীষা মম॥"

হে মৈত্রেয়ি! স্বর্গলোক আদি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যতপ্রকার বিষয়জন্য আনন্দ আছে, সেই সমস্ত আনন্দ অপেক্ষা অধিক এবং দ্বৈতভাবরহিত যে ব্রহ্মানন্দ তাহা এই জীবের আত্মা হইতে ভিন্ন নহে। কিন্তু সেই ব্রহ্মানন্দ এই জীবের আত্মারূপই। এই কারণে সেই আত্মাস্বরূপ আনন্দই এই জীবের পরম পুরুষার্থ রূপ। এই পর্যন্ত আত্মাস্বরূপ আনন্দ বিষয়ে পরমপুরুষার্থতা নিরূপণ করা গেল।

আত্মার সাক্ষাৎকার নিমিত্ত শ্রবণাদি সাধনের বিষয় নিরূপণ করা যাই-তেছে। হে মৈত্রেয়ি! যে অধিকারী পুরুষের করামলকের ন্যায় সংশয়-বিপর্য্যয়রহিত আত্মসাক্ষাৎকার ইচ্ছা হইবে, সেই অধিকারী পুরুষ প্রথমে বিবেক, বৈরাগ্য, শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি, মুমুক্ষুতা এই চারিসাধন সম্পন্ন করিবেন। পরে সেই অধিকারী পুরুষ শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যাইবেন। সেখানে গিয়া এই অধিকারী পুরুষ গুরুর মুখ হইতে "তত্ত্বমসি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ব্রহ্মাহমস্মি" ইত্যাদি অনেক শ্রুতিবাক্য বারম্বার শ্রবণ করিবেন। আর উপক্রম উপসংহারাদি ষট্-লিঙ্গ দ্বারা এই অধিকারী পুরুষ সেই বেদান্ত বচন সকলের অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিষয়ে তাৎপর্য্য ইহা নিশ্চয় করিবেন। ইহার নাম শ্রবণ। এই শ্রবণ দ্বারা অধিকারী পুরুষের প্রমাণগত অসম্ভাবনা নিবৃত্ত হইবে। এখানে বেদান্ত শাস্ত্র জীবব্রহ্মের অভেদপ্রতিপাদক অথবা ভেদপ্রতিপাদক এই প্রকার সংশয়ের নাম প্রমাণগত অসম্ভাবনা। এক্ষণে মনন নিরূপণ করা যাইতেছে। হে মৈত্রেয়ি! এই প্রকার গুরুমুখ হইতে বেদান্তবাক্য শ্রবণ করিয়া এই অধি-কারী পুরুষ একান্ত স্থানে বসিয়া শ্রুতি-অবিরুদ্ধ তর্ক করিয়া সেই বচনের অর্থ মনন করিবেন। সেই তর্ক এই "যেরূপ ইহলোকে একই মৃত্তিকাদি কারণ, ঘটশরাবাদি অনেক কার্য্যরূপে থাকে, সেইরূপ একই অদ্বিতীয় পরমাত্মা অজ্ঞানের সম্বন্ধবশতঃ নানা জগৎরূপ হইয়া প্রতীত হয়। আর যেরূপ ঘট-শরাবাদি কার্য্য মৃত্তিকাদি কারণে লয় হয়, সেইরূপ এই সম্পূর্ণ জগৎ অধিষ্ঠান আত্মাতে লয়ভাব প্রাপ্ত হয়। আর যেরূপ মালার পুষ্পে সূত্রের তো অন্বয় আছে, কিন্তু পুষ্পের পরস্পর ব্যতিরেক থাকে সেইরূপ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, বাল্য, যৌবন, বৃদ্ধ অবস্থাতে আত্মার তো অন্বয় আছে, কিন্তু এই সমস্ত অবস্থার পরস্পর ব্যতিরেক রহিয়াছে; ইত্যাদি নানাপ্রকার তর্ক করিয়া এই অধিকারী পুরুষ বেদবাক্যের অর্থ মনন করিবেন; এই মনন দ্বারা সেই অধিকারী পুরুষের প্রমেয়গত অসম্ভাবনা নিবৃত্ত হইবে। এখানে আত্মা ব্যাপক অথবা পরিচ্ছিন্ন, ইত্যাদি সংশয়ের নাম প্রমেয়গত অসম্ভাবনা। এক্ষণে নিদিধ্যাসন নিরূপণ

করা যাইতেছে। হে মৈত্রেয়ি! এই মন অত্যন্ত চঞ্চল, সুতরাং সেই মনকে এই অধিকারী পুরুষ প্রথমে কোন বাহ্যপ্রিয় পদার্থে একাগ্র করিবেন। তদনন্তর এই অধিকারী পুরুষ সেই শিক্ষিত মনকে অন্তরাত্মা বিষয়ে একাগ্র করিবেন; যেন আত্মাতে একাগ্রতা সম্প্রাপ্ত এই মন পুনঃ বহির্ম্মুখতা প্রাপ্ত হইবে না। ইহার নাম নিদিধ্যাসন। এই নিদিধ্যাসন দ্বারা এই অধিকারী পুরুষের বিপরীত ভাবনা নিবৃত্ত হইবে। অন্য বস্তুতে অন্য বুদ্ধির নাম বিপরীত ভাবনা। হে মৈত্রেয়ি! এই প্রকার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা অসম্ভাবনা, বিপরীত ভাবনা রহিত হইলে, অন্তরাত্মাতে একাগ্রতা প্রাপ্ত এই বিশুদ্ধান্তঃকরণ গুরু-উপদিষ্ট মহা-বাক্যরূপ শব্দ প্রমাণ হইতে আত্মার সাক্ষাৎকার উৎপন্ন করিবে। মহাবাক্যরূপ শব্দ প্রমাণ বিনা স্বতন্ত্র মন আত্মসাক্ষাৎকার কেন না উৎপন্ন করে? সমাধান। হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ নেত্রাদি বাহ্য-ইন্দ্রিয় কথন যথার্থ জ্ঞান রূপ প্রমা উৎপন্ন করে. আর কথন সেই নেত্রাদি ইন্দ্রিয় দোষবশতঃ অযথার্থ জ্ঞানরূপ অপ্রমাও উৎপন্ন করে। 'যথার্থ জ্ঞান আমি উৎপন্ন করিব,' 'অযথার্থ জ্ঞান আমি উৎপন্ন করিব না', এই প্রকার আগ্রহ সেই নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের হইতে পারে না। সেইরূপ সর্ব্ববৃত্তির উপাদান কারণ যে এই মন, সেই মনও কথন যথার্থ জ্ঞানরূপ প্রমাকে উৎপন্ন করে; আবার কথন দোষের বলে অযথার্থ জ্ঞানরূপ অপ্রমাকেও উৎপন্ন করে। যথার্থ জ্ঞান আমি উৎপন্ন করিব, অযথার্থ জ্ঞান আমি উৎপন্ন করিব না, এই প্রকার আগ্রহ এই মনের হইতে পারে না। কিন্তু সর্ব্বদোষরহিত এই মহাবাক্যরূপ শব্দ প্রমাণ হইতে কেবল যথার্থ জ্ঞানরূপ প্রমাকেই উৎপন্ন করে; সুতরাং আত্মসাক্ষাৎকার উৎপত্তি বিষয়ে মহাবাক্যরূপ শব্দ প্রমাণই প্রধান কারণ। শঙ্কা। হে ভগবন্! আত্ম সাক্ষাৎকার বিষয়ে যদি মহাবাক্যরূপ শব্দ প্রমাণেরই প্রধানতা হয়, তবে মনের সহায়তা বিনাই এই মহাবাক্যরূপ শব্দ প্রমাণ আত্মসাক্ষাৎকার কেন না উৎপন্ন করে? সমাধান। হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ নেত্রাদি বাহ্যইন্দ্রিয় জন্য যে ঘটপটাদি পদার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞান, সেই সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিষয়ে নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের ঘটাদি বিষয়ের সহিত সংযোগাদি সম্বন্ধ বিনা প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না, সেইরূপ মহাবাক্য-রূপ শব্দ প্রমাণ দ্বারা মনে যে আত্মাকার বৃত্তি উৎপন্ন হয়, সেই বৃত্তি জ্ঞান বিষয়ে সাক্ষাৎকারত্তা তখন সিদ্ধ হইবে যখন আত্মার সহিত মনের সংযোগ সম্বন্ধ হইবে। আত্মার সহিত মনের সম্বন্ধ বিনা সেই বৃত্তিজ্ঞান বিষয়ে সাক্ষাৎকাররূপতা সিদ্ধ হইবে না। এই কারণে মহাবাক্য জন্য আত্মসাক্ষাৎকার বিষয়ে আত্মার সহিত

শুদ্ধ মনের সম্বন্ধও অবশ্য অপেক্ষা করে। সুতরাং এই অর্থ সিদ্ধ হইতেছে যে, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন এই তিন সাধনযুক্ত যে শুদ্ধ মন সেই মন গুরু-উপদিষ্ট মহাবাক্যরূপ শব্দ হইতে অদ্বিতীয় আত্মার সাক্ষাৎকার উৎপন্ন করিবে। আত্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইলে এই অধিকারী পুরুষের কি ফললাভ হইবে ? সমাধান। হে মৈত্রেয়ি ! এই অধিকারী পুরুষের যখন শ্রবণাদি সাধন দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্তি হয়, তখন এই অধিকারী পুরুষের অজ্ঞানরূপ অবিদ্যা নিবৃত্তি হইয়া যায়। আর সেই অবিদ্যারূপ কারণ বীজ নিবৃত্তি হইলে পর, এই অধিকারী পুরুষের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি সম্পূর্ণ দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া যায়। আর সেই অবিদ্যারূপ কারণ বীজ নিবৃত্তি হইলে পর, এই অধিকারী পুরুষের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি সম্পূর্ণ দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া যায়। এই প্রকার কার্য্য সহিত অবিদ্যার ধ্বংস হইলে পর এই অধিকারী পুরুষের হৃদয়ে স্বয়ং জ্যোতি আনন্দ স্বরূপ অদ্বিতীয় আত্মা প্রাদুর্ভূত হন। এবিষয়ে দৃষ্টান্ত ;—যেরূপ মেঘাদি নিবৃত্তি হইলে শুদ্ধ নির্ম্মল আকাশ প্রতীত হয়, সেইরূপ কার্য্য সহিত অবিদ্যানাশ হইলে এই অধিকারী পুরুষের আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় আত্মা প্রতীত হয়। হে মৈত্রেয়ি ! যেরূপ স্বপ্নাবস্থা হইতে জাগ্রৎ অবস্থাপ্রাপ্ত পুরুষ সেই স্বপ্নের দুঃখ মিথ্যা জ্ঞান করে, সেইরূপ আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা অবিদ্যারূপ নিদ্রা হইতে জাগ্রত সেই বিদ্বান্ পুরুষ এই সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চকে মিথ্যা জ্ঞান করে। হে মৈত্রেয়ি ! যেরূপ ভয়শূন্য চক্রবর্ত্তী মহারাজা স্বপ্নাবস্থায় যাইয়া নানাপ্রকার ভয়প্রাপ্ত হয় ; আর সেই স্বপ্ন হইতে জাগ্রত হইলে সেই মহারাজা সেই স্বপ্নের ভয়কে আপনার বিষয়ে মানে না, সেইরূপ এই পুরুষ বাস্তবিক সর্ব্বদুঃখরহিত হইয়াও আপনার আত্মস্বরূপকে অজ্ঞানবশতঃ নিজের বিষয়ে নানাপ্রকার দুঃখ কল্পনা করেন ; আর আত্মসাক্ষাৎকারের পর এই বিদ্বান্ পুরুষ আপনার স্বরূপ বিষয়ে সেই সম্পূর্ণ দুঃখকে মিথ্যা জ্ঞান করেন। এক্ষণে আত্মার জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বপ্রপঞ্চ জ্ঞান সিদ্ধির জন্য প্রথমে অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব নিরূপণ করা যাইতেছে।

ক্রমশঃ—

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র (৺কাশীধাম)

স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা।

১

প্রেম-প্রতিমা হেম-মূরতি
চম্প-বরণী রাই,
নওল কিশোর কহত বিভোর
কিশোরী-বদন চাই' :—

২

"শয়ন-কুসুমদলে নলিন-চরণতল
সুন্দরি! করু বিনিবেশ;
তুয়া পদ-পল্লব পরশ-পরাভব
অনুভব করাহ বিশেষ।

৩

"বহু পথ যাহরি আওল তুঁহু ধনি!
ক্লান্ত চরণ অপসারি;
সেই নূপুরাধিক অনুগত কিঙ্করে
রাখহ চরণে তুহারি।

৪

"শুন, শুন কমলিনি! বদন চন্দ জিনি'
প্রেম-অমিয়া করু দান,
দীঘ বিরহ পর তাপিত তুঝ হিয়া
মঝু হিয়ে করাহ সিনান।

৫

"যা'ক মিলন লাগি' ন গণয়ি কুল-আগি
কলঙ্ক করলি তু সার,
তা'ক হৃদয় মাহ ডার মরম-দাহ
অয়ি মম গীমক হার!

৬

"তুঁহুময়-মানস তুয়া দুখ-কাতর
শববত আছিনু রাই!
জীবয় অব জীউ,— ভুজঙ্গধর কহ—
সঙ্গম-কাম কানাই।

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী।

চম্প—চম্পক। নওল—নবীন। চন্দ—চন্দ্র। করু—করুক্। তুঝ—তোমার। মঝু—আমার। সিনান—স্নান। যা'ক—যাহার। কুল-আগি—কুলাগ্নি। কয়লি—করিলে। তু—তুমি। মাহ—মধ্যে। গীমক—গ্রীবার। শববত—শববৎ। জীবয়—সঞ্জীবিত কর।

দ্বাদশী ব্রত।

(১)

একদা রাজা অম্বরীষ স্বীয় মহিষীকে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন "প্রিয়ে, আমি তোমার সহিত দ্বাদশী ব্রত আচরণ করিতে ইচ্ছা করি; এ বিষয়ে তোমার কি অভিপ্রায়?" রাণী দেখিলেন রাজার প্রসন্নবদন অতি সুন্দর! সেই সৌন্দর্য্য

তাঁহার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত পুলকে প্লাবিত করিয়া যেন কোন্ এক অনন্ত তুফানের সহিত মিলিয়া গেল। রাণী আত্মহারা।

রাজা। কি, উত্তর দিতেছ না যে?

রাণীর ওষ্ঠাধর একবার চঞ্চল হইয়া উঠিয়াই বিরত হইল। রাণী আত্মহারা; স্বামী ও দেবতায় প্রভেদ কি? রাণী গভীর চিন্তামগ্ন—"শুনিয়াছি দেবতার রূপ, দেবতার সৌন্দর্য্য অনন্ত—এই যে আমার প্রত্যক্ষ দেবতা—এ সৌন্দর্য্যও 'ত' অনন্ত—এইরূপ নয়নে, নয়ন হইতে প্রাণে, প্রাণ হইতে মনে, মন হইতে হৃদয়ে—তার পর? তার পর আর 'ত' জানি না—কোথায় মিশিয়া যাইতেছে। আর আমি—কত ক্ষুদ্র আমি—ওই রূপের পশ্চাৎ ছুটিতে ছুটিতে, কোথায় যেন মিশিয়া যাইতেছি—হারাইয়া যাইতেছি; 'আমি' হারাই তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু এই যে আমার প্রাণের দেবতা, তাহাকেও যে হারাইয়া ফেলি! এ কেমন রূপ! এ কেমন ভাব! জানি না দেবতা কি? তাহাকে কি এমন চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি দিয়া আরাধনা করিয়া—এমন করিয়া প্রেমের তরঙ্গে আত্মবিস্মৃতির দেশে ভাসিয়া যাওয়া যায়? জানি না এতটা তন্ময়তা আর কেথাও পাওয়া যায় কিনা?"

রাজা। "কি ভাবিতেছ?—"

রাণী এবার বড়ই লজ্জিত হইলেন, ভাবিলেন "আমি কি পাগল হইলাম!" লজ্জায় ও হর্ষে স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, অতি সাবধানে বাষ্পগদগদ স্বরে রাজাকে কহিলেন, "রাজন্, আমি আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী দাসী, দাসীকে এ কথা জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? ব্রত নিয়মাদিতে যে অল্প-বুদ্ধি স্ত্রী জাতি অতিসহজেই আনন্দ লাভ করে, তাহা বুঝিয়াই বোধ হয় দাসীর প্রতি কৃপা প্রকাশ করিবার জন্যই এই বিষয়ের উত্থাপন করিয়া থাকিবেন। আমি আপনার সহধর্ম্মিণী, আপনার অনুষ্ঠিত যজ্ঞ, দান তপস্যার ফলে আপনি যেমন আনন্দিত, আমিও আপনার চরণে অর্পিত-মতি ও আপনার লব্ধ কর্ম্মফলের ভাগিনী হইয়া বাসনাশূন্য চিত্তে আপনারই অনুবর্ত্তিনী হইয়া তৃপ্ত ও আনন্দিত আছি। আমাকে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি?" রাজা বলিলেন, "এই ব্রত তোমার আনন্দদায়ক হইবে কিনা তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমার অনুমতির জন্য নয়।" রাণী বলিলেন, "স্বামিন্, স্ত্রী জাতির দেহ, ইচ্ছা ও মন সকলই স্বামীর। অল্পবুদ্ধি ও মোহ বশতঃ যদিও আমার বলিয়া মনে হয়, তথাপি আজ আপনার সমক্ষে থাকিয়া "আপনার অনুবর্ত্তিনী হওয়াই, আমার একমাত্র আনন্দ" এই কথা বলিতে যে প্রীতির

অনুভব হইতেছে, অন্য উত্তর প্রদানে আমার তত আনন্দ হইতেছে না। প্রভু, ক্ষমা করুন, দাসীকে আদেশ করুন, কেমন করিয়া আপনার চির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া নারীজন্মের চরম স্বার্থকতা লাভ করিতে পারি।"

রাজা রাজ্ঞীর এতাদৃশ সুললিত ও মনোমত বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট চিত্তে রাজ্ঞীকে বলিলেন "প্রিয়ে, আমার একান্ত ইচ্ছা যে আমি তোমার সহিত এই ব্রত আচরণ করি। আমাদিগকে একবৎসর যাবৎ এই ব্রত আচরণ করিতে হইবে ও পরে উদযাপনের সময় ব্রত ও অতিথি জনের সেবা করিয়া যথা সৎপাত্রে বিহিত দানাদির দ্বারায় শ্রীভগবানে অর্পিতবুদ্ধি ও সমাহিত চিত্তে পারণাদির পর ব্রত সমাপন করিতে হইবে। বল সুশীলে, তুমি পারিবে কি না?"

রাণী বলিলেন,—"প্রভু উপবাসাদিতে ও নিয়মাদি পালনে আপনাদেরই ক্লেশ অধিক। আপনার যদি কোন ক্লেশ না হয় তবে দাসীর কি কষ্ট হইতে পারে?"

রাজা বলিলেন,—"ব্রতাদিতে উপবাস ও নিয়ম পালন তাদৃশ কঠিন নয়; কিন্তু তাৎপর্য্য ও মর্ম্ম গ্রহণই তোমাদের পক্ষে দুষ্কর। কেন না, ফলকামনা ও অভিসন্ধিশূন্য হইয়া, এই ব্রত ও উপবাস করিয়া, সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর ভগবানকেই সকল কর্ম্মের. সকল বিষয়ের, একমাত্র তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা তুমিও নয়, আমিও নই; ফলভাগী আমিও নই, তুমিও নয়; এবং এ সকল কর্ম্মের ভগবান্ ভিন্ন স্বতন্ত্র অস্তিত্বও নাই। এই কর্ম্ম, কর্ম্মের কারণ, কর্ম্মের উদ্দেশ্য ও কর্ম্মের ফল সকলই শ্রীভগবান্।"

রাণী কহিলেন "নাথ, আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার চরণে অচলা ভক্তি রাখিয়া, এই ব্রত শ্রীভগবানেরই মহিমা প্রচার করিবার জন্য অর্পিত হইতে পারে।" "আমারও সেই ইচ্ছা" এই বলিয়া রাজা নিরস্ত হইলেন।

(২)

রাজর্ষি অম্বরীষ, অতি পুণ্যবান্ ও পরম ভাগবৎ ছিলেন। তিনি সসাগরা ধরার অধীশ্বর। তাঁহার অসাম ঐশ্বর্য্য, অক্ষয় সম্পদ্ ভূতলে অতুল। এতাদৃশ সৌভাগ্য রাজরাজেশ্বরেরও দুর্লভ। কিন্তু সেই ধীর রাজর্ষি ওই সকল বিভব স্বপ্নকল্পিত মাত্র বুঝিয়া তাহাতে মুগ্ধ হইতেন না,এমন কি আসক্ত পর্য্যন্তও হইতেন না। রাজর্ষি সেই অতুল ঐশ্বর্য্য পানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেন যে তাহার সেই ধন-রত্ন-রাশি, সাগরতীরস্থ অনন্তবিস্তৃত বালুকারাশির ন্যায় সুন্দর—সেই সৌন্দর্য্যে কামনা নাই, বাসনা নাই, দর্প অহঙ্কার নাই, মানব-জীবনের অভিসন্ধি

বা উদ্দেশ্যের কলঙ্ক-কালিমা কিছুই নাই ; সৌন্দর্য্যে সেই অনন্ত শ্রীভগবানের অনন্ত মহিমা প্রতি অণু পরমাণু পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিতেছে। অহরহঃ বিষয় লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে বিষয়ের পারগামী ও বিষয়ের অন্তরস্থিত একমাত্র শ্রীবাসুদেবেরই শ্রীপাদপদ্মে পদ্ম-সংলগ্ন সৌগন্ধির ন্যায় তাহার মন সততই সংলগ্ন ছিল। আর সেই বিষয় সেবন দ্বারাই রাজর্ষি মনের সাহায্যে সেই দুর্লভ চরণ-সরোজের অবিকৃত ও নিত্য নূতন সৌগন্ধিরাশি সেবন করিয়া তন্ময় হইয়া থাকিতেন। তাঁহার হস্ত শ্রীভগবানেরই কর্ম্মে, নাসিকা তদীয় চরণ-সংলগ্ন তুলসীর আঘ্রাণে, জিহ্বা তাঁহারই নামগানে ও শ্রীভগবানে অর্পিত অন্ন আস্বাদনে, তাঁহাতেই অর্পিত থাকিত। চক্ষু বাসুদেবেরই মূর্ত্তি দর্শনে, কর্ণ তাঁহারই গুণানু শ্রবণে, অঙ্গ, তদীয় ভৃত্যবর্গের অঙ্গস্পর্শে তাঁহাতেই অনুক্ষণ অর্পিত থাকিত। তাঁহার প্রজাগণ পর্য্যন্ত পরম বৈষ্ণব ছিলেন। সুতরাং তাঁহার রাজ্যে কামনার কোন আশ্রয়-স্থল ছিল না, সেই সাস্ত প্রজাগণ শ্রীভগবানের সেবা ভিন্ন স্বর্গও কামনা করিতেন না। প্রজাগণ আপনাদিগকে শ্রীমৎ বাসুদেবের দাসানুদাস মনে করিতে পারিলেই গতাভিমান হইয়া পরস্পর পরস্পরকে ধন্য জ্ঞান করিতেন ও সাক্ষাৎ আনন্দের ন্যায় বিচরণ করিতেন। তাঁহার রাজ্য বাসন্তী উদ্যানের সুমধুর ঝঙ্কারসদৃশ সতত হরিনামকীর্ত্তনে সুমধুর ধ্বনিত হইত ; আর সেই ত্রিদিববাঞ্ছিত সুধাময় নামকীর্ত্তন ও তাহার স্বরলালিত্য, এই প্রপঞ্চের মায়া-আবরণ ভেদ করিয়া সাক্ষাৎ ভগবানকে ভক্তির দ্বারায় যেন বন্ধন ও আকর্ষণ করিয়া শ্রবণপথ দিয়া শ্রোতার হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিত। তখন বৃক্ষে বৃক্ষে পক্ষী সকল শ্রীভগবানের জয়ধ্বনিসূচক কলরব করিয়া উঠিত ; পশু সকল আনন্দে অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিত—স্তনে দুগ্ধ ক্ষরিত হইত। বৃক্ষ সকল ভক্তিপুলকিত কলেবরে শিহরিয়া সর সর শব্দে শ্রীভগবানকে লক্ষ লক্ষ মস্তকে প্রণাম করিবার জন্য শাখা সকল অবনত করিত। এবংবিধ প্রজা ও রাজ্য লইয়া রাজর্ষি নিরন্তর অশ্বমেধ যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও ব্রতাদি আচরণ করিয়া শ্রীভগবানের আরাধনা করিতেন।

(৩)

আজ কার্ত্তিক মাসের সেই শুভ দ্বাদশী। রাজা ব্রাহ্মণগণের বিধি ও নির্দ্দেশ অনুসারে মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ব্রত আচরণ করিতেছেন। রাজর্ষি এই সকল ক্রিয়াকলাপের মধ্যেও দ্বৈতজ্ঞানবিবর্জ্জিত। আজি ওই সকল কর্ম্মের মধ্যে একমাত্র শ্রীবাসুদেবকে দর্শন করিয়া ক্রিয়ার

দ্বৈতের আনন্দময় ভাবে বিভোর। শত শত দ্রব্য দেব, দ্বিজ ও অতিথি-গণকে সম্প্রদান করিয়াই শ্রীভগবানেরই চরণ-অমৃত আস্বাদনে দ্রব্যাদ্বৈতের অতুল আনন্দে আনন্দিত। এই ব্রত মধ্যে পুজিত দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের ভক্তি বন্দন করিয়া শ্রীকৃষ্ণে অর্পিতবুদ্ধি হইয়া ভাবাদ্বৈতের আনন্দময় ভাবে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। রাজর্ষি এই রূপে ব্রত সমাপন করিলেন। তৎপরে রাজর্ষি সেবা ও আতিথ্য দ্বারায় শত শত ব্রাহ্মণ ও অতিথি-গণকে পরিতুষ্ট করিলেন। ঋষিগণকে যে কোটী কোটী সবৎসা গাভী প্রাদন করিলেন তাহাদের সকলেরই খুর ও শৃঙ্গসকল স্বর্ণ, রৌপ্য ও রত্নাদি দ্বারায় সুসজ্জিত। সেই গাভীগুলি অতি সুশীলা ও সদ্গুণসম্পন্না। তাঁহারা তপস্যায় অনুগামী সিদ্ধির ন্যায় তপস্বিরূপী রাজার অনুগমন না করিয়া, মূর্ত্তিমান্ সাক্ষাৎ তপস্যারূপী ঋষিদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। তাহাতেই রাজা অভিমানশূন্য হইয়া ব্রতফলভোগী ও প্রশান্তচিত্ত হইয়া বিহিত পরম্পরানুযায়ী কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সাধারণ-সমক্ষে ব্রত-কর্ত্তা বলিয়া প্রতীয়মান হইলেন। অম্বরীষের রাজধানী জনপদ প্রান্তর আজ বারাণসীর ন্যায় পুণ্যক্ষেত্ররূপে বিরাজমান: কিন্তু পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীতেও মানবগণকেও ব্রাহ্মণ ও ঋষিদিগের পদধূলি কামনা করিতে হয়, কিন্তু এই কামনাশূন্য দেশে ভকত-বৎসল হরি আপামর মানব-গণকে অনুকম্পা প্রকাশ করিবার জন্য অদ্ভুৎ খেলার সৃষ্টি করিলেন। কোটী কোটী গাভী বৎসের সহিত অবিরত ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে, সাধক-শ্রুত হৃদয়ধ্বনির ন্যায় একাগ্রমনের শ্রোতব্য হইয়া আকাশাচ্ছন্ন ধূলিপটলের দ্বারায় গো-ব্রাহ্মণের পদরজে দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করত গমন করিতে লাগিল; আর আপামর সেই পদরজঃ অযাচিত ভাবে লাভ করিয়া, রাজার অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলভোগী হইয়া, কামনাশূন্য ও বাসনা-শূন্য হইয়া দুশ্ছেদ্য পশু-পাশ হইতে মুক্ত হইতে লাগিল। কোটী কোটী গাভী যেমন মুক্তবন্ধন হইয়া পূর্ণকাম ঋষিদিগের অনুগমন করিতে লাগিল, তেমনই কোটী কোটী মানব সেই আশীর্ব্বাদে ও ঋষিদিগের পদরজে ও রাজার পুণ্যে মুক্তবন্ধন হইয়া রাজার কর্ম্মফলের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ভকতবৎসল শ্রীহরি সেই অপূর্ব্ব শোভা স্বয়ং সৃষ্টি করিয়া যেন স্বয়ং হৃষ্ট হইয়া হৃদয়ে হৃদয়ে আনন্দময় ও জ্ঞানময় মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

ব্রত সমাপ্ত হইল। এখন ব্রতাঙ্গের পারণা মাত্র অবশিষ্ট। সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলী ও পুরোহিতগণ রাজাকে ব্রতাঙ্গ সম্পূর্ণ করিবার জন্য দ্বাদশীর পারণা করিতে আদেশ করিলেন। রাজা ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া আছেন। আতিথ্য ও দানাদি ক্রিয়াও শেষ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতগণ রাজাকে পারণা করিতে আদেশ করিলেন। রাজাও পারণার জন্য আসনে উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে অগ্নিতুল্য তেজস্বী দুর্ব্বাসা অতিথি হইয়া সেই রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজা ভগবান্ দুর্ব্বাসাকে দেখিয়া আনন্দে ও ভক্তিসহকারে তাঁহার পূজা করিলেন এবং আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্ম সমাদরপূর্ব্বক ঋষির নিকট প্রার্থনা করিলেন। দুর্ব্বাসা রাজার সেই মনোমত বাক্যে প্রীত ও সম্মত হইলেন। মহর্ষি তখন রাজাকে কহিলেন, "রাজন্! আপনি ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করুন আমি যমুনায় স্নান ও আহ্নিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া এখনই আসিতেছি"। মহর্ষি দুর্ব্বাসা যমুনাতীরে চলিয়া গেলেন। তিনি কোথায় গেলেন আর তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব হইতে লাগিল। রাজা অম্বরীষ স্থির হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; ব্রাহ্মণ-পুরোহিতগণ রাজার ব্রত শেষ করাইবার জন্য কেবল দুর্ব্বাসার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন কেহ কেহ অপূর্ব্বশোভাসম্পন্ন ও যেন অভিনবভাবে অভিব্যক্ত সুনীল আকাশপানে চাহিয়া শ্রীকৃষ্ণের দয়া ও মহিমার সহিত, আকাশ কেমন সুন্দর মিশ্রিত তাহাই যেমন আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে লাগিলেন। তৎকালীন ভ্রমর ও মধুমক্ষিকাকুলের মনোরম সংগীত, বৃক্ষ-বল্লরীর মধ্য দিয়া সুদূরশ্রুত বায়ুর উল্লাসধ্বনি ও দূরস্থিত তটিনীর কুল কুল শব্দ যেন সেই ব্রত-সমাপ্তির আনন্দসমাচার ঘোষণা করিবার জন্যই সম্মিলিতস্বরে, পুলকিত কুল-বধূর সন্ধ্যা আরাধনার শঙ্খধ্বনির ন্যায় আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়াছে—কেহ কেহ তাহাই শুনিতেছেন, আবার কেহ কেহ বা সেই স্বভাব-সংগীত শুনিতে শুনিতে আকাশ, শ্রবণেন্দ্রিয় ও স্ব স্ব অস্তিত্ব এই সকলের মধ্যে, কি এক মনোহারিণী শক্তির সুমধুর সংযোজনা ও সংগ্রহ শক্তিমাত্র উপলক্ষ করিয়া, হৃদয়ে হৃদয়ে, লহরে লহরে মাধুরী বিস্তার করিতেছে, তাহাই একাগ্র অন্তরে অনুভব করিতে লাগিলেন। তখন কোন কোন সাধু ঋষি যেন আরও অধিকতর আনন্দে নিমগ্ন হইয়া এই ব্যক্ত ও অব্যক্তের মধ্যে যে সংযোজনা-কারিণী শক্তি আছেন তাঁহার অনন্তলীলা-মাধুর্য্য বুঝিতে

পারিয়া এই প্রাকৃতিক সন্দোর্য্যের মধ্যে ধ্যাননিরত তাপসের ন্যায় বসিয়া আনন্দমগ্ন ও আপনারই হৃদয়নিহিত ভাবরাশির মধ্যে আত্মহারা।

কিন্তু আর স্থির থাকা যায় না—সকলেই উৎকণ্ঠিত হইলেন। দ্বাদশী গতপ্রায়। দ্বাদশী উত্তীর্ণ হইয়া গেলে ব্রত সম্পূর্ণ হইবে না, অঙ্গহীন থাকিয়া যাইবে। দ্বাদশীর মধ্যেই রাজাকে পারণা করিতে হইবে। কিন্তু প্রতিশ্রুত হইয়া, আহ্বান করিয়া, মহাত্মা দুর্ব্বাসাকে অগ্রে পারণ না করাইয়া—সেই ব্রাহ্মণ অতিথির সেবা ফেলিয়া কেমন করিয়াই বা অগ্রে পারণা করেন! এই উভয় সঙ্কটে রাজা কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মনে মনে সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরিরই শরণাপন্ন হইলেন। এদিকে আর অর্দ্ধমুহূর্ত্তকাল মাত্র দ্বাদশী অবশিষ্ট আছে। কৈ?—দুর্ব্বাসা আসিলেন কৈ? কেন, দেব দুর্ব্বাসা, ধর্ম্মপ্রাণ রাজার ব্রত পণ্ড কর? সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলী রাজাকে জলমাত্র সেবন করিয়া ব্রতাঙ্গ সমাপন করিতে আদেশ করিলেন। রাজা তাঁহাদের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ভগবানে মতি রাখিয়া, সেই অর্দ্ধমুহূর্ত্ত সময় মধ্যে কেবল জলমাত্র সেবন করিয়া ব্রত সমাপন করিলেন; কেন না জলমাত্র সেবন ও উপবাস দুই-ই এক। ইহাতে ব্রতাঙ্গ পূর্ণ হইল ও আতিথ্যজন্য বিহিত উপবাসও অক্ষুণ্ণ রহিল। এইরূপে রাজর্ষি উভয় সঙ্কট হইতে ব্রাহ্মণদিগের বিধান অনুযায়ী উত্তীর্ণ হইলেন।

(৪)

এদিকে মহাত্মা দুর্ব্বাসা স্নানান্তে আতিথ্য গ্রহণজন্য রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজা প্রত্যুত্থান করত অতীব হৃষ্টচিত্তে তাঁহার সমাদর করিলেন। কিন্তু সেই ঋষি দুর্ব্বাসা তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিবলে বুঝিতে পারিলেন যে, রাজা তাঁহার অগ্রেই পারণা শেষ করিয়াছেন। তখন অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত ও সহজে কোপনস্বভাব ঋষি দুর্ব্বাসা ক্রোধে কম্পিতকলেবরে ও অতি রূঢ় স্বরে বলিলেন, "ওরে, মূর্খ! তুই আর কৃষ্ণভক্ত নহিস্; যে হেতু অতিথিকে আহ্বান করিয়া তাহার পূর্ব্বেই স্বয়ং পারণা করিয়াছিস্। তোর এই কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ কর।" রাজা শ্রীভগবানে বুদ্ধি বন্ধনপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতেছিলেন। দুর্ব্বাসার এতাদৃশ কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই ভগবানেই বুদ্ধি স্থির করিয়া কুপিত ঋষিকে সান্ত্বনা করিবার জন্য রাজর্ষি সুমধুরবাক্যে মিনতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্ব্বাসা ক্রোধে জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন ও পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিয়াই স্বীয় জটা ছিন্ন করিয়া তাহাতে এক প্রবল কৃত্যা

কল্পনা করিয়া রাজা অম্বরীষকে বিনাশ করিবার জন্য, সেই প্রবল ব্রহ্মদণ্ড পরিত্যাগ করিলেন। সেই ভীষণ কৃত্যা, জ্বলন্ত শিখা বিস্তার করিয়া চতুর্দ্দিকে অগ্নি বর্ষণ করিতে করিতে অম্বরীষের দিকে ধাবিত হইল। রাজা স্থির—অচল, অটল ; ভগবানে হৃদয় অর্পণ করিয়া প্রশান্তভাবে মহর্ষির কোপ শান্তির প্রতীক্ষায়দণ্ডায়মান রহিলেন। প্রজাবর্গ হাহাকার করিয়া উঠিল ! রাণী শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন ! পুরোহিতবর্গ কোলাহল করিয়া উঠিলেন। সেই প্রলয়াগ্নির মধ্যে, সেই ব্রহ্মদণ্ডোত্থিত অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে রাজা আত্মরক্ষায় নিশ্চেষ্ট ;—অতি প্রশান্ত, অতি স্থির। তখন রাজর্ষি দেখিলেন একমাত্র ভগবানই জীবের হৃদয়ে, জীবের কর্ম্মে বিরাজমান ! "ভগবান্ ব্যতীত দ্বিতীয় পদার্থের সত্তা নাই—ব্রহ্মশাপের ও ব্রহ্মদণ্ডের, ভগবান্‌স্বতন্ত্র দ্বিতীয় সত্তা নাই। তখন দুর্ব্বাসাকে আহ্বানোদ্যত হইয়াই যেন রাজা পূর্ব্ববৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। আর হৃদয় মধ্যে যেন বলিতেছেন "ভগবান্, তুমিই সত্য !—তুমিই সত্য !—তুমিই সত্য !" সেই ঘোরতর অগ্নি রাজর্ষিকে গ্রাস করিবার জন্য ভয়ঙ্কর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রাজর্ষি স্বীয় পদবীতে স্থির ও অবিচলিত। পূর্ব্ববৎ যুক্তকরে দণ্ডায়মান। হৃদয়ে ধ্বনিত হইতেছে,—"তুমিই সত্য ! তুমিই সত্য !" সেই অগ্নিসন্তাপে চতুর্দ্দিক্ সন্তপ্ত হইয়া উঠিল ; যেন আকাশমণ্ডল ও দিক্ সকল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পশু, পক্ষী ; প্রজা, স্বজনবর্গ ; দ্বিজ, অতিথি ; সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া, ভীত ও ত্রস্ত হইয়া কোলাহল করিয়া উঠিল। আর "ওই স্থির রাজর্ষি বুঝি এই মুহূর্ত্তেই ভস্মীভূত হইয়া গেল" এই ভাবিয়া ভীষণ রোদনধ্বনি অতি কঠোর হৃদয়কেও বিচলিত করিল। হে ভগবান্, আজ তোমার ভক্ত তোমার পদে মতি রাখিয়া, অনাথের ন্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে !—ব্রহ্মাগ্নিতে ভস্মীভূত হইবে !—কোথায় ভক্তবৎসল.—অসহায়ের সহায়, দীননাথ ! এই প্রজাবর্গের এক মাত্র আশ্রয়তরু, ওই বজ্রাঘাতে নির্ম্মূল হইতে বসিয়াছে ;—একবার তোমার দীননাথ নামের সার্থকতা রক্ষা কর—একবার তোমার ভক্তবৎসল নামের মহিমা প্রচার কর !

পাঠক, ওই দেখ ভগবানের আশ্চর্য্য মহিমা।—কে তুমি ?—কে তুমি ?—কে তুমি ?—কোথা তুমি ?—কে দয়াময় এই প্রচণ্ড অগ্নিকে অর্দ্ধ পথে অবরুদ্ধ করিলে ? একবার দেখা দাও, লক্ষ লক্ষ সতৃষ্ণ নয়ন উর্দ্ধপানে চাহিয়া আছে। কেন এই প্রলয়োদ্যত জ্বলন্ত পাবক অম্বরীষের উপর পতিত না হইয়া, এক করালদর্শন অস্ত্রের উপর পতিত হইল !—সেই ভীষণ অস্ত্রের আকৃতি

চক্রের ন্যায়!—অবিরত ঘূর্ণায়মান! মুহুর্মুহুঃ অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে! ব্রহ্মদণ্ড সেই সুমহান্ সুদর্শন চক্রের উপর পতিত হইয়া নিমেষে ভস্মীভূত হইয়া গেল! ধন্য ভগবান্! ধন্য ভক্তবৎসল দয়াময়!—তোমার লীলা, অতি দুর্জ্ঞেয়!—অতি দুর্জ্ঞেয়!

মুহূর্ত্ত পরে সমবেত দর্শকমণ্ডলী বিস্ময়াবিষ্ট-নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন, ঋষি দুর্ব্বাসার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই অগ্নি মূর্ত্তিমান কালের ন্যায় তাঁহার অনুধাবন করিতেছে। আর প্রাণভয়ে ভীত, আত্মরক্ষায় অসমর্থ ক্রোধ-বিমূঢ় দুর্ব্বাসা পলায়ন করিতেছেন। সেই ঋষির মস্তকোপরি সেই ভীমদর্শন চক্র অবিরত বিঘূর্ণিত হইতেছে। রাজা তেমনি স্থির—তেমনই ঋষি দুর্ব্বাসাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য, যুক্তকরে, উর্দ্ধনেত্রে, প্রার্থনা করিতে করিতে দণ্ডায়মান। দুর্ব্বাসা নক্ষত্রবেগে ছুটিতেছেন। আর সেই অবিশ্রান্ত ঘূর্ণায়মান চক্র অসহ্য উত্তাপে দুর্ব্বাসাকে দগ্ধ করিতে করিতে পশ্চাৎ ধাবিত হইল। রাজা তখনও যেন হৃদয়ে ভাবিতেছেন—"তুমিই সত্য! তুমিই সত্য! তুমিই সত্য!" রাজা নয়ন ফিরাইয়া দেখিলেন দুর্ব্বাসা পলায়ন করিতেছেন আর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক করালদর্শন চক্র ধাবিত হইতেছে। রাজর্ষি ভাবিলেন "এ চক্র কে স্মরণ করিল? আমিত স্মরণ করি নাই, তবে কে করিল? অহো! ভগবান্ তুমিই রক্ষক! তুমি সত্য! জগৎ তোমাতেই স্বতঃই প্রতিষ্ঠিত। জীবের যে মুহূর্ত্তে যাহা প্রয়োজন, দেব, তুমিই সেই মুহূর্ত্তে তৎস্বরূপ হইয়া সৃজন, পালন ও ধ্বংস করিয়া থাক; ইহাতে জীবের চেষ্টা মায়াকল্পিত মাত্র।" রাজা দেখিলেন সমাগত দর্শকমণ্ডলীর শোকাশ্রু এখন আনন্দ-অশ্রুতে পরিণত হইয়া উন্মত্তপ্রবাহিণী যমুনার ন্যায় অবাধে প্রবাহিত হইতেছে। রাজার যুগলনয়ন সেই সমবেদনার পূত অশ্রুজলে ভাসিয়া গেল। কি রা[illegible], কি প্রজা, কি ঋষি কি চণ্ডাল, সকলেরই নয়নে প্রেমাশ্রু দরবিগলিতধারে প্রবাহিত হইল। তখন রাজর্ষি আবার যেন উর্দ্ধনেত্রে চাহিয়াই বলিলেন "দেব দুর্ব্বাসা, আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন, আমাকে সত্যে সংরক্ষিত করুন, আমি আপনারই আগমনপ্রতীক্ষায়, জলমাত্র সেবন করিয়া রহিলাম।"

(৫)

দুর্ব্বাসা প্রাণভয়ে ভীত, অবিশ্রান্ত ছুটিতেছেন; আত্মরক্ষার জন্য লালায়িত—কেমন করিয়া নিস্তার হয়! পশ্চাতে জ্বলন্ত চক্র প্রতি মুহূর্ত্তে অগ্নি বর্ষণ করিতেছে। অসহ্য উত্তাপে সর্ব্বশরীর দগ্ধপ্রায়। দুর্ব্বাসা যেখানেই পলায়ন

করেন, সেই অগ্নি উদ্‌গীরণকারী চক্র সেই থানেই তাঁহার অনুধাবন করে। দুর্ব্বাসা ভূমিতলে প্রবেশ করিলেন, জলন্ত চক্র সেইখানে উপস্থিত হইল। পর্ব্বত কন্দরে লুকাইতে গেলেন, সেখানেও সেই চক্র তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। সাগরজলে নিমগ্ন হইলেন, সেখানেও সেই চক্র তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। দুর্ব্বাসা অনন্যোপায় হইয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন, হায়! সেই অপ্রতিহতগতি চক্র সেখানেও প্রবেশ করিয়া দুর্ব্বাসাকে অসহ্য উত্তাপে দগ্ধ করিতে লাগিল। এইরূপে দুর্ব্বাসা কখন ভূতলে, কখন পাতালে, কখন শূন্যে, অন্তরীক্ষে, কখন বা স্থানান্তরে, এইরূপে, একস্থান হইতে অন্যস্থানে, নিরন্তর বায়ুর ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন আর প্রচণ্ড অনল যেমন ভ্রমণশীল বায়ুকে উত্তাপে দগ্ধ করে, সেইরূপ চক্রও সেই ভ্রমণশীল ঋষিকে অবিরত দগ্ধ করিতে লাগিল। দিন নাই, রাত্রি নাই, একটী নিমেষের বিশ্রাম বা বিরাম নাই, সেই দগ্ধকারী চক্রের দ্বারায় উৎপীড়িত হইতে লাগিলেন। ঋষি কোথাও আশ্রয় পাইলেন না; অবশেষে তিনি আশ্রয় প্রার্থনায় ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার চরণতলে পতিত হইলেন। হায়, সেই অহঙ্কারে মলিনবুদ্ধি ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মা যথোচিত জ্ঞানগর্ভ বাক্য কহিয়া বিদায় দিলেন আর বলিলেন, "দুর্ব্বাসা, তুমি তোমার আচরণে সেই দ্বন্দ্বাতীত শ্রীবিষ্ণুরই দ্বেষ করিয়াছ;—ও চক্র বিষ্ণুচক্র, আমি কেমন করিয়া উহাকে নিরস্ত করিব?" মহাত্মা দুর্ব্বাসা এই রূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া অবশেষে দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই মলিনবুদ্ধি ঋষির বুদ্ধি তখনও অহঙ্কারের মোহে এক ভ্রান্তি হইতে অন্য ভ্রান্তিতে মুগ্ধ হইতেছে। সেই পরম করুণাময়, সর্ব্বগুণের অতীত, দয়ার-সাগর মহাদেব তাঁহার এতাদৃশ দুর্দ্দশা দেখিয়া কহিলেন, "তপোধন, তুমি বিষ্ণু-ভক্তের প্রতি দ্বেষ করিয়া ভাল কর নাই—আমার ত্রিশূলেও ওই বিষ্ণুচক্র প্রতিরুদ্ধ হইবে না। তুমি বিষ্ণুর প্রতি দ্বেষ করিয়াছ। সেই জন্য তোমার এই দুর্দ্দশা। যাও বৎস! নিষ্পাপ-অন্তরে সেই পতিতপাবন হরির চরণতলে আশ্রয় লও; তিনিই তোমার উদ্ধারের উপায় করিবেন।" তখন অনন্যোপায় হইয়া দুর্ব্বাসা স্বীয় কৃতকর্ম্মের অনুশোচনা করিতে করিতে বিষ্ণুর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। সেই ভীষণদর্শন চক্রও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মস্তকোপরি অগ্নি বর্ষণ করিতে করিতে ধাবিত হইল।

এদিকে অম্বরীষের অন্তঃপুর একবারে শ্রীশূন্য—শোভা শূন্য। রাণী, উন্মাদিনীর ন্যায় লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন, শূন্যনেত্রে আকাশ পানে চাহিয়া বসিয়া আছেন

—সে দৃষ্টিতে আশা নাই—সাহস নাই। যাহা যাহা মনুষ্য-জীবনের পরিচায়ক তাহার কিছুই নাই। কেশ রুক্ষ—আলু থালু—যেন অনাথিনী—যেন তপস্বিনী; সমস্ত জীবন কোন নিষ্ঠুর দেবতার পূজায় বিফলমনোরথ হইয়া দুর্ব্বহ জীবন-ভারে অবসন্ন। কিয়ৎক্ষণ পরে অতিক্ষীণকণ্ঠে অর্দ্ধস্ফুট ভাষায়, কাতর স্বরে ডাকিলেন "কোথা, দেব দয়াময়! অনাথের নাথ—দীন নাথ! কি কুক্ষণে দ্বাদশী ব্রত করিয়াছিলাম? রাজার বাক্যে সম্মত হইয়াছিলাম? কখন আত্মাভিমান করি নাই, স্বামিপদ চিন্তা ভিন্ন কখন অন্য বাসনা করি নাই। আর আমার প্রভু—আমার স্বামী আহা সেই করুণাময়, মনুষ্যরূপী দেবতা আমার—ভ্রমরের ন্যায় তোমারই পাদপদ্মে মত্ত আছেন। তোমার সেই প্রিয় ভক্ত—আমার প্রাণের দেবতা—অনশনে প্রাণপাত করিতেছেন। ক্ষীর সর নবনীতে যিনি আজীবন পালিত;—জীবনে কঠোরতা যাঁহার সবে মাত্র নূতন। সেই সুষমা কোমলহৃদয় আর কত সহিবে—জলমাত্র সেবন করিয়া আর কত কাল প্রাণ ধারণ করিবেন! দিনের পর দিন চলিয়া গেল, মাসের পর মাস চলিয়া গেল, ঋতুর পর ঋতু চলিয়া গেল, এই সামান্য জল মাত্র সেবন করিয়া—আর ভরসা নাই, আর সাহস নাই; আর আশা নাই। দুর্ব্বাসা, তোমার কর্ম্মে বিধাতার এত লেখা লুক্কায়িত ছিল!—কেন দেব তোমার নয়ন-অনলে প্রথমেই আমি ভস্মীভূত হইলাম না?—এই জলটুকু দেখিলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে!—জল?—না না এ জল নয়—প্রাণরক্ষাকারী অমৃত—কোথায় বিপদ্‌ভঞ্জন মধুসূদন, এই প্রাণসঙ্কটে একবার মুখ তুলিয়া চাও; তোমার দয়ায় যেন এই জল অমৃততুল্য হইয়া আমার স্বামীর প্রাণ রক্ষা করে। মা সাবিত্রি, যদি এ জগতে তোমরা সতীত্বের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া থাক—এখনও যদি এ জগতে সতীত্বের মর্য্যাদা রক্ষার প্রয়োজন থাকে—যদি একান্তমনে স্বামি-সেবা করিয়া থাকি, তবে মা তোমার দয়ায় তোমার প্রসাদে এই জল যেন অমৃতরূপে আমার স্বামীর প্রাণ রক্ষা করে। হে পঞ্চ-কন্যে, তোমরা যদি স্বামি-সেবার দ্বারায় স্ত্রীজাতীর মর্য্যাদা কখন রক্ষা করিয়া থাক, তবে যেন আমার শক্তি—আমার পরমায়ু—আমার ইন্দ্রিয়সামর্থ্য তোমাদের দয়ায় তোমাদেরই সতীত্বে ও পুণ্যে আমার স্বামি-সেবার জন্য যথার্থ অর্পণ করিতে পারি। আর এই জল—কয়েক ফোঁটা মাত্র জল—মা তোমাদের আশীর্ব্বাদে অমৃত হোক্‌ অমৃত হইয়া আমার স্বামীর প্রাণ রক্ষা করুক।" অতি কষ্টে রাণী এইরূপে কিঞ্চিৎ বল সঞ্চার করিয়া ধীরে ধীরে জলপাত্র লইয়া অম্বরীষের নিকট উপস্থিত হইলেন।

রাজা যুক্ত-করে নির্নিমেষ নয়নে দুর্ব্বাসার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

দেখিলেন রাণী তাঁহার পারণার জল মাত্র লইয়া দণ্ডায়মানা। রাজা বলিলেন "প্রিয়ে, দুর্ব্বাসা 'ত' আইসেন নাই?—আমি অন্যমনস্ক ছিলাম—তিনি আসিয়া আবার বিমুখ হইয়া যান নাই 'ত'?

রাণী। প্রভু, প্রকৃতিস্থ হউন, ঋষি দুর্ব্বাসা কি জীবিত আছেন?—তাঁহার পশ্চাৎ কালের মত যে অগ্নি ও চক্র—"রাণী আর বলিতে পারিলেন না, রোদন করিতে লাগিলেন।"

রাজা। রাজ্ঞি, তুমি অতি অবোধ, ব্রহ্মহত্যা করিবার সাধ্য কাহারও নাই। প্রিয়ে, আমাদের এই ব্রতে ব্রহ্মহত্যা হইবে?—এ মিথ্যা কল্পনাও পাপ।

রাণী। ভগবান্ না করুন; কিন্তু দেখুন দিনের পর দিন চলিয়া গেল, মাসের পর মাস চলিয়া গেল, কিন্তু দুর্ব্বাসা ফিরিলেন কৈ?—আজ এক বৎসর পূর্ণ হইবে। প্রভু, অনুজ্ঞা করুন আরও কত কাল জলমাত্র সেবন করিয়া প্রাণ ধারণ করিবেন। আমি অল্প-বুদ্ধি, আপনার দাসী, আপনি পুরোহিতগণের সহিত পরামর্শ করুন—আমি আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছি না। আমার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে—প্রতি ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়া পড়িতেছে—আমার অন্তিমকালের বোধ হয় আর বেশী বিলম্ব নাই—নাথ, আমার পরমায়ু আপনাকে অর্পণ করিয়া যেন—

রাজা। রাজ্ঞি স্থির হও, ক্ষণমাত্র অপেক্ষা কর। ঋষিদের পারণার কাল এখনও উত্তীর্ণ হয় নাই,—মহর্ষি দুর্ব্বাসা এখনও আসিলে আসিতে পারেন। চারুশীলে, স্থির হও, ভয়ের কোনও কারণ নাই। যে ভগবান্ সীতাদেবীকে অমৃত পান করাইয়া স্বীয় মহিমা জগতে প্রচার করিলেন, সেই ভগবান্ অমৃত-রূপে জলমধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া তোমার প্রাণ রক্ষা করিবেন, যে ভগবান্ বায়ুতে অধিষ্ঠিত হইয়া সমাধিমগ্ন যোগীদিগের দেহ প্রাণ ইত্যাদি সতত রক্ষা করিতেছেন, সেই ভগবান্ এই জলমধ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তোমার ও আমার প্রাণ রক্ষা করিবেন। রাজ্ঞি! ধৈর্য্য ধর, আমরা ভগবানেরই সুকোমল কোলে রহিয়াছি। স্থির হও। যে ভগবান্ মৃত্তিকা মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বল্মীক-স্তূপের মধ্যে সমাধি-প্রাপ্ত বাল্মীকির প্রাণ রক্ষা করিলেন, তিনিই এই ভূতলে সর্ব্বদা অধিষ্ঠিত থাকিয়া আমাদের দেহ, প্রাণ, মন, ধর্ম্ম, সত্য সকলই রক্ষা করিবেন।

রাণী। না, প্রভু, বোধ হয় সেই দুর্ব্বাসা কোথাও হত-চৈতন্য হইয়া পতিত হইয়া থাকিবেন; তাই আমার ইন্দ্রিয় সকল এত বিকল—প্রতি অঙ্গ প্রাণহীন হইয়া আসিতেছে। মৃত্যু সন্নিকট হইতেছে—

রাজা দেখিলেন রাণীর প্রতি অঙ্গ অবশ হইতেছে—চক্ষু নির্জ্জীবের ন্যায় স্থির—রাজা বিচলিত হইলেন না, স্থিরচিত্তে ঘটনা-স্রোতের গতি দেখিতে লাগিলেন।

রাণী। "ওই দেখ—ওই দেখ রাজন্—আমি কি দেখিতেছি—ওকে?—আমি—আমি—ওই দেখ রাজন্ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল!—তাহার উপর একটী কার মূর্ত্তি?—দুর্ব্বাসা?—দুর্ব্বাসা?—না—ওযে আমি—আমি—আমার চিতাগ্নি—আহা! অগ্নি এত শীতল!—" রাজা দেখিলেন দুর্ব্বল রমণী মানসিক বিকারে স্বপ্ন দেখিতেছে। কহিলেন 'রাজ্ঞি! স্থির হও—স্থির হও! যে ভগবানকে অগ্নি-মধ্যে দেখিতে পাইলে অগ্নিও শীতল বলিয়া অনুভব হয়, সেই ভগবানের কৃপায় প্রকৃতিস্থ হও—ওই দেখ রাজ্ঞি—ওই দেখ রাজ্ঞি তোমার স্বপ্ন সত্য হইয়াছে।"

রাণী। "দুর্ব্বাসা!—দুর্ব্বাসা!—জল নয়, অমৃত নয়, প্রাণ নয়, পরমায়ু—নয়,—দুর্ব্বাসা কৈ?—ভগবান্ দুর্ব্বাসা কৈ?—দুর্ব্বাসা—দুর্ব্বাসা—"

রাজা। রাজ্ঞি! প্রকৃতিস্থ হও!—ওই দেখ—চাহিয়া দেখ—দুর্ব্বাসা আসিতেছেন। এই কথা বলিতে বলিতে সেই ভীষণ উত্তাপে দহ্যমান ঋষি একেবারে রাজর্ষি অম্বরীষের চরণ-তলে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার চরণযুগল ধারণ করিলেন।

রাজা। দেব—দেব—দুর্ব্বাসা—ক্ষমা করুন—আতিথ্য গ্রহণ করুন।

দুর্ব্বাসা। রাজন্! আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে এই বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করুন। আপনি বিষ্ণুভক্ত। আপনার প্রতি যে আচরণ করিয়াছি তাহাতে ত্রিলোকে কোথায় আশ্রয় পাইলাম না। স্বয়ং বিষ্ণুও আমায় আশ্রয় দিলেন না; তাঁহার আদেশমত আমি আপনারই শরণাপন্ন হইলাম। এই ভীষণচক্র হইতে আমায় নিস্তার করুন—আপনিই এই চক্র নিরস্ত করিতে সমর্থ।

রাজা সেই মহাত্মা দুর্ব্বাসাকে এতাদৃশ অবস্থায় দেখিয়া সাতিশয় লজ্জিত হইলেন ও দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইবার পূর্ব্বেই সেই চক্রের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া সুদর্শন চক্র নিরস্ত হইল।

দুর্ব্বাসা সরল অন্তঃকরণে রাজার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন ও উভয়ে এক সঙ্গে বসিয়া অন্ন গ্রহণ করিয়া পারণাক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। রাণীর দুই চক্ষে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল ও শ্রীভগবানের আশ্চর্য্য মহিমা সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে মুহুর্মুহুঃ শত-শত নমস্কার করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

"দিশেহারা—"

হরিদ্বার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হরিদ্বারের প্রতিষ্ঠান সমূহ।

হরিদ্বার বেদ বেদান্ত ও শাস্ত্র চর্চ্চার একটী প্রধান স্থান। এখানে অনেকগুলি সংস্কৃত পাঠশালা ও বেদ-বিদ্যালয় আছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ সদাচারবান্, সদনুষ্ঠান-নিরত অকপট এবং ভজন-পরায়ণ। তাঁহাদের সহিত সদালাপে পরম আনন্দ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মুনি-মণ্ডল মহাবিদ্যালয়, বাল ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা, ঋষি-কুল বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। যাঁহারা প্রাচীন আদর্শের শিক্ষাপ্রণালীযুত এবং সদাচারপূত, ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন বিদ্বান্ ব্রহ্মচারী দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের এইগুলি দেখা কর্ত্তব্য। কনখল অভিমুখে যে রাজপথ গিয়াছে; উক্ত রাজপথের দক্ষিণ পার্শ্বে বাল ব্রহ্মচারি-প্রতিষ্ঠিত পাঠশালাটী অবস্থিত। সুন্দর পুষ্পোদ্যান মধ্যে অধ্যাপনা-মন্দির ও ছাত্রাবাস। প্রাঙ্গণে একটী যজ্ঞ-বেদী। বাল ব্রহ্মচারীর বয়স অশীতি বর্ষের ন্যূন নহে; কিন্তু দেখিলে মনে হয় প্রৌঢ় বয়সে কেবল উপনীত, তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভ; তাঁহার বলিষ্ঠ দেহ হইতে যেন তপস্যার জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে। তিনি স্বয়ং অকৃতদার, তিনি ইচ্ছা করেন যাঁহারা পণ্ডিত বা সাধক তাঁহারা সকলেই অকৃতদার হইয়া থাকেন; বিবাহিত লোকের উপর তিনি একটু চটা; অনেক রাজা ও ধনী তাঁহার ভক্ত; ব্রহ্মচারী নানা স্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি এক একজন অধ্যাপককে মাসিক ২৫৲ ৩০৲ টাকা বৃত্তি দেন। নিযুক্তকালে তাঁহারা অবিবাহিত কি বিবাহিত তাহা বলেন না; পরে দুই এক মাস পরে গলির মধ্যে এক তালা ঘর খোঁজেন। ব্রহ্মচারী বলেন "তোমরা বেদবেদান্ত পড়িয়া পরমার্থতত্ত্ব অবগত হইয়াছ, তোমরা কেন রমণীর দাসত্ব কর? তোমরা বৃত্তি লও—খাও, খেলো ও "মৌজমে রহো"। প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মচারীর আশ্রমটী বড় শান্তিময়, নিকটে লোকালয় নাই, পূর্ব্বদিক্ দিয়া ভাগীরথী কুলকুল ধ্বনী করিয়া দ্রুত গমন করিতেছেন, পাঠশালায় বসিয়া গঙ্গা-প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়।

হরিদ্বারের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও দর্শনযোগ্য বিদ্যালয়, আর্য্য সমাজী-দের গুরুকুল। গুরুকুল একটী প্রকাণ্ড ব্যাপার। ভীষণ দুর্গম জঙ্গল

পরিষ্কার করিয়া বিস্তৃত বিদ্যালয়, মন্দির, খেলার মাঠ, ছাত্রাবাস, পুস্তকাগার, উদ্যান, শিল্পালয়, চিকিৎসালয়, গোশালা, ছাপাখানা, গুরুকুল-সমাচার ও Vedic Magazine নামক মাসিক পত্রের কার্য্যালয়, অধ্যাপক ও ছাত্রসমিতির গৃহগুলি বহু অর্থ ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। আর্য্যসমাজীদের এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে গবর্ণমেণ্টের বা কোন রাজা মহারাজার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। গুরুকুলের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা মুন্‌সী রাম নিজের অতুলনীয় অধ্যবসায়ে মধ্যবিত্ত অবস্থার আর্য্যসমাজীদের দানে এই সুবৃহৎ বিদ্যালয় ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আর্য্যসমাজীর সংখ্যা ৯২৪১৯ মাত্র [১৯০১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে]। তাঁহাদের মধ্যেও দুইটী শাখা,—একটী আমিষাশী ও অপরটী নিরামিষাশী। গুরুকুলের প্রতিষ্ঠাতারা নিরামিষাশী। মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত ভদ্র লোকের চেষ্টায় যে এত বড় একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

কনখল হইতে মাইল দুই গঙ্গার চড়া এবং উপলখণ্ডের উপর দিয়া চলিয়া পারঘাটার নৌকায় (ভাড়া ৵৫) গঙ্গা পার হইয়া মাইল ২।৩ কাশবনে (Tiger grass) হাঁটিয়া আসিলেই গুরুকুলে পৌছান যায়। এ স্থানের নাম কাঙ্গরী। কোন দর্শক উপস্থিত হইলেই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা সযত্নে দেখাইয়া থাকেন এবং অতিথিসৎকার করিয়া থাকেন। তিন দিকে ঘন জঙ্গল, এক দিকে পার্ব্বত্য নদী কল কল রবে প্রবাহিত। গুরুকুলের প্রাকৃতিক দৃশ্যও বড় মনোরম।

গুরুকুলের উদ্দেশ্য—আমাদের প্রাচীন কালের ব্রহ্মচর্য্য প্রণালীর এবং গুরুগৃহে শিক্ষার পুনঃ প্রবর্ত্তন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই ভারতবর্ষ উৎসন্ন যাইতেছে। তাঁহাদের উদ্দেশ্য এই আশ্রমের ব্রহ্মচারিগণ সংযত, সবল, বেদজ্ঞ ও ত্যাগী হইয়া ভারতবর্ষে পুনর্ব্বার প্রকৃত ব্রাহ্মণের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবেন। তাঁহারা এক দিকে বেদ বেদান্ত, সংস্কৃত কাব্য, দর্শন অধ্যয়ন করিবেন, অন্যদিকে ইউরোপীয় বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস হিন্দী ভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষা করিবেন। ইংরাজী ভাষাও শিক্ষা দেওয়া হয়। সম্প্রতি 'কীণ্ডার গার্টেন' প্রণালীর প্রবর্ত্তন হইয়াছে; এবং বিজ্ঞান শিক্ষা আলোচনার জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগার (Laboratary) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রহ্মচারিগণ ড্রিল, ফুটবল, ক্রিকেট খেলা ও অশ্বারোহণ ও নানারূপ ব্যায়াম করিয়া থাকেন। নয় বৎসর বয়সে উপনয়ন হইলে বালক গুরুকুলে প্রবেশ করে, এবং ২৪ বৎসর

বয়সে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে ফিরিয়া যায়। এই কয় বৎসর ছাত্রগণ বাটী যাইতে পায় না এবং ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে বাধ্য হয়।

ছাত্রগণকে বোর্ডিং চার্জ্জ ও স্কুলের বেতন দশ পনেরো টাকা পর্য্যন্ত দিতে হয়। রন্ধনশালার কার্য্য ছাত্রগণই করিয়া থাকেন।

ছাত্রগণের দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালী এইরূপ—

প্রাতে ৪ কি ৪৷৷০ ঘটিকার সময় আশ্রমস্থ ঘণ্টানিনাদে ব্রহ্মচারী ছাত্রগণ শয্যা ত্যাগ করত শৌচাদি করিয়া ব্যায়াম ও ড্রিল করেন। ব্যায়ামান্তে গঙ্গাস্নান করত ৫টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্রহ্মচারীকে বৈদিক সন্ধ্যা, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি শাস্ত্রীয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হয়। তাহার পর দুগ্ধ পান করিয়া ৬-১৫ মিঃ হইতে ১০৷৷টা পর্য্যন্ত পাঠাগারে অধ্যয়ন করিতে হয়। অতঃপর নিরামিষ আহারান্তে ২-৪৫ মিঃ পর্য্যন্ত বিশ্রামের সময়। ২-৪৫ মিঃ হইতে ৫-১৫ মিঃ পর্য্যন্ত পুনরায় অধ্যয়ন করিতে হয়। গ্রীষ্মকালে অধ্যয়নের সময় ২।১ ঘণ্টা কম হয়। বৈকালে কিছুক্ষণ ক্রীড়া ও ব্যায়ামের পর সন্ধ্যার সময় আবার আহ্নিক, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি সমাধা করিতে হয়। নৈশ আহারের পর ছাত্রগণ দিনের পাঠ আবৃত্তি করেন। রাত্রি ৯ ঘটিকায় ঘুমাইবার সময়। ছাত্রগণকে দৈনিন্দন কার্য্যলিপি রাখিতে হয়। তাহা শিক্ষকগণ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়া থাকে। গুরুকুলের পুস্তকালয়ে ৬০০০ হাজারের অধিক পুস্তক আছে। এখান হইতে একটী সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা "গুরুকুলসমাচার" ও Vedic Magazine নামক ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। গুরুকুলে সংস্কৃত-উৎসাহিনী সভা, হিন্দী-সাহিত্যপরিষদ্ এবং অধ্যাপকসভা আছে। সংস্কৃত-উৎসাহিনী সভার ছাত্র এবং অধ্যাপকগণ সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিয়া থাকেন। হিন্দী-সাহিত্যপরিষদে হিন্দী ভাষায় ভাল গ্রন্থ লিখিবার ও হিন্দীসাহিত্যের উন্নতি ও নাগরী অক্ষর দেশে প্রচারের চেষ্টা হয়। তাঁহারা বলেন হিন্দীই ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানের ভাষা, সুতরাং comman language ; ইহার বহুল প্রচারে ভারতের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। গুরুকুলে একটী তাঁত খোলা হইয়াছে। ব্রহ্মচারিগণ তাহার প্রস্তুত কাপড়ই ব্যবহার করেন। গোশালার দুগ্ধ এবং বাগানের তরকারী ফলমূল ব্রহ্মচারিগণ আহার করেন। এক কথায় গুরুকুল একটী ক্ষুদ্র উপনিবেশস্বরূপ। আশ্রমটী নিজেই নিজের প্রায় সমস্ত ভার বহন করিয়া থাকেন।

জ্বালাপুরে গুরুকুলের একটী শাখা আছে। মূল গুরুকুলে প্রায় ২৷৷০ শত

ছাত্র, তন্মধ্যে অধিকাংশই পঞ্জাবী। বাঙ্গালী যে কয়জন আছেন তাঁহারাও পাকা পঞ্জাবী বনিয়া গিয়াছেন। ছাত্রেরা যোধপুরী breeches (পাতলুন) পড়িয়া অশ্বারোহণ করে, আবার সচরাচর কাছা খোলা অবস্থায় থাকে এবং যজ্ঞশালায় হবন (হোম) করে। সকলেই জানেন আর্য্যসমাজ দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রতিষ্ঠিত। তিনি বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন। কিন্তু বেদের 'সায়নাচার্য্য' 'মহীধর' প্রভৃতি প্রাচীন ভাষ্যসঙ্গত অর্থ তিনি স্বীকার করিতেন না। নিজ বুদ্ধি বলে ও অলৌকিক ব্যাকরণ জ্ঞানের প্রভাবে নিজেই বেদের একরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারেই আর্য্যসমাজীরা চলিয়া থাকেন। তাঁহারা দেবতা পুরাণ তন্ত্র স্মৃতি মানেন না! হিন্দুসমাজের আচার অনুষ্ঠান, জাতিভেদ, মূর্ত্তি পূজা মানেন না। বেদের যে স্থলে জাতিভেদ মূর্ত্তি পূজা প্রভৃতির কথা আছে, তাঁহারা সেগুলি বেদে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলেন। অথবা তাহার বিকৃতার্থ করিয়া থাকেন। অধিকন্তু ইঁহারা পুরাণ, তন্ত্র এবং স্মৃতি-প্রোক্ত কর্ম্মকাল মানেন না। এবং তাঁহারা একেশ্বরবাদী; কতকটা ব্রাহ্ম-সমাজের ন্যায় তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস। তাঁহার বৈদিক যজ্ঞ করেন বটে, তবে বলেন যে ইহাতে কোন দেবতা তৃপ্ত হয় না। ধূম প্রচুর পরিমাণে উত্থিত হইলেই মেঘ হয়, মেঘ হইতেই বৃষ্টি, ইহাই হবনের উদ্দেশ্য।

নিম্নশ্রেণীর উত্তোলন ও মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতিকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে ইঁহারা কুণ্ঠিত নহেন। এই শেষোক্ত প্রকরণটির নামই শুদ্ধিকরণ। পূর্ব্বে যে সমস্ত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের জল চলিত না, আর্য্যসমাজে আসিয়া তাহাদের জল চলিতেছে। তাঁহারা তীর্থাদির ও মূর্ত্তিপূজার নিন্দা করিয়া থাকেন; এবং সনাতন ধর্ম্মের মূল ভিত্তি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মানেন না।

গুরুকুলের আদর্শে সনাতনধর্ম্মাবলম্বীরা "ঋষিকুল বিদ্যালয়" নামক যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন, তাহা হিন্দুর অবশ্য দর্শনীয়। ব্রহ্মকুণ্ড হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে জ্বালাপুর রোডের উপর, হরিদ্বার ষ্টেসনের অনতিদূরে ঋষিকুল আশ্রমটী স্থাপিত। তত্রত্য ব্রহ্মচারী বালকগণকে দেখিলে প্রাচীন-কালের ঋষিদের আশ্রমের কথা মনে পড়ে। এখানে গুরুকুলের ন্যায় বিজাতীভাবের লেশমাত্র নাই। ঋষিকুলের উদ্দেশ্য সনাতন ধর্ম্মানুমোদিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদান্ত ও কর্ম্মকাণ্ডনিপুণ ঋষিকুমার প্রস্তুত করা,—যাহাতে তাঁহারা প্রাচীন প্রথায় সুশিক্ষিত হইয়া ভারতবর্ষে সনাতনধর্ম্মের আদর্শ প্রচার করেন। অষ্টম বর্ষ হইতে দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক

বালক উপনীত হইয়া এই আশ্রমে প্রবেশ করিবেন; এবং ২০ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া পাঠ সমাপন করত বৈদিকপ্রথানুসারে সমাবর্ত্তন করিবেন। পাঠ্যাবস্থায় বিশেষ প্রয়োজনীয় হেতু ভিন্ন ব্রহ্মচারিগণ গৃহে যাইতে পান না; এবং মাতা ও সহোদরা ভিন্ন অন্য স্ত্রীর মুখ দর্শন করিতে পান না। ইচ্ছা করিলে ৭ম শ্রেণীর পণ্ডিতপরীক্ষা দিয়া ছাত্রগণ সমাবর্ত্তন করিতে পারেন। এই দ্বাদশ বৎসরে সমগ্র ব্যাকরণ, যজুর্ব্বেদ, কাব্য, স্মৃতি, জ্যোতিষ, পুরাণ, দর্শনশাস্ত্র ও ম্যাট্রিকুলেশন-পাঠ্য ইংরাজী ভাষা এবং অঙ্কশাস্ত্র, ভূগোল এবং সংস্কৃত রচনা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। যাঁহারা শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন, তাঁহারা ষড়ঙ্গ বেদ বেদান্ত, দর্শন, সাহিত্যে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন হয়েন। প্রথমতঃ হরিদ্বারের পাণ্ডা ও বণিক্‌গণের উদ্যোগে নৈনিতালের বিখ্যাত পণ্ডিত দুর্গাদাস পন্থ মহাশয় ইহা ক্ষুদ্রাকারে স্থাপিত করেন। পরে সনাতনধর্ম্মাবলম্বী পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম দেশবাসীর সাহায্যে উহা ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে রেজিষ্টারী হয়। কলিকাতার মারওয়ারীগণ ইহার প্রধান সহায়ক। তাঁহারাই ইহার অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন। গৃহনির্ম্মাণ-তহবিলে এক সুপ্রসিদ্ধ পান্নালাল মুরারকা মহাশয়ই ২১ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। সংপ্রতি ইহার বাৎসরিক ব্যয় ৩০ হাজার টাকা এবং ব্রহ্মচারীর সংখ্যা ১৫০ শতেরও অধিক। ছাত্রগণের নিকট কোনরূপ বেতনাদি লওয়া হয় না; আশ্রমই ছাত্রদের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচারিগণের পিতা বা অভিভাবকগণ ব্রহ্মচারিগণকে কোনরূপ অর্থাদি দিতে পারিবেন না। ব্রহ্মচারিগণের দৈনন্দিন জীবনযাপনপ্রণালী,—এইরূপ প্রাতঃ ৪টা হইতে ৬॥ পর্য্যন্ত শৌচ, স্নান, সন্ধ্যা ও যজ্ঞশালার সমিদাধান। ৬॥টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত বেদাধ্যয়ন, ৮—১০ পাঠশালার অন্যান্য বিষয় অধ্যয়ন। ১০—১২ ভোজন ও বিশ্রাম। ১২—২ পাঠাভ্যাস। ২—৫ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন। ৫—৬॥ ক্রীড়া, ব্যায়াম ও ভ্রমণ। ৬॥—৮ শৌচ, সন্ধ্যা, সমিদাধান। ৮—৯ ভোজন। ৯—১০ অভ্যাস; পরে দুগ্ধপানান্তর শয়ন।

ঋষিকুলেও ছাত্র-সভা ও অধ্যাপক সভা আছে, এবং ইহারও মহাসমারোহে গঙ্গা দশহরার সময়, পঞ্চ দিনব্যাপী সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া থাকে, এই সময় ঋষিকুলের হিতৈষী ও ট্রষ্টীগণ একত্রিত হইয়া ঋষিকুলে বিধি ব্যবস্থা আয় ব্যয় নির্দ্ধারণাদি করিয়া থাকেন। গত সন দ্বারভাঙ্গার মহারাজ বাহাদুর এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং বর্ত্তমান বৎসরে দেশপূজ্য পণ্ডিত

মদনমোহন মালব্য মহোদয় এই সাম্বৎসরিক মহোৎসবের সভাপতি হইয়াছিলেন, এবং ভারতের নানা প্রদেশের পণ্ডিতগণ উপস্থিত ছিলেন। আমরা এই ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। ব্রাহ্মণ বালকগণ শুভ্র বর্ণের, ক্ষত্রিয়গণ রক্তবর্ণের ও বৈশ্যগণ হরিদ্রা বর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন। সকলেরই মুণ্ডিতমস্তক; এবং সকলেরই মুখে সরলতা ও সৌম্যতার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাব যে কত উন্নত তাহা ইহাদিগকে দেখিলেই বুঝা যায়। ইঁহারা অধিষ্ঠাতার আজ্ঞা ভিন্ন কাহারও সঙ্গে কথা বলিতে পারেন না। এবং ভূষণ, পুষ্প, মাল্য, চন্দন, ছত্র, দর্পণ, উপানৎ আদি ব্যবহার নিষিদ্ধ। প্রত্যেক নিবাস-গৃহেই এক একজন অধিষ্ঠাতা আছেন। অধিষ্ঠাতা মহাশয়ের আদেশানুসারে ব্রহ্মচারী বালকগণের সুমধুর বৈদিক সুরে "গঙ্গালহরী" স্তোত্র আবৃত্তি শুনিয়া, আমাদের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইল। বৈদিক সুরের কি প্রাণোন্মাদিনী ও উর্দ্ধগামিনী শক্তি তাহার আভাস পাইলাম। প্রাতে অপরাহ্ণে যখন ইঁহারা গঙ্গার ক্যানেলের তীরে সন্ধ্যা বন্দনা করিতে সমবেত হয়েন, তখন যে অপূর্ব্ব শোভার উদয় হয় তাহা বর্ণনাতীত।

ঋষিকুলের উদ্দেশ্য মহান্। ভারতবর্ষে বোধ হয় ইহাই একমাত্র বিদ্যালয় যথায় সনাতনধর্ম্মানুযায়ী ব্রহ্মচর্য্য ও শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু অর্থাভাবে অনুষ্ঠাতারা এখনও তাঁহাদের সংকল্পিত সকল ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারে নাই। হিন্দুর দান নিত্য কর্ত্তব্য এবং শ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিক কার্য্যেও হিন্দু-সন্তানগণ আজিও প্রচুর দান করিয়া থাকেন। সকলেই যদি দান করিবার সময় ঋষিকুলকে স্মরণ করেন, তবে ঋষিকুল অচিরেই উন্নতি প্রাপ্ত হইবে। মায়াপুরী মাহাত্ম্যে আছে "বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে দান করাই উচিত।" সুতরাং তীর্থযাত্রি-গণকে অনুরোধ তাঁহারা যেন হরিদ্বারে গিয়া যথাসাধ্য ঋষিকুলে দান করেন। বিদ্যাদানের ন্যায় দান নাই; এবং ব্রহ্মচর্য্যের ন্যায় ধর্ম্ম নাই। সনাতন ধর্ম্মের উন্নতি বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপরই নির্ভর করিতেছে। আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্যের উপরই নির্ভর করিতেছে। অতএব ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পুনঃপ্রতিষ্ঠা ভিন্ন সনাতন ধর্ম্মের উন্নতি কদাচ সম্ভব নহে। ঋষিকুলের প্রতিষ্ঠাতাগণের ইচ্ছা আছে যে, কালে তাঁহারা বানপ্রস্থাশ্রমের ও সন্ন্যাসাশ্রমের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। কতিপয় গৃহনির্ম্মিত হইবে যাহাতে ধার্ম্মিক গৃহস্থগণ শাস্ত্রানুসারে গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া, এই আশ্রমে থাকিয়া, বানপ্রস্থ ধর্ম্মাচরণ করিবেন; এবং বিদ্বান্ সন্ন্যাসি-গণ এখানে ত্রিরাত্রি বা চাতুর্ম্মাস্য যাপন করিবেন। হরিদ্বারের তীর্থযাত্রীর পক্ষে

ঋষিকুল দর্শন এবং তথায় সাধ্যানুসারে দান অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা দর্শন করিলে প্রাচীন ভারতের ঋষি-আশ্রমের কথা মনে পড়িবে।

কেহ সম্পূর্ণ ব্যয়ে গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেও তাহাতে দাতা ইচ্ছা করিলে তাঁহার বা তাঁহার পিতৃ-পিতামহের নামযুক্ত স্মারকলিপি সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়।

হরিদ্বারের আর একটী উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান কনখলের "রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম।" পরমহংসদেবের শিষ্যগণ অনাথ আশ্রয়হীন পীড়িত ব্যক্তিগণকে সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য এইরূপ সেবাশ্রম বৃন্দাবন, কাশী ও কনখল প্রভৃতি নানা স্থানে স্থাপন করিয়াছেন। "দরিদ্র নারায়ণের" সেবাই ইঁহাদের উদ্দেশ্য। জীব-সেবার ন্যায় মহৎ-ধর্ম্ম আর কি আছে? পূর্ণ ভগবান্ই জীবরূপে ও জগৎরূপে লীলা করিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ সত্যই বলিতেন "ঐ যে, অনাথ দরিদ্র বা কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত দেখিতেছ, মনে করিও না তাঁহাকে দুই চার পয়সা দিয়া তুমি তাঁহাকে অনুগ্রহ করিলে। তোমার হৃদয়ে দয়াধর্ম্মের উদ্রেকের জন্য নারায়ণই দরিদ্র অনাথ এবং ঘৃণ্য ব্যাধিগ্রস্তের রূপে আসিয়াছেন। উদ্দেশ্য তোমার হৃদয়ে দয়া করুণা প্রভৃতির সদ্‌গুণের উদ্রেক করিয়া তোমাকে মুক্তিপথে অগ্রসর করেন"। ভাগবতেই আছে,—

"মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহুমানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকণয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥

ঈশ্বরই জীবরূপে প্রতিভাত। সুতরাং যেখানে দরিদ্র রুগ্ন অনাথ দেখিবে, যেখানে কাহারও অশ্রুপাত হইতেছে, সেই থানেই ভগবৎ-বুদ্ধিতে তাঁহার সেবা করিবে। দরিদ্র দুর্ব্বল পীড়িত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের পূজা করেন।

রামকৃষ্ণমিশনের সন্ন্যাসিগণ এই মহাভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ১৯০১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে এই সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক অধ্যবসায়ে এক্ষণে সেবাশ্রমের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে এবং দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ১১৷৷০ বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ ৫৬৯৭৪ জন নিরাশ্রয় রুগ্নের চিকিৎসা হইয়াছে, এবং ৯৪৫ জনকে আশ্রমের হাঁসপাতালে রাখা হইয়াছে। সাধারণের প্রদত্ত ভিক্ষালব্ধ অর্থ হইতেই আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। সন্ন্যাসিগণ এরূপ যত্ন সহকারে সেবা ও শুশ্রূষা করিয়া থাকেন যে, অনেক রোগীই গবর্ণমেণ্টের

হাঁসপাতালে না গিয়া, মিশনের আশ্রমে গিয়া থাকেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট ইঁহাদের কার্য্যের বিশেষ উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী কল্যাণানন্দকে একটী দিল্লী-দরবার-মেডেল ১৯১২ সালে প্রদান করিয়াছেন, এবং হরিদ্বার মিউনিসিপ্যালিটী মাসিক ১৫৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিতেছেন।

আশ্রমের কার্য্যক্ষেত্র আরও প্রসারিত হওয়া আবশ্যক বিবেচনায়, কর্ত্তৃপক্ষ আরও গৃহ নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। কারণ মেলার সময় হরিদ্বারে বহু লোকের সমাগম হয়, এবং বর্দ্ধিত সংখ্যক রোগীর সেবা স্থানাভাবে করা অসম্ভব হইয়া উঠে। তাই ইঁহারা আরও গৃহ নির্ম্মাণার্থ ভিক্ষার প্রার্থী হইয়াছেন। সকল ভারতবাসীর উচিত,—অর্থ সাহায্য করিয়া এই মহান্ সেবাধর্ম্মের সহায়তা করা। আগামী এপ্রেল মাসে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা হইবে, সেই সময় তথায় বহু লক্ষ ব্যক্তির সমাগম হইবে; রুগ্ন ব্যক্তির সংখ্যাও প্রচুর হইবে। বর্ত্তমানে মাসিক আশ্রমের ব্যয় দুই শত টাকার উপর। আশ্রমের কার্য্য প্রধানতঃ দাতাগণের অনিশ্চিত এক কালীন দানের উপর নির্ভর করিতেছে। কুম্ভমেলার সময় প্রচুর টাকার প্রয়োজন, সুতরাং সকলকেই করযোড়ে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন এই সময় যথাসাধ্য এই সেবাশ্রমে দান করেন। যাঁহারা এইরূপ দান করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা যেন উহা স্বামী কল্যাণানন্দ, পোষ্ট্ কনখল "রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম" এই ঠিকানায় টাকা পাঠান।

সেবক ও সন্ন্যাসিগণ সকলেই অবিবাহিত, শান্তমূর্ত্তি, সুশিক্ষিত এবং ভজনপরায়ণ। ইঁহারা সকলেই সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করিয়া আশ্রমের কার্য্যে প্রাণ ও মন নিয়োজিত করিয়াছেন।

হরিদ্বার ভারতপ্রসিদ্ধ তীর্থ, এখানে ভারতের সর্ব্বস্থান হইতেই যাত্রিগণ সমবেত হইয়া থাকেন। কত পীড়িত-সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী, কত দরিদ্র গৃহহীন তীর্থযাত্রী, ইঁহাদের কৃপায় রোগমুক্ত হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। স্বামী বিবেকানন্দের যে সকল মূলমন্ত্রের উপর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত, তাহার দুই একটী উদ্ধৃত করিতেছি। সকলেরই ইহা পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করা আবশ্যক।

Sympathy for the poor, the down trodden, even into death this is our motto" for us its not to pity but to serve; ours is not the feeling of compassion, but of love, of the feeling of Self in all.

I see there are poor, because it is of my salvation,

I will go to worship them, God is there. Some here are miserable for your and my salvation, so that we way serve the Lord, coming in the shape of deserved, coming in the shape of enratic, the leper and the sinner.

The life is short, the vanities of the world transient ; but they alone live, who live for others, the next are more dead than alive.

Do you love your fellowmen? Where go to see for God. Are not all the poor, the miserable, the weak Gods ? why not worship these first? Why go to dig a well on the banks of the Ganges.

"দরিদ্রের জন্য, পীড়িতের জন্য জীবনান্ত সমবেদনা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য।" অপরের দুঃখ দেখিয়া কেবল দুঃখ করা আমাদের ধর্ম্ম নহে, সেবা করাই আমাদের ধর্ম্ম। দয়ার অনুভবই আমাদের ধর্ম্ম নহে, পরন্তু সর্ব্বজীবে প্রীতি ও সমদর্শনই আমাদের ধর্ম্ম।

"ঐ যে, দেখিতেছি কতকগুলি দরিদ্র রহিয়াছে উহারা তোমার আমার মুক্তির জন্য জীবন ধারণ করিতেছে। আমি তাহাদের নিকট গিয়া পূজা করিব। কারণ ভগবান্ তাহাদের মধ্যে আছেন। এখানে যে কতকগুলি দুর্ভাগ্য জীব তোমার আমার মুক্তির জন্যই অবস্থিতি করিতেছে, কারণ যাহারা পীড়িত কুষ্ঠাদি ব্যাধিগ্রস্ত পাগল বা পাপী, তাহাদের সেবা করিয়া আমরা জগদীশ্বরের সেবা করিতে পারি। জীবন ক্ষণস্থায়ী, পার্থিব-গর্ব্ব মুহূর্ত্তে বিলীন হয়। যাঁহারা পরের জন্য জীবন ধারন করেন, তাঁহারাই জীবিত; এতদ্ভিন্ন লোক জীবিত নহে—মৃত।

"তুমি কি মানুষ ভালবাস? তাহা হইলে কেন তুমি পরমেশ্বরের অন্বেষণে (এখানে সেখানে) গমন কর। এই সমস্ত দরিদ্র, এই সমস্ত দুর্ভাগ্য, এই সমস্ত দুর্ব্বল, ইহারা কি ভগবান্ নহে? কেন তুমি তাহাদের (সেবারূপ) পূজা কর না? কেন তুমি গঙ্গাতীরে কূপ খননে প্রবৃত্ত হও?"

পুরাণ ও ইতিহাসে হরিদ্বার।

হরিদ্বার অতি প্রাচীন তীর্থ; তাই রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণশাস্ত্রে হরিদ্বারের অনাদিকালবিস্তৃত পৌরাণিক কাহিনী পাওয়া যায়; যুগযুগান্তরের অসংখ্য

পুণ্যকাহিনীর স্মৃতি এই হরিদ্বারের সহিত জড়িত। প্রাচীন তীর্থগুলি ঋষিগণের আবাসস্থান ও তপস্যার অনুকূল স্থান। কয়েকটীর উল্লেখ তীর্থ-উৎপত্তিপ্রসঙ্গে করিয়াছি। সকল কাহিনীর উল্লেখ করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। রামায়ণের সময় হরিদ্বার রামরাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল—হরিদ্বারের পিণ্ডদানাদি তীর্থকৃত্যের মন্ত্রোচ্চারণে তাহা জানা যায়। মন্ত্রে স্পষ্টতঃই উল্লেখ আছে যে, এই স্থান রাম-রাজত্বের অন্তর্গত ছিল। কতকাল হইতে তীর্থযাত্রিগণ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আসিতেছেন, কতকাল হইতে শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতি হরিদ্বারের সহিত বিজড়িত তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। হরিদ্বারের সপ্তস্রোতা তীর্থে সপ্তঋষি তপস্যা করিয়াছিলেন। এখানেই সুরধুনী গঙ্গা সপ্তঋষির প্রীতিসাধনার্থ সেই স্থানে আপনাকে সপ্ত ধারায় বিভক্ত করিয়াছেন, এই জন্য এই স্থান 'সপ্তস্রোতঃ' তীর্থ নামে অভিহিত। ভাগবৎ পাঠে অবগত হওয়া যায় কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পর শোকসন্তপ্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী এই পুণ্যতীর্থে যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করেন। [ভাগবৎ ১ম স্কন্ধ, ১৩ অধ্যায়।] এই পুণ্য তীর্থেই যখন মহামতি ভীষ্মের পিতামহ প্রতীপ রাজা ভাগীরথীতীরে তপস্যা করিতেছিলেন, সেই সময় চঞ্চলা বালিকা বেশে গঙ্গা আবির্ভূতা হইয়া তাঁহার দক্ষিণ জানুতে উপবেশন করেন, এবং যেরূপে তিনি শান্তনুকে বিবাহ করিয়া ভীষ্মজননী হন, তাহা মহাভারত-পাঠক অবগত আছেন। মহামতি ভীষ্ম যখন তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে উপস্থিত হইয়া গঙ্গাদ্বারে পুলস্ত্য ঋষির সহিত যে তীর্থবিবরণ ও উপদেশাবলী শ্রবণ করেন, তাহা মহাভারতের তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভূভার হরণ করিয়া যখন মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করেন, তখন ভগবৎভক্ত বিদুরকে উপদেশ দিবার জন্য মৈত্রেয় ঋষিকে আদেশ দিয়া যান। এই বার্ত্তা ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবের নিকট শ্রবণ করিয়া মৈত্রেয় ঋষির নিকট এই গঙ্গাদ্বারেই উপস্থিত হন। ভাগবতে আছে "দ্বারি দ্যুনদ্যা মৈত্রেয়মাসীনমনাধবোধং" অর্থাৎ অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন মুনিবর মৈত্রেয় হরিদ্বারে আসীন ছিলেন। মৈত্রেয়কথিত ভাগবতী কথাপূর্ণ উপদেশামৃত "মৈত্রেয় বিদুর সংবাদ" ভাগবতের ৩য় ও ৪র্থ স্কন্ধে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। ভগবান্ রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ-পাণ্ডব, বলরাম, প্রহ্লাদ প্রভৃতি সকলের তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে হরিদ্বারের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীমৎ রামানুজ স্বামী, শ্রীমৎ মধ্বাচার্য্য প্রভৃতির তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে ইতিহাসে হরিদ্বারের উল্লেখ আছে।

বৌদ্ধ প্রভাবের সময়ও হরিদ্বার প্রসিদ্ধ হিন্দুতীর্থ ছিল, তাহা আমরা চীন পরি-

ব্রাজক হুয়েনসাংর ভ্রমণবিবরণ হইতে জানিতে পারি। তিনি ৭ম শতাব্দীতে এই নগর দর্শন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন "ময়ুলো" (মায়াপুর) বা "ময়ুরো" গঙ্গাতীরের বহু জনাকীর্ণ এবং কুড়িলি—অর্থাৎ প্রায় ৩ মাইল পরিধিযুক্ত নগর। নগরীর অনতিদূরে গঙ্গাতটে একটী বৃহৎ দেবমন্দির আছে। ভারতের পঞ্চ প্রদেশের লোক ইহাকে "গঙ্গাদ্বার" বলিয়া থাকেন (১) এবং বিভিন্ন প্রদেশ হইতে শত সহস্র ব্যক্তি পাপস্খলন এবং পুণ্য সঞ্চয় উদ্দেশে এস্থানে আসিয়া স্নান করিয়া থাকেন। দানশীল রাজারা এস্থানে পুণ্যশালা (a house of merit) স্থাপন করিয়াছেন ; এই পুণ্যশালা হইতে দীনদরিদ্র, বিধবা এবং অনাথ বালকগণকে আহার্য্য ও ঔষধ বিতরিত হইয়া থাকে। এই নগরীর চারিদিকেই গঙ্গার শাখাপ্রশাখা প্রবাহিত।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থেও হরিদ্বারের বহুল উল্লেখ আছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে ১৩৯৮।১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে তৈমুরলঙ্গ এই নগর আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক ঐতিহাসিক সৈয়ফ-উদ্দীনের বর্ণনায় বিষ্ণুপদ পাহাড়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। গঙ্গাদ্বার মন্দির সেই পাহাড়ের নিম্নে নির্ম্মিত ছিল। মোগল সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে হরিদ্বারের প্রসিদ্ধি 'আইনি আকবরি' হইতে জানা যায়। আবুল ফজেল লিখিয়াছেন "হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে মায়াদেবীর মন্দির অবস্থিত। এই স্থান হইতে আঠার ক্রোশ পর্য্যন্ত অতি পবিত্র স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ।"

নানাকথা।

হরিদ্বার সমুদ্রবক্ষ হইতে ১০২৪ ফিট উচ্চে অবস্থিত। জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। নগরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। স্থায়ী লোকসংখ্যা ২৬০০০ হাজার। প্রত্যহই হরিদ্বারে বহু যাত্রীর সমাগম হইতেছে। বার্ষিক মেষসংক্রান্তির মেলার সময় লক্ষাধিক যাত্রীর সমাগম হয়। দ্বাদশ বার্ষিক কুম্ভমেলার সময় লোকসংখ্যা ২০।২২ লক্ষেরও অধিক হয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হরিদ্বার কণখল ও জ্বালাপুর একত্র করিয়া একটী মিউনিসিপ্যালিটী গঠিত হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যপ্রণালী চমৎকার। মিউনিসিপ্যালিটীর তীর্থের ও পথঘাটের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে এবং ক্রমশঃ নানারূপ উন্নতি হইতেছে। ইঁহাদের যত্নেই গঙ্গাতীরে প্রশস্ত চত্বর (Platform) ক্রমশঃ প্রস্তুত হইয়া যাত্রিগণের বিশেষ সুবিধা

(1) The men of the five Indies call it "The gate of the Ganga river."

হইয়াছে। অধিকাংশ পাণ্ডার নিবাস জ্বালাপুরে, জ্বালাপুর হরিদ্বার হইতে দুই মাইল দূরে। তবে প্রায় সকল পাণ্ডারই হরিদ্বারে এক একটী বাসা এবং যাত্রিনিবাস আছে।

হরিদ্বার ও মায়াপুরে পূর্ত্তবিদ্যা সম্বন্ধীয় বুদ্ধি-গৌরবের বহুনিদর্শন আছে। এখান হইতে গঙ্গার ক্যানাল বা খাল গঙ্গা হইতে কাটিয়া লইয়া গিয়া গবর্ণমেণ্ট (১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে) জলহীন প্রদেশে জল প্রবাহিত করিয়া সে সকল দেশ উদ্ধার করিয়াছেন। যেখানে পূর্ব্বে জলাভাবে মরুভূমিবৎ ছিল, এই গঙ্গ-খালের কল্যাণে তাহা শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। মায়াপুর ও কণখলের নিকট হইতে খাল বাহির হইয়া ৬৩৫ মাইল প্রবাহিত হইয়া কানপুরের নিকট পুনরায় গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই খাল নির্ম্মাণে এবং গঙ্গাতীরে 'ফেরো কন্‌ক্রীট্ প্রণালীতে যে সকল চত্বর প্রস্তুত হইয়াছে, এইগুলি পূর্ত্তবিদ্যার ছাত্রগণকে অভিজ্ঞাত ও তত্ত্ব লইবার জন্য Roorkee কলেজের ছাত্রগণকে কর্ত্তৃপক্ষ পাঠাইয়া থাকেন।

হরিদ্বারের বাজারটী ক্ষুদ্র হইলেও এখানে সকল প্রকার দেশী বিলাতি দ্রব্যই পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে Soda water বরফ কুলফীপ্রভৃতি দ্রব্য ও বিক্রয় হয়। এই স্থান হইতে কেদার-বদ্রী-যাত্রীরা রওয়ানা হইয়া থাকেন ; সুতরাং পর্ব্বত আরোহণোপযোগী লাঠি, কাপড় ও চামড়ার সকল প্রকার জুতা, কম্বল, শীতবস্ত্র, তীর্থমহিমা-ব্যঞ্জক মাহাত্ম্য গ্রন্থ, ও নানা শাস্ত্রগ্রন্থ, হিমালয় গমনের জন্য যান, 'ঝাম্পান কাণ্ডী' প্রভৃতি সমস্তই হরিদ্বারে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ফলকথা গৃহী বা সন্ন্যাসীর এবং হিমালয় তীর্থযাত্রীর পক্ষে যাহা কিছু আবশ্যক, হরিদ্বারের বাজারে তাহার কিছুরই অভাব নাই। খাদ্যদ্রব্য খুব বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট পাওয়া যায়। মূল্যও সস্তা; এখানকার দুগ্ধ, দধি, রাবড়ি ও ঘৃত উত্তম এবং সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়। বলাবাহুল্য এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে মৎস্য মাংস বিক্রয় হয় না।

হরিদ্বার প্রবন্ধ শেষ হইল। ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিতে গেলে যেরূপ লিপি-কুশলতা, সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ শক্তি, বর্ণনাচাতুর্য্যের আবশ্যক, আমার রচনায় তাহার একান্ত অভাব। আমি কেবল কতকগুলি শাস্ত্রবাণী ও জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি মাত্র। আশা করি ইহাতে তীর্থযাত্রীর কতকটা উপকার হইতে পারে। তবে আমার এ বিফলপ্রয়াশ কেন তাহার একটু কৈফিয়ত দেওয়া আবশ্যক মনে করি। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব বলিতেন "গরু যেমন পেটভরে জাব্ খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে এক জায়গায় বসে সেই সব খাবার উপরে ভাল করে

চিবাতে বা জাবর কাটতে থাকে, সেই রকম দেবস্থান, তীর্থস্থান দেখবার পর সেখানে যে সব পবিত্র ঈশ্বরীয় ভাব মনে উঠে, সেই সব নিয়ে একান্তে বসে ভাব্‌তে হয় ও তাইতে ডুবে যেতে হয়। দেখে এসেই সে সব মনথেকে তাড়িয়ে বিষয়ে রূপে রসে মন দিতে নাই; তাহলে ঈশ্বরীয় ভাবগুলি মনে স্থায়ী ফল আনে না।" আমার এই প্রবন্ধলেখার উদ্দেশ্য "কেবল জাবর কাটার চেষ্টামাত্র এবং তীর্থগুলির স্মরণ করা।" কারণ শাস্ত্রেই আছে "তীর্থের স্মরণ পুণ্যবর্দ্ধক, তীর্থ দর্শন পাপনাশক এবং তীর্থে স্নান করিলে দুষ্কৃতকর্ম্মাগণেরও সুকৃতি সঞ্চিত হয়। যাহারা তীর্থ স্মরণ করেন দেবতারা তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন এবং শ্রদ্ধাসহকারে তীর্থস্নান করিলে পরম গতি লাভ হয়।"—

তীর্থানাং স্মরণং পুণ্যং দর্শনং পাপনাশনং।
স্নানং পুণ্যকরং প্রোক্তমপি দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ॥
যে স্মরিষ্যন্তি তীর্থানি দেবতাঃ প্রীণয়ন্তি চ।
স্নান্তি চ শ্রদ্দধানাশ্চ তে যান্তি পরমাং গতিম্॥

বামনপুরাণ ৩৩ অধ্যায়ঃ।

(ক্রমশ)　শ্রীপান্নাসাল সিংহ।

মহামায়ার খেলা।

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ।

উমাপদ ব্রহ্মচারী জলদগম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন—"বুঝিলে ত, মা আমার কিরূপভাবে খেলা খেলিতেছেন—মা আমার যখন সেই রজতগিরিনিভ মহাদেবের মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাম পাদ স্থাপন করিয়া খেলা খেলিতে থাকেন, তখন সে খেলা আপাত-মধুর বোধ হইলেও, হিন্দুরা সে মূর্ত্তির পূজা করে না। যখন তিনি সেই বাম পাদ সেই ক্ষেত্র হইতে তুলিয়া লইবার উপক্রম করিতেছেন এবং দক্ষিণ পাদ হরহৃদয়-চৈতন্যে স্থাপন করিয়াছেন সেই মূর্ত্তি—দক্ষিণ-কালিকা মূর্ত্তি, বাম পাদের যাহারা পূজা করে তাহারা বিশেষাভিমুখী ও বামাচারী।

বড় শক্ত কথা ভাই, মুখে বলিলে চলিবে না। জগতে হাসি কান্না সুখ দুঃখ হর্ষ বিষাদ আছে ও থাকিবে—উহা ত খেলার কথা, তাহা লইয়া হর্ষ বা বিমর্ষ-

ভাব পোষণ করা কেন—সকল খেলার ভিতর দিয়া সেই এক গতির দিকে লক্ষ্য রাখা বড় শক্ত। সে যাক্—আমাদের এখন কর্ম্মের সময়—দেবীর সেই ভাব বুঝিতে না পারিলেও কেবল সেই ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া—জগতের সেবা কর—পাপী তাপী—রোগী—সকলকেই ডাকিয়া আন—হৃদয়ের কপাট খুলিয়া অকাতরে প্রাণ ভরিয়া ভালবাস—আপনি হৃদয়ে সব বুঝিতে পারিবে।"

এমন সময়ে নবকুমার আসিয়া বলিলেন দাদা! মাতাজী এই পথ দিয়া যাইতেছেন—একবার তাঁহাকে ডাকি—ব্রহ্মচারী বলিলেন আপত্তি কি?

সন্ন্যাসিনী প্রবেশ করিলেন; মুখে—

পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ
পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাসঃ।
পুনরপায়নং পুনরপি বর্ষং
তদপি ন মুঞ্চত্যাশামর্ষং॥

ব্রহ্মচারী দেখিলেন সন্ন্যাসিনী বস্তুতঃই রূপসী ভস্মাচ্ছাদিত রূপ যেন চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। মনে হইল যেন ইঁহাকে কোন সময় দেখিয়া থাকিব—সন্ন্যাসিনীও দেখিলেন যে ব্রহ্মচারী যেন তাঁহার নিজের লোক—কিন্তু তাহার কারণ হৃদয়ে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসিনী সম্মুখে মাতৃমূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করিলেন—যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন সন্ন্যাসিনী আগমন করিলে সকলেই দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, উপবেশন করিলে ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার নাম অনেক দিন হইতে শুনিয়াছি—আপনার অহৈতুকী সেবা-ধর্ম্মে আমরা পরম আনন্দিত—আজ আপনাকে দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম।"

সন্ন্যাসিনী। "ওকথা বলিবেন না—এ আশ্রমের কথা আমি কাশীতে পৌছিবার পূর্ব্বেই শুনিয়াছি—ও এই আশ্রমের সেবকদিগের সেবাধর্ম্ম স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। কাশীতে আসিয়াও বেশ বুঝিয়াছি যে মা আপনার দ্বারা এক মহৎ খেলা খেলাইতেছেন। আমি অনেক দিন পূর্ব্বেই এখানে আসিতাম, কিন্তু নানা কারণে আসা ঘটে নাই। অদ্য আশ্রম দর্শনে যে কি আনন্দ লাভ করিলাম তাহা কি বলিব।"

ব্রহ্মচারী। "আপনি থাকেন কোথায়?"

সন্ন্যাসিনী। "কিছুই স্থিরতা নাই, যে দিন যেখানে মায়ের ইচ্ছা হয় সেদিন সেখানেই থাকি।"

ব্রহ্মচারী। "আপনি কি আজন্ম ব্রহ্মচারিণী ?"

সন্ন্যাসিনী। "আজ্ঞে না,—আমি বিবাহিতা এবং বিধবা ; পিতা আমায় আদেশ করিয়াছেন ; তাই এরূপ ভাবে সাংসারে খেলা করিতেছি।"

কাশীস্থ অনেক ভদ্রলোক সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে এই আশ্রমে আসিয়া ব্রহ্মচারীর সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া থাকেন। বীরেন্দ্রবাবু আজ আসিয়াই দেখিলেন যে অপূর্ব্ব সম্মিলন, মাতাজীকে তিনি অনেক দিন দেখিয়াছেন এবং উহার সেবা-ধর্ম্মের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। ব্রহ্মচারী ত তাঁহার জীবনের গতিই ফিরাইয়া দিয়াছেন। তাই এই দুইএর মিলনে তিনি মহা আহ্লাদিত হইয়া সে স্থানে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মচারী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন—ও সন্ন্যাসিনীকে বলিলেন।

ব্রহ্মচারী। 'আপনি কত দিন গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছেন ?

সন্ন্যাসিনী। আমি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করি নাই,—তবে নির্দ্দিষ্ট গৃহে থাকি না এই মাত্র। পিতা আমাকে আদেশ দিয়াছেন যে তোমার সেবাই ধর্ম্ম। কিছু দিন আমি লোকালয়ের বাহিরে ছিলাম, বৃক্ষ লতা আমার সহচর ছিল। আমার মা দাঁড়াইয়া আছেন, সেখানেও তিনি আমার সম্মুখে থাকিতেন। কিন্তু সম্প্রতি পিতা বলিলেন—তোমার সংসারব্রত এখনও উদ্‌যাপন হয় নাই—এখনও তোমার বহু কর্ম্ম বাকী আছে—তাঁহারই আদেশে আমি কাশী আসিয়াছি।"

ব্রহ্মচারী। আপনার শিক্ষা প্রকৃতির কোলে সুসম্পন্ন হইয়াছে,—আপনার পিতা কি এখনও জীবিত ?

সন্ন্যাসিনী। ঠিক জানি না তিনি কখন কোথায় থাকেন।

ব্রহ্মচারী তাঁহার কথায় মুগ্ধ হইলেন।

বীরেন্দ্রবাবু বলিলেন যে, "আপনারা উভয়ে কিছু ধর্ম্মালোচনা করুন, আপনা-দের কথা বড় হৃদয়াকর্ষক। আপনাদের মুখে শুনিয়া চিত্ত মা জগদম্বার প্রতি আকৃষ্ট হয় ; আমাদের বিষয়াশক্ত চিত্ত আপনাদের উপদেশের ক্ষেত্র হউক।"

সন্ন্যাসিনী। কি বলিব বাবা মায়ের কথা কি বলিব, আমরা ভেদের মূর্ত্তি ; তাই ভেদ ভিন্ন অভেদের দিকে চাহিতে পারি না—মা যে আমার সর্ব্বরূপে বিরাজিতা তা আমরা চাহিয়াও দেখি না। কি ভ্রান্তি—মায়ের গর্ভে শুয়ে আছি—তাঁরি স্পর্শে বেঁচে আছি, তাঁরি ভাষায় তাঁরি কথা তাঁরি সাথে কইছি কিন্তু তাঁকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না। তাঁর চেয়ে আপন কে আছে বাবা ?

এই কথা বলিতে বলিতে সন্ন্যাসিনী যেন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন—হৃদয়ের কপাট যেন উন্মুক্ত হইয়া গেল—মুখে অনর্গল সেই একই কথা—কখনও মুখখানি ঈষৎ গম্ভীর কখনও বা হাসির রেখা কখনও বা গাম্ভীর্য্যে ও মাধুর্য্যে মিশামিশি। উপস্থিত সকলেই স্থির ও উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতেছে—কি এক ভাবের ফোয়ারা ছুটিতেছে।

"কি ভ্রান্তি! মা যে আমার সর্ব্বাবস্থায় সামনে আস্‌ছেন; কিন্তু কৈ দেখ্‌তে ত পাচ্ছি না। পিপাসায় যখন কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে আসে তখন তিনি শীতল জল হয়ে দেখা দেন—ক্ষুধায় যখন কাতর হয়ে পড়ি অন্নপূর্ণাই অন্নরূপে দেখা দেন। ঐ দেখ মায়ের রূপের জ্যোতিঃ আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে, তারার মধ্য দিয়া চন্দ্রমার মধ্য দিয়া সেই মায়ের জ্যোতিঃ। কি আশ্চর্য্য! মা আমার সুখের হাসিতে হাসায়, আবার দুঃখের রোদনে কাঁদায়। স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গ সকলের ভিতর দিয়াই যে মায়ের অপূর্ব্ব খেলা। মা আমার গভীর অরণ্যে বসিয়া তৃণের ফুলে ডালি সাজায়; আবার মেঘের অন্তরালে বসিয়া নানা বর্ণের ছবি আঁকেন। মা জগদম্বা—তুমি খেলা খেলিতে কি এতই ভালবাস? যদি খেল্‌তেই ভালবাস তবে আড়ালে কেন—একটু প্রকাশ হয়ে খেল্‌লেই ত ভাল হত। তুমিই আমাকে কখনও সংসারিণী ক'রে স্বামীর কোলে ঘুম পাড়াচ্ছ, আবার কখনও ভিখারিণীর সাজে সাজাচ্ছ। তুমি ত আমার পর নও—একেবারে আপনার; তবে কেন একটু প্রকাশ হচ্ছ না? বুকের মাঝে ধরে রয়েছ অথচ বুঝ্‌তে দিচ্ছ না—মায়ের স্তন ও পিতার স্নেহের মধ্য দিয়ে যে তুমিই উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছ কিন্তু প্রকাশ হচ্ছ না। আমি কিছু বল্‌তে চাই না, কিছু বুঝতে চাই না। তবে এই মাত্র বলি—যেন আর খেলায় মত্ত রাখিও না। খেলায় মত্ত ছিলাম বলে আবার খেলাচ্ছ—তাই করজোড়ে বল্‌ছি খেলা একবার সংহরণ কর—সাধ মিটেছে—একবার দুয়ার খুলিয়া দাও।

সন্ন্যাসিনীর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল আবার কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। সন্ন্যাসিনী বলিলেন, আপনি কত দিন গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন!

ব্রহ্মচারী। আমি প্রায় দশ বৎসর এইরূপ ভাবে ভাছি—পাঁচ বৎসর আমার দীক্ষাগুরুর নিকট হিমালয়ের একটী আশ্রমে ছিলাম—তাঁহার উপদেশে এই স্থানে আশ্রম স্থাপন করিয়াছি। যত দিন মায়ের ইচ্ছা তত দিন এখানে থাকিব; তাঁহার ইচ্ছা হইলেই আবার কোথায় চলিয়া যাইব।

আমি দেখিতেছি যে আমরা উভয়েই এক উদ্দেশ্যে প্রেরিত—সুতরাং

আমাদের পরস্পর মিলিত হওয়া আবশ্যক। আপনি স্ত্রীলোক, সুতরাং স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে আপনার কার্য্য বেশী হইবে। অবশ্য আপনার নিকট স্ত্রীপুরুষের ভেদ না থাকিলেও স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে আমাদের কার্য্য তেমন ফলবতী হইবে না। এই সেবা ধর্ম্মে যে সকল স্ত্রীলোক দীক্ষিত হইতে চান, আপনি তাঁহাদের ভার গ্রহণ করুন এবং তাঁহাদের জন্য আর একটী পৃথক্ মাতৃমন্দিরের শাখা স্থাপিত হউক।

বীরেন্দ্রবাবু বলিলেন—"বেশ কথা আমি কাশীর মহারাজকে এ বিষয় জ্ঞাপন করিব এবং আশা করি এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিবেন।"

সন্ন্যাসিনী। এ সংকল্প অতি মহৎ—মায়ের ইচ্ছা হইলে ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। অবশ্য এবিষয়ে অনেকে ইতিপূর্ব্বেও আমাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন—দেখা যাক মায়ের কি ইচ্ছা।

ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসিনীর নিরহঙ্কার, বাক্যবিন্যাস ও জগদম্বার ভাবে বিভোর দেখিয়া হৃদয়ে পরম আনন্দ লাভ করিতেছেন। সহসা জটাজূটবিলম্বিত গৈরিক বসনপরিহিত রুদ্রাক্ষমালা-শোভিত এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি তথায় উপস্থিত হইলেন। আপনার তেজে দিক্ সকল আলোকিত করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে ত্রিশূলহস্তে তথায় উপনীত হইলেন। উপস্থিত নরনারী সকলেই চমকিত হইয়া উঠিল। সহসা যেন সেই আশ্রম মুখরিত হইয়া উঠিল; অপূর্ব্ব সৌম্য মূর্ত্তি দর্শনে সকলেই সসম্ভ্রমে আসন পরিত্যাগ করিয়া প্রণাম করিলেন। উমাপদ ব্রহ্মচারী, মাতাজি, নবকুমার সকলেই যুগবৎ আনন্দিত ও বিস্মিত হইয়া কিছুক্ষণ বাক্যস্ফূর্ত্তি করিতে পারিলেন না। ক্ষণেক পরে মাতাজি বলিলেন—"পিতঃ! সহসা আজ এখানে যে আপনার দর্শন পাইব, এ কল্পনা মনে আনিতে পারি নাই। আপনার দর্শনে হৃদয়ে যে কি আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতেছে তাহা কি বলিব! আপনি কখন আসিলেন? ভৈরবীদিদি ভাল আছেন ত?"

সন্ন্যাসী গম্ভীর বদনে বলিলেন, "হাঁ মা ভৈরবী ভাল আছে—আশা করি তুমিও মায়ের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছ। আমি বেশ বুঝিতেছি—তুমি মাকে মা বলিয়া চিনিতে পারিয়াছ।"

নবকুমার বলিয়া উঠিল—"পিতঃ! এতদিন পরে এ অধমকে মনে পড়িয়াছে? কতদিন আপনার দর্শনলালসায় নিশি অতিবাহিত করিয়াছি, কত দিন আপনার জন্য কত চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু আজ আপনার দর্শনে ধন্য হইলাম। আমি এই আশ্রমে আসিয়া অবধি যে কি আনন্দে আছি তাহা আর কি বলিব।"

সন্ন্যাসী। বেশ নবকুমার—আমি এই রূপই আশা করিয়াছিলাম—"এই কার্য্যেই জীবন উৎসর্গ কর, তোমার ইহাই এখন কর্ত্তব্য।

উমাপদ ব্রহ্মচারী দেখিলেন এ'ক! সুদূর জনমানবশূন্য হিমালয়ের গিরি-গুহায় যাঁহার অবস্থিতি, যাঁহার নিকট শিক্ষিত হইয়া এই সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলাম, এই যোগিনী ও নবকুমার তাঁহার পরিচিত ও বিশেষ কৃপার পাত্র। মহামায়ার কিরূপ খেলা তিনিই জানেন।

সেই মাতৃমন্দিরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ তখন শশধরের শুভ্র জোৎস্নায় আলোকিত—সেই অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নার বিমল কিরণে সমস্ত আকাশে যেন আজ আনন্দ ধরিতেছে না। যেন চন্দ্রলোকের সেই আনন্দের তরঙ্গ আজ জগতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। উমাপদ ব্রহ্মচারী অবাক্ হইয়া সেই সন্ন্যাসীর চরণে স্থির দৃষ্টি—যেন ঐ রাঙ্গা চরণ দুটী তাঁহার ভুক্তি মুক্তির আশ্রয়—যেন ঋদ্ধি সিদ্ধি সকলই সেই পাদপদ্মের মহিমা। ঐ চরণ দুখানি যেন তাঁহার জীবনের সার—সংসার-সাগরের তরণী—ধ্যানের বস্তু।

সহসা এই আশ্রয় বস্তুটী সম্মুখে সমুদিত হওয়ায় উমাপদ ব্রহ্মচারীর মুখে কথা নাই—হৃদয়ে কেবল সেই ভাবের ফোয়ারা। তাই নিস্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া সহসা সেই চারুচরণে আপনাকে লুটাইয়া দিল—মুখে বলিল—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

সন্ন্যাসীর পাদস্পর্শে সেই বুভুক্ষিত তৃষ্ণাপীড়িত চিত্তক্লেশ বিদূরিত হইল—হৃদয়ের তমান্ধকার ক্ষণকালের জন্য কোন্ অন্ধকারের গভীর গহ্বরে লুক্কায়িত হইল। সন্ন্যাসী তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া বলিতে লাগিলেন—' দেখ উমাপদ! বিস্মিত হইও না। যে দিন তোমায় সমাধিগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়া সুদূর হিমালয়ে গমন করি, সেদিন তুমি ভাব নাই যে আবার সংসারে যাইতে হইবে। সমাধি হইতে উত্তোলন করিয়া, তোমাকে পাঁচ বৎসর শিক্ষা দিয়া এই আশ্রম উদ্দেশ্যে প্রেরণ করি। সে কার্য্য তুমি বেশ সম্পন্ন করিয়াছ এবং যতদিন মায়ের ইচ্ছা এই কার্য্য করিতে থাক। মায়ের সংসারে খেলা কর—অবাক্ হইও না—স্থির হইয়া আমার কথা শুন।" মাতাজিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হেমলতা! নির্ম্মল কুমার তোমার সম্মুখে—বিচলিত হইও না। নির্ম্মলকুমার ও উমাপদ ব্রহ্মচারী একই; এক্ষণে উভয়ে মিলিয়া মায়ের সংসারে মহামায়ার ক্ষেত্রে সেবা কর।

তোমরা দুইটী ধারা পরস্পর মিলিত হইয়া—সেই বিভুর চরণে মিলিত হও। এ মিলন প্রেমের মিলন, কামের নহে। এ প্রেমে 'তুমি পুরুষ আমি স্ত্রীলোক' এ জ্ঞান নাই—এই প্রেমে এক'দিন ব্রজসেবার অধিকার মিলে। এ মিলনের ফল 'আমি' স্থাপন নহে—'তুমি' স্থাপন। আর নবকুমার—যে হেমলতার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছিলে, সেই হেমলতা তোমার সম্মুখে।" সকলেই নিস্তব্ধ—সহসা উন্মাদগ্রস্তা অদ্ধউলঙ্গিনী ধুলিধুসরিতা একটী স্ত্রীমূর্ত্তি তথায় প্রবেশ করিল—সন্ন্যাসী তাহাকে দৃষ্টিমাত্র আরোগ্য করিলেন। নবকুমার দেখিল—তাহার পত্নী—বীরেন্দ্রবাবু নিস্তব্ধ অবাক্—বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই। সহসা সন্ন্যাসী "আবার আসিব" বলিয়া অন্তর্হিত।

(সমাপ্ত)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

সমালোচনা।

শ্রীযুক্ত শুদ্ধানন্দ স্বামী প্রণীত 'হিমালয় ভ্রমণ'—বাঙ্গালা ভাষায় বহুবিষয়ে প্রকাশিত হইতেছে; কিন্তু সে সকল পুস্তকের মধ্যে নাটক নভেলগুলি বিদেশীয় মালমসলায় প্রস্তুত বলিয়া সে সকলে খাঁটিভাব ও শিক্ষণীয় বিষয় প্রায় থাকে না। কেবল চিত্তচাঞ্চল্যকর বিলাস-ভাবপূর্ণ কথা থাকে বলিয়া একরূপ চিন্তাশীল সুধীগণের অপাঠ্য বলিলেও চলে। বর্ত্তমান সময়ে মাসিকপত্রিকাগুলিও বিদেশীয় স্ত্রীলোকের ছবি ও তদ্রূপ রঙে সঙে পূর্ণ থাকে। এই গ্রন্থখানি সেরূপ নয়। বর্ত্তমান সময়ে অনেকে ছুটি লইয়া হাওয়া পরিবর্ত্তনের ব্যপদেশে রেল ষ্টীমার যোগে তীর্থভ্রমণ করেন মাত্র, তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্তে পরমপূতঃ তীর্থের বর্ণনা ও তাহার মাহাত্ম্য, অনুষ্ঠানযোগ্য কার্য্যাবলির বিষয়ে শিখিবার যোগ্য কিছুই থাকে না। এই গ্রন্থ খানিতে পদব্রজে উত্তরাখণ্ডপরিক্রমণ অর্থাৎ হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, কেদারেশ্বর প্রভৃতি দর্শন, ভ্রমণ করিতে হইলে কোন্ কোন্ তীর্থ, কোন্ কোন্ পথে কি ভাবে কখন যাইতে হয় তাহার সুযোগ, পথের প্রান্তবাসীদিগের প্রাচীন ইতিবৃত্ত, আচার ব্যবহার ও খাদ্য দ্রব্যের বিবরণ, এবং তীর্থ ও উপতীর্থের সূচীপত্র, মাহাত্ম্য অতি সরল সুমধুর প্রাঞ্জল বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা হরিদ্বার হইতে বদরিকাশ্রম প্রভৃতি ভূ-স্বর্গ তুল্য তীর্থভ্রমণে যাইবেন, তাঁহাদের এই বহিখানি একান্ত পাঠ করা

উচিত। বহিখানি সুন্দর বাঁধান, ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। প্রথম সংস্করণ বলিয়া দুই একটী ভুল দেখিতে পাওয়া যায়। আশা করি অন্য সংস্করণে নির্ভুল হইবে। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রি-সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শনতীর্থ।

বিশেষ নিবেদন।

নানাবিধ সাংসারিক বিপৎপাতে আমাকে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বিদেশে থাকিতে হয়। তাহার উপর সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় কর্ম্ম ত্যাগ করেন। এই সব কারণে পন্থা প্রকাশে বিলম্ব হইল। তাহাতে আমরা বড়ই লজ্জিত আছি। আশাকরি পাঠকগণ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

আগামী বৎসর হইতে পন্থার সুদুর্লভ দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি, হিন্দু সন্তানের নিত্যকর্ত্তব্য সন্ধ্যা-বন্দনার ব্যাখ্যা, সহজ যোগ্য, প্রণবরহস্য ও 'মহামায়ার খেলা'-প্রণেতার লিখিত নূতন ধর্ম্মবিষয়ক উপন্যাস ও পান্নালাল বাবুর তীর্থভ্রমণ প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

এখনও অনেকের নিকট পত্রিকার মূল্য বাকী আছে। তাঁহা পাঠান আবশ্যক। পাঠকগণ এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি করিলে বাধিত হইব ইতি।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

---

৯ পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

৩য় ভাগ।] চৈত্র ১৩২১। [১২শ সংখ্যা

শিব-সঙ্গীত-লহরী

(১)

মম জীবন বাঞ্ছিত. শঙ্কর, তব
চরণ পরশ লাগিয়া
যেন তব ধেয়ানে মম দিবস-
যামিনী যায় কাটিয়া।
মম সব সঙ্গীত মাঝে
যেন পুলক ভরে বাজে
সুন্দর তব মঙ্গলময়
বন্দনা গীতি অমিয়া;
মম জ্ঞান কর্ম্ম সকলি
উঠয়ে যেন আকুলি
পূজিতে ও দেব-বন্দিত পদ
বিশ্ব-ভুবন ভুলিয়া
সার্থক কর, সুন্দর কর
পদ-পিয়াসী মম হিয়া।

(২)

রজত শুভ্র বরণাঙ্কিত
দেহ তোমার সুন্দর,
কোটী-ভাস্কর-রশ্মি আলোক
বিতরি নিরন্তর

বসুধা পুরিত তিমির রাশি
মঙ্গল ইঙ্গিতে পলকে নাশি,
করহ দীপ্ত মম অজ্ঞান-
তমসাবৃত অন্তর।
নিখিল জগত জন-শরণ
চিন্ময় শিব শঙ্কর।

(৩)

হাস হাস সবে হাস,
আর শিবপূজা রসে ভাস
কামনা যাতনা সব দূরে ফেলি
পূজ শিবপদ ভুবন ভুলি
ভবন বন্ধন কর মোচন
মন কালিমা নাশ;
শঙ্কর পদে সঁপিয়া প্রাণ
গাহ ঝঙ্কারি মহা বিমান
সত্য সুন্দর শিব মহেশ্বর
শঙ্কর দেব দেবেশ
(আর) হাস, হাস সবে হাস।

(৪)

তাঁর প্রেমে মজনারে মন
ওরে জানিবে তবে সে কেমন,
ঐশ্বর্য্য দূরে ফেলে
ভূত সনে সে নাচে খেলে
(ও রে) পূজিলে তাঁর বিল্লদলে
অন্তিমে সে দেবে শরণ।

(৫)

অধম অভাজন আমি অতি দীনহীন
কলুষিত দেহ মন পাপেতে বিমলিন।
ভুবনের সবে মোরে কত ঘৃণাভরে চায়
কহি কত কটুবাণী দূরে দূরে চলে যায়।
এভুবনে কেহ মোরে ভালতো নাহিবাসে

তাই প্রভু! ছুটে আজি এসেছি তোমারি পাশে।
জানি প্রভু, ও চরণে শরণ লহে যেই
সব দুঃখ গ্লানি হতে মুকতি লভয়ে সেই।
করুণা ভিখারী তব আমি প্রভু দীনহীন
কর দেব কর মোরে তব প্রেমানন্দে লীন।

(৬)

জয় শিব শঙ্কর ভোলা মহেশ্বর
চন্দ্রশেখর ত্রিপুরারি,
বৃষভবাহন, বল্কল-বসন,
ভীতিমগন ভয়হারী,
ভগবতী-সেবিত-চরণ তলে
স্বীয় জটা-নির্গত গঙ্গা গলে
মধুর হাসে করুণা ভাসে
বন্ধন পাশে নাশকারী,
শ্মশান ভস্ম লেপিত অঙ্গে
প্রমথযূথ সহ নাচ রঙ্গে
ত্রিশূলকর, পিণাক ধর
সাধকবর প্রাণচারী,
জয় শিব শঙ্কর, ভোলা মহেশ্বর,
চন্দ্রশেখর ত্রিপুরারী।

শ্রীশ্রীশঙ্কর-চরণাভিলাষী দীনতম সেবক—
শ্রীহরিকৃপা চৌধুরী।

সাধনায় বিঘ্ন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তান্ত্রিকের পরমপ্রিয় গ্রন্থ "শাক্তানন্দতরঙ্গিণী" বোধ হয় শাস্ত্রানুসন্ধিৎসু সুধীমাত্রেরই পরিচিত। এই সুপ্রসিদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থের রচয়িতা সাধকপ্রবর শ্রীশ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ স্বামীর অমানুষ জীবনেও অশ্রুতপূর্ব্ব সাধনবিঘ্নের কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, বা সম্যক্ প্রকারে অতিরঞ্জন-রহিত কিনা

তাহা আমার বিচার্য্য নহে ; অপিচ এরূপ বিচার করিবার সাহসও আমার নাই। কারণ পণ্ডিতম্মন্যমান মানবের বুদ্ধিবৃত্তি অদ্যাপিও সেই সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ের অঘটন-ঘটনপটীয়সী মহিমার মন্দিরদ্বারে উপনীত হইতে পারে নাই। কে জানে, আত্মম্ভরী মানবের অহঙ্কার-মলিন নয়নে কবে সেই মহতো মহীয়ান্ পরাপর পরমেশ্বরের শান্তোজ্জ্বল সুন্দর ছবি প্রতিভাত হইবে? ফলতঃ অন্তর্জগৎ দূরে থাকুক, এই সতত পরিদৃশ্যমান বহির্জগতেরই বিচিত্র কার্য্যপরম্পরার সম্যক্ পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, মানবের অপ্রবুদ্ধমন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অমর কবি সেক্ষপীয়রের সঙ্গে বলিয়া উঠে—"There are more thengs in heaven and earth, Horatio than are dreamt of in your philosophy. এস্থলে এবিষয় অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। সম্ভব অসম্ভব—জ্ঞানবৃদ্ধ গুরুগণের হস্তে অর্পণ করিয়া আমি পূর্ব্বোক্ত কিম্বদন্তীটী যথাশ্রুত * বর্ণনা করিতেছি। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই সংক্ষিপ্ত আখ্যানটী অতি মনোহর ও সুশিক্ষাপূর্ণ বলিয়া প্রতীতি হইয়াছে। এক্ষণে সহৃদয় সুধীগণ ইহার যাথার্থ্য বিচার করিবেন।

সাধন-সৌধের উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপান অতিক্রম করিতে করিতে সাধক-প্রবর তন্ত্রোক্ত শক্তিসাধনরূপ পরম রহস্যময় সোপানসমীপে উপনীত হইলে, তাঁহার মনে এক অভূতপূর্ব্ব অভিলাষ হয়। সামান্যা মানবীকে শক্তি-সাধনার সঙ্গিনী না করিয়া, সর্ব্বশক্তিসমষ্টিভূতা সেই আদ্যাশক্তিকে—সেই সর্ব্বার্থ-সাধিকাকে এই মহাসাধনার সহকারিণী করিতে তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। না হইবে কেন? মানবের মুদিত চিত্তকোরক যখন সেই পূর্ণ প্রভাময়ের বিমল শুভ্র জ্যোতির প্রতিবিম্বস্পর্শে বিকশিত হইতে থাকে, তখন জোনাকীর চঞ্চল দিপ্তীতে তার তৃপ্তি হইতে পারে না। প্রাণ যখন পূর্ণতার সন্ধানে পাগল হইয়া উঠে তখন অপূর্ণ অংশের প্রলোভনে সে আর আকৃষ্ট হয় না। তাই আজি ব্রহ্মানন্দের ব্যাকুল চিত্ত মহাশক্তির স্ফুলিঙ্গ-রূপিণী মর্ত্ত্যরমণী উপেক্ষা করিয়া "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা"র সঙ্গলাভে উৎসুক হইল। অমনি তিনি 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন' সঙ্কল্প করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ঐ অচিন্তিতপূর্ব্ব সাধনার উত্তরসাধক হয় কে? তিনি সিদ্ধিকামীর সর্ব্বথা রক্ষক ক্ষেত্রপাল ভৈরবকে মহাসাধনায় প্রসন্ন করিয়া এই ত্রিলোকবিস্ময়কর

* খাটোল হাইস্কুলের হেডমাষ্টার আমার পরমপূজ্য অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র প্রধান বি, এ, মহাশয়ের নিকট হইতে এই আখ্যানটী প্রাপ্ত।—লেখক।

সাধনায় উত্তরসাধকত্বে বরণ করিলেন। তাঁহার উগ্র সাধনায় কামখ্যার মহা পীঠ সন্তপ্ত হইয়া উঠিল! দৈববাণী তাঁহাকে এই উৎকট অভিলাষ পরিহার করিতে আদেশ করিল। অবশেষে দেবীর আদেশে কামাখ্যাক্ষেত্রের রক্ষক তাঁহাকে বলপ্রয়োগে নিরস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইল। ক্রুদ্ধ সাধক দলিতপুচ্ছ ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধপ্রদীপ্ত হইয়া অভিশাপ-বিষে মহাপীঠের মহিমা বিলোপ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন পুনরায় দৈববাণী হইল—"তুমি কল্য নগরপথে দুইটী যুবতীর সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হইবে। তাহারাই তোমার অভীপ্সিত সাধনার সঙ্গিনী হইবে। কিন্তু তুমি আত্মশক্তির পরিমাণ না বুঝিয়া মহাশক্তির সঙ্গ লইলে, সাবধান হইও।"

আমরা আত্মজীবন পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাই যে, অনেকেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ধীর ভাবে উহার পরিণতির অপেক্ষা করিতে চাহেন না; প্রাথমিক অনুষ্ঠান পরম্পর সুনিষ্পাদিত না হইতেই চরম ফল হস্তগত করিতে ব্যস্ত হয়েন। আধুনিক যুগে এই অধীরতার এই অবিবেকিতার পরিণাম সাতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত ব্যাকারণের উপক্রমণিকা সম্যক্ অভ্যাস না করিয়াই সর্ব্বোপনিষদ্-সারভূতা গীতা লইয়া বসি এবং শাঙ্করভাষ্যের ভ্রমনিরসনে প্রবৃত্ত হই। বাঁশীটী হস্তে লইয়াই, গোপী-মোহনের যে বিশ্ববিমোহন তানে যমুনা উজান বহিয়াছিল, সেই প্রাণময় প্রেমময় স্বরলহরীর পুনরাবৃত্তি করিতে চেষ্টিত হই। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসার" 'অথ' ও 'অতঃ' ত্যাগ করিয়া প্রথমেই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয়ে বদ্ধপরিকর হই। তাই আজি আমাদের অনুষ্ঠানসমূহ প্রাণহীন; তাই আজি আমাদের সাধনা সিদ্ধিদায়িনী নহে। সাধকপ্রবর ব্রহ্মানন্দেরও বুঝি এই পরমার্থপরিপন্থিনী কুমতির আবির্ভাব হইয়াছিল; তাই তিনি আত্মশক্তির পরিমাণ করিতে চেষ্টা না করিয়াই সেই অনন্ত শক্তি-আবর্ত্তে ঝম্প প্রদান করিলেন। অথবা মোহান্ধ মানবের শিক্ষার জন্য সাধকপ্রবর আজ লীলাময়ীর লীলাবিলাসের নিমিত্তমাত্র হইলেন।

* * *

পথে এক জন তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী চলিয়াছেন; সঙ্গে অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতীদ্বয়। সন্ন্যাসীর পূর্ব্ব পরিচয় পাঠকবর্গের অজ্ঞাত নহে। তিনি তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। সন্ন্যাসীর সহিত যুবতীদ্বয়কে দেখিয়া একদল লোক তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইয়াছে; কেহ কুপ্রবৃত্তির তাড়নায়, কেহ ঔৎসুক্যের বশে, কেহ বা নিষ্কর্ম্মা বলিয়া, এই দলের পুষ্টিসাধন করিতেছে। সূর্য্যদেব

ঊর্দ্ধগগনে আরূঢ় হইয়া অনলময় কর বর্ষণে প্রকৃতিকে সন্তপ্ত করিতেছেন। সন্ন্যাসী যেন পথশ্রমে বড় কাতর হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সঙ্গিনী দ্বয় চিরপ্রফুল্ল। রবিকরস্পর্শে ফুল্ল কমলের ন্যায় উজ্জ্বল—সুন্দর। সম্মুখে একটী গ্রাম, পথিপার্শ্বে শৌণ্ডিকালয়; বৃহৎপাত্রে মদ্য পরিরক্ষিত হইতেছিল। সন্ন্যাসী কিঞ্চিৎ মদ্য প্রার্থনা করিলেন। শৌণ্ডিক সন্ন্যাসী দেখিয়া অথবা সঙ্গিনীদ্বয়ের উপর কোন-প্রকার মন্দ অভিসন্ধি-প্রণোদিত হইয়া যথেষ্ট মদ্য পান করিতে দিল। সন্ন্যাসী একপাত্র মদ্য নিঃশেষে পান করিয়া পুনরায় মদ্য প্রার্থনা করিলেন। এইরূপে পাত্রের পর পাত্র নিঃশেষিত করিয়া সন্ন্যাসী শৌণ্ডিকের সমুদয় মদ্য উদরস্থ করিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত হইলেও শৌণ্ডিক মদ্যের মূল্য প্রার্থনা করিলে, সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "আমিত নিঃসম্বল। দেশের রাজাই তোমাকে মূল্য দিবেন।" এই সকল সংবাদ অবিলম্বেই স্থানীয় ভূম্যধিকারীর কর্ণগোচর হইলে, ঔৎসুক্য বশতঃ তিনি কতিপয় সঙ্গীসহ তৎস্থানে উপনীত হইলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে শৌণ্ডিকের প্রার্থিত মূল্য দিতে বলিলে তিনি কহিলেন, "একজন লোকে এত মদ্য পান করিতে পারে কি? আমি স্বচক্ষে না দেখিলে প্রত্যয় করিতে পারি না। ভাল, আপনি আর মদ্য পান করিতে পারিলে, আমি সমস্ত মূল্য দিব।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমার আর পান করিতে ইচ্ছা নাই; তবে তোমার সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য যাহা দিতে চাও, পান করিব।" কিন্তু শৌণ্ডিকের আর মদ্য ছিল না; সে বলিল, "কর্ত্তা, মদ্য ত আর প্রস্তুত নাই; যাহা ছিল সন্ন্যাসী ঠাকুর খাইয়াছেন। এই পাত্রে যে মদ্য প্রস্তুত হইতেছে তাহা এখনও অত্যন্ত উত্তপ্ত, পানের অযোগ্য।" তখন ভূম্যধিকারী সন্ন্যাসীকে তাহাই পান করিতে বলিলেন। সন্ন্যাসী আপত্তি করিলে ভূম্যধিকারী বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "তবে আপনি কেমন সন্ন্যাসী। আপনি এত মদ্য পান করিলেন, আর পুড়িয়া মরিবার ভয় করিতেছেন।" অগত্যা সন্ন্যাসী সুতপ্ত মদ্যরস আকণ্ঠ পান করিলেন। এই অনৈসর্গিক ব্যাপার অবলোকন করিয়া সমবেত জনমণ্ডলী ভয়ে বিস্ময়ে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। ভূম্যধিকারী সন্ন্যাসীর চরণে প্রণত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন; শৌণ্ডিকের আর মদ্যের মূল্য চাহিতে সাহস হইল না। হায়! অল্পশক্তি ভ্রমান্ধ মানব, আপনার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানদণ্ডের সাহায্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিপুল রহস্যের পরিমাণ করিতে সবাই উৎসুক।

(ক্রমশঃ) শ্রীহৃদয়নাথ মিশ্র।

সাধনার পথে।

(ষষ্ঠানুবৃত্তি)

বৎস! গ্রীক লোগস্ (Logos) শব্দে ভগবানের ব্যক্তভাব বা ঈশ্বরকেই বুঝায়। ইনিই দেবদেব স্বয়ংজ্যোতিঃ দৈবী চৈতন্য; এবং মহাপুরুষগণ এই চিন্ময়ের বিলাসের বা লীলার সম্প্রজ্ঞাত সাধক। মানবসমাজের ভাষায় বলিতে গেলে, ইঁহারা সেই দেবদেবের কর্ম্মাধ্যক্ষ;—ইঁহাদেরই ভিতর দিয়া দৈবী জ্যোতিঃ ও দৈবী চৈতন্য আমাদিগের উপর বর্ষিত হয়। আমরা মায়ার আবরণে আবৃত ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ মাত্র; প্রথমতঃ সেই স্ফুলিঙ্গেরও পরে যে মহাসূর্য্য হইতে ঐ স্ফুলিঙ্গসমূহের উদ্ভব হইয়াছে, এবং উহারা যাঁহার প্রতিবিম্ব মাত্র তাঁহার স্বরূপ বোধের চেষ্টা করিতেছি। ঐ মহাসূর্য্যকে শাস্ত্রে 'কাষ্ঠা' ও পরাগতি'রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, নির্ব্বিশেষ্য; পশ্যন্তী বাক্ অধিগত হইলেই ইনি দৃষ্ট হন। এই সম্বন্ধ ভাষায় ব্যক্ত করা বড় দুরূহ। তুমি বাক্যে ইঁহাকে যতটুকু প্রকাশ করিতে পার, তদপেক্ষা হৃদয়ে উঁহার বিষয়ে অধিকতর উপলব্ধি করিতে পারিবে।

শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে তোমার পারিপার্শ্বিক অবস্থা তোমার নিকট এতই অপ্রীতিকর। কর্ম্মফল ভোগে আত্মসমর্পণের চেষ্টা ও বহির্ম্মুখী শক্তিনিচয়ের মোহ সত্ত্বেও তিতিক্ষার আচরণ শিক্ষা পরিণামে তোমাকে যে বর্ত্তমানাপেক্ষা সেই মহিমময় ঋষিগণের অধিকতর অনুগত, অবিচলিত ও অব্যভিচারী শিষ্য করিয়া তুলিবে এবং এরূপে তাঁহাদের শ্রীচরণকমলে তোমাকে শীঘ্র শীঘ্র পৌছাইয়া দিবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ঐরূপ অধিকারের মূল্য নাই; উহা অমূল্য ধন। অতএব তোমার পরীক্ষা যতই কঠোর হউক না কেন, উহাতে অভয় হারাইও না। পরন্তু ভেদের "আমি"কে বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহাদের শ্রীচরণে চিরদিনের মত দাস হইয়া থাকিবার জন্য তোমার যে ব্যাকুলতা আছে, সে সাধ যত দিন পূর্ণ না হয়, ততদিন তাঁহাদের চরণে তোমার হৃদয়কে নিবিষ্ট করিয়া রাখিবে। কামের বন্ধন ছিন্ন করিয়া যদি আমরা ক্রমশঃই বিষয়ে অনাসক্ত হই, তাহা হইলে আমাদের বাহিরটা যতই অপ্রীতিকর হউক না কেন, চতুঃপার্শ্বে জগতের কল-কোলাহলের মধ্যেও সে অভিমত জীবন যাপন করা যাইতে পারে।

বাস্তবিকই তোমার যাদৃশ কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইতেছে তাহাতে তোমাকে কোনও উপদেশের কথা বলিতে আমার হৃদয় নির্ভিন্ন-প্রায় হইয়া যায় কিন্তু বৎস! আমি তোমাকে পুনরায় বলিতেছি যে শিষ্যের জীবনের সহিত অতি ভীষণ পরীক্ষা অভিন্নভাবে সংযুক্ত; এবং যদি কাহারও মুক্ত হইবার বাসনা থাকে, তবে তাহাকে অলোকসাধারণ ভীষণ স্রোতের বাধা অতিক্রম করিতে হইবে। অনাদি কাল হইতেই এরূপ হইয়া আসিতেছে, এবং চিরদিনই এরূপই হইবে। যে নিয়মের ফলে ঐ প্রকার পরীক্ষা হয়, তাহাও ন্যায্য ও গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। যদি এই অস্ফুট বাক্য তোমার মনে শান্তি আনয়ন করে, তাহা হইলে তাহা পাইবে। কিন্তু আমি জানি তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা নিতান্তই ক্ষীণ সান্ত্বনা বাণী মাত্র। তুমি শুনিয়াছ যে ভক্তি-বিশ্বাসে পাষাণকেও বিচলিত করিতে পারা যায়। প্রহ্লাদের আখ্যায়িকাও ত' জান। এতদিনে তোমার এই দৃঢ় বিশ্বাস হওয়া উচিত যে যে মহাজ্ঞানময় পুরুষ জীবাত্মার ক্রমাভিব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত করেন এবং যে মহর্ষিরা যোগীর সাধন সংগ্রামের উপর অনিমেষ দৃষ্টি রাখেন, তাঁহারা অসীম করুণাময় ও অপার জ্ঞানবারিধি; এরূপ যে তাহা মানবের ধারণার অতীত। অতএব যদি আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিসমূহকে তাঁহাদের মূল-আধারের সহিত একসুরে গাঁথা ভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তিগত কামনা না রাখি, এবং অধ্যাত্ম মহাসূর্য্য হইতে যে আলোক আসে তদনুগত ভাবে ঐ শক্তিনিচয়ের প্রয়োগ করি, ফলতঃ যদি আমরা তাঁহাদের ও শ্রীভগবানের শ্রীচরণে সম্পূর্ণ রূপে আত্মসমর্পণ করি,—আমাদের ক্ষুদ্র, অসার অনিত্য ও মায়িক ব্যক্তিত্বের ধ্বংসকারী যাহাই আপতিত হউক না কেন, তাহাতে আমাদের হৃদয়ের শান্তি বিচলিত করিবে না অথবা মহিমময়ী ভগবদিচ্ছার অনুগত ভাবে কর্ম্ম করিবার নিরপেক্ষ সঙ্কল্প ক্ষীণ করিবে না। এই নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের পথপ্রদর্শিনী শ্রদ্ধা অবলম্বন কর; তাহা হইলে আর সবই লঘু হইয়া দাঁড়াইবে।

যদি আমি তোমাকে আমার জীবনের ইতিহাস বলি, এবং কিরূপে ও কীদৃশ ধৈর্য্যের সহিত আমি বহুবৎসর লোকের স্বেচ্ছাকৃত গঞ্জনা ও দুর্ব্যবহার সহ্য করিয়া আসিয়াছি তাহা বলি, তাহা হইলে তুমি জানিতে পারিবে যে শুধু সর্ব্ব প্রকার শোকমোহের ভিতর দিয়াই প্রকৃত আত্ম-বিকাশ সম্ভবপর। লোকে যে শোকমোহাক্রান্ত হয়, তাহাতে এক প্রকারে ইহাই প্রমাণিত হয় যে সে এখনও দুর্ব্বল এখনও সম্পূর্ণ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় নাই, এখনও অবিকশিত; এবং তজ্জন্যই

তাহার আরও শিক্ষার প্রয়োজন আছে। অতএব তোমার অদৃষ্টে ধিক্কার দিও না। যোগবিদ্যার্থীর পক্ষে অসন্তোষ প্রকৃত ভাব নহে। ভক্ত সর্ব্বদাই স্বীয় ভাগ্যে সন্তুষ্ট থাকিবে, নতুবা তাহার ভক্তি একটা অস্বাভাবিক ভাব মাত্র, এবং উহা কামনার দ্বারা রঞ্জিত।

*　　　　*　　　　*

তোমার উন্নতির কথা শুনিয়া, এবং যখন অচিরভাবি পুত্রশোক তোমার হৃদয়কে মথিত করিতেছিল, তখন তুমি যে আমায় দেখিতে পাইয়াছিলে, তাহাও জানিতে পারিয়া সুখী হইলাম। সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিও যে শ্রদ্ধাবান্ শিষ্যকে কখনও একাকী কষ্টভোগ করিতে দেওয়া হয় না।

এই পুণ্যভূমির সেবায় আমি অধিকারী হইব আশা করিতেছি। আমার দীন ভ্রাতৃগণ যদি এত সহজেই বিশ্বাস হারায় এবং সন্দেহকে নিজের চিত্ত আক্রান্ত ও অভিভূত করিতে দেয়, তবে কিরূপে তাহারা উন্নতির আশা করিতে পারে? আচ্ছা, কালেই তাহারা জানিতে পারিবে যে কাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে। কিন্তু তাহাদের সন্দেহরাশি মহাপুরুষগণ্ এবং তাহাদের মধ্যে ঘোর অন্ধকারের ব্যবধান সৃষ্টি করে।

এরূপ ব্যস্ততার সহিত লিখিত পত্রে তোমাকে যে ধ্যানের সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিব এরূপ মনে করি না। পরন্তু বাক্যের আড়ম্বরে আমি তোমাকে যাহা কিছু উপদেশ দিব, তদপেক্ষা তুমি অন্তর্লোকসমূহ হইতে যাহা পাইবে তাহাই অধিকতর উপযোগী হইবে। এজন্যই এ বিষয়ের সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে আমি বরাবরই লেখা অপেক্ষা নীরব ব্যাখ্যান শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিয়াছি। বর্ত্তমানে অথবা যে কোনও সময়েই হউক না কেন যদি তোমার অনুভূতি শক্তি ক্ষীণ হয় অথবা তোমার শিক্ষাবিধায়ক মহাপুরুষগণের সমীপ হইতে আগত ভর্গ ধারণে তোমার চিত্ত অক্ষম হয়, তাহাতে নিরাশ হইয়া পড়িও না। যথাসময়েই ঐ মোহঘোর কাটিয়া যাইবে এবং তুমি যে মধ্যবর্ত্তী সময়ে মোহ ও নৈরাশ্যে ডুবিয়াছিলে তজ্জন্য তোমার কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। কারণ ঐ ঐ সময়েই বিপরীত উপায়ে নানা শিক্ষা প্রদত্ত হয়। উহার বিপরীত অবস্থা, জ্যোতিঃ ও চৈতন্যের স্বতঃ স্ফুরণও, যেরূপ প্রয়োজনীয় উহাও সেরূপ প্রয়োজনীয়; কারণ ঐ সময়েই আমরা আত্মার পরাগতি অনুভব করিতে সক্ষম হই। হৃদয়ে যখন স্বতঃই চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি হয়, তখন সর্ব্বত্রই ভগবানকে ওত-প্রোতভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। আর যখন বেদনা ও শোক মোহের অন্ধকারে হৃদয় শুষ্ক

হইয়া যায়, তখন তিনি যে পরাৎপর জ্যোতিঃ ও চৈতন্যের পরপারে অবাস্থত, ইহাই অনুভূত হয়।

কতকটা অন্য কাজের জন্য এবং প্রধানতঃ সাহায্যের অন্য উপায়গুলি অধিকতর কার্য্যকর হইবে এই বিবেচনায় আমি ইচ্ছাপূর্ব্বকই তোমাকে পত্র লিখিতে বিরত হইয়াছিলাম। অতএব তুমি যে উচ্চতর লোকে আমাকে মোটেই অনুভূতি করিতে পার নাই, ইহা তোমার পত্রে জানিয়া আমি কিছু বিস্মিত হইয়াছি! তোমার স্থূল ভৌতিক মস্তিষ্কের উপর দিয়া অনেক প্রবল বাত্যা বহিয়া গিয়াছে বলিয়াই তোমার পার্থিব চৈতন্য উচ্চতর লোকের অনুভূতিসমূহ প্রতিবিম্বিত করিতে পারে নাই। এই জন্যই বাহ্য শমতা ও স্থূলে পবিত্রতার এত প্রয়োজন। ইহা কখনই সম্ভব নহে যে আমি স্থিরভাবে অনেকক্ষণ ধরিয়া যে চেষ্টা করিয়াছি ও যাহাতে আমার তৃপ্তি হইয়াছে, সে সব তোমার উপর কোনই কাজ করে নাই। সে যাহাই হউক, আমি সর্ব্বদাই ভিতরের জ্যোতিঃ ও প্রত্যাদেশ লক্ষ্য করিয়াই চলিব, ও যাঁহারা আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক জানেন সেই ঋষিদের চরণে ফল সমর্পণ করিয়া শান্ত ও নিশ্চিন্ত থাকিব।

মুহূর্ত্তের জন্যও কখনও ভাবিও না যে আমি তোমাকে পত্র লিখি নাই বলিয়া তোমার কথা ভুলিয়া গিয়াছি। ধ্যানের সময় সর্ব্বদাই আমি তোমার কথা ভাবিয়াছি, এবং প্রেম, পবিত্রতা ও জ্ঞানরূপ দেবশিশুগুলিকে তোমার নিকট পাঠাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে যদিও তোমার ভৌতিক মস্তিষ্কে ও গুলি প্রতিবিম্বিত হয় নাই, তথাপিও তাহারা কখনও কখনও তোমার হৃদয়ের উপর উহাদের চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারিয়াছে।

আমাদের কাহারও সময় বড় সচ্ছন্দে কাটে নাই। অতএব তুমি যে দুঃখ পাইতেছ, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ভাবিয়া দেখ সমস্ত ব্যক্ত জীবনটাই এই সব অসুখকর ও সুখকর বোধ ও অনুভূতিতেই পরিপূর্ণ। ইহাদের যে কোনটীরই অভাবে জীবন নীরস ও শুষ্ক হইয়া উঠে। যদি কেবল সুখদায়ক অনুভূতিগুলিই থাকিত, তাহা হইলে জীবন একটা অসহনীয় একঘেয়ে ভাবের হইয়া পড়িত; এবং সুখও পর্য্যন্ত দুঃখে পরিণত হইয়া যাইত। সে দুঃখ নির্দ্দেশ যোগ্য দুঃখ নহে, কিন্তু একরূপ নীরস যন্ত্রণাময় শূন্যতার মত। অভাব এবং উদ্বেগই পার্থিব জীবনকে রুচি ও আস্বাদ যুক্ত করে, এবং ভোগসমূহের রসপ্রদায়িত্ব বিধান করে। যতদিন আমরা ইন্দ্রিয়ের ও বাহ্যানুভূতির রাজ্য অতিক্রম করিয়া যাইতে সমর্থ না হই, যতদিন আমাদের আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির (মধুকৈটভের)

অনুভূতি মাত্রও আছে, ততদিন আমাদের দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। কারণ শুধু তাহা হইলেই সুখভোগ সম্ভবপর হইতে পারে। বিশেষ ব্যক্তভাবাপন্ন জীব দুয়েতে একটু গতি একটু স্পন্দনকার্য্য দেখে তাহার সুখ ও দুঃখে এই ভাব আছে। ইহা জানিতে পারিয়া আমি মুহূর্ত্তের জন্যও অসন্তোষ প্রকাশ করি নাই, কদাপিও বিরক্ত হই নাই এবং কদাচ আমার মানসিক স্থৈর্য্য ও অন্তর্নিহিত শান্তি হারাই নাই। আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে তুমিও যখন প্রকৃতির এই ব্যাপার ও নিয়ম সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবে, তখন শমতা লাভ করিবে, এবং অনল ও সলিলের ভিতর দিয়া সমভাবে চলিয়া যাইতে পারিবে।

বৎস! তুমি কেন যে নৈরাশ্যকে তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে দিবে তাহা বুঝি না। তুমি কি জান না যে নৈরাশ্য মানেই অসন্তোষ; শুধু তাই বা কেন, অকৃতজ্ঞতা। এটী দৈত্যশক্তিনিচয়কে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ছিদ্র প্রদান করে। তুমি কি ভুলিয়া যাও যে তুমি অনন্ত ধামের যাত্রী, অমৃতের পুত্র। তোমার যদি বিজয়ে অভিলাষ থাকে, তবে তোমার প্রাক্ সঞ্চিত কর্ম্মরাশি শীঘ্রই ভোগ দ্বারা ক্ষয় করিতে হইবে। অতএব ভাবিয়া দেখত, সাধারণ মানুষে যে যন্ত্রণা বহুবৎসর ও বহুজন্ম ধরিয়া ভোগ করে, তাহা কয়েক বর্ষের ভিতর ঘন করিয়া ভোগ না করিলে সে কার্য্য কিরূপে সম্পাদিত হইতে পারে? কর্ম্ম বা কর্ম্মক্ষয়ে যে যাতনা আনে তাহাতে বিরক্ত হইও না। বরং শেষোক্তটীকে (কষ্টকে) তোমার ঋণের পরিশোধক, চিত্তের তমুভাবের সম্পাদক ও অচিরে আকাঙ্ক্ষিত প্রাপ্তির সহায়ক মনে করিয়া সাদরে আহ্বান কর। হাঁ, স্বেচ্ছাকৃত বর্ত্তমান কর্ম্মের সহিত যাহার কোনও সম্বন্ধ নাই সেই দুঃখ-ক্লেশকে সাদরে আলিঙ্গন কর, এবং আমাদিগকে যে অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তর্যামিত্ব শক্তি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার বলে বীরের ন্যায় ধীরভাবে তাহাদের সম্মুখীন হও। তোমার বালোচিত স্বভাব স্বক্ষেত্রেই শোভা পায়, কিন্তু যখন তুমি যোগিজনের পরীক্ষা সমূহের সহিত সংগ্রাম করিতেছ তখন উহাকে শির তুলিতে দিও না। যুদ্ধ কর—মহাসেনাপতি, তাই বা কেন, সারথীদেবের আদেশানুবর্ত্তী সৈনিকের ন্যায় যুদ্ধ কর—তাঁহার আদেশের শ্রদ্ধা বিশ্বাস স্থাপন কর—তাহা হইলে তুমি অন্তর ও উপর হইতে শক্তি লাভ করিবে ও বিজয়ী হইবে। যুদ্ধের মুহূর্ত্ত সমাগত হইলে ক্রন্দন করিলেত চলিবে না।

তোমার মানসিক অবসাদ ও অন্যান্য কষ্টের কথা শুনিয়া আমি

দুঃখিত হইলাম। কিন্তু প্রিয়তম! এ গুলি সমস্তই আমাদের নির্বন্ধের বা চুক্তির ভিতর। অতএব কখন সাহসহীন হওয়া কদাপিও উচিত নহে। উহারা আমাদের সাধারণ সম্পত্তি এবং সাধারণ পথে সকলেরই উহাদের অধীন হইতে হয়। * ইহারাই আমাদের বিশ্বাস পরীক্ষা করে ও পরিণামে আমাদের বিকাশেরই সহায়তা করে। যখন সমস্তই অন্ধতমসাবৃত ও ভীষণ বলিয়া প্রতীত হয় তখন স্থির নির্ভয়ে দাঁড়ান,—যখন গুরুও পর্য্যন্ত যেন আমাদের পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, এমন কি যাহা যাহা সত্য, তাহা সমস্তই ভ্রান্ত ও অসত্য বলিয়া বোধ হয় এবং দেবত্বও যেন ফাঁকা স্বপ্নের মত প্রতীয়মান হয়.—তখন দৃঢ়সংযুক্ত হইয়া অবস্থিত ইহাই প্রকৃত ভক্তির লক্ষণ। যে কেহই এরূপ ভাবে থাকে তাহাকে মহত্তর পদে উন্নমিত করিয়া লওয়া হয়।

জানিও, যে শোকমোহ চিত্তকে লঘু ও পবিত্র করে, ও আমাদের অন্তরাত্মার বিকাশ ও শুদ্ধির জন্য যতদিন উহাদের প্রয়োজনীয়তা আছে ততদিনই উহারা সমাগত হয়। যখন জগতের সকলেই দুঃখ পাইতেছে, তখন দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা নীচ স্বার্থানুসন্ধিৎসা মাত্র। যতদিন সহজাত জীবগণের নয়নে বারিবিন্দুও থাকিবে, ততদিন প্রকৃত শিষ্য কখনই মুক্তির কথা ভাবিবে না। বৎস! তুমি কি মনে কর যে আমরা জীবনের জোয়ারভাটা অতিক্রম করিয়া গিয়াছি এবং সর্ব্বদাই ঐশী করুণার আলোকমাত্রায় নিমজ্জিত আছি। এরূপ ভাব মনেও স্থান দিও না। তুমি যেরূপ দুঃখ পাইতেছ, আমারও সেরূপ, হয়ত ততোধিক প্রবল ভাবেও কষ্ট পাইতে হয়, এবং আমার যে শুধু নিজের জন্যই কষ্ট পাইতে হয় তাহা নহে, পরন্তু উচ্চতর লোকে যাহারা আমার সহিত কর্ম্মসূত্রে যুক্ত হইয়াছে তাহাদের জন্যও ভোগ করিতে হয়। আমার ভিতর যখন চৈতন্য-শক্তি ক্ষীণ ভাবে প্রবাহিত হয়, তখন আমি জানি যে নিশ্চয়ই আমার প্রেমাস্পদ-গণের উপর উহার প্রতিবিম্ব বা ছায়া পতিত হইবে। (গর্ভস্থ ভ্রূণ যেরূপ মাতার সুখ দুঃখ দ্বারা অভিভূত হয়, তদ্রূপ গুরুর জীবনের আলোক ও ছায়া ও শিষ্যের অনুভব গোচর হয়; গুরু সেই মহাচৈতন্যের দৈবীগর্ভ)। এই জ্ঞান ও বোধ আমার ব্যক্তিগত জীবনের বিরসতা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ আনয়ন করে। যখনই আমি তোমাদের কাহারও শোকমোহের কথা শুনি, তখন তজ্জন্য দুঃখানু-

* দুঃখ সামান্য অর্থাৎ সকলের সাধারণ সম্পত্ত। উহা সর্ব্বদাই ভেদ ভাবের আমার মিথ্যা প্রত্যয় ধ্বংস করে। যথা ভাগবত ৭।১৫।২৪

ভব না করিয়া থাকিতে পারি না। অতএব বৎস! কর্ম্মফলকে যত প্রফুল্লতার সহিত অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে পার, কর; এবং জানিও যে তোমার যখন আমাকে ব্যক্ত ভাবে দেখিতে পাইলে ভাল হইবে, তখন তুমি তাহা দেখিতে পাইবে। এতদ্বিরোধী আকাজ্ক্ষা মাত্রই বিকাশের পরিপন্থী হইয়া দাড়ায়, ও সে মহা নিয়মের কার্য্য ক্ষুন্ন (কার্য্যে ব্যাঘাত) করে। আমাদের ব্যক্তিগত কোনও অভিলাষ থাকা অকর্ত্তব্য। শুধু সেই মহাদেবের শ্রীচরণে আমরা নিঃশেষে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিব এবং তাঁহার আজ্ঞায় যাহা উপস্থিত হয় তাহাই লাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিব।

পক্ষান্তরে, অন্যের সুখ দুঃখে আমাদের একেবারে নিরপেক্ষ থাকাও কর্ত্তব্য নহে; বরং যাহাদের সঙ্গে তুমি কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ তাহাদের জন্য ভাবিত হওয়াই উচিত। তাহারা নিজেরা যেরূপ তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করে তাদৃশ অনুভব করিও, যেন তোমার সহানুভূতি সম্পূর্ণ হইতে পারে এবং তুমি তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে অধিকতর সক্ষম হও। তুমি কি জান না যে যাহারা সম্পূর্ণ সহানুভূতি না করে, তাহারা সম্পূর্ণ সান্ত্বনাও দিতে পারে না। কারণ সহানুভূতি বস্তুতঃ ইহাই দেখায় যে আমাদের আমিটা প্রকৃতই এক, ইহা আত্মার সর্ব্বাত্মিকা ভাবের বিকাশ মাত্র। বর্ত্তমান কালের যে সব বৈদান্তিক মানুষকে তুষারের ন্যায় শীতল, এবং বিশ্বের নিকটে, নিজের নিকটে এমন কি বিশ্বপতির নিকটেও অপ্রয়োজনীয় হইতে শিক্ষা দেয়, তাহাদের নির্ম্মম ভাবুকতার অনুসরণ করি না। আমাদের প্রেম যতই মহত্তর, গভীরতর ও পবিত্রতর হইবে, সকলের জন্য আমরা যতই সহানুভূতি করিতে শিখিব, ততই অধ্যাত্মরাজ্যে আমাদের স্থান উচ্চতর হইবে ও আমরা ভগবানের ততই সন্নিকটে পৌছিব। একমাত্র প্রেমই জ্ঞানের স্পষ্ট ও অনন্যসাপেক্ষ বিভাব এবং পূর্ণতম অভিব্যক্তি।

বৎস! তোমাকে আমি আর অধিক কি বলিব। তুমিত জানাই যে আমার যথাসাধ্য আমি করি, এবং আজ্ঞা পাইলে, তোমার সাময়িক শোক মোহভার অপনয়ন করিতে আমার যতটা আনন্দ হইবে এরূপ আর কিছুতেই হইবে না। একজন তৎপর শিষ্যের হৃদয় হইতে ক্ষণকালের জন্যও অন্ধকার দূর করা অপেক্ষা আকাঙ্ক্ষিত ও মহত্ত্বাবোদ্দীপক কর্ত্তব্য আর কি হইতে পারে? অতএব মুহূর্ত্তের জন্যও মনে ভবিও না যে আমার আসিবার ইচ্ছার অভাব আছে। কিন্তু, প্রিয়তম! আমাদের পক্ষে অভিলাষ সংযম করিয়া রাখিয়া ভগবদিচ্ছারই সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পাইতে দেওয়াই অবশ্য কর্ত্তব্য। এখন তুমি বুঝিতে পারিতেছ কি? না,

তুমি এখনও 'এস, এস', বলিয়া কাঁদিবে, এবং তোমার বিলাপে আমার হৃদয়কে বিদীর্ণ করাইবে ?

প্রিয় বৎস ! নৈরাশ্যে কখনও অবসন্ন হইও না। উহা অহঙ্কারের সর্ব্বপ্রধান অস্ত্র। তুমি যে নীরসতা, শুষ্কতা ও শূন্যতা অনুভব করিতেছ, উহা সমস্তই মায়া মাত্র, এবং কালে উহার ঘোর কাটিয়া যাইবে। তোমার নিরাশ হওয়ার কোনও কারণ নাই।

কেন, প্রিয়তম, তুমি কি নিমেষের জন্যও, অতি অল্প কালের তরেও, প্রকৃত চৈতন্যের বা সত্যের আস্বাদ অথবা ভগবানের নিকট হইতে যে দৃষ্টি আসে তাহা লাভ কর নাই ? এবং সাংসারিকতার মেঘ ও কুজ্ঝটিকার মধ্যে এবং শারীরিক অভিলাষগুলির মধ্যে থাকিয়াও হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তুমি কি দীন ও অনুগত ভাবাপন্ন নহ ? অতএব তোমার পরিণাম উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইবে না বলিয়া কেন সন্দেহ করিতেছ ? গীতাই বলেন—

"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"

অর্থাৎ এই ধর্ম্মের স্বল্পও মহাভয় হইতে ত্রাণ করে, আমার ভক্ত কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।

শ্রীকৃষ্ণের ভগবদ্গীতা স্মরণে রাখ ও তোমার মনোনীত মার্গে সতত যুক্ত হইয়া নিত্যাভিযুক্ত হইয়া রহ। সবই অতঃপর ভাল হইয়া আসিবে। ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগ বা আশঙ্কা যেন কদাপিও তোমার হৃদয়কে অভিভূত না করে। কারণ তাহা হইলে অসুরশক্তি সমূহকে নূতন নূতন মায়া সৃজন করিয়া তোমাকে আরও যন্ত্রণা দিবার নূতন অবসর প্রদান করা হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাম] মুগ্ধ।

(১)

ঘুরিব তোমারি লাগি হে হৃদিরঞ্জন,

ঘ্রাণে চিত্ত মাতোয়ারা রূপে মুগ্ধ আঁখিতারা

ঘুরিব উন্মত্ত পারা অনন্ত জীবন।

(২)

ঘুরিছে অনাদি কাল মুগ্ধ পৃথিবী,
নিরখি ভাস্কর শোভা সাতিশয় মনোলোভা
ছুটিয়াছে নিশি দিবা পরশিতে রবি।

(৩)

জ্বলিলে স্ফটিকাধারে জ্যোতি মনোহর,
মুগধ পতঙ্গগণে ঘেরিতার আবরণে
উৎসুক অক্লান্ত মনে ঘুরে নিরন্তর।

(৪)

পুষ্প-মধু গন্ধে মুগ্ধ মধুকর যত,
কুসুমের আশে পাশে ঘুরিতেই ভালবাসে
সুমধুর মৃদুভাষে গুঞ্জরি নিয়ত।

শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

রাই বিরহিণী।

কেন লো স্বজনী বল বারবার,
আমাতে কি আমি আছি হায়।
কেমনে ভুলিব মুরতি তাহার,
সতত যাহারে পরাণ চায়।
শিরায় শিরায় হৃদয় মাঝারে,
সে মুরতি লেখা কে মুছে হায়।
পলকে প্রলয় না হেরে যাহারে,
কেমনে পাসরি বলনা তায়।
ভালবাসা সখি জাননা কেমন,
কভু অমিয় কভু বা গরল।
কভু মারে কভু বাঁচায় জীবন।
আমার ভাগ্যে শুধু হলাহল।
চির সুধা ভাবি প্রণয়-সলিলে,
ঝাঁপ দিয়ে সখি সবাই ভাসে।

করমের দোষে ডুবি হলাহলে,
রেখেছি পরাণ পীযূষ আশে।
কি হ'ল আমার বুঝি না লো সখি,
আমি কে "সে" মম ? বুঝিতে নারি।
নয়ন চাহিলে তাহারে দেখি,
মুদিত করিলে অন্তরে হেরি।
নাহি ঘুম চোখে, সেথা সে বিরাজে।
স্বপন-আবেশ যদি বা হয়,
দেখি লো তাহারে মনোরম সাজে ;
নয়ন-নীরে যামিনী পোহায়॥
যমুনার জল আনিবারে যবে,
যাই লো ফিরি কতই নিরাশে।
স্খলিত পল্লব পতনের রবে,
চমকিয়া ভাবি ঐ শ্যাম আসে॥
কলস-তাড়নে কালিন্দী সলিলে,
খেলে লো চঞ্চল লহরীচয়।
ভাবি শ্যাম বুঝি কেলী করে জলে,
চিত তরঙ্গিত হতাশ হয়॥
একঠাই সবে বসন রাখিয়া.
চঞ্চল মনে স্ববাস না পেয়ে।
ভাবি শ্যাম তাহা লয়েছে হরিয়া,
পাইয়ে হৃদি যায় গো ভাঙ্গিয়া॥
গৃহে ফিরি যবে দেখি চেয়ে,
ওই তমাল কদম্বের তল।
ভাবি বুঝি শ্যাম র'য়েছে দাঁড়ায়ে,
ভয়হৃদয় হয় লো চঞ্চল।
পবন হিল্লোলে তরুশাখা দোলে,
ভাবি নটবর দুলিছে তা'তে।
আশে বুক বেঁধে দাঁড়াইল মূলে,
চলে যাই পুন ব্যথিত চিতে॥

বিহগপক্ষের সঞ্চালন স্বরে
কৌতুক করি দেয় করতালি।
লুকায়ে সে বুঝি, ভাবি মনি মনে ;
দুখের কাহিনী কাহারে বলি॥
নিকুঞ্জ কাননে বিহঙ্গম গায়,
মোহন মুরলী ভাবি ঐ বাজে।
আকুল পরাণে ছুটিলো তথায়,
বাধা ঠেলে পায় সকাল সাঁজে।
যাইয়ে কাননে ঝিল্লির শুনি,
ভ্রান্ত হৃদয়ে ভাবি মনে মনে।
ওই বুঝি তার নূপুরের ধ্বনি,
খুঁজিলো বৃথায় গহন বনে॥
পক্ষরবে পাখী তরুবাটি ছাড়ি,
কাঁপা'য়ে পল্লব পলা'য়ে যায়।
ভাবি সখা মোর, খেলে লুকোচুরী ;
নিমেষ তরে পাই সুখ তায়॥
চলিতে চলিতে কুঞ্জে কুঞ্জে সখি,
কণ্টক লতিকা বসন ধরিলে।
চমকিত হ'য়ে ফিরে চেয়ে দেখি
সে এসে বুঝি ধরেছে আঁচলে॥
নিজগৃহে বনে কিম্বা পরবাসে,
শুকসারী যবে করে আলাপন।
ক্ষণিকের তরে ভাবিলো উল্লাসে,
ডাকে বুঝি মোরে মদনমোহন॥
তা'র লীলাস্থল পুলিন কানন,
শান্তির আকর হয়েছে লো মোর,
তা'র নাম কথা হয় লো যখন,
তাহারে ভাবিয়া হইলো বিভোর॥
(সখি) আমি যা'র তরে হয়েছি এমন,
সে কি মোর তরে ভাবেলো আর ?

ভাবিতে ভাবিতে যাবে লো জীবন ,
তবুও না ছাড়ি ভাবনা তার।
মরমের ব্যথা মরমে মিশাই ;
স্মৃতি কই তার পারি হে ভুলিতে ?
আপনা ভুলিতে পারিবে লো রাই,
ভুলিতে তবু নারিবে মুরলী।

"শরচ্চন্দ্র"

অর্থ]

প্রায়শ্চিত্ত।

আহারাদির পর উপরে শুইয়া আছি, এমন সময়ে, শ্যামলাল আসিয়া খবর দিল "বাবু, নীচে একজন রোগী আসিয়াছে।" তাহাকে বলিলাম, "জানিয়া এস যে কি রোগ ও আমাকে এখনি যাইতে হইবে কি না। আর যদি তেমন শক্ত অসুখ না হয়, তাহা হইলে তাহাকে একটু অপেক্ষা করতে বল, আমি আধ ঘণ্টা পরেই নীচে যাইতেছি"।

শ্যামলাল ফিরিয়া আসিয়া বলিল "বাবু, রোগীর বড় যাতনা হচ্ছে, আপনাকে এখনি যাইতে হবে"।

আর অপেক্ষা করিতে পারিলাম না ; বৈঠক খানায় গিয়া দেখি রোগী একজন অপরিচিত যুবক। আমাকে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল, "ডাক্তার বাবু, আমার এই ডান হাত অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে, অনবরত কাঁপিতেছে ও মধ্যে মধ্যে যন্ত্রণা হয়। এক এক সময় এত বাড়ে যে ইচ্ছে করে, আত্মহত্যা করে ফেলি ; সে যন্ত্রণা অসহ্য"। বলিতে বলিতে একটা অস্পষ্ট কাতর ধ্বনি করিয়া, চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া, নিজের ডানহাত বাঁ হাতে চাপিয়া ধরিল ; বোধ হইল যেন ভিতরে একটা প্রবল যাতনার সহিত যুদ্ধ হইতেছে ও তাহা নীরবে সহ্য করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। মুখমণ্ডল আরক্ত, চক্ষু দুইটা যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে।

তাহার বেদনাযুক্ত হাত খানাকে একটু দেখিয়া বেদনার স্থান ও ধরণের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সে কোনই উত্তর দিতে পারিল না।

"কাঁধের কাছে ?"—না ?" "কনুইয়ের কাছে ?"—"না ?"

"কব্‌জীর কাছে ?"—"না ? সমস্ত হাত জুড়িয়া ব্যথা ও বড় যাতনা! ডাক্তার বাবু রক্ষা করুন, আপনি ছুরি দিয়ে অস্ত্র করে দিন, যদি সেরে যায়।"

"কি রকমের কি ধরণের ব্যথা বলুন দেখি ?—খুব কন্‌কন্ করছে কি ?" "না।" "সিঙ্গি মাছের কাঁটার মতন বিঁধছে কি ?"—"না।" "ছিঁড়ে যাচ্ছে বা খসে যাচ্ছে এরকম কিছু মনে হয় ?"—"না। সমস্ত ভিতরটা কে যেন জোরে মুচড়ে দিচ্ছে। ওঃ গেলাম"! তাহাকে কথাবর্ত্তায় অন্যমনস্ক রাখিয়া হাতটা পরীক্ষা করিতে লাগিলাম; কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

অনেকক্ষণ পরে যন্ত্রণার একটু প্রশমন হইলে, যুবক বলিল "এই দেখুন হাত কাঁপচ্ছে; এই রকম দিন রাত কাঁপে। আমি সংসারে একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছি; চাকরী বাকরী সব গিয়াছে। সে যাক্, যন্ত্রণার উপশম হলে বাঁচি। আচ্ছা ডাক্তার বাবু, অস্ত্র করে হাতটাকে বাদ দিলে উপকার হতে পারে না।"

আ। তা' বোধহয় দরকার হবে না; আর তা'র ফলাফলও সম্পূর্ণ রূপ অনিশ্চিত।

যু। ডাক্তারী, কবিরাজী ঔষধ মালিস, দৈব মাদুলী ধারণ, মাটীমাখা প্রভৃতি অনেক করেছি; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। এখন আপনার কাছে এসেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক যদি ছুরি চালিয়ে, কেটে কুটে দিয়ে, কোন উপকার করতে পারেন, তা করুন; তা ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না।

"আপনার নাম কি ?" "হরগোপাল রায়।" "আসছেন কোথা থেকে ?" "কোন্নগর।" "এ অসুখ আজ কতদিন হয়েছে ?" 'প্রায় ছমাস।" "কোন আঘাত টাঘাত লেগেছিল কি ?" "না।" "কোন উচু জায়গা হতে পড়ে গিয়েছিলেন কি? "না।" "কোন ঠাণ্ডা জায়গায় বেশী দিন ছিলেন কি ?" "না।" "তবে এরূপ হবার কোন কারণ অনুমান করতে পারেন ?" "না।"

পুনরায় হাত খানাকে ভালরূপে পরীক্ষা করিলাম; কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ইহা বাত নয়; কেননা তা হলে অনবরত কাঁপচে কেন? হইতে পারে পক্ষাঘাতের পূর্ব্বলক্ষণ; কিন্তু ছয়মাসের রোগ তথাপি কোন রূপ স্ফীততা বা কৃশতা হয় নাই। খুব সম্ভব ভিতরের পেশী ও স্নায়ু কোনরূপ জখম হইয়াছে; কিন্তু তা'র কারণ কি ?

পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনার পূর্ব্বে মেহ কি উপদংশ রোগ হইয়াছিল কি ?" না।" "কোন গর্হিত কার্য্য করেছিলেন কি না ?" প্রশ্নটা যেন হঠাৎ

আমার মুখ দিয়া বাহির হইল। লোকটা কিন্তু শুনিয়াই যেন একবার চমকাইয়া উঠিল। আমারো কৌতূহল বাড়িল; সন্দেহ হইল, নিশ্চয়ই কোন না কোন গর্হিত কার্য্য করিয়াছে। বলিলাম "বলুন না, না বল্লে চিকিৎসা করিব কি করে? বৈদ্যের কাছে রোগ লুকাইয়া রাখিলে, আপনাকেই ভুগিতে হইবে।"

যু। অন্যায় কাজ? হাঁ একটা অন্যায় কাজ করেছিলাম বটে। কিন্তু তার সঙ্গে এরূপ রোগের কোন সম্বন্ধ আছে কি না ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে শুনুন। আমাদের ওখানে পুরাণো বাঁধাঘাটের নিকট গঙ্গাতীরে অশ্বত্থতলায় এক প্রাচীন সাধু আসিয়া দিন কতক ছিলেন। সাধুটী সর্ব্বদাই মৌনী, অনাহারী ও ধ্যানস্থ। চারিদিকে মহা গুজব রটিয়াগেল, যে এমন সাধু কখন আসে নাই, কেহ কখন দেখে নাই। লোকে লোকারণ্য হইত ও পদধূলি লইয়া যাইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অনাহারী; কিন্তু কেহ কিছু মুখের নিকট ধরিলে তাহা তিনি খাইতেন। আমরা কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অনেক যুক্তি তর্ক করিয়া স্থির করিলাম, যে লোকটা নিশ্চয়ই বুজরুক ও জুয়াচোর; নহিলে প্রায় সমস্ত ক্ষণ মানুষ কখনো ধ্যানস্থ বা মৌনী থাকিতে পারে না। সঙ্গে নিশ্চয় জন কয়েক ওস্তাদ চেলা আছে; তারা এই সুযোগে কিছু উপায় করবার চেষ্টায় আছে; আর ওই বুজরুক বেটা চোক বুজে, মট্‌কা মেরে, বসে আছে। আর যদি বলেন অনাহারে থাকার কথা? তা হলে বলি যে তার মুখের ফাঁদে যা ধরা হত, তাতেই একজন বেশ 'খাইয়ে' লোকেরও পেটভরে যায়; তা'ছাড়া লোকে ক্ষীর, দই, লুচী, রাবড়ী, সন্দেশ, ও ক্ষীরেলা ছাড়া প্রায়ই কোন বাজে জিনিষ আনিত না; সুতরাং না খাটিয়া যদি বসে বসে এমন মুখের সাম্‌নে পেটভরা চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় পাওয়া যায়, তা' হ'লে আমরা অনেকেই এরূপ সাধু সাজতে পারি। তাই ভাবিয়া ঠিক করিলাম যে মুখের সাম্‌নে ধর্‌লেই যদি খায় ত বাছাধনকে এমন জিনিষ খাওয়াতে হবে যে আর এখানে সাধুগিরি না দেখাতে হয়।

পরামর্শ আঁটিয়া একদিন মধ্যাহ্ন কালে, অর্থাৎ যখন লোকজন ছিল না, কাঁটানটে শাক লইয়া তার মুখের সামনে ধরিলাম! একবার মনে হইল, না কাজটা ভাল হচ্ছে না, আবার মনে হ'ল দেখা যাক্‌ না, কত বড় বুজরুক্‌, কতক্ষণ সহ্য কর্‌তে পারে? মুখের নিকট ধরতে, সাধু ধীরে ধীরে অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের ন্যায় অম্লান বদনে চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন; আমিও মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। মনে মনে বলিলাম, 'বাপুহে, ঘু ঘু দেখেছ, ফাঁদত' দেখনি। আরাম ক'রে রাবড়ী মালাই খাও; এবার কাঁটা খাওয়ার সুখ দেখ।"

তার পর বেচারীর জিহ্বা ও ঠোঁট কাঁটাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। তখন একটু কষ্ট ও অনুতাপ বোধ হইল, একজনের শরীর হইতে রক্তপাত হইলে কাহার না কষ্ট হয়! মনে হইল, 'না আর নয়, যা 'কর্‌বার তা' করে ফেলেছি আর কষ্ট দিব না।—কিন্তু ভাবিলাম বেটা নিশ্চয়ই সাধু নয়, কেন না সাধু হ'লে যোগবলে কাঁটার তীক্ষ্ণতা অনায়াসে লোপ করিত পারিত। সাধারণ মানুষ, তাই কাঁটাতে আমাদেরই ন্যায় দুর্দ্দশা পাইল। ভাবিলাম ও খুসী হইলাম যে, বেটাকে খুব নাকাল করেছি। এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় সমস্ত কাঁটা ও শাক নিঃশেষ হইয়া গেল। আহার শেষ হইলে সাধু একবার চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে আমার ডান হাতটা যেন একটু আড়ষ্ট ও ব্যথা বোধ হইল। ভাবিলাম অনেকক্ষণ হাতখানাকে এক ভাবে শূন্যে রাখাতে এইরূপ ব্যথা অনুভব হ'চ্চে। কিন্তু সে চাহনীতে কি যেন একটা ছিল, যেন তাহাতে আমার বুকের ভিতরটা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল; যেন সে নীরব ভাষায় বলিল, "আমি ত' তোমার বা জগতের কাহারও কোন অনিষ্ট করি নাই; তবে তুমি আমাকে এরূপ ক্লেশ দিলে কেন?'

সে নীরব দৃষ্টির পর আর আমি তথায় থাকিতে পারিলাম না; কি যেন ভয়, অনুতাপ ও চক্ষুলজ্জা আসিয়া ঘেরিয়া ধরিল; কেমন যেন নিজেকে একটা অপরাধী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। নিজেকে স্থির রাখিতে পারিলাম না। সেখান হইতে সরিয়া পড়িলাম। ক্রমাগত মনে হইতে লাগিল, যে কাজটা গর্হিত হইয়াছে, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আসা উচিত। গভীর রাত্রে আমাদের দলের জন দুইকে লইয়া সাধুর নিকট গমন করিলাম,—একলা যাইতে ভরসা হইল না,—কি জানি যদি মার্ ধোর্ দেয়,—তা' ছাড়া আর একটা অনির্দ্দেশ্য ভয়ও হইতেছিল।

অশ্বথতলায় গিয়া সাধুকে দেখিতে পাইলাম না, ভাবিলাম যে হয়ত' মুখে ঔষধ লাগাইবার চেষ্টায় কোথায় গিয়াছে। কিন্তু যাহা দেখিলাম তাহাতে চক্ষু স্থির; দেখিলাম সাধু আমাদের মাথার উপরে; ভূমি হইতে প্রায় দশ হাত উচ্চে,—সম্পূর্ণ নিরাবলম্বনে শূন্যে পদ্মাসন করিয়া বসিয়া আছে। তাহার মাথাটা প্রায়—গাছের ডাল স্পর্শ করিয়াছে। আমরা নির্ব্বাক্, বিস্মিত ও স্তম্ভিত; শূন্যে কিরূপে এই ভাবে একজন বসিয়া থাকিতে পারে, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। সেই মুহূর্ত্তে বৃক্ষতল হইতে ভীষণাকার দুই ছায়া-মূর্ত্তি বহির্গত হইল,—মূর্ত্তিদ্বয় এত ভীষণ ও তাহাদের এরূপ ভ্রূকুটী, যে

আমরা আর ক্ষণমাত্রও অপেক্ষা না করিয়া ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া আসিলাম।

পরদিন শুনিলাম,—সাধু স্থান ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই দিন হইতেই হাতের এই প্রকার অনবরত কম্পন ও দারুণ যন্ত্রণা; জানি না, ঐ ঘটনার সহিত আমার এই রোগের কোনরূপ সংস্রব আছে কি না?"

* * * * *

আমি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিলাম, হাতটীকে আরও দুই তিন বার ভালরূপে পরীক্ষা করিয়াও কিছু বুঝিতে পারিলাম না। শেষে বলিলাম "নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই সংস্রব আছে; নিরীহ ভগবৎতুল্য সাধুকে বিনা কারণে পাপ-বুদ্ধির বশীভূত হইয়া যে ক্লেশ দিয়াছেন, তাহারই ফলে এই যাতনা।—আমি যতদূর দেখিলাম তাহাতে বোধ হয় ডাক্তারি চিকিৎসায় কিছু হইবে না।"

যু। আপনার দ্বারা কোন উপকারের আশা নাই?

আ। না।

যু। তবে উপায়।

আ। এক উপায় দৈব কৃপা; দৈব উপায়ে যদি কিছু উপশম হয় ত' হবে। নহিলে চিকিৎসায় কোন আশা নাই; আমার যতদূর মনে হয়, তা'তে যদি আপনার তীব্র অনুতাপ হয় ও তদুপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে ভগবান্‌কে ধরুন, এবং সাক্ষাৎ ভগবান্ সদৃশ সাধু সন্ন্যাসিগণের শরণাপন্ন হউন;—হয়ত' এক দিন না ক দিন রোগ মুক্তি ঘটিবে।

যুবক চুপ করিয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল, তার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেল। ইহার ছয় মাস পরে হঠাৎ এক দিন যুবকের সঙ্গে রাস্তায় দেখা। যুবক আমাকে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি সানন্দে বলিয়া উঠিল, "ডাক্তারবাবু আমি সেরে গেছি, আপনার উপদেশ মত কাজ করেই এ যাত্রা নিষ্কৃতি পেয়েছি। আপনার কথা আমার চিরদিন মনে থাকিবে।" অত্যন্ত কৌতূহল বাড়িয়া উঠিল।

যু। আপনার কথামত সাধু সন্ন্যাসী দেখিলেই অকপটে আত্মপাপ বর্ণন করিয়া তাঁহাদের কৃপা ভিক্ষা করিতাম। অবশেষে এক প্রাচীন সাধু বলিল ভয় কি? যদি তোমার মনে প্রকৃত অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্তের বাসনা উদয় হইয়া থাকে, তা' হ'লে নিশ্চয়ই নিষ্কৃতি পাইবে। ক্ষণিক অহঙ্কারের মোহে, নাস্তিক্য বুদ্ধির দোষে, অপকর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছ, তা'র ক্ষমা অবশ্যই আছে।"

আমি সাধুর পা দু'টী জড়াইয়া ধরিলাম। সাধু বলিলেন "আমাকে ধরিয়া কি হইবে।" বাবা তারকনাথের নিকট গিয়া পড়,—তিনি জগদ্‌গুরু—সকলের গুরু, সন্ন্যাসী মাত্রেরই গুরু, তিনি সদাশিব আশুতোষ। তাঁহার শরণাপন্ন হও, তিনিই মুক্তি দিয়া দিবেন।" মজ্জমান ব্যক্তি যেমন প্রাণের আশায় তৃণখণ্ড ধরিয়া বসে, সেইরূপ আশায় ৺তারকেশ্বরে ছুটিলাম।

ক্রমাগত নয়দিন অনাহার অনিদ্রা ও দুশ্চিন্তার পর প্রত্যাদেশ পাইলাম। এ নয়দিন যে কি কষ্টে কাটিয়াছিল, তা' মুখে বলিতে পারি না—একেবারে অনাহার, রাত্রে নিদ্রা নাই।—তার উপর দুশ্চিন্তা—যদি দুরদৃষ্ট ক্রমে ব্যর্থ-মনোরথ হইতে হয়। প্রত্যাদেশ হইল যে, "যদি তীব্র দংশন-যাতনা সহ্য করিতে পারিস্, আর এক মাস ধরিয়া রাস্তায় পতিত শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য উচ্ছিষ্ট খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারিস্, ত' রোগ হইতে মুক্তি পাইবি।"

দংশন যাতনা সহ্য করিতে অনায়াসে প্রস্তুত; কেননা দিবারাত্রি যে যাতনা ভোগ করিতেছিলাম তার তুলনায় দংশন-যাতনা যতই তীব্র হউক না কেন, তত প্রবল হইবে না। কিন্তু নর্দ্দামায় পতিত শৃগাল-কুক্কুর-ভক্ষ্য ঘৃণাকারজনক উচ্ছিষ্ট কি করিয়া খাই,—যাহা মেথর স্পর্শ করে না, ভদ্র সন্তান তাহা কিরূপে ভক্ষণ করিব? একবার মনে হইল পারিব না চলিয়া যাই। আবার দারুণ রোগ-যন্ত্রণা মনে হইল,—ভাবিলাম মরণ হয় না কেন—অবশেষে উচ্ছিষ্ট ভক্ষণই স্থির করিলাম।

প্রথম দু' এক দিন পারিলাম না—বমনোদ্বেগ আসিল; অনাহারে—কাটাইলাম। তারপর—এ কষ্ট রহিল না,—উচ্ছিষ্ট দ্রব্যের পার্শ্বেই পাতায় মোড়া উৎকৃষ্ট ভোগ রহিয়াছে দেখিলাম, এইরূপ প্রত্যহই থাকিত। বোধ হইত কে যেন আমারই নিমিত্ত সযত্নে দেবতার ভোগ রাখিয়া যাইত। দেখিতে দেখিতে একমাস কাটিয়া গেল; চলিয়া আসিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে কোথা হইতে এক পাগল আসিয়া আমার ডান হাতের এই কবজীর কাছে ভীষণ ভাবে কামড়াইয়া দিল। বহুকষ্টে তা'র হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া দেখি, যে ছাল, চামড়া, মাংস কাটিয়া শির ও হাড় বাহির করিয়া দিয়াছে ও বেগে রক্তস্রাব হইতেছে। চীৎকার করিতে করিতে দুধ পুকুরের জলে পড়িয়া হাত ডুবাইয়া ধরিলাম;—ঘাটের নিকটের জল রক্তে লাল হইয়া উঠিল। দারুণ যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। মূর্চ্ছা ভঙ্গে দেখি দু'একজন লোক আমার শুশ্রূষা করিতেছে; জলপটী বাঁধিয়া

দিয়াছে ও রক্তস্রাব বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু একটা জিনিস সেই সঙ্গে লক্ষ্য করিলাম, যে পূর্ব্বের মত হাতের আর কাঁপুনী ও যন্ত্রণা নাই। এত যন্ত্রণাতেও আনন্দ উৎসাহ এবং ভরসা যেন মেঘান্তরিত রৌদ্রের অন্তরাল হইতে জাগিয়া উঠিল। আবার নবজীবন পাইবার আশায় উৎফুল্ল হইলাম। তারপর ধীরে ধীরে ক্ষত ও তজ্জনিত স্ফীতি এবং প্রদাহের উপশম হইয়া গেল। সেই অবধি বেশ সুস্থ আছি। আপনার উপকার আমি জীবনে বিস্মৃত হইব না

পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম বাহুমূলে গভীর ক্ষতের চিহ্ন বর্ত্তমান।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

অর্থ]

চন্দ্রালোকে বারাণসী।

(সনেট্)

দেখিলাম বারাণসী নিশির হৃদয়-দেশে,
বিশ্বেশ্বর বসে যেন ভুবনমোহন বেশে ;
শুভ্রকান্তি-সৌধময় স্ফটিক প্রতিমা প্রায়,
সুপ্রসন্ন সমুজ্জ্বল শুভ্র চারু চন্দ্রিকায় ;
পরিপূর্ণ শোভাধর শিরে শোভে শশধর,
ব্যোম জটা উজলিয়া উছলিছে চন্দ্রকর,
তারকা-কুসুম জালে সজ্জিত সুকেশ-দাম,
দিগম্বর বামদেব ত্রিভুবন-অভিরাম ;
সমাসীন যোগীশ্বর দিব্য যোগাসন পরে,
দুই ধারে দুই উরু অসি বরুণার ধারে ;
সম্মুখে সন্নদ্ধ সুখে বিশ্ববন্দ্য পদদ্বয়
অর্দ্ধচন্দ্র-অনুকারী জাহ্নবীর বারিময় ;
শশি-স্নাত সোপানের শত শ্রেণী সুবিমল
পদে যেন ভক্তার্পিত সচন্দন মাল্যদল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র।

ব্রহ্মচর্য্য।

হিন্দুসন্তান মাত্রেই সনাতন ধর্ম্মসাধন মার্গে ব্রহ্মচর্য্য যে প্রথম অবলম্বনীয়, ও ইহা যে সাধনার একটী বিশেষ অঙ্গ তাহা অবগত আছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে আমাদের উত্থানশীল যুবক ও বালকবৃন্দ যাহাদের উপর হিন্দুর পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি সর্ব্ব ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছে বর্ত্তমান সময়ে তাহাদের অধিকাংশই এই ব্রহ্মচর্য্য অভাবে ভগ্নস্বাস্থ্য, উদ্যমহান, ও উন্মার্গগামী হইয়া তাহাদের উপর ন্যস্ত কর্ত্তব্যসমূহ, প্রাচীন সম্প্রদায়ের আশা ভরসা বীজাবস্থায়ই বিনষ্ট হইতেছে। ইহা সম্পূর্ণ তাহাদের স্বভাবজাত দোষ বলা যায় না; শিক্ষার অভাব ও অসৎ সঙ্গও এই অধঃপতনের কারণ। তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, ও তাহাদের প্রাণে হিন্দুধর্ম্মের উজ্জ্বল বিভা বিস্তার দর্শন মানসেই ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

মনুষ্য-দেহধারী মাত্রেরই নিজের বিদ্যা বুদ্ধি ও শক্তি অনুসারে সাধনপথে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য; কারণ, মানব-জন্ম বহু আরাধনা ও বহুভাগ্য-ফলেই লাভ হইয়া থাকে এবং ইহাই স্বর্গদ্বারের সোপান। যদি ইহার সদ্ব্যবহারই না করিলাম, যদি কহিনুরের ক্ষেত্রে আসিয়া মাটি কাটিয়া তাহার সন্ধানই না করিলাম, আর্য্যভূমে আর্য্যসন্তান হইয়া যদি "বিষধরসদৃশৈরিন্দ্রিয়ৈর্দষ্টগাত্রঃ" হইয়া অনার্য্যোচিত কার্য্যেই জীবন অতিবাহিত করিলাম, তাহা হইলে এই মনুষ্যজন্মে ধিক্! আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—

"লব্ধ্বা সুদুর্লভতরং নরজন্ম জন্তু-
স্তত্রাপি পৌরুষমতঃ সদসদ্বিবেকম্।
সংপ্রাপ্য চৈহিকসুখাভিরতো যদিস্যাৎ
ধিক্ তস্য জন্ম কুমতে পুরুষাধমস্য॥"

"অতিশয় দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া এবং সেই জন্মে পুরুষকার ও সদসদ্ বিবেক প্রাপ্ত হইয়াও জীব যদি পার্থিব সুখ ভোগেই একান্ত নিরত হয়, তাহা হইলে সেই কুমতি পুরুষাধমের জন্মই ধিক্।"

ধর্ম্মাচরণের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই; ইহা হিন্দুর নিত্য অনুষ্ঠেয়। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্ম অধিকার অনুসারে পালন করাই নর-নারীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম; না করাই পাপ। উহা "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা" এই ভাবে আচরণ করিবে। মৃত্যুর যখন অবধারিত কাল নাই, ধর্ম্মাচরণেরও কোন অবধারিত কাল থাকিতে পারে না। অতএব দেহ ও মনের উন্নতিকল্পে, চৈতন্যশক্তি আমাদের মধ্যে বিকাশ করার মানসে আমাদের আশৈশব যে সমস্ত ক্রিয়া করিতে হইবে। ভগবদ্ভাবে লীন থাকার জন্য আমাদের যে সকল অভ্যাস অবলম্বন করিতে হইবে, অষ্টাঙ্গ যোগের যমসাখান্তর্গত ব্রহ্মচর্য্য তাহার মধ্যে একটী প্রধানতম। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা আমি শুধু হঠযোগের একটী প্রক্রিয়া বা শারীরিক "কস্রৎ" বলিতেছি না। কিন্তু ইহা মানব-জন্মের একমাত্র উদ্দেশ্য ভগবৎ শক্তি বিকাশের সহায়রূপে অবশ্য পালনীয় এবং হিন্দুসন্তানমাত্রেরই দৈনন্দিন কর্ত্তব্য। তবে ক্ষেত্র ও অবস্থা অনুসারে যে যত দূর পারিবেন সে তত দূরই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন; স্বল্প হইতেই ক্রমশঃ বৃহতের দিকে অগ্রসর হইতে হয়; ভালর যতটুক্ পাওয়া যায় তাহাই ভাল। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"

অতএব স্কুলে যাইতে হইবে, পড়া তৈয়ারী করিতে হইবে বলিয়া নিত্য ধর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করা কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে উহাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া যথাসম্ভব আশ্রমোচিত ধর্ম্ম আচরণ করাই আর্য্যসন্তানের আর্য্যত্বের পরিচয়। এই আশ্রমোচিত ধর্ম্মই দেহ ও মনের পোষক ও উহাদের শক্তি বৃদ্ধিকারক; এবং ঐ শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই অধ্যয়নাদির ফলসহজসিদ্ধ হইয়া পড়ে।

মানবদেহে যত প্রকার শক্তি আছে ওজঃ (Human magnetism) তন্মধ্যে প্রধান, এবং ইহাই ব্রহ্মতেজ নামে অভিহিত। ওজঃই রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্ত ধাতুর তেজ এবং সপ্তম ধাতু শুক্রই ইহার আশ্রয়স্থল। এই ওজঃ সর্ব্বদেহব্যাপী হইলেও মস্তিষ্কে ও হৃদয়েই বেশীর ভাগ সঞ্চিত থাকে। ইহা যাহার শরীরে যত বেশী থাকে সে সেই পরিমাণে শ্রীমান্, বুদ্ধিমান্, মেধাবী ও তেজস্বী হয়। সঙ্গীত, কবিত্ব, পাঠ, বক্তৃতা প্রভৃতি তত্তৎকার্য্যকারীর ওজের বিকাশানুযায়ী শ্রোতার

চিত্তাকর্ষক ও আনন্দপ্রদ হইয়া থাকে। আমরা ভাব বলিলে যাহা বুঝি তাহাতেও ওজের ক্রিয়া আছে, ওজের তারতম্য অনুসারে হৃদয়ে ভাবের উন্মেষ হয় ও অন্যের উপর তাহা বিস্তার করে। ভাবহীন ভাষা ও চেতনাশূন্য দেহ উভয়ই সমান। জগতে উন্নতিলাভ করিতে হইলে দেহে ওজের সংরক্ষণ বিশেষ আবশ্যক; এবং তাহার উপায় ব্রহ্মচর্য্য। কামভাব দমিত থাকিলে ঐ শক্তিই ও রূপে পরিণত হইয়া থাকে; অতএব কাম রিপুর হস্ত হইতে সর্ব্বদা দেহ ও মনকে রক্ষা করা সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য; কারণ, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ওজসংরক্ষিত দেহই সাধনার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র, মহাশক্তি বিকাশের মন্ত্র।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সপ্তম ধাতু শুক্র বা বীর্য্যই ওজের প্রধান আশ্রয়স্থল।

"ওজস্তু তেজো ধাতূনাং শুক্রান্তেষাং পরম্ স্মৃতম্"। সুশ্রুতঃ

অতএব বীর্য্যধারণই ওজঃ রক্ষার ও বৃদ্ধির একমাত্র উপায়; এবং এই বীর্য্যধারণই ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া অভিহিত।—

"বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্"।

পক্ষান্তরে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলেই বীর্য্য লাভ হইতে থাকে—

"ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ"।

ব্রহ্মচারী শ্রেষ্ঠবীর্য্যবান্-শরীরসম্পন্ন মহাযোগী দধিচীমুনির অস্থি দ্বারা বিশ্বকর্ম্মা বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া দিলে; দেবরাজ সেই বজ্র ধারণপূর্ব্বক অমিত-তেজা বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে কু-শিক্ষা ও কু-সঙ্গের ফলে অনেক বালক চিররুগ্ন-দেহ, স্ফূর্ত্তিবিহীন, লুপ্তস্মৃতি ও নষ্ট-সৌন্দর্য্য হইয়া অকর্ম্মণ্য ও অনেক স্থলে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। অপরিণামদর্শী ঐ সকল বালকগণ আশু সুখে মত্ত হইয়া, ভবিষ্যৎ জীবনকে দুর্ব্বহ ও ক্লেশের আগার বলিয়া মনে করে, মণিভ্রমে অগ্নিতে হস্তক্ষেপ করিয়া দগ্ধ হইতে থাকে। ব্রহ্মচর্য্যই বর্ত্তমানে কার্য্যসাফল্যের শ্রেষ্ঠ উপায় ও ভবিষ্যতের জীবানন্দদায়ক অমৃত।

মৈথুনকে প্রকৃতিগত ধর্ম্মে পরিণত করার নামই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য; অন্য কথায় কামের সুখলিপ্সা ও ভোগলিপ্সা পরিত্যাগ করাই ব্রহ্মচর্য্য।

এস্থলে মৈথুন ও প্রকৃতিগত ধর্ম্ম এই উভয়ই একটু বিশদভাবে বলা আবশ্যক।

মৈথুন সম্বন্ধে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"স্মরণং দর্শনং স্ত্রীণাং গুণকর্ম্মগুকীর্ত্তনম
সমীচীনত্বধীস্তাসু প্রীতিঃ সম্ভাষণং মিথঃ।
সহবাসশ্চ সংসর্গঃ অষ্টধা মৈথুনং বিদুঃ।"

রমণীগণের চিন্তা, তাহাদিগকে দর্শন এবং তাহাদের গুণ ও কর্ম্মের প্রশংসা, তাহাদিগকে রমণীয় বলিয়া মনে করা, তাহাদের সহিত সপ্রেম এবং সানুরাগ সম্ভাষণ, তাহাদের সহিত এক সঙ্গে বাস,—এই অষ্ট প্রকার ব্যবহারকেই পণ্ডিতগণ মৈথুন বলিয়া নির্দ্দেষ করিয়াছেন। অন্য যে কোন প্রকারে শারীরিক বীর্য্যহানি হয় তাহাকেও মৈথুন বলা যায়। ব্রহ্মচারীর পূর্ব্বোক্ত কোন বিষয়েই আদৌ লিপ্সা থাকিবে না।

সর্ব্বাত্মিকাই প্রকৃতির ক্ষেত্র ;—অতএব সর্ব্বভাবে, সর্ব্বসময়ে, সর্ব্বরূপে, যাহা সিদ্ধ, তাহাই প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। যেমন প্রাণের নিশ্বাস প্রশ্বাস, চোখের দেখা, শ্রবণের শোনা সেই সেই ইন্দ্রিয়ের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম, হজম হওয়া ও মলত্যাগ করা যেমন অন্ত্রের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম ইহারা যেমন কাহারও চেষ্টাসাপেক্ষ নহে, কামও যদি তদ্রূপ ব্যক্তিগত লিপ্সাশূন্য সর্ব্বমঙ্গলাত্মিক প্রাকৃতিক ধর্ম্মে পরিণত হয়, তবেই ব্রহ্মচর্য্য বলা যায়। প্রাকৃতিক কার্য্য মলমূত্রাদি ত্যাগের পর সুখ অনুভব হয় বটে, কিন্তু তাহাতে ভোগের লিপ্সা নাই। লিপ্সাই অনিষ্টের মূল। লিপ্সার হস্ত এড়াইতে পারিলেই "ন লিপ্যতে স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।" সেই ভোগেচ্ছা-বর্জ্জিত নির্লিপ্ত অবস্থায়, সকলই ভগবানের প্রাকৃতিক বিলাস বলিয়াই সিদ্ধ হইতে থাকে। নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, রাগ, দ্বেষাদি সকলই ঐরূপ প্রকৃতিগত করাই যম সাধনের চরম ; কিন্তু ঐ ঊর্দ্ধতম অবস্থায় উপনীত হইতে হইলে প্রথম আমাদিগকে একটা শিক্ষাবস্থার ভিতর দিয়া আসিতে হইবে। বৃত্তিগুলিকে প্রকৃতিগত করার যে সব উপায় নির্দ্ধারিত আছে, তাহা অবলম্বন করিতে হইবে। নতুবা একলম্ফে এত উচ্চস্তরে পৌছিবার চেষ্টা "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ"মত হাস্যাস্পদ হইবে। প্রথম হইতেই শাস্ত্রানুশাসন ও মহাপুরুষ বাক্যরূপ আইনের অধীন হইয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে ; উহারা আশুকঠোর হইলেও পরিণামে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অশেষবিধ মঙ্গলপ্রদ। সাময়িক কঠোরতা অবলম্বনে আমরা ভবিষ্যতে অমৃতের অধিকারী হইতে পারিব।

ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে যাহা যাহা পালন করা কর্ত্তব্য ভাগবতের নিম্নোদ্ধৃত অংশটীতেই তাহার সার সংগৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্বে গুরুকুলে বাসের যে প্রথা ছিল বর্ত্তমান সময়ে তাহা লুপ্ত প্রায় বিধায় সেই বিষয় এই প্রবন্ধে নিরুক্ত রহিল।

"সায়ং প্রাতরুপাসীত গুর্ব্বগ্ন্যর্কসুরোত্তমান্।
সন্ধ্যে উভে চ যতবাগ্ জপন্ ব্রহ্ম সনাতনম্॥

সুশীলো মিতভুগ্দক্ষঃ শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
যাবদর্থং ব্যবহরেৎ স্ত্রীষু স্ত্রীনির্জ্জিতেষু চ॥
বর্জ্জয়েৎ প্রমদাগাথামগৃহস্থো বৃহদ্ব্রতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্ত্যপি যতের্মনঃ॥

নন্বগ্নিঃ প্রমদা নাম ঘৃতকুম্ভসমঃ পুমান্।
সুতামপি রহো জহ্যাৎ ＊ ＊ ＊।
কল্পয়িত্বাত্মনা যাবদাভাসমিদমীশ্বরঃ।
দ্বৈতং তাবন্ন বিরমেৎ ততোহ্যস্য বিপর্য্যয়ঃ॥

অঞ্জনাভ্যঞ্জনোন্মর্দ্দস্ত্র্যবলেখামিষং মধু।
স্রগ্গন্ধলেপালঙ্কারাংস্ত্যজেয়ুর্ব্বুধাঃ বৃহদ্ব্রতাঃ।

এবং বিধো ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থো যতির্গৃহী।
চরন্ বিদিত বিজ্ঞানঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥"

"ব্রহ্মচারী—গুরু, অগ্নি, সূর্য্য ও দেবতাদিগের উপাসনা করিবে এবং গায়ত্রী জপ ও ত্রিকালে সন্ধ্যা করিবে। এবং সায়ং প্রাতঃ উভয় সন্ধ্যাকালেই মৌনী হইয়া থাকিবে। সুশীল, মিতভোজী, কার্য্যদক্ষ, শ্রদ্ধাশীল হইবে এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্ত্রীদিগের এবং স্ত্রীজিত ব্যক্তিগণের সহিত কেবল প্রয়োজনমত ব্যবহার করিবে। গৃহস্থ ব্যতীত ব্রহ্মচারী মাত্রেই নারীঘটিত কথাবার্ত্তা পরিত্যাগ করিবে; কেন না প্রবল ইন্দ্রিয় সকল যতিরও মন হরণ করে। প্রমদা অগ্নিতুল্য, পুরুষ ঘৃতকুম্ভসদৃশ; নির্জ্জনে কন্যার সহিতও অবস্থিতি নিষিদ্ধ।

যতদিন না আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা দেহাদিকে অভাসমাত্র বিবেচনা করিয়া জীব স্বতন্ত্র হইতেছেন, ততদিন ভেদজ্ঞান থাকিবে। ভেদজ্ঞান হইতেই বিপর্য্যয়। ভোক্তা ও ভোগ্য এই ভেদজ্ঞান থাকে ত, স্ত্রীসঙ্গ পরিহার কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচারিগণ অঞ্জন, অভ্যঞ্জন, গাত্রসংবাহন, স্ত্রীসঙ্গ, চিত্রকর্ম্ম, আমিষ, মধু, মাল্য, চন্দন, অনুলেপন ও অলঙ্কার ত্যাগ করিবে। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, যতি অথবা গৃহী এই রূপ অনুষ্ঠানান্বিত হইলে বিজ্ঞেয় বস্তু বিদিত হইয়া পরমব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।”

আহারের সঙ্গে দেহ ও মনের নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে ও আহার অনুযায়ীই প্রকৃতি গঠিত হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মচারীর চৈতন্যশক্তি বিকাশে সহায়কারী সৎ প্রবৃত্তির অনুকূল সাত্ত্বিক আহারই বিশেষ আবশ্যক। ভগবান বলিয়াছেন—

“আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥

আয়ু, সাত্ত্বিক ভাব, শক্তি, আরোগ্য, চিত্তপ্রসাদ ও রুচিরবর্দ্ধক, রসযুক্ত এবং স্নেহযুক্ত, যাহার সারাংশ দেহে স্থায়ী এরূপ এবং চিত্ত পরিতোষকর আহার সাত্ত্বিকগণের প্রিয়।

যাহাতে মন অপবিত্র করে, পশুভাব বৃদ্ধি করে ব্রহ্মচারীর সেইরূপ খাদ্য সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়।

এই মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া আমাদের স্বকীয় কর্ম্মদ্বারা যে ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইতে আমরা বাধ্য, তন্মধ্যে ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হইতে ব্রহ্মচর্য্যই বিশেষ আবশ্যক।

“ঋষীণাং ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রুতেন তপসা তথা”—

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

তপস্যা, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হইবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে মানবজীবনের প্রতিসম্পাদ্য বিষয়েই ব্রহ্মচর্য্য প্রধান সহায়। তাই শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

“অথ যদ্‌ যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেবতৎ ব্রহ্মচর্য্যেণহ্যেব যো জ্ঞাতা তং বিন্দতে। অথ যদিষ্টমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেবতদ্‌, ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেবেষ্টাত্মানমনুবিন্দতে।

ছান্দোগ্য।

"(শিষ্টগণ) যাহাকে যজ্ঞ বলিয়া থাকেন, তাহা ব্রহ্মচর্য্যই ; ব্রহ্মচর্য্যেরই দ্বারা যে ব্যক্তি জ্ঞাতা হন তিনিই তাঁহাকে (ব্রহ্মলোকরূপ আত্মাকে) লাভ করেন। আর (শিষ্টগণ) যাহাকে পূজা বলিয়া থাকেন, তাহা ব্রহ্মচর্য্য , ব্রহ্মচর্য্যেরই দ্বারা পূজা করিয়া তাঁহারা আত্মাকে লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীবিধুভূষণ সেন গুপ্ত।

আমি ভক্তি-বাঁধনে বাঁধিব।

কাম)

সখা ! চারিদিকে দেখি আঁধার জগৎ
কোথা তুমি প্রাণ ! লুকালে হে ?
(আমি) নিবিড় তিমিরে ঘুরে যে গো মরি
তোর অমল আলোক পাই না যে।
ওরে ! তুই যে রে সখা প্রাণের প্রদীপ
নিবিয়া কোথায় ভাতিছ হে ?
তিমিরে পরাণ ছাইয়ে দিয়ে—
কাঁদায়ে ভাসায়ে গেলি যে রে !
ল'য়ে শোকের প্রবল হিল্লোলে
ভাসায়ে কোথায় যায় রে ?
সেথা কি গো সখা ও চরণ-ছায়ে
শ্রান্ত-জীবন জুড়াবে হে ?
বারেক পাইলে ও চরণ তোর
ভকতি-বাঁধনে বাঁধিব
তবে——শকতি বিহীন হইবি রে সখা
নারিবি ছেঁদিতে বাঁধন।

শ্রীবিশ্বনাথ মিত্র

ওঁ

তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রম্ । (ভাষ্যব্যাখ্যাসমন্বিতম্)

সম্যগ্দর্শনজ্ঞানচারিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়ার্থ :— সম্যগ্ [যথার্থঃ] দর্শনম্ [জিনদেবোক্তপদার্থেঽভিরুচিঃ] জ্ঞানং, চারিত্রঞ্চ—এতত্ত্রিতয়ানাং সম্মিলিতানাং মোক্ষস্য (নির্ব্বাণস্য) মার্গঃ (উপায়ঃ) [বিজ্ঞেয়ঃ] ইতি। অত্র তু সম্যক্ শব্দস্য দর্শনাদি-পদেন প্রত্যেকেন সহ সম্বন্ধস্তাৎপর্য্যতঃ সমুন্নেয়ঃ, সর্ব্বমন্যদ্ ভাষ্যে সুস্পষ্টমস্তি ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ :— সম্যগ্দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান, এবং সম্যক্ চারিত্র—এই তিনটী তত্ত্ব মিলিত হইয়া মোক্ষমার্গ নামে অভিহিত হয়। সম্যগ্দর্শন প্রভৃতি শব্দের অর্থ স্বয়ং গ্রন্থকার পরে বলিবেন ॥ ১ ॥

ভাষ্য-ব্যাখ্যা :—সম্যগ্দর্শন সম্যক্ জ্ঞান, এবং সম্যক্ চারিত্র, সদাচরণ বা (জিনোক্ত-তত্ত্বানুশীলন) এই তিনটীকে মোক্ষের উপায়স্বরূপ জানিবে। উক্ত ত্রিবিধ মোক্ষমার্গের আমি লক্ষণ এবং পরীক্ষা ভেদ প্রভৃতি নিরূপণপূর্ব্বক বলিব। এইস্থলে কেবল শাস্ত্রের আনুপূর্ব্বিক রচনা প্রদর্শনের নিমিত্ত শুধু উদ্দেশমাত্র করিলাম (১)। এই তিন পদার্থ মিলিত হইয়া মোক্ষমার্গের সাধন হয়; যেহেতু এই তিনের মধ্যে একটীও না হইলে, অপর এক বা দুইটী মোক্ষের উপায় হইতে পারে না। এই নিমিত্ত ভগবান্ সূত্রকার এই তিনেরই গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকলের মধ্যে পূর্ব্বে লাভ হইলে উত্তরের বা পরের লাভ হওয়া চাই। অর্থাৎ সম্যগ্দর্শনের প্রথমে লাভ হইলে তাহার পরবর্ত্তী সম্যক্ জ্ঞান এবং সম্যক্চারিত্র লাভ স্বীয় [illegible] বা অধ্যবসায় দ্বারা করা চাই। এবং উত্তরের বা সম্যক্ চারিত্রের লাভ হইলেও পূর্ব্বের লাভ অবশ্যই হইবে। যেহেতু প্রথম সোপান বা ভূমিকায় আরূঢ় না হইলে দ্বিতীয় সোপানে আরোহণ করা

---

(১) পদার্থ সমূহের কেবল নাম দ্বারা উল্লেখ বা নিরূপণকে "উদ্দেশ" কহে। নাম্না বস্তুকীর্ত্তনমুদ্দেশঃ"। "শাস্ত্রাদৌ বস্তুনামুদ্দেশো লক্ষণং, পরীক্ষাবেত্তীত্যেতত্ত্রয়ং কর্ত্তব্যমিতি" কাশ্যপীয়াঃ। "অসাধারণ ধর্ম্মো লক্ষণং, লক্ষিতস্য লক্ষণং সম্ভবতি নবা ইতি বিচারঃ পরীক্ষা"।

যায় না। [এখানে তাৎপর্য্য এই যে সম্যক্ জ্ঞানের লাভ হইলে সম্যগ্ দর্শনের লাভ নিশ্চিত জানিবে] এবং সম্যগ্ চারিত্রের লাভ দ্বারা সম্যগ্ দর্শনও জ্ঞান—এই উভয়ের নিয়ত লাভ হয়।) সূত্রে দর্শন প্রভৃতি পদের যে, সম্যক্‌পদ বিশেষণ দিয়াছে তাহা প্রশংসার্থের দ্যোতক (প্রকাশক) কিংবা বাচক,' নিপাত দ্বারা (২) সিদ্ধ হইয়াছে ; অর্থাৎ সুপ্রশংসিত শ্রেষ্ঠ দর্শন প্রভৃতি 'মোক্ষমার্গের সাধন হইবে। কিংবা সম্-উপসর্গপূর্ব্বক অঞ্চ্ ধাতুর পর কিপ্ প্রত্যয় করিয়া 'সম্যগ্'পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ব্যভিচার (দোষ) শূন্য অর্থাৎ নিয়ত সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় এবং অনিন্দ্রিয় দ্বারা যে, পদার্থের প্রাপ্তি হয় তাহাকে সম্যগ্ দর্শন বলা যায়। এই দর্শন পদটী দৃশ্ ধাতুর পর লুট্ (অনট্) প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। প্রশস্ত বা শ্রেষ্ঠ (নিন্দা ব্যভিচারাদি দোষরহিত যে দর্শন, তাহাকে সম্যগ্ দর্শন বলে। (৩) অথবা সঙ্গত (নিরন্তর ব্যবধান শূন্য) যে দর্শন, তাহা সম্যগ্ দর্শন পদবাচ্য। এইরূপ জ্ঞান এবং চারিত্রেতে সম্যক্ পদ যোজিত করিতে হইবে ॥ ১ ॥

তত্ত্বার্থ-শ্রদ্ধানং সম্যগ্ দর্শনম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ার্থঃ—তত্ত্বানাং (ভগবজ্জিনোক্তবাক্যানাং) [যৎ] শ্রদ্ধানং (সম্যগভিরুচিঃ বিশ্বাসো বা) [তদেব সম্যগ্ দর্শনম্ (যথার্থতত্ত্বজ্ঞানং) অর্থাজ্জিনদেবোক্ত জীবাদি-তত্ত্বেষু সম্যগ্ বিজ্ঞানমিত্যর্থঃ] ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ :—ভগবান্ জিনদেবোক্ত জীবাদিতত্ত্বসমূহে যে সম্যক্ শ্রদ্ধা, তাহাকে সম্যগ্ দর্শন বলে ॥ ২ ॥

ভাষ্য-ব্যাখ্যা,—(ভগবান্ জিনদেবোক্ত কিংবা জিনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য) তত্ত্বস্বরূপ পদার্থের প্রতি শ্রদ্ধা (আস্তিক্য বুদ্ধি), অথবা তত্ত্ব (জীবাদি পদার্থ) জ্ঞান দ্বারা যে, অর্থের প্রতি শ্রদ্ধা তাহাকে তত্ত্বার্থশ্রদ্ধা কহে।

---

(২) "যল্লক্ষণেনানুৎপন্নং তৎসর্ব্বং নিপাতনাৎ সিদ্ধম্"। যাহা লক্ষণ বা সূত্র দ্বারা সিদ্ধ হয় না, সে সমুদয় নিপাতন দ্বারা সম্পন্ন হয় জানিবে। নিপাত, নিরুক্ত, পৃষোদরাদি ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দ-সঙ্কেত বিশেষ।

(৩) পদার্থ দুই ভাবে প্রতিপন্ন হয়, এক ব্যুৎপত্তি-নিমিত্ত, অপর প্রবৃত্তি-নিমিত্ত ; ব্যুৎপত্তি পক্ষেও সম্যক্ পদ প্রশংসার্থের বোধক হইয়া দর্শন প্রভৃতি পদের বিশেষণ হয় ; এই জন্য প্রকারান্তরে বলিতেছেন—অর্থাৎ যে পূর্ণরূপে দ্রব্য ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাকে সম্যগ্ দর্শন প্রভৃতিতে জানিবে।

সেই তত্ত্বার্থশ্রদ্ধাকে সম্যগ্‌দর্শন (৪) (বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনের মতে পরম তত্ত্বজ্ঞান) বলে। তত্ত্ব দ্বারা অর্থাৎ ভাবরূপ (যথাযথরূপ) নিশ্চয়কে সম্যগ্‌দর্শন নামে অভিহিত করা হয়। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ,—যে পদার্থ যেরূপ, সেরূপে তাহার যে অবধারণ করা হয় তাহাকে সম্যগ্‌দর্শন কহা যায়। তত্ত্ব পদার্থ,—জীব, অজীব প্রভৃতিকে বলে, তাহা পরে স্পষ্টরূপে বলা হইবে। সেই তত্ত্বরূপ যে, জীবাদি পদার্থ সে সমুদয়ের প্রতি শ্রদ্ধা—অর্থাৎ সে সকল পদার্থের যথার্থরূপে বিশ্বাস (নিঃসংশয় প্রত্যয়) করাকেও তত্ত্বার্থশ্রদ্ধা বলিয়া উক্ত হয়। এইরূপ প্রশম,—অর্থাৎ রাগাদির উৎকটতার অভাব; সংবেগ,—সংসারে শরীর ভোগ প্রভৃতিতে ভয়; নির্ব্বেদ,—সাংসারিক বিষয়ের প্রতি ঘৃণা বা তুচ্ছবোধপূর্ব্বক বৈরাগ্য, বৈরাগ্য অনুকম্পা—সকল জীবে দয়া, এবং এই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পদার্থ-সমূহে আস্তিক্য বোধের অভিব্যক্তি বা আবির্ভাবরূপ যে তত্ত্বার্থশ্রদ্ধা তাহাই সম্যগ্‌ দর্শনের পদবাচ্য হয়॥ ২॥

তন্নিসর্গাদধিগমাদ্বা ॥ ৩॥

অন্বয়ার্থঃ—(ইদং পূর্ব্বসূত্রোক্তং সম্যগ্‌দর্শনং) নিসর্গাৎ (পরোপদেশনিরপেক্ষাৎ স্বরূপাৎ) অধিগমাৎ বা (জৈনাচার্য্যোপদেশাৎ) [অথবা তদিতি—তদা সম্যগ্‌দর্শনং পরামৃশ্যতে জায়তে ইতি শেষঃ]॥ ৩॥

সূত্রার্থ :—সেই পূর্ব্বসূত্রে উক্ত সম্যগ্‌দর্শন নিসর্গ অর্থাৎ পরের উপদেশনিরপেক্ষস্বরূপ হইতে, এবং অধিগমদ্বারা অর্থাৎ আচার্য্যের উপদেশ দ্বারা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ৩।

ভাষ্য-ব্যাখ্যা :—এই সম্যগ্‌দর্শন দুই প্রকার হইয়া থাকে। এক,—নিসর্গজ (স্বাভাবিক) সম্যগ্‌দর্শন, অপর অধিগম (গুরূপদেশাদি দ্বারা) জনিত সম্যগ্‌ দর্শন। নিসর্গ—পরিণাম, স্বভাব, এবং অন্যের উপদেশশূন্য, এই সকল একার্থের বাচক বা পর্য্যায়ক শব্দ। জ্ঞান এবং দর্শনস্বরূপ যে, উপযোগ, সে উপযোগের সহিত সংযুক্ততাই জীবের লক্ষণ, ইহা পরে ব্যক্ত করিয়া বলা যাইবে। সে জীবের অনাদিকাল হইতে সিদ্ধ এই সংসারে স্বীয়কর্ম্ম বা অদৃষ্ট বা ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারা ভ্রমণ হইতেছে; এবং নিজ নিজ কর্ম্মের অনুযায়ী নরক

---

(৪) সম্যগ্‌দর্শন প্রভৃতিকে কোন কোন আচার্য্য "রত্নত্রয়" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। (১) সম্যগ্‌দর্শন (২) সম্যক্ জ্ঞান (৩) সম্যক্ চারিত্র। ভগবান্ জিনদেবের সর্ব্বজীবের কল্যাণের নিমিত্ত যে উপদেশ, সেই উপদেশে বিশেষ অভিরুচির নাম সম্যক্ শ্রদ্ধা, যথা—"রুচির্জ্জিনোক্তত্ত্বেষু সম্যক্ শ্রদ্ধানমুচ্যতে"॥

তির্য্যক্, মনুষ্য, ও দেবজন্ম গ্রহণে বন্ধনিকাচনের উদয়, এবং নির্জ্জরা (সপ্ত পদার্থের মধ্যে ষষ্ঠ পদার্থ) অপেক্ষা রক্ষা-কারকরূপে নানা প্রকার পুণ্য পাপ ফলের যে, জীব অনুভব করিয়া থাকে, তাহার জ্ঞান এবং দর্শনরূপ উপযোগ স্বভাব হইতে অল্প অল্প পরিণাম, অধ্যবসায় এবং অন্যান্য স্থানাদিতে প্রাপ্ত হইয়া অনাদিকাল হইতে মিথ্যাজ্ঞানে আবদ্ধ থাকিলেও পরিণাম বিশেষে বা কর্ম্মের পরিপক্কতা হইতে ভাববিশেষে অপূর্ব্ব (অভিনব) কার্য্য এইরূপে হইয়া থাকে যে, তাহা ভিন্ন অপর কোনও উপদেশাদিশূন্য কোন সময়ে যে সম্যক্‌দর্শন উৎপন্ন হয় তাহাকে নিসর্গ সম্যগ্‌দর্শন বলে। অভিগম, অধিগম, আগম, নিমিত্ত শ্রবণ, শিক্ষা, ও উপদেশ এই সব সমানার্থক জানিবে। এই অধিগম-পরোপদেশ প্রভৃতি দ্বারা যে তত্ত্বার্থের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয় তাহাকে অধিগমজ সম্যগ্‌দর্শন বলে ॥ ৩ ॥

অত্রাহ—তত্ত্বার্থশ্রদ্ধানং সম্যগ্‌দর্শনমিত্যুক্তং। তত্র কিং তত্ত্বমিতি অত্রোচ্যতে —পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে, তত্ত্বরূপ অর্থের প্রতি যে, সম্যক্ শ্রদ্ধা তাহাকে সম্যগ্‌দর্শন বলে। এখানে তত্ত্ব শব্দদ্বারা কোন্ কোন্ পদার্থের গ্রহণ করিতে হইবে এই শঙ্কার সমাধানের নিমিত্ত পরসূত্রের অবতারণ হইতেছে।

জীবাজীবাস্রব-বন্ধ-সম্বর-নির্জ্জরামোক্ষাস্তত্ত্বম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ—সূত্রেণানেন সপ্তানাং জীবাদিতত্ত্বানাং স্বরূপং বক্তি। তচ্চ জীবঃ, অজীবঃ, আস্রবঃ, বন্ধঃ, সম্বরঃ, নির্জ্জরা, মোক্ষঃ, এতে সপ্ত শাস্ত্রস্যাস্য পতিপাদ্যং তত্ত্বং (পদার্থঃ) ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ :—তৃতীয়সূত্রে তত্ত্বের উদ্দেশ মাত্র করা হইয়াছে। এই সূত্রে তত্ত্বের স্বরূপ কথিত হইল ; সেই তত্ত্ব,—জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সম্বর, নির্জ্জরা, মোক্ষ, এই সাতটীতে সম্যক্‌রূপ শ্রদ্ধা করিলেই সম্যগ্‌দর্শনের বিকাশ হইবে ॥ ৪ ॥

ভাষ্য-ব্যাখ্যা :—(সপ্ত পদার্থের সংক্ষিপ্ত মূল দুই পদার্থ ;—জীব ও অজীব।) জীব—মনুষ্য প্রভৃতি ; অজীব—আকাশাদি। আস্রব, (৫) বন্ধ, সম্বর, নির্জ্জরা, এবং

(৫) আস্রব শব্দের অনেক প্রকার অর্থ আছে। তন্মধ্যে সংক্ষিপ্ত অর্থ এই—পুরুষকে (জীব বা মানুষকে) ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়সমূহেতে যে প্রবৃত্ত করায় তাহাকে 'আস্রব' বলে। যে হেতু ইন্দ্রিয় দ্বারাই পৌরুষ-জ্যোতি (পুরুষসম্বন্ধিজ্ঞান প্রকাশ) বিষয় সমূহকে স্পর্শ করত অনন্ত রূপাদি জ্ঞানরূপে পরিণত হয়। উপযোগ, আস্রব, বন্ধ, এই তিনটী বিষয় খুব জটিল ও নানার্থযুক্ত ; উত্তরোত্তরে এই সকল বিষয় প্রাঞ্জলরূপে বলা যাইবে। শ্রীমদ্‌বাচকাচার্য্য মতে বন্ধের হেতু চারিটী, মিথ্যাদর্শন, অবিরতি, প্রমাদ, কষায়। মিথ্যাদর্শন দুই প্রকার,—এক মিথ্যাকর্ম্মের উদয় হইতে

মোক্ষ—এই সাত ভাগে বিভক্ত যে পদার্থ তাহাই তত্ত্ব। অথবা জীব প্রভৃতি সাতটী পদার্থ তত্ত্ব নামে কথিত। সেই সাত প্রকার তত্ত্বস্বরূপ পদার্থের পরে লক্ষণ এবং ভেদ নিরূপণপূর্ব্বক বিস্তাররূপে বলা হইবে ॥ ৪।

নাম স্থাপনা দ্রব্য ভাবতস্তন্ন্যাসঃ ॥৪॥

অন্বয়ার্থঃ—নাম, স্থাপনা, দ্রব্য (এবং) ভাবশ্চ (এতেষামনুযোগৈঃ জীবাদীনাং সপ্তানাং তত্ত্বানাং ন্যাসঃ [লোকে প্রসিদ্ধিঃ] ভবতীত্যর্থঃ) অত্রানুযোগপদেন সর্ব্বেষাং গণিপিটকার্থানামভিধানম্ ॥৫॥

সূত্রার্থ :—নাম স্থাপনা দ্রব্য এবং ভাব—এই সকলের অনুযোগ দ্বারা জীব প্রভৃতি সপ্তপদার্থের বা তত্ত্বের ন্যাস হইয়া থাকে ; অর্থাৎ লোকে ব্যবহার হয়। (অনুযোগ শব্দদ্বারা সকল গণিপিটকার্থের কথন জানিবে ; অধিক বিবরণ ভাষ্য-ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য) ৫ ॥

ভাষ্য-ব্যাখ্যা :—নাম প্রভৃতি যে, চারিটী অনুযোগের দ্বার আছে, তাহাদের দ্বারা জীব প্রভৃতি সপ্তপদার্থের ন্যাস (লোকে প্রসিদ্ধি) হইয়া থাকে, অর্থাৎ বিস্তাররূপে পদার্থের লক্ষণ এবং বিধান (জীবাদির প্রভেদ সংখ্যা প্রভৃতি) দ্বারা জ্ঞান হওয়ার নিমিত্ত যে, ব্যবহারের উপযোগ তাহাকেই ন্যাসের লক্ষণ বলা যায়। অর্থাৎ নাম প্রভৃতি নিক্ষেপ দ্বারা উদ্দিষ্ট জীবপ্রভৃতি পদার্থের সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান হইবে। যেরূপ নাম জীব, স্থাপনা-জীব, দ্রব্য-জীব, এবং ভাব-জীব। নাম, সংজ্ঞা, এবং কর্ম্ম এই সকল শব্দ পর্য্যায়-বাচক বা একার্থের বোধক। চেতনাযুক্ত কিংবা অচেতন বস্তুর ব্যবহারের নিমিত্ত যে, 'জীব' এইরূপ নাম বা সংজ্ঞা করা হয় তাহাকে 'নাম-জীব' বলে। এবং কাষ্ঠ, পুস্তক, চিত্রকর্ম্ম (চিত্রশিল্প) ও অক্ষক্রীড়া (পাশা খেলা) কার্য্যে যে, জীবের স্বরূপ স্থাপনা করা হয় তাহাকে "স্থাপনা জীব" কহে ; অর্থাৎ কাষ্ঠ, পুস্তক, চিত্রকার্য্য (চিত্রাঙ্কন শিল্প বা ছবি প্রভৃতি আঁকা), অক্ষনিক্ষেপ (পাশা প্রভৃতি ক্ষেপ করা) দ্বারা যে জীবের স্থাপনা করা হয় তাহাকে 'স্থাপনাজীব' বা

(হইলে) পরের উপদেশনিরপেক্ষ যে, নৈসর্গিক তত্ত্বার্থশ্রদ্ধা তাহা অপর পরোপদেশসাপেক্ষ। উক্ত মিথ্যাদর্শনাদিবশতঃ কিংবা যোগবশতঃ এবং কষায়যুক্ত বশিয়া জীবকর্ম্মভাবযোগ্য যে পদার্থ-সমূহ তাহাদিগকে যে গ্রহণকরে তাহাকে 'বন্ধ' বলে। আত্মা প্রদেশ সমূহেতে কর্ম্মের প্রবেশ বা সম্বন্ধ হওয়াকে 'বন্ধ' বলে। অস্রবকে নিরোধ করে যে তাহাকে 'সম্বর' বলে। আত্মার (জীবের) প্রদেশ হইতে কর্ম্মচনিয়ের এক দেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়াকে (ভিন্ন হইয়া যাওয়াকে) "মোক্ষ" বলে। এই দর্শনের দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। তার পর এই তত্ত্ব সকলের বিবরণ আরও বিস্তার রূপ মোক্ষশাস্ত্রের অনুবাদে বলিব)।

দ্রব্য পদার্থ বলে। দেবতাদিগের প্রতিমাতুল্য অর্থাৎ এইটী ইন্দ্র, এইটী রুদ্র, এইটী বিষ্ণু, এরূপে পাষাণ বা ধাতু-নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তিসমূহের যে, স্থাপনা হয় তাহাদিগকে 'স্থাপনা-জীব' বলে। গুণপর্য্যায়রহিত ও অনাদি পরিণাম বা রূপান্তর প্রাপ্তি স্বভাবযুক্ত এবং প্রজ্ঞা দ্বারা যাহাকে স্থাপিত করা হয় তাহাকে 'দ্রব্যজীব' বলে। অথবা ইহা ভঙ্গবর্জ্জিত হয়। যেমন অজীবরূপ হইতে বর্ত্তমান দ্রব্যের শ্রেষ্ঠরূপে দ্রব্যত্ব হইতে পারে তাহাই 'দ্রব্যজীব' হইবে। কিন্তু ইহা অনিষ্ট বা অনভিপ্রেত হয়; এবং ভাবদ্বারা ঔপশমিক, ক্ষায়িক, ক্ষায়োপশমিক, ঔদয়িক ও পারিণামিক, ভাব-দ্বারা যুক্ত, এবং উপযোগলক্ষণ সমন্বিত জীব সংসারী ও মুক্ত এবংবিধ দুই-প্রকার জীবের কথা পরে বলা যাইবে। এই নিয়মে অজীব আদি সকল পদার্থেতে নাম নিক্ষেপ বিধির অনুসরণ করা চাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শনতীর্থ-শাস্ত্রী।

কাম]

বিরহে।

মালতী মল্লিকা যূঁথি
সুরভিত বনবীথি
গোলাব করবী বেলা
পারুল ক'রেছে আলা;
মাধবী লতাটী ধীরে
জড়ায়েছে সহকারে;
চম্পক চামেলী কলি
আকুল বকুলগুলি,
কৌমুদী রজত ভাতি
চকোর রয়েছে মাতি
ঝরে সুধা নিরমল
জাগিছে তারকাদল

শোভিছে নিকুঞ্জ আজি
পুঞ্জ পুঞ্জ পুষ্পরাজি;
শুধুই বাজে না বেণু,
নাহি সে প্রাণের কানু
শূন্য নীপতরুবর
নাহি শাখে গোপবর
বিফল চাঁদনী যামী
সজনী লো শ্যামবিনি
প্রাণ করে হায় হায়
বুক না বাঁধিতে চায়
হ'ক দেহ অবসান
ক'রে শ্যাম নাম গান।

শ্রীলীলাদেবী।

কেন ?

১

হে চিরসুন্দর তব সুন্দর ভবনে
পাঠালে আমারে যবে করিবারে খেলা,
দিয়েছিলে সাজায়ে কতনা যতনে,
তুষিতে মানস মম কবলিত হেলা।

২

দিয়েছিলে মাতৃবক্ষে পীযূষনির্ঝর,
ততোঽধিক মধুময় অপার্থিব স্নেহ ;—
বিমল আনন্দ উৎস উল্লাস মুখর
প্রিয়পরিজন পূর্ণ সুখময় গেহ !

৩

দিয়েছ সুন্দর দেহ স্বাস্থ্যসুখ ভরা,
সদা হাস্যময় তাহে প্রফুল্ল যৌবন,
প্রেমময়ী প্রিয়ম্বদা প্রাণমনোহরা,
বিদ্যাবুদ্ধি পদৈশ্বর্য্য সুখের সাধন।

৪

সংসার সামগ্রী যত সকলি প্রচুর
দিয়েছ আমারে কিন্তু হৃদয়ের মাঝে
কি যেন অভাব এক রয়েছে অপূর—
কা'র তরে যেন স্থান শূন্য পড়ে আছে !

৫

অসার খেলনা পেয়ে ভুলি তোমা পাছে
তাই বুঝি অপূর্ণ অভাব দেছ হেন !
নহে এত সুখৈশ্বর্য্য আনন্দের মাঝে
লুকান এ দীর্ঘশ্বাস, ব্যাকুলতা কেন ?

কাশীচন্দ্র প্রধান বি, এ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পন্থার নূতন বৎসরের নূতন আয়োজন।

নানাবিধ দৈব বিপৎপাতে উৎপীড়িত হওয়াতে পন্থার কর্ম্মকর্ত্তাগণ যথাসময়ে পন্থা প্রকাশ করিতে না পারায় গ্রাহকদিগের নিকটে বড়ই লজ্জিত আছেন। এরূপ গোলযোগের মধ্যে পন্থা প্রকাশ করিতে পারিব এ বিষয়ে অল্পই আশা ছিল। ইহার উপর পন্থার কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় হঠাৎ কার্য্য ত্যাগ করায় আফিসের কার্য্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা হয়। কি সামাজিক জীবন কি ব্যক্তিগত জীবন, কি পত্রিকার জীবনে এইরূপ সুখ দুঃখ বিপদ্ সম্পদ্ প্রভৃতি বিরুদ্ধ ভাবের খেলা না হইয়া থাকিতে পারে না।

সে যাহা হউক, আগামী বৎসরের জন্য আমরা 'পন্থার' নূতন বন্দোবস্ত করিতেছি। সহৃদয় ধনী ও ভক্ত শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন বর্ম্মণ মহাশয় 'পন্থার' কার্য্য বিভাগের সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন। বৈশাখ মাস হইতে 'পন্থা' আফিস ১৫ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা তাঁহারই তত্ত্বাবধানে রহিল। গ্রাহকগণ পন্থার মূল্য পত্রাদি ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ উক্ত ঠিকানায় 'পন্থা' আফিসে তাঁহাকেই লিখিবেন। বড়ই সুখের বিষয় বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর মধ্যে বাঙ্গালী জাতির কর্ত্তব্যে শ্রীযুক্ত মদনমোহন বাবুর মত লোকের প্রবৃত্তি জন্মিল। কর্ম্ম বিভাগ আমার হস্ত হইতে আরও সুনিপুণ, সুদক্ষ ব্যক্তির হস্তে যাওয়াতে, 'পন্থার' সম্পাদকতা কার্য্যে বিশেষ অবসর পাইব বলিয়া আশা হয়। নূতন বৎসরের পন্থার বিশেষত্বের মধ্যে এইগুলি থাকিবে—(১) সন্ধ্যা বন্দনাদি হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দুর অনুষ্ঠান কর্ম্মগুলির গভীরতম মর্ম্ম পণ্ডিত ও ধ্যানী উভয়বিধ লেখকের সাহায্যে উদ্‌ঘাটিত হইয়া হিন্দুসমাজকে উপহার দেওয়া হইবে। হিন্দু দেখিবেন যে কি গভীরতম ভাবে বৈদিক ও তন্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানগুলি গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে।

(২) যোগানন্দ ভারতী মহাশয় তীর্থ দর্শন ও কুম্ভমেলা উপলক্ষে এদেশে না থাকাতে তাঁহার অনুভবসিদ্ধ প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয় নাই।

এক্ষণে তিনি সহজ যোগ, ভাগবতের উপদেশ প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিক ক্রমে লিখিতে আরম্ভ করিবেন। শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র মহাশয় বেদান্তের রহস্য মূলক প্রবন্ধ ধারাবাহিক ক্রমে প্রকাশ করিবেন।

(৩) বৈষ্ণব শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম নানাবিধ প্রবন্ধে প্রকাশিত হইবে।

(৫) দশমহাবিদ্যা তত্ত্ব সুরঞ্জিত চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

(৪) 'মহামায়ার খেলা' প্রণেতা আর একটি নূতন অথচ জীবনে সংঘটিত ঘটনাবলী সম্বলিত উপন্যাস আরম্ভ করিবেন।

"মহামায়ার খেলা" শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে; যাঁহারা জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে 'পন্থার' অগ্রিম দেয় মূল্য পাঠাইয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহারা অর্দ্ধ মূল্যে ঐ উপন্যাসখানি উপহার পাইবেন। অতএব আশাকরি সহৃদয় গ্রাহকগণ তৎপর হইয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন। ইতি ১২ই বৈশাখ, ১৩২২।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।